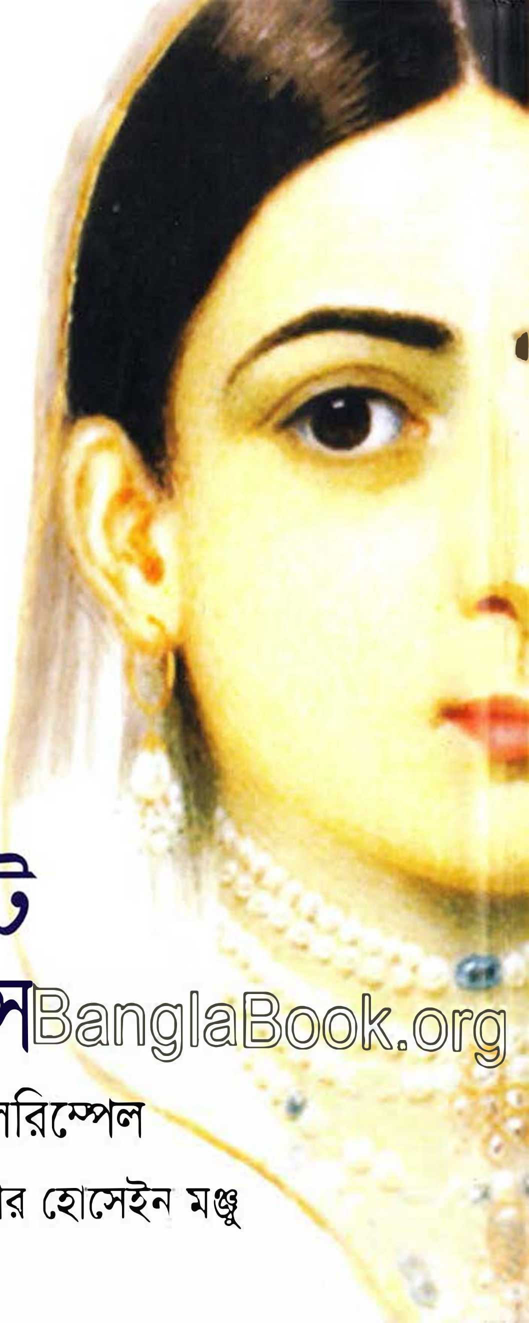

# হোয়াইট মোগলস

BanglaBook.org

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল

অনুবাদ আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

কর্নেল জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক হায়দরাবাদে নিজামের দরবারে বৃটিশ রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন ১৭৯৭ সাল থেকে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত। একটি জাতিকে পদানত করার বৃটিশ অভিপ্রায়ে তাঁর নাম স্মরণীয় রাখার অভিলাষ পোষণ করতেন তিনি। কিন্তু পরিবর্তে তিনি বিজয়ী হতে পারেননি, বরং তাকে পরাস্ত হতে হয়েছিল মোগল বংশোদ্ভূত অভিজাত নারী খায়রুন্নিসা বেগমের কাছে।

১৮০০ সালে তিনি খায়রুন্নিসার প্রেমে পড়েন, ইসলামী রীতি অনুসারে তাঁকে বিয়ে করে মোগল অভিজাতদের জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন এবং এক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনিশ শতাব্দীর প্রথম অংশ জুড়ে বহু বৃটিশ অফিসারের ভারতীয় রীতিনীতি ও ধর্ম গ্রহণ সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় অভিজাত পরিবারের সাথে বৈবাহিক সূত্রে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। বহু বছর পর ইতিহাসের এই অজানা দিকগুলো উঠে এসেছে উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল এর 'হোয়াইট মোগলস' গ্রন্থে।

তিনি বৃটিশ অফিসারদের অনেক উইল দেখেছেন, অনেকে তাদের সকল সম্পত্তির মালিকানা ন্যস্ত করেছেন তাদের ভারতীয় স্ত্রীদের উপর। 'হোয়াইট মোগলস' যদিও জেমস কার্কপ্যাট্রিক ও খায়রুন্নিসা বেগমের সত্যিকার প্রেমকাহিনি ভিত্তিক, কিন্তু বাস্তবে এটি ওই সময়ের বৃটিশ ও ভারতীয় অভিজাতদের সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশ। ড্যালরিম্পেল তার কাহিনিকে শুধু জেমস কার্কপ্যাট্রিক ও খায়রুন্নিসার প্রেম ও বিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ভারতে বৃটিশ পরিচালিত বাণিজ্য, সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা দিয়েও সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে। কাহিনীর দুঃখজনক দিক কার্কপ্যাট্রিকের মৃত্যু এবং খায়রুন্নিসা বেগমের দুই সন্তানকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়ার ঘটনা–যাদের সাথে আর কখনো খায়রুন্নিসার সাক্ষাৎ ঘটেনি। বহুকাল পর খায়রুন্নিসার তাঁর এক নাতনির সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে, পুরনো ঘটনাগুলোকে আবার মূর্ত করে তোলে।

'হোয়াইট মোগলস' উইলিয়াম ড্যালরিম্পেলের ব্যতিক্রমী এক সৃষ্টি, যা পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে এটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশে 'নালন্দা'র উদ্যোগ পাঠকদের জন্য অনন্য এক সংযোজন।

জন্ম শেরপুর জেলায়, ১৯৫৪ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯৭৭ সালে। ১৯৮৩ সালে জার্মানির বার্লিনে ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ জার্নালিজম থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা লাভ করেন। তিনি বৃটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স-এর প্রথম বাংলাদেশি ফেলো হিসেবে রয়টার্স-এর বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও রাজনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করেন ১৯৮৮-৮৯ সালে। ১৯৯২-৯৩ সালে কমনওয়েলথ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের ফেলোশিপ লাভ করে ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্সটিটিউট অফ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড পার্লামেন্টারি স্টাডিজ-এ সংবিধান ও পার্লামেন্টের ওপর পড়াশোনা করেন।

দীর্ঘ চার দশকের পেশাজীবনে তিনি বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে তার শেষ কর্মস্থল ছিল বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)। ১৯৮৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জনপ্রিয় মাসিক ম্যাগাজিন 'নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট'-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কারণে অনুবাদের কাজে হাত দেন এবং প্রায় তিন দশকে ৪৫টি পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, যার মধ্যে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক নাগিব মাহফুজ-এর *কায়রো ট্রিলজি*, *উইজডম অফ খুফু*, *থেবস অ্যাট ওয়ার*, আইভো অ্যানড্রিচ-এর *দ্য ব্রিজ অন্য দ্য ড্রিনা*, ভিএস নাইপল-এর *হাফ অ্যা লাইফ*, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর *মেমোরিজ অফ মাই মেলানকোলি হোরস*, ওরহান পামুক-এর *ইস্তাম্বুল: মেমোরিজ অ্যান্ড দ্য সিটি* উল্লেখযোগ্য।

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ : মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে এ কে আজাদ

হোয়াইট মোগলস

Welcome
to
www.BanglaBook.org

For more bangla translated books
please :

Click Here

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

# হোয়াইট মোগলস

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল

অনুবাদ আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

নালন্দা

ঘরে বসে বই পেতে লগ অন করুন
http:// rokomari.com/nalonda
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG


| | |
|---|---|
| হোয়াইট মোগলস | উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল |
| অনুবাদ | আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু |
| প্রকাশক | রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল |
| | নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার |
| | (মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০ |
| প্রচ্ছদ | মূল বই অবলম্বনে এ কে আজাদ |
| নালন্দা প্রথম প্রকাশ | ফেব্রুয়ারি ২০১৭ |
| মুদ্রণ | শামীম প্রিন্টিং প্রেস |
| বর্ণবিন্যাস | নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ |
| ফোন | ০২-৯৫৯০৬১৭ |
| মূল্য | ৬৫০.০০ টাকা মাত্র |
| যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন |
| যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক | মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক |


© Writer


| | |
|---|---|
| White Mughals | William Dalrymple |
| Translated by | Anwar Hossain Manju |
| Publisher | Redwanur Rahman Jewel |
| | Nalonda |
| | 38/4 Banglabazar (Mannan Market) |
| | 2nd Floor Dhaka-1100 |
| Cover Design | A K Azad |
| First Published | February 2017 |
| Printers | Nalonda Printers |
| Compose & Make-up | Nalonda Computer Department |
| Phone | 02-9590617 |
| Price | 650.00 Taka Only |
| ISBN | 978-984-92329-0-2 |
| E-mail | nalonda_10@ yahoo.com |

# ভূমিকা

জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারি ১৯৭৭ সালে হায়দারাবাদে বেড়াতে গিয়ে। নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের স্মৃতিজড়িত শিয়া সম্প্রদায়ের শোক পালনের মাস মহরমের মাঝামাঝি সময়। চার বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টান ধর্মীয় স্থানগুলোর ওপর একটি গ্রন্থের কাজ সবে শেষ করেছি এবং বলা যায়, এ কাজ করতে গিয়ে আমি ঝলসে গেছি। আমার টেবিল থেকে দূরে থাকার জন্যে এবং বইপত্রে ঠাসা শেলফ থেকে পালাতে, একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে নিজেকে মর্জির ওপর ছেড়ে দিয়ে আবার লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতেই আমার হায়দারাবাদ আগমন।

তখন বসন্তকাল। পায়ের নিচে মসজিদের পাথরের চাতালও উত্তপ্ত এবং প্রাচীন নগরীর পবিত্র স্থানগুলো এখন পূর্ণ কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার ওপর উর্দু মর্সিয়া গাওয়ার জন্যে সমবেত কালো বস্ত্রে আচ্ছাদিত মহরমের শোক জ্ঞাপনকারীদের দ্বারা। মনে হয়, যেন হোসাইন মাত্র এক সপ্তাহ আগে নিহত হয়েছেন, সপ্তম শতাব্দীতে নয়। এ কারণে ভারতের এই নগরী আমার প্রিয়।

তাছাড়া, এই নগরী তুলনামুলকভাবে অনাবিষ্কৃত এবং অলিখিত, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় এবং এটি গোপন এক নগরী। আগ্রার জাঁকজমকপূর্ণ সৌধ এবং উত্তর ভারতের রাজপুত নগরীগুলোর চাইতে হায়দারাবাদ বহিরাগতদের দৃষ্টি থেকে তার সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রেখেছে। কৌতূহলী চোখ থেকে নিজের ঐশ্বর্যকে বর্ণনার অতীত প্রাচীরের পর্দার আড়ালে ও গলিপথের গোলক ধাঁধার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। কারো পক্ষে শুধু মন্থর গতিতে একটি প্রাচিরবেষ্টিত বিশ্বে প্রবেশ সম্ভব, যেখানে ফোয়ারা থেকে তখনো পানি ঝরছে, বাতাসে গাছের ডালে ফুল ঝুঁকে পড়েছে এবং আমে পূর্ণ গাছের ডালে বসে ময়ূর ডাকছে। সেখানে রাস্তা থেকে লুকানো নিরন্তর এবং প্রশান্ত এক জগৎ, ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাওয়া ভারতীয় ইসলামী সভ্যতার সর্বশেষ এক বুরুজ। একজন শিল্প ইতিহাসবিদের বর্ণনা অনুসারে, 'প্রাচীনপন্থী হায়দারাবাদি ভদ্রলোকরা এখনও মাথায় ফেজ টুপি ধারণ করেন, গোলাপ এবং বুলবুলের স্বপ্ন দেখেন এবং গ্রেনাডা হারানোর জন্যে শোক প্রকাশ করেন।'

পুরনো নগরী থেকে আমি গোলকুণ্ডার পার্বত্য দুর্গ দেখতে যাই। ছয়শ' বছর ধরে গোলকুণ্ডা ছিল সেই অঞ্চলের খনি থেকে আহরিত হীরকের দৃশ্যত বাধাহীন স্রোতের ভাণ্ডার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'নতুন বিশ্বে'

এসব মূল্যবান পাথরের উৎস সম্পর্কে জানার আগে গোলকুণ্ডাই ছিল হীরকের একমাত্র জ্ঞাত উৎস। প্রাচীর অতিক্রম করার পরই একটির পর একটি হারেম ও হাম্মাম, প্রাসাদ এব প্রমোদ উদ্যান। ১৬৪২ সালে ফরাসি জুয়েলার জীন ব্যাপ্টিস্ট টাভারনিয়ার গোলকুণ্ডা সফরকালে সেখানকার লোকজনকে দেকতে পান কিছুটা সম্পদশালী, কিন্তু স্থাপত্যের অবস্থা জীর্ণ। তিনি লিখেছেন, শহরে বিশ সহস্রাধিক তালিকাভুক্ত দরবারি আছেন, যারা প্রতি শুক্রবার পালা করে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

অত্যন্ত রোমান্টিক এবং দরবারি পরিবেশ ক্ষয়িষ্ণু হলেও আমি শিগ্‌গির আবিষ্কারে সক্ষম হই, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশরা হায়দারাবাদে পৌঁছার পরও অবক্ষয়ের মন্থর ধারা অব্যাহত ছিল। পুরনো ব্রিটিশ রেসিডেন্সি, যেখানে এখন ওসমানিয়া মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অবস্থিত, সেটি ছিল গ্রিক স্থাপত্য কৌশলে নির্মিত বিশাল এক প্রাসাদ। এর স্থাপত্য সমসাময়িককালে নির্মিত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজের মতো নয়। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত ভবনগুলোর মধ্যে এটি অত্যন্ত নিখুঁত। পুরনো শহরের বাইরে মুসি নদীর তীরে বিশাল সুরক্ষিত উদ্যানের মাঝে এই প্রাসাদ।

তখনকার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক এই প্রাসাদের নির্মাতা বলে আমাকে জানানো হয়েছে, যিনি ১৭৯৭ ও ১৮০৫ সালের মধ্যে হায়দারাবাদের দরবারে দূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। কার্কপ্যাট্রিক দৃশ্যত হায়দারাবাদি পোশাক পরতেন এবং তার জীবনধারাও হায়দারাবাদের অধিবাসীদের মতো ছিল। কাহিনি অনুসারে, তিনি হায়দারাবাদে পৌঁছার অল্প কিছুদিন পরই দিওয়ানের (প্রধানমন্ত্রী) ভাগ্নির প্রেমে পড়েন এবং ১৮০০ সালে মুসলিম আইন ও রীতি অনুসারে খায়রুন্নিসাকে বিয়ে করেন।

পুরনো রেসিডেন্সি ভবনে আমি দেখেছি সাবেক বলরুমের এবং দরবার হলের সিলিং থেকে বড় বড় আকৃতির পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে। দোতলায় শয়নকক্ষগুলো একেবারেই বাজে রূপ ধারণ করেছে। কক্ষগুলো এখন শূন্য ও পরিত্যক্ত, যত্রতত্র বাদুড় এবং কখনো কখনো প্রণয়ী কবুতর যুগল চোখে পড়ে। নিচতলার বিশাল ডিম্বাকৃতির জায়গাটিকে হার্ডবোর্ড দিয়ে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে কলেজ কর্মকর্তাদের অফিস করা হয়েছে। ভবনের কেন্দ্রীয় অংশ ছাত্রদের জন্যে বিপজ্জনক বিবেচিত হওয়ায় অধিকাংশ ক্লাস এখন অনুষ্ঠিত হয় ভবনের পেছনে হাতির আস্তাবলে।

অর্ধ বিধ্বস্ত দশার মধ্যেও সহজেই আন্দাজ করা যায় যে, এককালে রেসিডেন্সি ভবনটি কতো চমৎকার ছিল। ভবনের দক্ষিণে মুসি নদীর ওপর সেতুর মুখোমুখি বিশাল বিজয় তোরণের দিকে জাঁকজমকপূর্ণ অর্ধবৃত্তাকৃতির একটি স্থান গম্বুজ শোভিত। উত্তর দিকে একজোড়া সিংহের মূর্তি, সামনের দিকে থাবা বের করা। সিংহ দুটি তাকিয়ে আছে বিশাল এলাকা জুড়ে সাজানো ইউক্যালিপটাস, মালসারি ও কাসুরিনা গাছের বনের দিকে। ইস্ট

BanglaBook.org

ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিটি ইঞ্চি স্থানকে জাঁকজমক ও আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে চেয়েছিল। এরপরও পেছনের কম্পাউন্ডে অপেক্ষা করছিল এক বিস্ময়।

রেসিডেন্সির পেছনে উদ্যানে স্ত্রীর জন্যে কার্কপ্যাট্রিকের প্রেমের একটি ধ্বংসপ্রায় নমুনা দেখানো হলো। আমার ধারণা কাহিনিটি প্রামাণ্য নয়, কিন্তু চমৎকার। তা হচ্ছে, খায়রুন্নিসা সারা জীবন কঠোর পর্দার মধ্যে বাস করেছেন এবং কার্কপ্যাট্রিকের উদ্যানের পিছনে পৃথক একটি 'বিবিঘরে' থাকতেন। স্বামীর নির্মিত বিশাল ভবনের বিস্ময়কর পোর্টিকোর প্রশংসা করার জন্যে তিনি এর পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত রেসিডেন্টকে একটি উপায় বের করতে হয় এবং তিনি স্ত্রীর জন্যে তার নতুন প্রাসাদের একট প্লাস্টার মডেল তৈরি করেন, যাতে তিনি প্রাসাদের বিস্তারিত পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কাহিনির সত্যতা যাই থাকুক না কেন, ১৯৮০'র দশকে মডেলটির ওপর একটি গাছ পড়ে এর ডান অংশটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি ভালোভাবে টিকে ছিল। বাম অংশ এবং কেন্দ্রীয় অংশ মোগল বিবিঘরের ধ্বংসাবশেষের কাছে একটি ঢেউটিনের নিচে রাখা আছে। লতাপাতায় আচ্ছাদিত এবং অযত্নে বর্ধিত জঙ্গলে পূর্ণ জায়গাটি এখনও 'বেগমন বাগিচা' বলে পরিচিত। আমার মনে হয়েছে, কাহিনিটি চমৎকার এবং আমি যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত ছিলাম। কাহিনির আরও জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। ভারতে ব্রিটিশদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত কোনোকিছুর চাইতে এ কাহিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং রোমান্টিক। হায়দারাবাদে আমার অবশিষ্ট সময় আমি শুধু খুঁজে ফিরেছি যে, কার্কপ্যোট্রিক সম্পর্কে আমাকে কে আরও বেশি তথ্য দিতে পারবে। আমাকে খুব বেশি অনুসন্ধান করতে হয়নি। ড. জেবুন্নিসা হায়দার পুরনো রেসিডেন্সির তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত একটি অংশে বোরখা পরিহিতা ছাত্রীদের পড়ান। তিনি বয়োবৃদ্ধা ফারসি শিক্ষিকা। ড. জেবুন্নিসা আমাকে জানান যে, তিনি হায়দারাবাদের এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী রুকন-উদ-দৌলাহর বংশধর। তিনি যে শুধু কাহিনির কিছু অংশের সাথে পরিচিত তাই নয়, বরং সমসাময়িক বহু ফারসি ও উর্দু বিররণীতে যে এই কাহিনির উল্লেখ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও বিশদ জানেন।

ড. জেবুন্নিসার মতে, কাহিনির হায়দারাবাদি উৎসগুলো কার্কপ্যাট্রিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছে যে, প্রেমিকা খায়রুন্নিসাকে বিয়ে করার জন্যে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এসব উৎস একথাও বলেছে যে, কার্কপ্যাট্রিকের বিয়ে সংক্রান্ত কেলেংকারি সত্ত্বেও তিনি হায়দারাবাদে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। লোকজনের সঙ্গে অবাধে মিশতেন এবং শহরের বাসিন্দাদের আচার-আচরণ আয়ত্ত্ব করতেন। ড. জেবুন্নিসা 'তারিখ-ই-খুরশিদ জাবি' নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থের একটি বাক্য স্মরণ করেন, 'এ দেশের মহিলাদের সাচহচর্যের ক্ষেত্রে তার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তিনি হায়দারাবাদের আচরণ ও শালীনতার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে

Banglabook.org

নিয়েছিলেন।' কিছু ফারসি রচনাতেও এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, শেষ দিকে কার্কপ্রাট্রিকের রাজনৈতিক আনুগত্য ব্রিটিশদের তুলনায় 'নিজাম' অর্থাৎ হায়দারাবাদের শাসকের প্রতি বেশি ছিল। এই কাহিনির কোনো কিছুই কখনো ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি এবং এই ভূখণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যের উর্দু অথবা ভারতীয় ধাঁচের ফারসিতে লেখা পাণ্ডুলিপি, যা গুটিকয়েক প্রবীণ হায়দারাবাদি ইসলামী চিন্তাবিদ ছাড়া আর কারো পক্ষে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এক রাতে আমি কার্কপ্যাট্রিকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল মাইকেল জোয়াদিন রেমন্ডের সামাধি পরিদর্শন করি। রেমন্ত নিজামের সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত রিপাবলিকান ফরাসি সৈনিক ছিলেন। কার্কপ্যাট্রিকের মতই তিনি হায়দারাবাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। কার্কপ্যাট্রিকের দায়ত্ব ছিল হায়দারাবাদিদের ব্রিটিশমুখী করা, আর রেমন্ড চেষ্টা করতেন নিজামকে ফরাসিদের মিত্রে পরিণত করতে। মৃত্যুর পর তাকে শহরের বাইরে মালাখপেটে ফরাসি সেনানিবাসের ওপর পর্বতে অবস্থিত ছোট্ট গ্রিক মন্দিরের পাশে কবরস্থ করা হয়।

রেমন্ড যে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে তার কবরের ওপর কোনো খ্রিস্টান ক্রস বা অন্যকিছু না থাকায়ও তা প্রমাণিত হয়। তিনি হিন্দু না মুসলিম ছিলেন সে সম্পর্কে অবশ্য তার হায়দারাবাদি ভক্তরা অনিশ্চিত। তার হিন্দু সিপাহীরা মঁসিয়ে রেমন্ডের নামের সংস্কৃতকরণ করে 'মুসা রাম' হিসেবে। অপরদিকে মুসলিম সিপাহীরা তাকে জানতো 'মুসা রহিম' বলে—অর্থাৎ আরবি রহিমের অর্থ ক্ষমাশীল। নিজাম স্বয়ং অন্যান্যর মতোই অনিশ্চিত ছিলেন, যিনি রেমন্ডের মৃত্যুবার্ষিকী ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতিতে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রতিবছর ২৫ মার্চ। সেদিন তিনি রেমন্ডের সমাধিতে এক বাক্স চুরুট এবং এক বোতল বিয়ার পাঠাতেন। ভারতের স্বাধীনতার পর শেষ নিজাম অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবার পূর্ব পর্যন্ত এই রীতি চালু ছিল। কিন্তু যেহেতু আমি তার মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে হায়দারাবাদে উপস্থিত ছিলাম, সেজন্যে আমার জানার ঔৎসুক্য ছিল যে রেমন্ডের কোনো স্মৃতি বেঁচে আছে কি-না।

যখন রেমন্ডের সমাধি নির্মাণ করা হয় তখন এটি ছিল হায়দারাবাদ শহরের প্রাচীর থেকে বেশ কয়েক মইল দূরে এক বিচ্ছিন্ন নির্জন পাহাড়ের ওপর। কিন্তু সাম্প্রতিককালের দ্রুত নগরায়নে হায়দারাবাদ ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম নগরীতে পরিণত হওয়ায় রেমন্ডের সমাধির আশেপাশের সব জায়গা দখল হয়ে গেছে। অতএব সমাধি সংলগ্ন খুব কম সংখ্যক পর্বতই এখন নতুন বাংলো এবং হাউজিং এস্টেটের জন্যে শূন্য পড়ে আছে। আমি রাস্তার মাথায় গাড়ি রেখে পর্বত শিখরে মন্দিরের দিকে উঠতে শুরু করি। শহরের রাতের লালচে আকাশের বিপরীতে মন্দিরটি স্পষ্ট দৃশ্যম্যান ছিল। কাছে যেতে যেতে আমি স্তম্ভগুলোর মাঝে কম্পিত ছায়া লক্ষ্য করি। নিকটবর্তী হতেই বুঝতে পারি মন্দিরের পেছনে সমাধি সৌধে মাটির প্রদীপ

জ্বালানোর কাজে নিয়োজিতদের অবয়ব সেগুলো। হতে পারে, তারা আমাকে আসতে দেখেছে। কারণ যাই হোক না কেন, আমি সমাধিকে পৌঁছার সময়ের মধ্যেই তারা যেন মিলিয়ে গেল। সৌধের ওপর স্থপিত তাদের নৈবেদ্য, কিছু সংখ্যক নারিকেল, কয়েকটি আগরবাতি, গাঁদা ফুলের কিছু মালা ও সাদা রঙের মিষ্টি প্রাসাদের কয়েকটির স্তূপ পেছনে ফেলে আমি সমাধিতে পৌঁছলাম।

লন্ডনে ফিরে গিয়ে আমি কার্কপ্যাট্রিক সম্পর্কে আরও তথ্য অনুসন্ধানে লেগে গেলাম। ভারতে ব্রিটিশ রাজের স্থাপত্যের ওপর বেশ কিছু গ্রন্থে তার রেসিডেন্সি এবং তার বেগমের অস্তিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ আছে; কিন্তু বিস্তারিত কোনো বিবরণ নেই। মনে হয়, এটুকু তথ্যও নেওয়া হয়েছে ১৮৯৩ সালে 'ব্ল্যাকউডস ম্যাগজিনের' একটি নিবন্ধ 'দ্য রোমান্টিক ম্যারেজ অফ জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক' থেকে, যেটি লিখেছিলেন কার্কপ্যাট্রিকের এক আত্মীয় এডওয়ার্ড স্ট্রাচে।

আমি যখন কার্কপ্যাট্রিক ও তার ভাই উইলিয়ামের মধ্যে বিনিময় করা চিঠিগুলো দেখলাম, তখন সত্যিসত্যিই আসল তথ্য লাভের একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হলো। চিঠিগুলো সংরক্ষণ করেছেন কার্কপ্যাট্রিকের উত্তরাধিকারী স্ট্রাচে পরিবার, যেগুলো সম্প্রতি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি কিনে নিয়েছে। চিঠিগুলোর এক একটি খণ্ডে বাঁধাই করে শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল-'ফ্রম মাই ব্রাদার জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক' (কালের চক্রে চিঠির কাগজ ধূসর ও লেখা ম্লান হয়ে গেছি), এছাড়া গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির সাথে কার্কপ্যাট্রিককের মধ্যে লেখা সরকারি চিঠিপত্রের চামড়ায় বাঁধাই করা কয়েকটি খণ্ড, ফারসিতে লেখা বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি, কয়েক বাক্স রসিদ এবং বড় আকৃতির একটি এনভেলাপে রাখা একটি উইল—যাতে প্রতিটি জীবনীকারের স্বপ্ন যা থাকে, সেরকম বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে।

প্রথম দিকের চিঠিগুলোর অধিকাংশ হতাশাব্যঞ্জকভাবে একঘেঁয়ে: দরবারের রাজনীতি সম্পর্কে কথাবার্তা, তথ্য জানার জন্য কলকাতা থেকে অনুরোধ, এক ঝুড়ি ম্যাডেইরা পাঠানোর তাগিদ-অথবা কোনো ধরনের সব্জি, যা কার্কপ্যাট্রিক হায়দারাবাদের বাজারে পাননি, যেমন, আলু এবং মটর। এগুলো যথেষ্ট মজার প্রসঙ্গ, কিন্তু প্রথমে মনে হবে তুলনামূলকভাবে অনুল্লেখ্য। পাগলের মতো যা খুঁজছিলাম—কার্কপ্যাট্রিকের ধর্মীয় অনুভূতি অথবা তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, তাও কিছু উল্লেখ পাওয়া গেল। কিন্তু অধিকতর আগ্রহের বিষয়গুলো খুঁজে পাওয়া গেল সরকারি গোপনীয় পত্রাদিতে। যখন কার্কপ্যাট্রিক তার প্রণয়ের প্রসঙ্গ বলতে শুরু করেছিলেন অথবা তিনি যে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজে জড়িত হয়েছিলেন, তখন থেকে তার সুস্পষ্ট ও ধীরস্থির কলমনবিশি হারিয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ চিঠির অব্যক্ত কথার মধ্যে।

BanglaBook.org

কয়েক সপ্তাহ ধরে এসব চিঠি পড়ার পর আমি খায়রুন্নিসা সম্পর্কিত চিঠির ফাইলে হাত দিলাম এবং এসব চিঠি বেশ কিছু লিখিত আকারে উদ্ধার করা হয়নি, সাংকেতিক বার্তা হিসেবেই আছে। একদিন আমি ইন্ডিয়া অফিসের আরেকটি ফাইল ধরলাম। একটি চিঠির অংশ বিশেষের ওপর আমার দৃষ্টি স্থির হলো, ছোট অক্ষরে দৃঢ়তার সাথে লেখা—

> "ভূমিকা হিসেবে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়তো ভুল হবে না যে, এক রাতে আমি আমার প্রেমিকার সাথে মধুময় সময় কাটিয়েছি, যা এই চিঠির চমকপ্রদ বিষয়। এই মধুর সাক্ষাতে আমি পরিপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠভাবে তাকে মনোমুগ্ধকর দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী দেখে বিস্মিত হয়েছি—আমাদের সাহচর্য স্থায়ী ছিল রাতের অধিকাংশ সময় জুড়ে এবং এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তার নানি ও মা-এর পরিকল্পনা ছিল এটি, তার ওপর যাদেও ব্যাপক প্রভাব ছিল, যারা তাকে তার উন্মত্ত আগ্রহে সম্মতি দিয়েছিলেন। যেহেতু এই সাক্ষাৎ হয়েছে আমার বাড়িতে, অতএব আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলাম। আমার সামনে উপস্থাপিত উত্তেজনাকর নৈবেদ্য গ্রহণে এবং যদিও ঈশ্বর জানেন যে, এই কর্মের জন্যে আমি তেমন যোগ্য নই, সেজন্য আমি যৌবনবতী লোভনীয় সৃষ্টির কাছে বরং যুক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করেছিলাম। সে ব্যগ্রতার সাথে বারবার আমাকে বললো যে, তার ভালোবাসা অনিবার্যভাবে শুধু আমারই জন্যে এবং তার ভাগ্য আমার ভাগ্যের সাথে যুক্ত। আমার নগন্য পরিচারিকা হিসেবেও আমার সাথে কাটাতে পারলে সে পরিতৃপ্তভাবে তার জীবন কাটাতে পারবে।"

এর কিছু পরই আমি সাংকেতিকভাবে লেখা কিছু পৃষ্ঠা পাই, যেগুলো সেই পৃষ্ঠাগুলোর ওপরই অনুবাদ করা হয়েছে এবং সবগুলোকে একটি চিঠিতে রূপ দেয়া হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ায় পুরো কাহিনি দ্রুত একসাথে আসতে শুরু করল।

আরও একটি বড় সুযোগ এল যখন এই প্রেমঘটিত ব্যাপারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তদন্ত সংক্রান্ত গোপন একটি দলিল আমার হাতে পড়ল, যাতে সাক্ষীদের শপথ থেকে তদন্তের বিস্তারিত বিরবণ, খোলামেলা জেরা এবং বাধাহীন উত্তর রয়েছে। এটি পাওয়ার পর আমার মনে যে সন্দেহ ছিল তা দূর হয়ে গেল এবং আমি নিশ্চিত হলাম যে, এই গ্রন্থের জন্যে এখানেই রয়েছে আছে বিস্ময়কর সব উপকরণ।

চার বছর ধরে আমি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ঘুরাফেরা করেছি। এরপর দিল্লি ও হায়দারাবাদের আর্কাইভে পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটেছি। ভারতে কোনো কাজের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই সমস্যা থাকবেই। দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্কাইভসে যিনি নতুন করে এয়ার কন্ডিশনিং-এর কাজ করছিলেন তিনি ভুলবশত হায়দারাবাদ রেসিডেন্সি রেকর্ডের ছয় শত খণ্ড খোলা জায়গায় ফেলে রেখেছিলেন। তখন ছিল বর্ষাকাল। পরবর্তী বছর

আমি যখন রেকর্ডগুলো দেখতে দ্বিতীয় দফা সেখানে যাই, তখন অধিকাংশ খণ্ড ব্যবহারের অযোগ্য এবং যেগুলো পানিতে ভেজেনি সেগুলোর চারদিকে পড়েছে সবুজ আস্তরণ। কয়েকদিন পর একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এ ধরনের আস্তরণ বিপজ্জনক এবং ছয়শত খণ্ডকে বাষ্পীভবনের জন্যে পাঠানো হবে। আমি এই রেকর্ডগুলো আর কখনো দেখিনি।

সেই একই বর্ষাকালে মুসি নদী হায়দারাবাদ শহরকে প্লাবিত করে ফেলেছিল এবং বিবিসি টেলিভিশন প্রদর্শন করে কীভাবে আর্কাইভের লোকজন শহরের পুরনো অংশের কাপড় শুকানোর দড়িতে ঝুলিয়ে তাদের অবশিষ্ট দুর্বল সংগ্রহ শুকাচ্ছে।

এই বিপর্যয় ও বাধাগুলো সত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্রেম কাহিনি তার রূপ নিতে শুরু করে। এটা পোলারয়েড ক্যামেরায় ছবি বের হয়ে আসা দেখার মতো; সরু প্রান্তরেখা ক্রমে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সাদা অংশগুলো রং-এ পূর্ণ হতে থাকে।

কিছু মুহূর্ত থাকে যখন রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। হায়দারাবাদের আমার তিনবারের সফরে আমি অনেকগুলো আর্কাইভ ঘেঁটেছি। এতে কয়েক মাস সময় লেগেছে। চারমিনারের পেছনে পুরনো শহরের বাজারে উপহার সামগ্রী কেনার জন্যে শেষ সফরের সময় শেষ বিকেলে ঘুরছিলাম। দিনটি ছিল রোববার এবং চক প্রায় বন্ধ ছিল। আমার পরিবারের জন্যে আমি কিছু নিতে পারিনি। আমাকে ঘড়ির দিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছিল। কারণ আর মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লিগামী বিমান ছেড়ে যাবে। ব্যস্ততার সাথে আমি এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঘুরছিলাম এমন কাউকে খুঁজছিলাম, যিনি আমার কাছে হায়দারাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধাতব পাতে খচিত সামগ্রী বিক্রি করবেন, যা 'বিদ্রি' হিসেবে পরিচিত। হঠাৎ একটি ছেলে আমাকে একটি দোকানে নিয়ে যেতে চাইল, যেখানে আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পেতে পারি। আমাকে চক মসজিদের গলিতে নিয়ে গেল সে এবং সেখানে থেকে আরও সরু এক গলিতে তার কথিত দোকানে, সেখানে আমি 'বিদ্রি' বাক্স খুঁজে পাব।

আসলে দোকানটি বাক্স বিক্রি করে না, বরং বই বিক্রি করে। আমার গাইড বিদ্রি 'বক্সেস' কে হয়তো ধরে নিয়েছি 'বুকসিস'। যাহোক, সেই দোকানের বইগুলো উর্দু বা ফারসি পাণ্ডুলিপির বাইরে কিছু নয় এবং মুদ্রিতাকারে অত্যন্ত দুর্লভ কিছু বিবরণী। ষাট ও সত্তরের দশকে শহরের অভিজাত প্রাসাদগুলো যখন খালি করে ভেঙে ফেলা হচ্ছিল, তখন দোকান মালিক প্রাচীন হায়দারাবাদি লাইব্রেরি থেকে এগুলো কিনে নিয়েছিলেন। সেগুলো এখন ছোট্ট, জীর্ণ প্রায় অন্ধকার এক কক্ষে ধুলিময় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত স্তূপ করে রাখা হয়েছে। তাকে যখন আমি আমার লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বললাম তখন বই-এর বিরাট এক স্তূপের নিচে থেকে বড় আকৃতির জরাজীর্ণ একটি ফারসি বই বের করলেন। আব্দুল লতিফ শুস্তারি লিখিত 'কিবাত-তুহফাত-আস-আলম'। কার্কপ্যাট্রিকের চিঠিতেই আমি

লেখকের নামটি পড়েছি। তিনি ছিলেন খায়রুন্নিসার চাচাতো ভাই। তার গ্রন্থটি ছয়শত পৃষ্ঠার অনবদ্য এক আত্মজীবনী। কার্কপ্যাট্রিকের সাথে খায়রুন্নিসার বিয়ের পর নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ার পরই হায়দারাবাদে এটি লেখা হয়েছিল। দোকানে আরও অনেক পাণ্ডুলিপি ছিল, যার একটি তখনকার যুগের অত্যন্ত দুর্লভ হায়দারাবাদি ইতিহাস গ্রন্থ 'গুলজার-ই-আসাফিয়া'। বিকেলের অবশিষ্ট সময় আমি দোকান মালিকের সাথে দরকষাকষি করে চারশ পাউন্ড দরিদ্র হয়ে পড়ি, কিন্তু ইতোপূর্বে অনুবাদ হয়নি, এমন প্রাথমিক কিছু উৎসের বিবরণী ভর্তি ট্রাংক নিয়ে আমি স্থান ত্যাগ করি। সেসবরে বিষয়বস্তুই রূপ দিয়েছে এই গ্রন্থের।

২০০১ সাল পর্যন্ত আমি চার বছর গবেষণার কাটিয়েছি এবং অবস্থা এমন হয়েছে, যেন আমি কল্পনায় কার্কপ্যাট্রিকের কণ্ঠ শুনতে পাই, তার চিঠিগুলো বারবার পড়ি। তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু শূন্যতা ছিল। বিশেষ করে ইন্ডিয়া অফিসের দলিলে ১৮৯৩ সালে ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনের নিবন্ধে কার্কপ্যাট্রিকের মৃত্যুর পর খায়রুন্নিসার কি হয়েছিল তার শুধু উল্লেখ ছাড়া বিস্তারিত কিছু নেই। এ প্রশ্নের দুঃখজনক উত্তর খুঁজে পাবার আগে আমাকে আরও নয় মাস ধরে অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে অক্সফোর্ডে বডলিয়ান লাইব্রেরিতে রক্ষিত হেনরী রাসেলের দলিলপত্র নিয়ে। যে কাহিনি কখনো বলা হয়নি এবং কার্কপ্যাট্রিকের সমসাময়িকদের কাছেও অজানা ছিল বলে মনে হয়—সে তথ্য 'ম্যাডাম বাটারফ্লাই'-এর কাহিনির অনুরূপ। দিনের পর দিন সুরক্ষিত ডিউক অফ হামফ্রে লাইব্রেরির বুকশেলফের অন্ধকারে আমি দ্রুত রাসেলের প্রায় অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া লেখাসমৃদ্ধ জীর্ণ চিঠিগুলো পাঠ করার পর বিয়োগান্তক প্রেম কাহিনি ধীরে ধীরে আমার সামনে পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করে।

অবশেষে আমি লিখতে শুরু করার আগে কার্কপ্যাট্রিক ও খায়রুন্নিসার নাতির নাতির কাছে রক্ষিত পারিবারিক দলিলপত্রের সংগ্রহ আমার ওয়েস্ট লন্ডনের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই আছে বলে দেখা গেল। এর ফলে কাহিনি সম্প্রসারিত হয়েছে খায়রুন্নিসার কন্যা কিটি কার্কপ্যাট্রিকের চমকপ্রদ কাহিনি পর্যন্ত। তিনি প্রথমে লালিত হয়েছেন 'সাহিব বেগম' হিসেবে। হায়দারাবাদে অভিজাত মুসলিম হিসেবে ছিলেন। চার বছর বয়সে তাকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং লন্ডনে পৌঁছার পরই খ্রিস্টান নামকরণ করা হয়। এরপর মায়ের সঙ্গে সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার। পরবর্তীতে তিনি ভিক্টোরিয়ান লিটারারি সোসাইটির অভিজাত সদস্য হয়েছিলেন এবং তার জ্ঞাতি ভাই এর শিক্ষক টমাস কার্লাইলের প্রেমে পড়েন। এ পর্যায়ে তিনি কার্লাইলের উপন্যাসের নায়িকা 'প্রাচ্যের আলো আনয়নকারীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী, ব্লুমিনে পরিণত হন।

পারিবারিক দলিলপত্রের শেষদিকে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাক্রম দেখা যায় যে কিটি যখন পূর্ণবয়স্ক তখন তার হায়দারাবাদি দাদির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এব আবেগময় পত্র বিনিময় প্রায় চল্লিশ বছরের

BanglaBook.org

ব্যবধানে দুই মহিলাকে পুনরায় মিলিত করে। তাদের চিঠিগুলো ছিল সুলিখিত এবং বেদনায় পরিপূর্ণ। কারণ ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির কারণে দুটি জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এর সাথে জড়িত হয়েছিল ভাগ্য এবং রাজনীতি। একজন লিখতেন টরকোয়ের সমুদ্র তীরবর্তী ভিলা থেকে ইংরেজতে, আরেকজন সে চিঠির উত্তর দিতেন হায়দারাবাদের এক হারেম থেকে। ফারসিতে তিনি বলতেন তার কাতিবকে। কাগজের ওপর সোনালি রঙের গুঁড়া ছিটিয়ে লিখতেন এবং চিঠি ভরে দিতেন সোনালি ব্রোকেডের সিলমোহর করা থলে মোগল আমলের 'খারিতায়'। কিটির কাছে লেখা তার দাদির চিঠিতে প্রকাশ প্রেয়েছে যে কিভাবে তার বাবা মা'র সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তারা প্রেম পড়েছে, যা এক পর্যায়ে খায়রুন্নিসার ভাগ্যের দুঃজনক পরিণতি ডেকে এনেছে।

তিন প্রজন্ম ধরে খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামের মধ্যে বিভক্ত একটি পরিবার, যাদের অনেকে আবার নিজ ধর্মে ফিরে গেছে, স্যুট ও সালোয়ারের ব্যবহার, মোগল হায়দারাবাদ ও লণ্ডনের রিজেন্সি, সবকিছু প্রচুর প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ এবং তাদের সাম্রাজ্যের প্রকৃতি, তাদের বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত পরিচিতি ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং কতোটা নির্ধারিত ও পরিবর্তনের অযোগ্য ছিল অথবা এগুলো নমনীয় বা আলোচনাযোগ্য ছিল কি-না। কখনো মনে হয়, এটা কোনো সাম্যজ্যের দ্বৈত নীতির অংশ-শাসক ও শাসিতের, সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সেনাপতিদের, উপনিবেশবাদী ও উপনিবেশী, সবকিছু ভেঙে পড়েছিল। ধর্ম, বংশ ও জাতীয়তাবাপদের সহজ পরিচিত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ইতিহাসবিদরা, যার ফলে ইতিহাস বিস্ময়করভাবে অস্থিতিশীল। তবুও আমাকে যা মুগ্ধ করেছে তা হচ্ছে, কার্কপ্যাট্রিকের কাহিনি ঘিরে তৈরি দলিলপত্র অদ্ভুতভাবে সংরক্ষিত ছিল। কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন, যারা সমসাময়িক পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী হয়ে নিজেদের সচেতন রেখেছিলেন।

আমি আমার অনুসন্ধানের যত গভীরে গিয়েছি, আমার বিশ্বাস ততো দৃঢ় হয়েছে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশরা একটি ক্ষুদ্র বিদেশি সংখ্যালঘু গ্রুপ হিসেবে তাদের প্রেসিডেন্সি টাউন, দুর্গ ও সেনানিবাসে আবদ্ধ ছিল, যা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ভারতে ব্রিটিশদের প্রাথমকি যুগে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে স্থাপনের পরিবর্তে তারা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপরিকল্পিতভাবে জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল।

কার্কপ্যাট্রিকরা এমন এক জগতে বাস করতেন যা অনেক বেশি দো-আঁশলা গোছের এবং সুস্পষ্টবাবে শ্রেণিভেদ, জাতীয় ও ধর্মীয়ভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার মতো নয়। তদুপরি আমরা ১৯৪৭ সালের পূর্বে ব্রিটেনে লিখিত সনাতন পদ্ধতির রাজকীয় ইতিহাস গ্রন্থ অথবা স্বাধীনতা-পরর্বর্তী ভারতের

BanglaBook.org

জাতীয় ইতিহাস, কিংবা ঔপনিবেশিক আমলের পর নতুন প্রজন্মের ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা, যাদের অনেকে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত এডওয়ার্ড সাঈদের 'ওরিয়েন্টালিজম'-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মনে হয় যেন, প্রথম দিকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও আদর্শের, পোশাকের ধরণে এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে সংমিশ্রণ বিটিশদের কোনো লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। সে কারণে কারো ব্যাখ্যা এক ধরনের নয়। প্রতিটি পক্ষ মনে করেন যে, বিভিন্ন কারণে বিবরণীতে ব্যতিক্রম ঘটলেও তারা এ ধরনের ভান করতে পছন্দ করেন যে, এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। লেখার ক্ষেত্রে এ ধরনের পাশ কাটিয়ে যাওয়া সবচেয়ে সহজ।

আমার গবেষণার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি নিয়ে আমি অত্যন্ত স্পর্শকাতার ছিলাম এবং এক পর্যায়ে আমি আবিষ্কার করি যে, আমি স্বয়ং এ যুগের অনুরূপ আন্তঃসম্প্রদায়গত সম্পর্কে সৃষ্টি এবং সেই সূত্রে আমার শিরায়ও ভারতীয় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার মনে হয় না যে, আমার পরিবারের কেউ একথা জানে, যদিও এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ আমরা সবাই শুনেছি যে, কিভাবে আমাদের সুন্দরী, কৃষ্ণনয়না কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী নানির নানি সোফিয়া প্যাটেলের প্রেমে পড়েছিলেন বার্ণ জোনস। জোনস তার বোনদের সাথে হিন্দুস্থানি ভাষায় কথা বলতেন এবং তারা জোনসের হাতে 'রাখী' বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারি আর্কাইভে কাজ করতে গিয়ে এবং আবিষ্কারে সক্ষম হই যে, সোফিয়া প্যাটেল চন্দননগরের বাঙালি হিন্দু মহিলা ছিলেন, যিনি ১৭৮০'র দশকে পণ্ডিচেরিতে এক ফরাসি অফিসারকে বিয়ে করে ক্যাথলিক ধর্মমতে দীক্ষিত হন।

আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটাই স্থায়ী। ঠিক যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশরা ভারতে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের প্রশংসা করেছে এবং তাদের আচার-আচরণ ও ভাষা গ্রহণ বা শিখেছে এবং ভারতীয়রাও এ যুগে যেভাবে ব্রিটেনে গিয়ে স্থানীয়দের বিয়ে করছে এবং পাশ্চাত্যের জীবন ধারায় অভ্যস্ত হয়েছে উঠছে।

মোগল ভ্রমণকাহিনি লেখক মির্জা মির্জা আবু তালেব খান ১৮১০ সালে তার এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনি প্রকাশ করেন। ফারসিতে লেখা এই গ্রন্থে তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ কায়দা কানুন রপ্ত করা বেশ কিছু মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাদের স্বামী-সন্তানসহ ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের সাংস্কৃতিক রূপান্তর এতটাই নিখুঁত ছিল যে, তিনি যে ভারতীয় ছিলেন তা তার স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিতে হত। তিনি দীন মোহাম্মদ নামে পাটনার এক বিশিষ্ট মুসলিমের বর্ণনা দিয়েছেন, যিনি তার ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকের সাথে আয়ারল্যান্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে খুব শিগ্‌গির তিনি এক অ্যাংলো-আইরিশ পরিবারের মেয়ে জেন ডেলির প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেন। ১৭৯৪ সালে তিনি তার চমকপ্রদ

Banglabook.org

ভ্রমণকাহিনি প্রকাশ করে কর্ক সোসাইটিতে তার স্থান নিশ্চিত করেন। তার 'ট্রাভেলস' ছিল ইংরেজিতে লেখা কোনো ভারতীয়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। আয়ারল্যান্ডের বহু লোক বইটি ক্রয় করে।

১৮০৭ সালে দীন মোহাম্মদ লন্ডনে চলে আসেন এবং ব্রিটেনে ভারতীয় মালিকানাধীন প্রথম রেস্টুরেন্ট চালু করেন 'দীন মোহাম্মদ'স হিন্দুস্থানী কফি হাউস' নামে। 'এখানে ভদ্রলোকেরা এসে হুক্কায় খাঁটি তামাকে ধূমপান করতে পারত এবং খেতে পারত সুস্বাদু রকমারি ভারতীয় খাবার। ইংল্যান্ডের যে কোনো খাবারের চাইতে আকর্ষণীয় ছিল এগুলো।' শেষ পর্যন্ত তিনি চলে যান ব্রাইটনে এবং ব্রিটেনের প্রথম ওরিয়েন্টাল ম্যাসাজ পার্লার চালু করেন। এক পর্যায়ে তিনি রাজা চতুর্থ জর্জ ও চতুর্থ উইলিয়ামের 'শ্যাম্পুইং সার্জন' হন। দীন মোহাম্মদের জীবনী লেখক মাইকেল ফিশার যথার্থই লিখেছেন, 'মোহাম্মদের বিয়ে এবং পেশাদার চিকিৎসক হিসেবে সাফল্য পরবর্তীকালের ইংরেজ জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সহজ দৃষ্টান্ত।'

এ ধরনের কিছু নজির অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত সম্পর্কে লিখিত ইতিহাসের সাথে কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। এত অধিক সংখ্যক ইতিহাসবিদ ভিক্টোরীয় ও এডওয়ার্ডের যুগের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন এবং আমরা সাধারণত সেগুলোর সাথেই পরিচিত। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিকার শংকা ও আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ ও আশার সাথে একবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোম্পানির অফিসার ও তাদের স্ত্রীদের চিঠিপত্র ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দলিলপত্র সহজে পাঠ করা যেতে পারে। পড়ে মনে হবে, ভিক্টোরীয় ব্রিটিশরা ভারতকে শুধু উপনিবেশে পরিণত করতেই সফল হয়নি বরং আরও স্থায়ীভাবে আমাদের কল্পনায় স্থান করে নিতে সফল হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা এবং পাশ্চাত্যে ব্যাপক সংখ্যায় ভারতীয়দের উপস্থিতি, যাদের অধিকাংশ পাশ্চাত্যের পোশাক ও আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ আমাদেরকে মোটেও বিস্মিত করেনি। কিন্তু উদ্ভট বৈপরীত্যই এখনো বিস্ময়ের কারণ ঘটায় যে, একজন ইউরোপীয় স্বেচ্ছায় নিজেকে বদলাতে পারে এবং এলিজাবেথ যুদ্ধের ব্যাখ্যা অনুসারে 'নব্য তুর্কি' সবসময় দেশি হিসেবেই থাকে।

এই তত্ত্বের যে ক্ষমতা তা যে কাউকে চমকে দেওয়ার মতো।

জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিকের মৃত্যুর পঁচাত্তর বছর পর এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জীবদ্দশায় টরকোয়ে-হায়দারাবাদি, ইসলামী–খ্রিস্টান কন্যার অস্তিত্বের কারণেই হয়তো রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছিল যে, 'ইস্ট ইজ ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট এন্ড নেভার দি টোয়াইন শ্যাল মিট' (প্রাচ্য প্রাচ্যই, পাশ্চাত্য অবশ্যই পাশ্চাত্য এব এই দুয়ের কখনও মিলন হতে পারে না)। কিপলিং-এর এই বক্তব্যকে বিদ্রুপ

করার প্রবণতা এখনও আছে। কিন্তু যখন শ্রদ্ধেয় বিদ্বজনেরা সভ্যতার দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিদেশিদের এই বিসদৃশ গ্রুপটি অত্যন্ত সময়োপযোগীভাবে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বাস্তবিকপক্ষেই দুটি বিশ্বের মধ্যে সমঝোতা সম্ভব এবং সবসময়ই সম্ভব ছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

## ১.

১৮০১ সালের ৭ নভেম্বর অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে দুজন ব্যক্তি সতর্কভাবে মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট হাউজের উদ্যানে প্রবেশ করল।

বাইরে ধূলির মেঘের মধ্যে লাল কোট পরিহিত সিপাহীরা সমুদ্র উপকূল থেকে সেন্ট টমাস মাউন্ট ক্যান্টনমেন্টের দিকে প্রশস্ত, উত্তপ্ত রাস্তা ধরে কুচকাওয়াজ করছে। গভর্নমেন্ট হাউজের গেটে বিভিন্ন সমস্যা নিস্পত্তির জন্যে আবেদন নিয়ে আসা লোকদের ভিড়ে ফেরিওয়ালারা ঘুরাফিরা করছে। তাছাড়া আছে কৌতূহলী দর্শক, যারা সবসময় এ ধরনের স্থানে ভিড় করে। ফেরিওয়ালারা বিক্রি করছে চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি পিঠা, কলা, মিষ্টি, কমলা ও পান। গেটের ভেতরে প্রহরীদের অবস্থান ছাড়িয়ে সে ভিন্ন এক জগৎ : পঁচাত্তর একর জমিতে সাজানো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সবুজ উদ্যান। কলা গাছের সারি এবং দীর্ঘ তেঁতুল গাছ, অশোক, কৃষ্ণচূড়া এবং সুগন্ধি ছড়ানো শিউলি ফুলের গাছ। এখানে কোনো ধূলিবালি নেই, মানুষের ভিড় নেই এবং পাখির কলগুঞ্জন ছাড়া কোনো কোলাহল নেই। সুর তোলার ঢং-এ ময়নার ডাক, যা কখনো দীর্ঘলয়ে প্রতিধ্বনি তোলে, কোয়েলের ঝগড়াটে আওয়াজ এবং আধ মাইল দূরে সাগরের তীর থেকে ভেসে আসা অবিশ্রাম শব্দ এ উদ্যানের বৈশিষ্ট্য।

উদ্যানের মাঝ দিয়ে দুজন লোককে এগিয়ে নেয়া হলো সাদা রঙের প্রাচীন স্থাপত্যরীতির উদ্যান প্রাসাদের দিকে যে প্রাসাদটি পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব পালন করছিলেন মাদ্রাজের নতুন গভর্নর লর্ড ক্লাইভ। এখানে একজনকে অপেক্ষায় রেখে অন্যজনকে উদ্যানের এক ছায়াঘন স্থানে নেয়া হলো, যেখানে একটি টেবিল ঘিরে রাখা হয়েছে তিনটি চেয়ার। আগে থেকেই সেখানে আছেন লর্ড ক্লাইভ এবং তার একান্ত সচিব মার্ক উইলক্স। এ ধরনের একটি বৈঠক নিয়ে কৌতূহলী হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকে, বিশেষ করে যেখানে ভৃত্যদের ছাড়া কোনো কিছুই করা হয় না সেক্ষেত্রে শুধু তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই।

ক্লাইভ শপথ পরিচালনার সাথে মার্ক উইলক্স কার্যবিবরণীর বিস্তারিত টুকে নিতে শুরু করেন, যা এখনও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে—

> "মহামহিম লর্ড ক্লাইভ গোপনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশে গভর্নমেন্ট হাউজের উদ্যানে লে. কর্নেল বাউসার-এর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং লর্ড মহোদয় ক্যাপ্টেন এম



BanglaBook.org

> উইলক্সকে তার পাশে উপস্থিত থেকে আলোচনার বিষয়গুলো টুকে নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি লে: কর্নেল বাউসারকে এভাবে বলেন—
> আমি যে বিষয়ে তদন্ত করতে যাচ্ছি তার সাথে জাতীয় স্বার্থের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। সেজন্য আমি মহামান্য গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছি আপনার কাছে বিষয়টি জানাতে এবং তিনি চান যে, আপনি নিজেকে এমন একট বিষয়ের ওপর তথ্য প্রদানে প্রস্তুতি নিন, যার যথার্থতা আপনি অবগত এবং আলোচনার পবিত্রতাও তার মধ্যে নিহিত... ।"

শপথ গ্রহণ শেষে লর্ড ক্লাইভ বাউসারকে ব্যাখ্যা করলেন যে, কেন তাকে ও তার সহকর্মী মেজর ওরকে হায়দারাবাদে তাদের রেজিমেন্ট থেকে চারশ পঞ্চাশ মাইল দূরে মাদ্রাজে তলব করা হয়েছে এবং তাদের এই দীর্ঘ সফরের প্রকৃত কারণ হায়দারাবাদে কারো না জানাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হায়দারাবাদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক সম্পর্কে সত্য ঘটনা জানা ক্লাইভের জন্যে জরুরি ছিল। কারণ দুবছর ধরে তার সম্পর্কে গুজবের সৃষ্টি হয়েছে এবং এর আগে আরও দুটি আনুষ্ঠানিক তদন্তে যে অনুসন্ধান করা হয়েছে তা সত্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছে।

কার্কপ্যাট্রিক সম্পর্কে গুজবের কিছু ঘটনা কলকাতায় কোম্পানির সদর দফতরে দু-একজনের ভ্রূভঙ্গি করার মতো হলেও তারা ক্ষতিকর কিছু বিবেচনা করেননি। বলা হয়েছে, 'খুব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার না হলে তিনি ইংলিশ পোশাক পরিধান ছেড়েই দিয়েছেন এবং এখন রেসিডেন্সির একজন আকস্মিক দর্শনার্থী, যাকে বর্ণনা করা হয়েছে, চমৎকার বস্ত্রে তৈরি মুসলিম পোশাক পরিহিত লোক। আরেকজন তথ্য দিয়েছেন যে, কার্কপ্যাট্রিক মোগল আভিজাত্যের মতো তার হাতে মেহেদি লাগিয়েছেন এবং হিন্দুস্থানি ধাঁচের গোঁফ রেখেছেন... যদিও অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ইংলিশম্যানের মতোই।'

এ ধরনের খামখেয়ালিপনার মধ্যে তাদের কাছে উদ্বেগজনক কিছু মনে হয়নি। ভারতে ব্রিটিশরা-বিশেষ করে যারা প্রধান প্রেসিডেন্সি শহর কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে থেকে দূরে অবস্থান করতেন তারা বহু পূর্বে নিজেদেরকে মোগল পোশাক ও রীতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে এর ফলে কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এগুলোর কোনটাই কোনো মানুষের পেশায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার মতো নয়। নিঃসন্দেহে এটা বড় ধরনের কোনো তদন্ত পরিচালনার জন্যে যথেষ্ট কারণ ছিল না। কিন্তু কার্কপ্যাট্রিকের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগ ছিল অত্যন্ত গুরুতর।

প্রথমত, কার্কপ্যাট্রিকের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে খবর আসছিল যে, তিনি হায়দারাবাদের অন্যতম অভিজাত পরিবারের এক মেয়ের সাথে নিজেকে জড়িত করে ফেলেছেন। তদন্তের কাগজপত্রে কখনোই মেয়েটির নাম উল্লেখ

BanglaBook.org

করা না হলেও বলা হয়েছে যে, তখন মেয়েটির বয়স চৌদ্দ বছরের বেশি নয়। তদুপরি মেয়েটি একজন সৈয়দা, নবী মোহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধর। অতএব তার বংশের অন্যান্য মহিলার মতো সেও কঠোর পর্দার মধ্যে থাকে। সৈয়দ বংশীয়রা, বিশেষ করে ভারতীয় সৈয়দরা তাদের বংশের পবিত্রতা এবং তাদের মহিলাদের চরিত্রের মর্যাদার প্রশ্নে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তারা যে শুধু নিজ বংশের মধ্যে বিয়ে করে তাই নয়—অন্য কথায় বলা যায়, তারা অন্য সৈয়দ ছাড়া বিয়ে করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে সৈয়দ বংশের মেয়েরা তাদের বংশের বাইরের গর্ভবতী মহিলাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে না। কারণ তাতে অজ্ঞাত সেই মহিলার গর্ভস্থ শিশু যদি ছেলে হয়, তাহলে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করতে পারে। এহেন কঠোর সংস্কার এবং তার পরিবারের সতর্কতা সত্ত্বেও মেয়েটি কোনোভাবে কার্কপ্যাট্রিকের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং সম্প্রতি তার সন্তানের জন্ম দিয়েছে বলে জানা গেছে।

হায়দারাবাদের গুজব ও ভাঁড়ামিপূর্ণ নিউজলেটারে প্রথমে খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, কার্কপ্যাট্রিক খায়রুন্নিসা নামের মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং তাকে বাধা দিতে গেলে কার্কপ্যাট্রিক তার ভাইকে হত্যা করেন। কিন্তু এক ধরনের মতৈক্য ছিল যে, এই বর্ণনাগুলো বিদ্বেষপ্রসূত এবং অসত্য। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এবং কোম্পানির জন্যে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, 'মেয়েটির গর্ভধারণের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ায় হায়দারাবাদে ব্যাপক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আরও আশংকার ব্যাপারে হচ্ছে, মেয়েটির দাদা তার বংশের মর্যাদায় কালিমা লেপনের এহেন নিন্দনীয় কাজের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় হায়দারাবাদের প্রধান মসজিদ 'মক্কা মসজিদে' গিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দক্ষিণাত্যের মুসলমানদের উত্তেজিত করে তোলার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।' দক্ষিণ ও মধ্যভারতে ব্রিটিশদের অবস্থা তখন এমনিতেই নাজুক ছিল। নেপোলিয়নের বাহিনী তখনো মিশরে অবস্থান করছিল এবং ব্রিটিশরা আশংকায় ছিল যে, ফরাসি বাহিনী উপমহাদেশে ব্রিটিশদের ওপর হামলা চালানোর পাঁয়তারা করছে।

কলকাতায় কোম্পানির কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত এবং সম্ভবত অত্যন্ত বেদনার সাথে জানতে পারেন যে, আসলে কার্কপ্যাট্রিক মেয়েটিকে বিয়ে করেছে;ন যার অর্থ তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং শিয়া মুসলমানদের মতো ধর্মীয় অনুশাসন পালন করছেন। কার্কপ্যাট্রিকের নতুন ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত গুজব এবং তার স্ত্রীর হায়দারাবাদি সংস্কৃতির প্রতি তার আকর্ষণ ও প্রকাশ্য সহানুভূতির কারণে তার কিছু সহকর্মীর মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, কোম্পানির প্রতি তার রাজনৈতিক আনুগত্য আদৌ অবশিষ্ট আছে কি না। এক বছরের বেশি সময় আগে ভবিষ্যৎ ডিউক অফ ওয়েলিংটন তরুণ কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলি তার বড় ভাই কলকাতায় গভর্নর জেনারেল রিচার্ডকে নিয়ে ঠিক

BanglaBook.org

এই আশংকা ব্যক্ত করেই লিখেছিলেন। প্রতিবেশী রাজ্য মহীশূরের কমান্ডার কর্নেল ওয়েলেসলি নির্ভরযোগ্য খবর পেয়েছেন, 'কার্কপ্যাট্রিক এখন এত দৃঢ়ভাবে হায়দারাবাদি প্রভাবের আওতায় রয়েছেন, ফলে ধারণা করা ভুল হবে না যে, তিনি তার নিজের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার চাইতে বরং নিজামের দরবারের সদস্য হিসেবেই উপস্থিত থাকেন।' অন্য কথায়, কার্কপ্যাট্রিক অন্য পক্ষে চলে গেছেন এবং বলা যায় দ্বৈত ভূমিকা পালন করছেন।

কি করে এই অভিযোগগুলোর বিহিত করা যায় তা স্থির করতে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলিকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে কাটাতে হয়েছে। প্রথমত সব ধরনের গুজব সত্ত্বেও কোম্পানির রাজনৈতিক দায়িত্বে কার্কপ্যাট্রিকের রেকর্ড ব্যতিক্রমী সাফল্যের। এক বিন্দু রক্ত না ঝরিয়েই তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে সর্বশেষ শক্তিশালী ফরাসি বাহিনীকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হন এবং হায়দারাবাদের নিজামের সাথে সাফল্যের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন। এর ফলে প্রথমবারের মতো বিশাল ভূখণ্ডের শাসক নিজামের সাথে ব্রিটিশদের সুদৃঢ় মৈত্রী স্থাপিত হয়, যা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ভঙ্গুর অবস্থাকে ব্রিটেনের অনুকূলে আনতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। এই সাফল্যের জন্যে মাত্র কয়েক মাস আগে ওয়েলেসলি কার্কপ্যাট্রিককে ব্যারন মর্যাদা দেওয়ার জন্যে লন্ডনে সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু এটাই একমাত্র জটিলতা ছিল না। কার্কপ্যাট্রিকের বড় ভাই উইলিয়াম কলকাতায় গভর্নর জেনারেলের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের একজন। যাকে ওয়েলেসলি স্বয়ং তার নীতির প্রধান স্থপতি হিসেবে বর্ণনা করতেন। ওয়েলেসলি যখন ছোট কার্কপ্যাট্রিক সম্পর্কিত গুজবের সত্যতা বের করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তার বড় ভাইকে বাদ না দিয়েই তা করতে চাইলেন। শেষ পর্যন্ত তার মনে হলো যে, বড় ধরনের কোনো কেলেংকারি ছাড়া এ ধরনের কোনো স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রকাশ্য তদন্ত করা কঠিন কাজ। এর ফলে শুধু যে হায়দারাবাদেই ব্রিটিশ স্বার্থের ক্ষতি হবে তা নয়, সমগ্র ভারতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। কিন্তু গুজব স্পষ্টতই গুরুতর এবং এতোটাই ব্যাপক ছিল যে, অগ্রাহ্য করা কঠিন।

সমস্ত কার্যকারণ বিবেচনা করে ওয়েলেসলি মাদ্রাজে অতি গোপনীয়তার সাথে তদন্ত পরিচালনার কৌশল গ্রহণ করেন। সেখানে গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নেবে হায়দারাবাদের দুজন ঊর্ধ্বতন ব্রিটিশ সৈনিক, লে. কর্নেল বাউসার এবং মেজর ওর। দুজনের সাথে কার্কপ্যাট্রিক অতি ঘনিষ্ঠ।

এ সমাধানও যথার্থ ছিল না। কারণ ওয়েলেসলি মাদ্রাজের নতুন গভর্নর এডওয়ার্ড লর্ড ক্লাইভকে তেমন পছন্দ করতেন না। তিনি বিখ্যাত রবার্ট ক্লাইভের পুত্র, চুয়াল্লিশ বছর আগে পলাশীতে যার বিস্ময়কর বিজয়ের কারণেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রূপান্তর শুরু হয়েছিল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে

BanglaBook.org

সেনাবাহিনীতে এবং তাদের নিজ জন্মভূমির চাইতে বৃহত্তর এক ভূখণ্ডের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হওয়ার। প্রথম সাক্ষাতের পর ওয়েলেসলি লিখলেন, 'ক্লাইভ কাজের লোক, ঈর্ষাপরায়ণ, অনুগত এবং ভদ্রলোকের মতো তার মেজাজ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সামালানোর মতো মেধা, জ্ঞান, ব্যবসায়ী প্রবণতা অথবা দৃঢ়তা তার নেই। কি করে সে এখানে এল? তা সত্ত্বেও ওয়েলেসলি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কার্কপ্যাট্রিকের ভাইকে সংশ্লিষ্ট না করে তদন্ত পরিচালনা অসম্ভব এবং ক্লাইভের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো সুযোগও নেই।

তাছাড়া ভারতের সর্ববৃহৎ স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের সাথে ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্তত আংশিকভাবে নির্ভর করছে মেয়েটির সঙ্গে কার্কপ্যাট্রিকের সম্পর্কের বিস্তারিত বিষয় জানার ওপর। তদন্তের এ পর্যায়ে কিছু একান্ত ও গোপন প্রশ্ন করা জরুরী হয়ে পড়বে।

পুরো ব্যাপারটি নিয়ে ওয়েলেসলিকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলো যে, এ ঘটনা প্রমাণে সংশ্লিষ্ট সকলে বিব্রত হবে এবং সেজন্য এটাই উত্তম যে, মাদ্রাজে বসেই ক্লাইভ দায়িত্বটা পালন করুক। ১৮০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ওয়েলেসলি আনুষ্ঠানিকভাবে লর্ড ক্লাইভকে লিখলেন কার্কপ্যাট্রিকের ঘটনা গোপনে তদন্ত করার জন্যে। একই সাথে তিনি হায়দারাবাদের বাউসার ও ওরকে নির্দেশ পাঠালেন, তারা যাতে সতর্কতার সাথে দ্রুত উপকূলের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

পরবর্তী কয়েকটি দিন ধরে বাউসার এবং ওর শপথ নিয়ে ক্লাইভের প্রশ্নের উত্তর দেন, যেগুলো অতি একান্ত এবং গেপানীয় প্রকৃতির। এর ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্ট যৌন বিবরণে পরিপূর্ণ সরকারি দলিল হত ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্যে। কার্কপ্যাট্রিকের শয়নকক্ষের জানালা পথে উঁকি দিয়ে দেখা উত্তেজনাকর দৃশ্যের বর্ণনার অনুভূতি এনে দেওয়ার মতো মনে হত।

ক্যাপ্টেন উইলকস-এর হাতের লেখা বিবরণী থেকেও দুই সাক্ষীর উজ্জ্বল সেনাসুলভ চেহারা স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কিভাবে একজন মুসলিম অভিজাত বালিকার সঙ্গে কার্কপ্যাট্রিকের সাক্ষাৎ এবং প্রেমের সম্পর্ক হলো, যে বালিকাকে রাখা হত কঠোর পর্দার মধ্যে, বিশেষ করে অন্য এক ব্যক্তির সাথে যখন তার বিয়ে স্থির হয়েছিল। কে প্রথমে উদ্যোগী হয়েছিল, কার্কপ্যাট্রিক, না সেই বালিকা, কে কাকে মুগ্ধ করেছিল? কখন তারা সর্বপ্রথম একত্রে শুয়েছিল? এরপর কখন তারা মিলিত হত? কখন বিষয়টি লোকদের মধ্যে জানাজানি হলো? কি করে ব্যাপারটি ফাঁস হলো? হায়দারাবাদে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল?

দলিলটি যেভাবে লিখিত হয়েছে, তা আধুনিক বিচারের রিপোর্ট অথবা পার্লামেন্টারি তদন্ত রিপোর্টের মতো।

BanglaBook.org

**প্রশ্ন:** আপনার কি মনে হয়, তরুণীটিকে রেসিডেন্ট প্রলুব্ধ করেছিলেন অথবা আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মেয়েটির পরিবারের উৎসাহী মহিলাদের ষড়সন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তিনি?

**উত্তর:** আমি বলতে পারব না, এ ধারণাগুলোর মধ্যে কোনটির ওপর মানুষের বিশ্বাস জন্মেছে। বলা হয় যে, মেয়েটি রেসিডেন্টের প্রেমে পড়েছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে অবাধে মেলামেশা যেহেতু অস্বাভাবিক সেজন্য মেয়েটির পরিবারের মহিলারাই এ ধরনের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

**প্রশ্ন:** রেসিডেন্ট এবং মেয়েটি কবে দৈহিকভাবে মিলিত হয়েছিল?

**উত্তর:** এ নিয়ে আমি প্রথম কানাঘুষা শুনি বছরের প্রথম দিকে। এরপর প্রতিদিন ব্যাপারটি প্রকাশ্যে আলোচনা হতে থাকে এবং অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বজনীন বিশ্বাসের বিষয়ে পরিণত হয়।

কাহিনির লিপিবদ্ধ কিছু অংশ পাঠ করে মনে হয়, এ কাহিনি একেবারেই আধুনিক, বিশ্বাস করা কঠিন যে, এটা দু'শ বছর আগে লিখিত হয়েছে। মেয়েটির গর্ভসঞ্চারে বিব্রতকর এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। তার পরিবার গর্ভপাতের বেপরোয়া উদ্যোগ নেয়। কার্কপ্যাট্রিক শেষ মুহূর্তে গর্ভপাতে বাধা দেন এবং মেয়েটির মা চিৎকার করে বলেন, 'পুরো ঘটনাকে বিষময় করে তোলার ধর্মীয় বিভাজনগুলোর অস্তিত্ব যদি না থাকত, তাহলে লোকটি হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও নবী মুহাম্মদ সৃষ্ট পরিচিতি নির্ধারণের পূর্বের পরিস্থিতির মতো আমার কন্যাকে গ্রহণ করতে পারত।' কার্কপ্যাট্রিক ও কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে রোমান্টিক ঘোষণা দেন, 'তদন্তের ফলাফল যাই হোক না কেন তিনি মেয়েটিকে ও তার সন্তানকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না।' ইতিহাসের দূরত্ব বাষ্পীভূত হয়ে গেলেও এগুলো হচ্ছে দ্রুত শনাক্তযোগ্য ও সহজাত মানবিক পরিস্থিতি।

কিন্তু, একইভাবে রিপোর্টটি পাঠ করেও এমন মহূর্তের উপস্থিতি আঁচ করা যায়। যখন পরিচিতির অনুভূতি হারিয়ে যায় এবং মনে হয়, আমরা আরব্য উপন্যাসের শাহ্জাদির কোনো অর্ধ-প্রাচীন কাহিনির মাঝে ফিরে গেছি। বাঁশের চিকের আড়াল থেকে গোপন আলোচনার র্বণনা, শিকার অভিযানের বর্ণনা— যেখানে চিতা বাঘ তৃণভূমিতে বিচরণরত হরিণকে সরে পড়তে দিচ্ছে, গুপ্তচরেরা বাজারের মাঝ দিয়ে পালকি অনুসরণ করছে এবং মেয়েটির নানার হুমকি 'ব্রিটিশদের ভিক্ষুকে পরিণত করার'—পরিবারের মর্যাদা রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সর্বোপরি, একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ অফিসার, যিনি মুসলিম রীতি অনুসরণ এবং নিয়মিত ভারতীয় পোশাক পরিধান করছেন মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্ব থেকেই—তিনি তার বাসভবনের পিছনে মোগল পরিচারিকা, ধাত্রী ও প্রহরী-সমৃদ্ধ একটি হারেমও রেখেছিলেন, তার মুখোমুখি হওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ অফিসারের সাথে এত ঘনিষ্ঠ

সাহচর্যের বিষয় বিস্ময়কর। কারণ ভারতে ইংরেজরা তাদের মেকি মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে নিজেদের কঠোরভাবে বৃত্তবন্দি করে রাখত, যা অসংখ্য চলচ্চিত্র এবং সস্তা টিভি নাটকে বারবার প্রদর্শিত হয়েছে। তারা সাম্রাজ্যবাদী অবতার, হীন মানসিকতাসম্পন্ন, কাঠখোট্টা সোলার হ্যাট পরিহিত, গোঁফধারী, গরম সত্ত্বেও ডিনারের পোশাক পরা ভারতবাসী ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি নাসিকা কুঞ্চনকারী সাহেব।

কেউ সেই যুগের দলিলপত্র যত বেশি ঘাঁটবে, তার ততো বেশি উপলব্ধি হবে যে তখনকার বহু ইউরোপীয়, যারা ভারতের প্রতি এমনভাবে সাড়া দিয়েছিলেন যা সম্ভবত তাকে বিস্মিত করবে এবং এখনও আমাদেরকে আলোড়িত করবে। কারণ তারা এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিকে শুধু রূপান্তর নয়, মোগল ভারতের বিরাট বৈচিত্র্যকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন।

ইউরোপীয়দের ভারত বিজয় ও শাসনের সুপরিচিত কাহিনির অন্তরালে এবং এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে ইউরোপীয় পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া সত্ত্বেও এখানে সবসময় আরও চমকপ্রদ এবং অলিখিত কাহিনি আছে, তা হচ্ছে—ইউরোপীয়দের কল্পনার ওপর ভারতীয়দের বিজয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সকল পর্যায়ে, বিশেষ করে ১৭৭০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে আন্তঃসম্প্রদায় যৌন সম্পর্কের ছড়াছড়ি ছিল এবং বিস্ময়করভাবে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণও হয়েছে ব্যাপকভাব। যাকে সালমান রুশদি আধুনিক 'বহুজাতিক সাংস্কৃতিক মতবাদকে অভিহিত করেছেন 'চাটনিফিকেশন' হিসেবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই যুগের ভারতে সকল ইংলিশম্যান কিছু পরিমাণে হলেও ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন। যারা আরও খানিকটা অগ্রবর্তী হয়ে হিন্দু ধর্ম অথবা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিংবা বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে নাটকীয় সম্পর্ক স্থাপন করে যাচ্ছিলেন তারা সুনির্দিষ্টভাবেই সংখ্যালঘু ছিলেন, কিন্তু এতোটা সংখ্যালঘু নয়, যা আমরা সাধারণভাবে ধারণা করতে অভ্যস্ত।

পুরো সময় জুড়ে কারো মধ্যে এ ধরনের অনুভূতি জাগ্রত হওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না যে, দুটি ভিন্ন বিশ্ব নতুন ধরনের সমস্যায় পড়েছে যে দুয়ের মাঝে সংঘাত ঘটেছে এবং প্রথমবারের মতো ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছে। এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই এবং লিখিত আকারে কিছু নেই। চিঠিপত্র, ডায়েরি এবং তখনকার রিপোর্ট পাঠ করে মনে হয়েছে যে, এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা পথ অতিক্রম করেছেন সমস্যা, রীতিনীতি, উত্তেজনা ও আবেগের মধ্য দিয়ে—যার অভিজ্ঞতা এ দেশবাসীর আগে কখনো ছিল না।

বিজয়ীদের সঙ্গে ভারত সবসময় অদ্ভুত আচরণ করেছে। পরাজিত হয়ে তারা বিজয়ীদের কাছে ডেকেছে, প্রলুব্ধ করেছে, নিজেদের সাথে একাত্ম করেছে এবং পুরো রূপান্তর ঘটিয়েছে তাদের।

BanglaBook.org

শত শত বছরের ইতিহাসে বহু শক্তি ভারতের বাহিনীকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু কেউ কখনো উপমহাদেশকে সেই শক্তির দাপটে কোনভাবে উপনিবেশে পরিণত করতে পারেনি, বরং যারা সে চেষ্টা করেছে তারা এখানে স্থায়ী হবার চেষ্টা করেছে। এত বিশাল এই ভারত এবং এত অপূর্ব ও গভীর প্রেথিত তার সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিকড় যে সকল বিদেশি অনুপ্রবেশকারী আগে হোক বা পরে হোক, হয় বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে অথবা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে। একজন ইতিহাসবিদ লিখেছেন, 'ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলরা যখন মধ্য এশিয়া থেকে আসে তখন তারা ছিল অমার্জিত পোশাক পরা মানুষ, আর চার শতাব্দী পর তারা সুসজ্জিত রুচিশীল মানুষে পরিণত হয়।' ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত ভারতে ইউরোপীয়দের নাটকীয় রূপান্তর ঘটেছিল, যারা মোগলদের অনুসরণ করত। তাদের পূর্ববর্তী সকল বিদেশির মতো মনে হয়েছিল যে, তারাও নিশ্চেষ্টভাবে এর মাঝে লীন হয়ে যাবে।

রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ভারতে ইউরোপীয়দের উপস্থিতির সূচনা কাল থেকেই এবং পর্তুগীজরাই প্রথমে এই উদ্যোগ নিয়েছিল। উত্তর ভারতে মোগলদের আগমনের ষোলো বছর আগে ১৫১০ সালে পুর্তগীজরা গোয়া বিজয়ের পর পর্তুগীজ কমান্ডার আফোনসো ডি অ্যালবুকুয়েরকু তার সৈনিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন শহর দখলের সময় শহরের যেসব মুসলিম প্রতিরোধকারী নিহত হয়েছিলেন তাদের বিধবা স্ত্রীদের বিয়ে করার জন্যে। অ্যালবুকুয়েরকু স্বয়ং ফর্সা গাত্রবর্ণের সুন্দরী মুসলিম রমণীদের সঙ্গে তার সৈনিকদের এসব বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন এবং তাদেরকে যৌতুক দিতেন। অতঃপর এই সুন্দরী মহিলাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হত এবং খ্রিস্টান হওয়ার পর তাদের অনেককে ক্যাথলিক বিশ্বাসের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু এই জবরদস্তিমূলক উদ্যোগ সফল হয়নি। ভারতে পর্তুগীজ সংস্কৃতি স্বল্পস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছে, ঠিক যেভাবে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ভ্রান্তভাবে তুর্কি, সাসানীয়, পারসিক অথবা গ্রিক সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে মহিলাদের সাহচর্য, পরিবেশ এবং ইউরোপ থেকে গোয়ার দূরত্ব সবকিছুর প্রভাব পড়তে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের সদস্যরা পর্তুগালের জীবনপদ্ধতি পরিত্যাগ করে ভারতের রীতিনীতি গ্রহণ করতে থাকে। ১৫৬০ সালে যখন পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের আবির্ভাব ঘটে, সেই সময়ের মধ্যে গোয়াকে মনে হত কমবেশি মোগল রাজধানী দিল্লি বা আগ্রার মতো, কিছুতেই লিসবন বা পর্তুগালের অন্য কোনো শহরের মতো নয়। এর ফলে ব্যথিত এক জেসুইট ফাদার গোয়ার পরিস্থিতি জানিয়ে রোমে লিখেছিলেন, অন্য যে কোনো অংশের চাইতে এখানেই ধর্মীয়

BanglaBook.org

বিচারের প্রয়োজন অধিক, কারণ এখানকার সব খ্রিস্টান মুসলিম, ইহুদি ও হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে। এর ফলে এখানে বসবাসকারী লোকদের বিচার বিবেচনা ভোতা হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ধর্মীয় সংশোধনের মাধ্যমেই তাদেরকে সৎভাবে জীবনযাপনের দিকে ফিরে আনা যায়।

১৫৬০ সালের মধ্যে গোয়ার পর্তুগীজ অমাত্য ও বিত্তবানরা দক্ষতা এবং অন্যভাবে জাঁকালো জীবনযাপন শুরু করে। নিজেদেরকে তারা ছাতার ছায়ায় রাখত। দাস ও ভৃত্য পরিবৃত না হয়ে ঘরের বাইরে বের হত না। পর্যটকদের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, পর্তুগীজ অভিজাতরা কিভাবে হারেম রাখত এবং খ্রিস্টান মহিলারা বাড়ির অভ্যন্তরে ভারতীয় পোশাক পরিধান করত, যেন তারা পর্দার মধ্যে বসবাস করছে। তাদের যদি বাইরে যেতে হত, তাহলে মুখ ঢেকে অথবা পর্দা ঘেরা পালকিতে চড়ে যেত।

পর্তুগীজ পুরুষরা পান সুপারি চিবুতো, ভাত খেতো ডান হাত দিয়ে এবং আরক পান করত। তারা শরীরে সুগন্ধি তেল মাখতো এবং চিকিৎসকরা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বিধানের অনুকরণে রোগীদের দৈনিক তিনবার গো-চোনা পানের ব্যবস্থাপত্র দিতো : সকালে এক গ্লাস, দুপুরে এক গ্লাস এবং সন্ধ্যায় আরেক গ্লাস। ভারতীয় ধরনে তারা পানি পান করত, মুখে পানির পাত্র স্পর্শ না করে ওপর থেকে হা করা মুখে পানি ঢেলে দিত আলগোছে। এ পদ্ধতিতে এক ফোঁটা পানিও বাইরে পড়তো না এবং যখন নতুন কোনো মানুষ পর্তুগাল থেকে আসত এবং সেখানে পানি পান করতে চেষ্টা করত, তার অভ্যাস না থাকার কারণে পানি পড়তো তার বুকে এবং আশেপাশের লোকজন মজা পেয়ে হেসে উঠতো, তাকে বলত আনাড়ি।

এমনকি গির্জার স্থাপনাতেও ভারতীয় পরিবেশের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। ১৫৮৫ সাল থেকে একটি কঠোর নির্দেশ জারি করা হয়, যাতে ব্রাহ্মণরক্ত মিশ্রিত ইন্দো-পর্তুগীজদের মধ্য থেকেই তাদের উপনিবেশের গির্জা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক চার্চের যাজক তৈরির জন্যে প্রশিক্ষণ দিতে। এ অবস্থা দেখে বিস্মিত এক ওলন্দাজ পর্যটক জ্যান ভ্যান লিনসকোটেন লিখেছেন, 'এর সবকিছুই তারা শিখেছে এবং গ্রহণ করেছে ভারতীয় আচরণ পদ্ধতি থেকে, যা ভারতীয়রা অনুসরণ করে আসছে দীর্ঘদিন থেকে।'

ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর এন্থনি ভ্যান জিয়মের লিখেছেন, '১৬৪২ সালের মধ্যে ভারতে অবস্থানরত অধিকাংশ পর্তুগীজ এই এলাকাকে মনে করত তাদের পিতৃভূমি বলে এবং পর্তুগালের কথা আদৌ ভাবতো না। তারা খুব বেশি নড়াচড়া করত না, কিংবা স্থায়ী ব্যবসাও করত না। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে যেত পণ্য নিয়ে, যেন তারা এদেশেরই বাসিন্দা এবং তাদের আর কোনো দেশ নেই।' তার দেশেরই আরেক ব্যক্তি ভ্যান লিনসকোটেন একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, 'পর্তুগাল থেকে আগতদের, নারী

BanglaBook.org

পুরুষ নির্বিশেষে সহজাত ভারতীয় বলে মনে হত, তাদের গাত্রবর্ণের দিক থেকে এবং আচার-আচরণ ও পোশাক পরিচ্ছদে।'

ইন্দো-পর্তুগীজ সংস্কৃতির প্রাথমিককালের এই বিবরণ থেকেই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে, পরবর্তী তিনশ বছরের বিশাল এক সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় এবং বিভিন্ন ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে তাদের সংমিশ্রণ বা দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের মাঝে কি রূপান্তর ঘটতে পারে। শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল যে, যা কিছু ঘটছে, তা একটি সংস্কৃতির বিকল্প হতে পারে না, বিশেষ করে এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে। ভারতে ইন্দো-পর্তুগীজ সম্প্রদায় খাঁটি পর্তুগীজ অথবা পুরোপুরি ভারতীয় কোনটাই ছিল না, বরং দুটির উন্নততর সংমিশ্রণ ছিল। ইউরোপীয় ভাবধারা মিশে গিয়েছিল ভারতীয় আবহাওয়া ও সমাজের সাথে অথবা এক বিপরীত দিক থেকেও দেখা যেতে পারে যে ভারতীয় পরিবেশ ইউরোপীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—এ প্রভাব পড়েছে স্থাপত্যে, যার মধ্যে দুই সংস্কৃতির মিশ্রণ এবং ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভারতীয় সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়া। ভারতে পর্তুগীজরা এবং তাদের ইন্দো-পুর্তুগীজ উত্তরসূরিরা একটি সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে আরেকটি সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি, বরং দুটিই একত্রে টিকে আছে একই সাথে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি জীবনধারা একাকার হয়ে গেছে।

গোয়ার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ডোমিনিকান ফাদারদের কাছে সংস্কৃতির মিশ্রণের এই ধারা কখনোই গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোনো খ্রিস্টান পরিবারে হিন্দু প্রথা অনুসরণের কোনো লক্ষণ ধরা পড়লে পুরো পরিবার এবং তাদের ভৃত্যদের আটক করে নির্যাতন করা হত। যেসব ভারতীয় আচরণ পরিহার করতে হবে গির্জার পক্ষ থেকে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেগুলো এখন সামাজিক ইতিহাসবিদদের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে যে, পর্তুগীজরা তাদের ভারতীয় প্রতিবেশীদের কোন্ অভ্যাসগুলো, কোন্ রুচি ও কুসংস্কার গ্রহণ করেছিল। গির্জার নিষিদ্ধ তালিকার মধ্যে বিস্মিত করার মতো বিষয় ছিল, হিন্দুদের অনুসরণে লবণ ছাড়া ভাত রান্না করা, ধুতি পরিধান অথবা চোলি (খাটো, স্বচ্ছ ভারতীয় বডিস বা বক্ষবন্ধনী) ব্যবহার এবং শূকরের মাংস খাওয়া বর্জন ছিল ধর্মবিরোধী কাজ। এমনকি কিছু কিছু গাছ এবং সবজি গ্রহণও বর্জনীয় ছিল। যেমন তুলসি গাছকে বহু হিন্দু অশুভ দৃষ্টি থেকে বাঁচার মোক্ষম উপায় বলে ভাবে, পর্তুগীজ ফাদাররা এটি নিষিদ্ধ করে পর্তুগীজ খ্রিস্টানদের জন্যে।

সম্ভবত কিছুটা ধর্মীয় কারণে বিপুল সংখ্যক পর্তুগীজ তাদের দেশ থেকে চলে আসে বিভিন্ন ভারতীয় রাজ দরবারে তাদের ভাগ্য অন্বেষণে, বিশেষ করে গোলন্দাজ ও অশ্বরোহী সৈনিকের চাকরি গ্রহণের উদ্দেশ্যে। আসলে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৪৯৮ সালে ভারতে পর্তুগীজদের উপস্থিতির সময়

BanglaBook.org

থেকেই। সে বছর ভাস্কো ডা গামা তার প্রথম ভারত সফরের সময় দেখতে পান যে, মালাবার উপকূলের অনেক রাজার বাহিনীতে ইটালীয় ভাড়াটে সৈনিক নিয়েজিত আছে। তিনি যখন পুনরায় নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেন, তখন তার জাহাজের দুজন নাবিক তাকে পরিত্যাগ করে অধিকতর বেতনে মালাবারের একজন রাজার চাকরিতে ইটালীয়দের সঙ্গে যোগ দেয়। ষাট বছর পর ১৫৬৫ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজার বাহিনীতে নিয়োজিত ছিল কমপক্ষ দুই হাজার পর্তুগীজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু দিকে একজন পর্তুগীজ ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন, ভারতে পর্তুগীজ সৈন্য সংখ্যা ছিল অন্তত পাঁচ হাজার।

যারা ভারতীয় পক্ষে চলে এসেছিল তারা প্রকৃতপক্ষে পর্তুগীজ সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। ভারতের লক্ষণীয় ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ছাড়াও নিজেদের সমৃদ্ধির সুযোগ দেখেছিল। তাছাড়া তারা লাভ করত উচ্চ বেতন এবং তা নিয়মিত পেত। পর্তুগীজদের অন্যরাও ভারতে দাসদাসী, রক্ষিতা এবং বহুবিবাহের ব্যাপকতায় প্রলুব্ধ হয়ে সেগুলো পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় মালাক্কা উপকূলে বসবাসকারী কিছু 'ব্রিটিশ নাবিককে তাদের পছন্দমতো বহুসংখ্যক রমণীদের নিয়ে বাস করতে দেখেও কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। তারা গান গায়, সারাদিন নাচে এবং প্রায় উলঙ্গ থাকে এবং মদ পান করে দুদিন পর্যন্ত মাতাল হয়ে থাকে।' তার বিপরীতে গোয়ার সেনাবাহিনীতে চাকরি খুব কঠোর ছিল, বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন কাজ থাকে না, থাকার ঘর থাকে না এবং প্রায়ই বেতন পাওয়া যায় না। তেমন পরিস্থিতিতে তাদের অনেককে গোয়ার রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখা যায়।

কারণ যা-ই হোক না কেন, শুধু পর্তুগীজরাই নয়, কয়েক হাজার ইউরোপীয় উপমহাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন রাজ দরবারে চাকরি নেয়। মোগল শাসনের গৌরবের যুগে মোগল সেনাবাহিনীতে এত অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় চাকরি গ্রহণ করে যে, তাদের বসবাসের জন্যে দিল্লির বাইরে একটি উপশহর গড়ে তুলতে হয়েছিল, যাকে বলা হত ফিরিঙ্গিপুরা। ফিরিঙ্গিপুরায় বাস করত পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ফরাসি সৈনিকরা, যাদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি পৃথক ফিরিঙ্গি রেজিমেন্ট, যার নেতৃত্বে ছিল ফাররাশিশ খান নামে একজন ফরাসি।

এসব ধর্মত্যাগী বা পক্ষত্যাগী বিদেশিরা যে শুধু মোগল বাহিনীতেই ছিল এমন নয়, তাদের প্রতিপক্ষ দাক্ষিণাত্যের চারটি বড় সালতানাত, যারা দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত তারাও বিদেশিদেরকে নিজ নিজ বাহিনীতে নিয়োগ করেছিলেন। বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহীর দরবারে ছিলেন গোয়ার সাবেক শক্তিশালী জমিদার গনজালো ভাজ কোটিনহো,

যিনি খুনের দায়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং পরে প্রাণভয়ে বিজাপুরে পালিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাকে রাজস্ব আদায়ের সুযোগসহ অনেক জমি প্রদান করা হয় এবং তিনি খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করেন তার স্ত্রী ও সন্তানদেরসহ।

আরও এক শতাব্দী পর ইংরেজরা যখন অধিক সংখ্যায় ভারতে আসতে শুরু করে তখন দাক্ষিণাত্যের সুলতানরা ব্রিটিশ পক্ষত্যাগী ইংরেজদের তাদের বাহিনীতে নিয়োগ করেন। তখনকার একজন ইংরেজ বণিক নিকোলাস ইউহিংটন পক্ষত্যাগীদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন। তার বিবরণে এটা স্পষ্ট ছিল যে, সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতের বিভিন্ন শাসকের অধীনে বহুসংখ্যক স্বাধীন ইউরোপীয় ছিল, যাদের সকলের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল নিজের ভাগ্য গড়া এবং প্রয়োজনে এক শাসকের বদলে অন্য শাসকের আনুগত্য করা, ধর্ম পরিবর্তন করা। এমনকি তাদের অনেককে খৎনা করার মতো বিপজ্জনক রীতি অনুসরণ করতেও সম্মতি দিতে হয়েছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখাতো, খৎনার ব্যাপারটি তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল। ইউহিংটন লিখেছেন, 'এমন পরিস্থিতিতে অনেকে আবার পর্তুগীজদের মধ্যেই ফিরে যেত এবং পরে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসত।' তিনি আরও লিখেছেন, 'দাক্ষিণাত্যে কোনো ইউরোপীয় আরেক ইংলিশম্যান দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, যে আগেই মুসলমান হয়েছে এবং তার খৎনাও হয়েছে। অতঃপর সুলতান তাকে দৈনিক ছয় দিনার বরাদ্দ দিয়েছেন এবং তাকে সুলতানের সাথে এক টেবিলে বসে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু খৎনার আটদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে।

অনুরূপ, আমাদের দলের আরেকজন সদস্য রবার্ট ট্রুলে দাক্ষিণাত্যে রাজার দরবারে গিয়েছিল, তার সাথে ছিল এক জার্মান দোভাষী, যে সেই অঞ্চলের ভাষা বুঝত। সেখানে যাওয়ার পর তারা মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং রাজা অনুগ্রহ করে তাদের আগ্রহে সাড়া দেন। মুসলমান হওয়ার পর ট্রুলেকে খৎনা করানো হয়, তাকে নূতন নাম দেওয়া হয় এবং রাজা তাকে প্রচুর ভাতা বরাদ্দ দেন। কিন্তু যখন তারা জার্মান লোকটির খৎনা করার উদ্যোগ নিল তখন দেখতে পেল যে, তার খৎনা করানো হয়েছে আগেই। কারণ, সে আগে পারস্যে ছিল। যেহেতু আগেই সে মুসলমান হয়েছে, অতএব দাক্ষিণাত্যে তাকে তেমন সমাদর করা হয়নি। সে আগ্রায় ফিরে গেল এবং একজন ফরাসির অধীনে চাকরি গ্রহণ করল। এরপর সে আবার খ্রিস্টধর্মে প্রত্যাবর্তন করলো। মনিবের সঙ্গে সে অভিযানে যেত। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের রাজার অধীনে ইংলিশ ও পর্তুগীজরা ছিল।

প্রথম দিকের ইউরোপীয় ধর্মত্যাগীরা তাদের নিজ সমাজের প্রান্তিক অবস্থান থেকে ইউরোপ এবং ভারতের মধ্যে যোগাযোগ বা মধ্যস্থতার কাজ

BanglaBook.org

করত। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে, বিশেষ করে গোয়ার পর্তুগীজদের মধ্যে পক্ষত্যাগের প্রবণতা ব্যাপক রূপ লাভ করে এবং এক শতাব্দী পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষত্যাগীর সংখ্যা বিশেষ করে সুরাটে ব্যাপক আকার ধারণ করে। কিন্তু পরবর্তী তিনশো বছরে তারা নিজেদের সামলে নিয়েছিল। কারণ জাতীয় আনুগত্যের ধারণা, ক্ষমতাসীনদের সাথে সম্পর্কে প্রায় ক্ষেত্রে শিথিল ছিল। এর ফলে আত্ম-রূপান্তরের সম্ভাবনা ছিল সীমাহীন।

ভিক্টোরীয় শাসকদের রাজকীয় তত্ত্বের আওতায় ব্রিটিশরা ভারতে প্রাথমিকভাবে পর্তুগীজদের মতো অবাধে ধর্মত্যাগ বা পক্ষত্যাগ করার মতো স্বাধীন ছিল না। বাস্তবিকপক্ষ সপ্তদশ শতাব্দীতে যারা প্রথম মোগল সাম্রাজ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারে চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছিল মোগলদের কাছে তারা পুরোপুরিই বিদেশি ছিল।

পর্তুগীজরা নিজেদের কল্যাণের লক্ষ্যে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেই গোয়ায় এসেছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের লক্ষ্য ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দায়িত্ব পালন শেষে নিজ দেশে ফিরে যাওয়া। এর ফলে তারা যে দেশে বাস করেছে তার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তবু, নিজেদেরকে সুসংহত করার প্রাথমিক বছরগুলোতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নির্ভর করতে হয়েছে এদেশে বংশ বা জাত প্রথা ও ধর্মের সীমারেখার মধ্যে। তারা এ বিষয়টি রক্ষা করেছে তাদের বাণিজ্যিক উদ্যোগে, সেনাবাহিনীতে, কূটনীতিতে, এমনকি যাজক বৃত্তিতে; যারাই প্রাচ্যে এসেছিল, মোগল ভারতের রীতিনীতির আওতায় থাকা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। এই প্রবণতা কাউকে বিস্মিত করবে না। বরং ব্যতিক্রম এবং বৈপরীত্য মনে হবে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের প্রবণতায় পরিবর্তন না আসায়, যারা বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ ভুখণ্ড শাসন করেও নিজেদেরকে কোনো সংস্কৃতির সাথে গুলিয়ে ফেলা থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অবশ্য, সংস্কৃতির মাঝে মিশে যাওয়া নতুন কিছু নয়। মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্রিটিশ বণিকরা মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলাম গ্রহণ করছে, এমন দৃষ্টান্ত শত শত বছরের। ব্রিটেন এবং ইসলামী বিশ্বের মধ্যে অধিকাংশ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে নৌ-যুদ্ধের পটভূমিতে, যেখানে সমুদ্রে মুসলমানদের প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তারা বহু ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ আটক ও ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। ১৬০৯ থেকে ১৬১৬ সালের মধ্যে ৪৬৬টি ব্রিটিশ জাহাজ অটোম্যান বা বার্বারদের জাহাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সেসব জাহাজের নাবিকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৬২৬ সালের মধ্যে শুধু আলজিয়ার্স শহরে পাঁচ হাজারের অধিক ব্রিটিশ বন্দি ছিল

BanglaBook.org

এবং আরও দেড় হাজার ছিল স্যালিতে। অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করার জন্যে লন্ডনে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের দৃষ্টান্ত অনসুরণে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছিল।

১৬২০ সালের মধ্যে তুর্কি নৌ শক্তির উপস্থিতি শুধুমাত্র ভূমধ্যসাগরে সীমাবদ্ধ ছিল না, এমনকি তাদের ক্ষমতা সম্প্রসারণ করেছিল ব্রিটিশ দ্বীপগুলো পর্যন্ত। ১৬২৫ সালে তুর্কিরা মাউন্টস উপসাগরের মানিজেসকা গির্জা দখল করে প্রায় ৬০ জন নারী পুরুষ ও শিশুকে বন্দি করে নিয়ে যায়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক খবর ছিল যে, এসব অভিযান পরিচালিত হচ্ছিল একজন ইংলিশম্যানের নেতৃত্বে। যিনি ইসলাম গ্রহণ করে 'নব্য তুর্কিতে' পরিণত হয়েছিলেন। ১৬৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে বার্বার অঞ্চল থেকে আগত সাতটি জাহাজা কর্নওয়াল দ্বীপে নোঙর করে এবং জাহাজগুলোর নাবিকদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যার দ্বীপের কিছুসংখ্যক পক্ষত্যাগী লোক।

তবে ব্যাপক হারে ব্রিটিশদের ইসলামে দীক্ষিত হওযার খবর আসছিল সুরাট থেকে। গুরুতর ব্যাপার হলো, ধর্মান্তরের কিছু ঘটনা ছিল বলপূর্বক। কিছু ছিল স্বেচ্ছায় এবং তখনকার ব্রিটিশ পর্যটকেরা নিয়মিতই খবর আনতো তাদের পাগড়িধারী স্বদেশবাসী সম্পর্কে, যারা এখন ইসলামী বিশ্বের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী অটোম্যান খোজা হাসান আগা ছিলেন গ্রেট ইয়ার মাউথের সাবেক বাসিন্দা স্যামসন রাউলি। অন্য দিকে আলজিরিয়ার রাজার মুসলিম জল্লাদ ছিল এক্সেটার থেকে যাওয়া একজন সাবেক কসাই, যার মুসলিম নাম দেওয়া হয়েছিল আবদেস-সালাম। একইভাবে কিছু পর্যটক কন্সটান্টিনোপলে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ মুসলিমের, যাকে তারা পরে এডেনেও দেখেন। যদিও লোকটি নিজেকে তুর্কি দাবি করছিল, কিন্তু আসলে সে ছিল ব্রিটেনের করনিশে। ইঙ্গলিজ মোস্তফা নামে অটোম্যান সেনাপতি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন স্কটল্যান্ডবাসী ক্যাম্পবেল, যিনি ইসলাম গ্রহণ করে জানিসারিদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

অটোম্যান দরবারে নিয়োজিত ব্রিটিশ দূত স্যার টমাস শার্লি ধর্মত্যাগীদের নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি তাদেরকে বলতেন অমার্জিত ধরনের মানুষ এবং প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক, যারা নিজের সুবিধা ও স্বস্থি লাভের জন্য তুর্কিদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও নিঃসন্দেহে এক ধরনের উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতার সুর ছিল, কারণ তাকেও ভয়ের মধ্যে থাকতে হত যে, তিনি রাজরোষের শিকার হতে পারেন। তবে নিশ্চিতভাবেই যারা তুর্কিতে পরিণত হয়েছিল তারা ব্রিটিশ সমাজের সর্বস্তরের লোক ছিল—অস্ত্র বিক্রির ডিলার, মুদ্রা বিনিময়কারী, নৌ-সেনাপতি, সৈনিক, ভেরীবাদক এবং ডুবুরি, যারা উত্তর আফ্রিকার বার্বার উপকূলে জলদস্যু ছিল। এছাড়া একজন ব্রিটিশ মহিলাও ছিলেন যিনি আলজিয়ার্সের এক অভিজাতের স্ত্রীতে পরিণত হন।

BanglaBook.org

শার্লি তার এক বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে, ইংলিশরা যত বেশি সময় প্রাচ্যে অতিবাহিত করেছে, তারা ততো বেশি মুসলিম আচার-আচরণ রপ্ত করেছে। তিনি লিখেছেন, বিধর্মীদের সাথে মেলামেশার কারণে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, ইংলিশরাসহ বহু জাতির উদ্দাম তরুণরা বছর তিনেক তুরস্কে অবস্থান করলেই তাদের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস হারাতে শুরু করে। ইসলাম যে তরবারির শক্তির চাইতে তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও শোভনতার কারণে ব্রিটিশের ওপর বিজয়ী হয়েছিল তার প্রমাণ ১৬০৬ সালে মিশরে নিয়োজিত ব্রিটিশ কনসাল বেঞ্জামিন বিশপের ইসলাম গ্রহণ। এর ফলে ব্রিটিশ সরকারি দলিলপত্রে তার অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভারতে ইংলিশ বণিকদের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণের ধারা ব্যাপক ছিল, যারা ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যবধান থেকে ঊর্ধ্বে উঠার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং তারা বিপুল সংখ্যায় অধীনে চাকরি গ্রহণের জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে শুরু করেছিল। এ পর্যায়েই ১৬১৬ সালে মোগলদের সাথে ব্রিটিশদের প্রথম চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রিটিশ দূত স্যার টমাস রো। তার কাছে স্পষ্ট ছিল যে, পক্ষত্যাগীরা কোম্পানির জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এবং চুক্তির অষ্টম দফায় সে কারণে উল্লেখ করা হয় যে, 'মোগলরা ইংলিশ পক্ষত্যাগী বা পলাতকদের কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে ফেরত পাঠাবে।' মোগল শাহজাদা খুররম, পরে যিনি শাহজাহান হন, তিনি এই শর্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু টমাস রো তার অবস্থানে দৃঢ় ছিলেন। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে অটোম্যানদের কাছে ব্রিটিশের অবস্থা সম্পর্কে তার জানা ছিল এবং সে কারণে মোগলদের সাথে এ ব্যাপারে তার শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছিল।

BanglaBook.org

গুজরাট উপকূলে বিখ্যাত মোগল বন্দর সুরাট হয়েই ব্রিটিশ বণিক ও মোগল সাম্রাজ্যের জনগোষ্ঠীর সাথে প্রথম যোগসূত্র ঘটে। সেখানে ব্রিটিশরা বাস করত এমন একটি ভবনে, যেখানে ব্রিটিশদের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মোগলদের সরাইখানা ছিল। একদিকে দিবসের সূচনা হত প্রার্থনা দিয়ে আর সমাপ্ত হত একত্রে আহার্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে, যেখানে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এবং কার্যাধ্যক্ষ, যাদের কাজ ছিল তাদের অধীনস্থ ইংলিশদের আচার আচরণ সম্পর্কে আলোচনা, গির্জায় নিয়মিত উপস্থিতি এবং অখ্রিস্টানসুলভ আচরণ দূর করা। অন্যদিকে, আরামদায়ক ইংরেজ কলেজিয়েট দৃশ্য অনুসৃত হয়েছে এক মুসলিম ভবনে এবং নৈশভোজনের পর এর বাসিন্দারা নিজেদের ধৌত করতে পারত এবং সেজন্যে হাম্মামখানায় যেত। ইউরোপীয় উপকরণের ঘাটতি হলে এখানকার ইউরোপীয়রা দ্রুত নিজেদেরকে ভারতীয় উপকরণের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিত এবং খুব শিগ্গির দেখা গেল, তারা ভারতীয়

বিলাসিতাও কিছু কিছু গ্রহণ করছে—একটি পানের বাটা, পিকদান ও গোলাপজলের বোতল রাখা। ইংলিশ ফ্যাক্টরিগুলোর তালিকায় এসব উপকরণও যুক্ত হতে থাকে।

সুরাট কারখানার দৈনন্দিন জীবনের সর্বোত্তম বিবরণী পাওয়া যায় ভ্রমণ কাহিনিতে। কারণ সেখানকার কর্মচারীদের সরকারি চিঠিপত্রে যদিও অনেক বিষয়ের উল্লেখ থাকত, কিন্তু সেগুলো ছিল মুলত ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত এবং তাদের জীবনযাত্রার বর্ণনা প্রায়ই অস্পষ্ট থাকত। তবুও মাঝে মধ্যে এমন ইঙ্গিত থাকত যে, কারখানার কোনো সদস্য প্রাচীরের বাইরের জগতের সাথে কতোটা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে।

একটি বড় ব্যতিক্রম ঘটে ১৬৩০ সালে যখন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম মেথওল্ড স্বীকার করেন, কোম্পানি সুরাটে যে ওষুধপত্র পাঠায় কারখানার সদস্যরা সেগুলোর ব্যবহার প্রায় পুরোপুরিই বর্জন করেছে এবং স্থানীয় মোগল চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে। তিনি লিখেন, 'আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষের দেহের তাপমাত্রার যে পার্থক্য ঘটে তা বিবেচনায় না রেখে প্রেরিত ওষুধপত্র অদক্ষ হাতে ব্যবহারের কারণে রোগ নিরাময়ে তেমন ফল পাওয়া যায় না। সেজন্যে আমাদের পক্ষে নিরাপদ ব্যবস্থা হচ্ছে ভারতীয় পদ্ধতি এবং প্রয়োজনে এ দেশের খাদ্য গ্রহণ। অতএব কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্যে উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে এ দেশের সাধারণ চিকিৎসা গ্রহণ করা।'

ডিউক অফ হোলস্টেইনের দূত জন অ্যালচার্ট ডি ম্যান্ডেলসলো প্রায় একই সময়ে সুরাটের কারখানা পরিদর্শন করেন। তার বিবরণীতে দেখা যায় যে, যদিও তিনি কারখানাকে শান্ত, ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ধার্মিকতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে তুলে ধরেছেন, কিন্তু সেখানকার সদস্যদের জীবনযাত্রা অনেক বেশি উচ্ছল ছিল, এমনকি লণ্ডনের চাইতেও। সুরাট ফ্যাক্টরির ইংলিশরা হয়তো অবিবাহিত থাকার বিধানটি পালন করে থাকবে। কিন্তু প্রাথমিক সময়ের একটি রিপোর্ট পাওয়া যায় যে, একজন ইংলিশ এক ভারতীয় মেয়েকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করে বড় ধরনের কেলেংকারি ঘটিয়েছিল। কিন্তু এ ঘটনার পরও ভারতীয় পোশাক পরিধান এবং সন্ধায় মোগল নর্তকিদের নৃত্য উপভোগ ও দরবারে হাজিরা দেওয়া থেকে তাদের বিরত রাখা যায়নি। সুরাটের উত্তর দিকে ব্রিটিশরা একটি সৌধ সংলগ্ন বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। সৌধটিকে ম্যান্ডেলসলো নামে সেখানকার এক অভিজাত ব্যক্তির সমাধি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ম্যান্ডেলসলোর সফরের সময় একদিন সন্ধ্যায় ফ্যাক্টরির সদস্যরা বের হয়ে সমাধির চারপাশের উদ্যান প্রদক্ষিণ করে এবং এক পর্যায়ে তাদের কাপ্টেনের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় এবং 'সহজেই কল্পনা করা যায় যে মহানন্দে মেতে ওঠে। তারা কিছু মহিলার খোঁজ করে যারা আমার

BanglaBook.org

পোশাক দেখতে আগ্রহী ছিল। তখনো আমি জার্মান পোশাক পরতাম, যদিও ব্রিটিশ ও ওলন্দজরা যারা ভারতে বসবাস করছিল, তারা সাধারণত সে দেশের পোশাকই পরিধান করত এবং আমাকেও পীড়াপীড়ি করল জার্মান পোশাক পরিত্যাগ করতে। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল, আমি আমার পোশাক ছাড়তে আগ্রহী নই, তারা আমাকে উলঙ্গ করতে চেষ্টা করল এবং বিপরীত লিঙ্গের কারো কাছে যা কাঙ্ক্ষিত তাতে লিপ্ত করতেও তাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু আমাকে তাদের ইচ্ছায় সাড়া দেয়ার মতো না দেখে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল।'

সুরাট ফ্যাক্টরিতে পরবর্তীতে আরও যেসব ইংরেজ গেছে তারা অধিকতর ভারতীয় জীনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক বাঙালিদের লুঙ্গি পরিধান করেন এবং এক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেন। যাকে তিনি তার প্রথম স্বামীর সাথে চিতায় পুড়ে মরার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ভারতের ওপর লেখা প্রথম দিকের ভ্রমণ কাহিনগুিলোর অন্যতম আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের 'নিউ একাউন্টস অফ দ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া'-এ। তিনি লিখেছেন:

'জব চার্নক উপনিবেশকে পছন্দ করেছেন, সেখানে তিনি এখন একজন রাজার মতোই নিরঙ্কুশ। দেশটি ধর্মীয় গোঁড়ামিতে পূর্ণ, মৃত স্বামীদের সাথে তাদের স্ত্রীদের পুড়িয়ে দেয়ার রীতি এখানে পালিত হয়। জব চার্নক একদিন তার প্রহরীদের নিয়ে বের হয়ে দেখতে পান, এক সদ্য বিধবা তরুণী এই বিপর্যয়ের মুখে। তিনি বিধবার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং প্রহরীদের পাঠান বলপূর্বক মেয়েটিকে ঘাতকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে। তাকে তিনি নিজ বাসস্থানে নিয়ে আসেন। দীর্ঘদিন তারা প্রেমময় জীনব কাটান এবং বেশ ক'টি সন্তান হয় তাদের। চার্নক কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করার পর তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। চার্নক স্ত্রীকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেননি। তার নিজের ধর্মই পালন করতে দিয়েছেন। অতএব মৃত্যুর পর সুচারুভাবে তাকে দাহ করা হয় এবং দাহ করার স্থানে একটি সৌধও নির্মাণ করেন জব চার্নক। সেখানে প্রতিবছর তার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হত তার সৌধের ওপর একটি মোরগ উপসর্গ করে।'

মোগল রাজধানী আগ্রায় ইংরেজরা মোগলদের শক্তি ও সমৃদ্ধির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। মোগল ঐশ্বর্য তাদেরকে বিস্মিত করে। তাদের একজনের মতে, 'এখনে নগরীর কেন্দ্রস্থলে আমরা মাংস, পানীয় এবং পোশাকের বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করতাম। এখানকার রীতি অনুসারে মেঝের ওপর বসে মাংস বা অন্যান্য খাবার খেতে হত। কক্ষগুলো সাধারণভাবে গালিচায় মোড়া এবং সুন্দর উঁচু তাকিয় দিয়ে সাজানো।' প্রথম দিকে একজন ইংরেজ দূত উইলিয়াম হকিং সম্রাট কর্তৃক তাকে প্রদত্ত একজন স্ত্রীও গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি নিজ



BanglaBook.org

বাড়িতে মুসলিম রীতিই অনুসরণ করতেন। তার সঙ্গীরা এ ধরনের আচরণ পছন্দ না করলেও তিনি তার সিদ্ধান্ত এবং ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন না।

খুব বেশিদিন হয়নি, এক ইংরেজ আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালের ৫ এপ্রিল ফ্রান্সিস ব্রেটন, যিনি এশিয়ার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার ছিলেন, লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকদের কাছে একটি চিঠি লিখতে বসেন। তাদেরকে দেওয়ার জন্যে কিছু মন্দ খবর ছিল তার কাছে। 'আমি ইচ্ছা করছি যে, এখনেই আমার কলম থেমে যাবে। আমাদের জন্যে বেদনার বিষয় হল, আপনাদেরকে একটি দুঃখজনক খবর শোনাতে হচ্ছে। এটি শুধু একজন ব্যক্তিকে হারানোর ঘটনা নয়, আমাদের জাতির জন্যে অসম্মানের ব্যাপার এবং খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসের প্রতিও অমর্যাদার। আগ্রায় অবস্থানকালে আপনাদের একজন অফিসার জসুয়া ব্ল্যাকওয়েল স্বধর্ম পরিত্যাগ করেছেন।'

ব্রেটন তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে কিভাবে এক রোববার প্রার্থনার পর ব্ল্যাকওয়েল একান্তে নগরীর গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যিনি একজন কাজীকে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন এবং আরও অনেকে অপেক্ষা করছিল তার আগমনের। তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে ব্ল্যাকওয়েল খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তখনই তার খৎনা করানো হয় এবং তিনি ইংরেজদের দল থেকে হারিয়ে যান।

ব্ল্যাকওয়েলের বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর। সেন্ট জেমসের রাজদরবারে পণ্য সরবরাহকারীর পুত্র। সতের বছর বয়সে তিনি তার বাড়ি ছেড়ে আসেন এবং এর আগেও মোগল দরবারে কোম্পানির বিপণন কেন্দ্রটি দেখাশুনার জন্যে তাকে পাঠানো হয়েছিল। তার নিয়োগটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন ভারতে মোগল শাসনের স্বর্ণযুগ এবং আগ্রা থেকে সম্রাট শাহজাহান ভারতের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন, যা বর্তমান ভারত, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের বিশাল অংশ পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। ছোট্ট ইংরেজ সম্প্রদায় বাস করত যমুনা নদীর ওপারে। যমুনার প্রান্তে তখন তাজমহলের ভিত্তির ওপর বিশাল শ্বেত গম্বুজ উঠছে। ব্ল্যাকওয়েল উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি জানতেন, মোগলদের সম্পদ ইউরোপের যে কোনো রাজার সম্পদের চেয়ে বহুগুণ অধিক। তাছাড়া মোগল রাজধানীর সৌন্দর্য, আয়তন খ্রিস্টান জগতে অকল্পনীয়। তিনি যে প্রাচুর্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে যাচ্ছেন তার তুলনায় খৎনা করানোর ব্যথা অতি সামান্য। ব্ল্যাকওয়েলকে তার সহকর্মীরা বিদ্রুপ করে লিখত, 'জাগতিক সুবিধা লাভের অলস ও ভ্রান্ত আশা এবং শয়তানের ভ্রান্ত পরামর্শ।' এসব চিঠি তাকে নিরুৎসাহিত করার পরিবর্তে বরং আরও উৎপসাহিত করত। অন্য বিষয়ে উল্লেখ করলে বলতে হয়, ধর্মীয় কারণে নয়, উচ্চাভিলাষই তাকে ধর্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

BanglaBook.org

শিগ্‌গির ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে আরও ধর্মত্যাগী যোগ দিল এবং তাদের অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করতে আগ্রা ত্যাগ করল। ১৬৫৪ সালে সুরাট থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তেইশজন সদস্য একযোগে পক্ষ ত্যাগ করে। আরও অনেকে তাদের অনুসরণ করে। ঠিক যেভাব পরবর্তীতে ইংরেজ বিপথগামীরা নৈশ অভিযানে বের হত : তাদের নির্দিষ্ট বেশ্যাদের কাছে গমন, মাতলামি করা, কখনো বলপূর্বক বেশ্যালয় বা মদের দোকানে ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটত। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে ইংরেজদের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। উইলিয়াম মেথওল্ড অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে এসব বিবরণ লিখেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতির পর ইংরেজদের রাস্তায় দেখে যে কেউ 'বাহেনচোদ্,' 'বেটিচোদ্' বলে গালি ছুড়লে তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

ইংরেজদের পূর্বে পর্তুগীজদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে—ব্রিটিশরাও ক্রমবর্ধমান হারে মোগলদের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে আগ্রহ দেখাতে থাকে এবং তা ব্যাপক সংখ্যায়। এর মুখ্য কারণ ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাধারণ সৈনিক ও নাবিকদের মানবেতর অবস্থায় রাখত এবং তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় ভারতে আসতে চায়নি। মাদ্রাজ কাউন্সিলের পাঠানো চিঠিপত্রগুলো অভিযোগে পূর্ব থাকত যে, ভারতে যাদেরকে পাঠানো হচ্ছে, তারা ব্রিটিশ সমাজের অতি নিম্ন পর্যায়ের লোক। 'এটা খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল যে, তাদের অনেকে নিউগেট কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে, অনেকে তা স্বীকারও করেছে। তাদেরকে মোটামুটি শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে পারলেও পরবর্তীতে আগত অনেকে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল।'

এ ধরনের লোকজন, যাদেরকে প্রায় ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করা হয়েছে ব্রিটিশ সমাজের প্রান্তিক অবস্থান ও ভৌগোলিকভাবেও দূর থেকে—তাদের পক্ষে লন্ডনের বিত্তবান ব্যবসায়ীদের একটি কোম্পানির পতাকার প্রতি আনুগত্যের আশা করার সামান্য কারণই ছিল। অতএব তাদের কাছে মোগলদের দেয়া লোভনীয় প্রস্তাব প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্রতিরোধ্য প্রমাণিত হয়েছে। ১৬৭০-এর দশকে ব্রিটিশরা যখন বুঝতে পারল যে, মোগলরা বোম্বেতে গোপনে তাদের মধ্য থেকে লোক সংগ্রহ করছে, তখন যথার্থই শংকিত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে ১৬৮০-এর দশকে ব্রিটেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লস দেশিয় চাকরিতে নিয়োজিত সকল ইংরেজকে ইংল্যাণ্ডে তলব করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। খুব কম সংখ্যক ইংরেজই তার আহ্বানে সাড়া দেয়। শতাব্দীর শেষ দিকে স্বপক্ষ ত্যাগ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্যে মারাত্মক এক সমস্যায় পরিণত হয়। কারণ তখন অধিক হারে ইংরেজরা ভারতীয় চাকরিতে যোগ দিচ্ছিল; কখনো মোগল দরবারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পদশালী ও সহনশীল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের অধীনে, যাদের নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের বেশিরভাগ এলাকা ছিল।

BanglaBook.org

দক্ষিণাত্যের এই প্রেক্ষাপট ছিল চমৎকার। কারণ এই অঞ্চলের বিখ্যাত এই নগররাজ্যগুলো রেনেসাঁর যুগের ইতালির সমসাময়িক এবং আগ্রায় মোগল দরবারের চাইতে অধিকতর উন্মুক্ত সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ছিল বহিরাগতদের জন্যে। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কে সহজ সাধারণ ছিল। বিশেষ করে উত্তর ভারতের চাইতে এবং দীর্ঘদিন থেকেই বিজয়নগরের হিন্দু রাজা প্রকাশ্যে ইসলামী আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিধানের উদারতা প্রদর্শন করে আসছিলেন। অন্যদিকে সেই অঞ্চলের প্রতিটি মুসলিম সুলতান নিজ নিজ রাজ্যে হিন্দু প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করাকে নিয়মে পরিণত করেছিলেন।

গোষ্ঠীগত ও ধর্মীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের এই পরিস্থিতি যে শুধু পর্তুগীজদের এই এলাকায় আকৃষ্ট করেছিল তা নয়, অন্যান্য ইউরোপীয় ভাড়াটে সৈনিকদেরও আকষ্ট করেছে। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকেও জাহাজ বোঝাই হয়ে আসত অভিবাসীরা, যাদের মধ্যে ছিল পারস্য, ইয়েমেন ও মিশরের লোকজন।

মধ্যপ্রাচ্যের এসব অভিবাসীরা দাক্ষিণাত্যকে আরবি শিক্ষা ও সাহিত্যের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করেছিল এবং তার সাথে এনেছিল অটোম্যানদের ট্যালির কাজ এবং পারস্য ও ট্রান্সওক্সিয়ানার স্থাপত্য কৌশল।

অভিবাসনের এই ধারার প্রতিফলন ঘটেছে দাক্ষ্যিনারত্যর চিত্রকলায়, ১৬৭০ সালের দিকে অঙ্কিত রহিম ডেকানির মিনিয়েচার চিত্রে। চিত্রের এক পাশে দাক্ষিণাত্যের রাজ পোশাকে সজ্জিত এক যুবরাজ উপবিষ্ট, অন্য পাশে দুজন মহিলা পরিচারিকা, একজন, বীণা বাজাচ্ছে, আরেকজন তাকিয়ে আছে। তার পেট অনাবৃত, স্তনের কালো বোটা স্বচ্ছ রেশমি ওড়নার ভেতর দিয়ে দৃশ্যমান। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এটাই ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় উদ্যান দৃশ্য। কিন্তু চিত্রের কেন্দ্রেস্থলে চতুর্থ এক অভিজাত তরুণী, যার পরনে মূল্যবান রেশমি বস্ত্র এবং মাথায় পালকশোভিত প্রশস্ত প্রান্তের টুপি। ইউরোপীয় গ্লাসে সে শাহজাকে পানীয় পরিবেশ করছে।

শাহজাহানের আমলে হারেমের মিনিয়েচার চিত্রের সঙ্গে এ চিত্রের কোনো মিল নেই, বরং বৈপরীত্য আছে। দাক্ষিণাত্যের এই পরিবেশ যে বহুসংখ্যক ইউরোপীয়ের সমাবেশের কারণ তা স্পষ্ট বুঝা যায়। গোষ্ঠীগতভাবে পৃথক হলেও সহজে খাপ খাইয়ে নেয়ার মানসিকতা ছিল দাক্ষিণাত্যের শাসকদের মধ্যে। সে কারণে সাবেক পর্তুগীজ গোলন্দজারা এখানে এসে দরবারে পারস্যের কবি ও ক্যালিগ্রাফারদের সাথে, পাগড়িধারী আফগান যুদ্ধবাজ, সংস্কৃতিসম্পন্ন শিরাজের নাবিক, সাবেক অশ্বারোহী সৈনিক, পক্ষত্যাগী ফরাসি জুয়েলার এবং নবাগত ইংরেজ ভেরীবাদকরা পাশাপাশি আসন নিয়েছে।

দাক্ষিণাত্যের দরবারের সামর্থ্য ছিল বহিরাগতদের ধরে রাখার এবং তাদের সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলার। গোলকুণ্ডা দরবারে রবার্ট ট্রুলের

BanglaBook.org

খৎনার দেড়শ বছর পর কুতুব শাহীদের স্থলাভিষিক্ত হায়দারাবাদের আসফ জাহি নিজামদের দরবারে জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক একই ধরনের অস্ত্রোপচারের জন্যে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন।

১৬৩৬ সালে শাহজাহান দাক্ষিণাত্যের সুলতান শাসিত রাজ্যগুলো দখলের জন্যে যে অভিযান শুরু করেছিলেন তা অর্ধ শতাব্দী পর তার পুত্র আওরঙ্গজেব সমাপ্ত করেন ১৬৮৭ সালে। এই বিজয়ের ফলে মোগল সাম্রাজ্য বিশালভাবে বিস্তৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী দেড়শ বছরে তাদের যে অবক্ষয় ঘটে তার সূচনা করেছিল। দাক্ষিণাত্যে শক্তির সমাবেশ মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে শক্তির শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল—সেই শূন্যতা পূরণে যারা আগ্রহী ছিল তাদের মধ্যে ব্রিটিশরাও ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং মোগলদের শক্তি ক্ষয় হতে থাকে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আশায় পক্ষত্যাগের ঘটনাও ক্রমে শেষ হয়ে যায়। এর ফলে প্রকাশে ইসলামে দীক্ষা নেওয়ার ঘটনাও আর সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা যায় না। কিন্তু ততোদিনে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে ঔপনিবেশিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। গোপন ধর্মান্তর তবুও চলতে থাকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কোনো অভিজাত মুসলিম মহিলাকে বিয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ জরুরি ছিল।

বলপূর্বকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক ধর্মান্তরের একটি ঘটনা ঘটেছিল। মহীশূরের টিপু সুলতানের কাছে পল্লিলুরের যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিপর্যয়মূলক পরাজয়ের পর ১৭৮০ থেকে ১৭৮৭ সালের মধ্যে সাত হাজার ব্রিটিশ পুরুষ এবং অজ্ঞাত সংখ্যক মহিলাকে বন্দি করে শ্রীরঙ্গপতনায় সুরক্ষিত দুর্গে রাখা হয়। তাদের মধ্যে তিনশ জনকে খৎনা করিয়ে মুসলিম নামকরণ এবং মুসলিম পোশাক পরানো হয়। আরও অপমানজনকভাবে ব্রিটিশ রেজিমেন্টাল ঢাকবাদক বালকদেরকে মেয়েদের ঘাগড়া ও ওড়না পরিয়ে নর্তকিদের মতো দরবারিদের মনোরঞ্জনে নিয়োগ করা হয়। দশ বছর ধরে বন্দিত্বের পর একজন বন্দি জেমস স্কারি দেখতে পান যে, তিনি চেয়ারে বসতে বা ছুরি ও কাঁটাচামচ ধরতে ভুলে গেছেন। তার ইংরেজি ভাঙা ভাঙা এবং দ্বিধাগ্রস্তের মতো এবং তার নিজ দেশের বহু শব্দই ভুলে বসেছেন। তার ত্বক কালো হয়ে নিগ্রোদের মতো ময়লা রং ধারণ করেছে এবং তিনি আরও বিস্ময়ের সাথে প্রত্যক্ষ করেন যে, তিনি ইউরোপীয় পোশাক পরিধান অপছন্দ করতে শুরু করেছেন। এ অবস্থা ছিল ঔপনিবেশিক দুঃস্বপ্নের অনিবার্যতা এবং সবচেয়ে গুরুতর ছিল যে, বন্দিরা তাদের আটককারীদের পদ্ধতি অনুসরনকেই প্রাধান্য দিচ্ছিল।

BanglaBook.org

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে, জেমস কার্কপ্যাট্রিক যে সময়ের দিকে প্রথম ভারতে আসেন তখন এদেশে ব্রিটিশ শক্তি ও ক্ষমতার বলয় ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। সেই সাথে ভারতে ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তনের সূচনা ঘটেছিল। নতুন আস্থা এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে উপকুল জুড়ে ব্রিটিশ প্রভাবিত শহরগুলো অধিকতর অ-ভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করছিল। প্রতি বছর সেন্ট মার্টিন ইন দি ফিল্ডস-এর মডেল অনুসারে গির্জাগুলোর পাশাপাশি নির্মিত হচ্ছিল ব্রিটিশ থিয়েটার ও লাইব্রেরি। তারা ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশও শুরু করে, ব্রিটিশ ধরনে তাস খেলা শুরু হয়, ফুটবল খেলা ও ব্রিটিশ নৃত্যানুষ্ঠান আয়োজিত হতে থাকে। ফ্রিম্যাশনরা একটি আবাস চালু করেন, ওল্ড এটোনীয়রা বার্ষিক ক্রিকেট ম্যাচের ব্যবস্থা করে। ১৭৭৪ সালের মধ্যে 'ক্যালকাটা হান্ট ক্লাব'ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলো তাৎক্ষণিক অথবা পুরোপুরি কোনো পরিবর্তন ছিল না এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরো সময় জুড়েই পুরনো ধারায় আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিবর্তন অব্যাহত ছিল। যেমন—তখনো একান্তে এবং অনানুষ্ঠানিক সমাবেশে ভারতীয় পোশাক ইংরেজদের প্রিয় ছিল। ১৭৭০-এর দশক পর্যন্ত কলকাতায় কাউন্সিলের কাছে সভায় হাজির হতে ভারতীয় পোশাক পরিধানের বিষয়টি আর অজ্ঞাত ছিল না। অন্য সকল বিবেচনার বাইরেও ভারতের আবহাওয়ায় এ পোশাক অত্যন্ত উপযোগী ছিল।

যে স্বাচ্ছন্দ্য বা সাবলীলতার কারণে এত অধিক সংখ্যক কোম্পানির কর্মচারী ভারতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয় তা ছিল ভারতের গ্রহণযোগ্যতার যুগ, যে কারণে বিদেশিরা দলে দলে এদেশে আসতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিধি অনুসারে ষোল বছরের অধিক বয়সী কাউকে কোম্পানির হয়ে ভারতে আসতে দেওয়া হত না। অতএব কোম্পানির যে অফিসারের বয়স ত্রিশ, তিনি তার জীবনের অন্তত অর্ধেকটাই ভারতে অতিবাহিত করেছেন। এ পদ্ধতির বিরোধী ব্রিটিশ মিশনারি রেভারেন্ড ক্লদিয়াস বুকানন ব্রিটেনে বহু প্রজন্মের রাজকীয় ও ধর্মীয় অফিসারদের উৎকণ্ঠার কথা ব্যক্ত করেছেন। তার মতে, 'দূর অঞ্চলে বিশাল সাম্রাজ্যের দিকে আমাদের তাকানোর লক্ষ্য কি, যা সর্বোতভাবে পরিচালিত হবে পুরুষদের দ্বারা, যারা সেখানে যায় বালক বয়সে এবং একজন ইংরেজ তরুণের যে শিক্ষা, নৈতিকতা বা ধর্মবোধ সে দেশের আচরণের সাথে, নিজেদের গুলিয়ে ফেলে এবং নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়।'

এসব সত্ত্বেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করেছিল ব্রিটিশদের মধ্যেই, যারা তিনটি উপকূলীয় শহরে ইউরোপীয় কায়দায় বসবাস করত এবং যারা বিক্ষিপ্তভাবে প্রকৃত ভারতীয় পরিবেশে থাকত তিন প্রেসিডেন্সি এলাকার বাইরে। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগতে পড়ে একজন ইংরেজকে নিজ পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হত। পূর্বের মতোই ইউরোপীয়

BanglaBook.org

সমাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ব্রিটিশদের মধ্যে ব্যাপক রূপান্তর ঘটে, বিশেষ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যেসব প্রতিনিধিকে দূরবর্তী ভারতীয় রাজ্যগুলোতে নিয়োগ করা হয়েছিল। দিল্লিতে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের ব্রিটিশ প্রতিপক্ষ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন বোস্টনে জন্মগ্রহণকারী স্যার ডেভিড অক্টারলোনি। জেমস কার্কপ্যাট্রিকের বড় ভাইয়ের পুরনো বন্ধু। অক্টারলোনি ইতেমধ্যে বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ঘূর্ণাবর্তে চলাফেরা করেছেন। তার পিতা ছিলেন স্কটিশ, যিনি ম্যাসাচুসেটস-এ বসতি স্থাপন করেছিলেন। আমেরিকান বিপ্লব শুরু হলে তিনি সপরিবারের কানাডায় পালিয়ে যান এবং সেখানে থেকে লণ্ডনে আসেন। লন্ডনে ডেভিড কোম্পানির সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৭৭৭ সালে। এরপর তিনি আর কখনো নতুন বিশ্বে ফিরে যাননি এবং ভারতকে নিজের দেশ হিসেবে ঘোষণা করে এ দেশ ত্যাগ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

ভারতের রাজধানীতে অক্টারলোনি মোগল খেতাব 'নাসির-উল দৌলা' হিসেবে সম্বোধিত হতে পছন্দ করতেন এবং মোগল অভিজাতদের মতোই জীবনযাপন করতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার তেরজন পত্নী ও উপপত্নী স্বামীর পেছনে নিজ নিজ হাতিতে উঠে শহর প্রদক্ষিণ করতেন। অক্টারলোনির হুক্কায় ধুমপান, বাইজি নাচ ও ভারতীয় পোশাকপ্রিয়তা কলকাতার অ্যাংলিকান চার্চের প্রধান বিশপ রেগিন্যাল্ড হেবারকে বিস্মিত করে। তিনি একটি ডিভানে বসে হেবারকে অভ্যর্থনা জানান। তার পরনে ছিল চোগা ও পাগড়ি। ভৃত্যরা ময়ূরের পালকের তৈরি পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করছিল। অক্টারলোনির তাঁবুর এক পাশে লাল রেশমি বস্ত্রে তৈরি হারেম, যেখানে তার রমনীরা ঘুমাতো। অন্য পাশে তার কন্যাদের তাঁবু, সবার পরনে লাল জামা এবং হেবারের দৃষ্টিতে তাদেরকে সুশ্রী লাগছিল।

রাজপুতানার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় বিশপ লক্ষ্য করেন, অক্টারলোনির অনুচরবৃন্দও অত্যন্ত চৌকস। তাদের ঘোড়া, হাতির সংখ্যা অনেকগুলো। মহিলাদের বহনকারী পালকি পর্দা ঘেরা। তারা নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের মতে সার বেঁধে যাচ্ছিল। 'আমার ধারণা সংখ্যায় তারা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন হবে। কেউ ঘোড়া পিঠে, কেউ পদাতিক। তারা বর্শা এবং বিভিন্ন ধরনের গাদা বন্দুকে সজ্জিত। উটের রশিগুলো দীর্ঘ। যেন প্রাচ্যের কোনো রাজা ভ্রমণে বের হয়েছেন। অক্টারলোনি আরও চারজনসহ একটি বহরে। তিনি দীর্ঘাকৃতির সুদর্শন বৃদ্ধ লোক, কিন্তু শাল দিয়ে তার সারা শরীর আবৃত, মাথায় মোগল ধাঁচের ফার টুপি। শুধু তার মুখটাই দেখা যাচ্ছিল। নিজ দেশে ৫৪ বছর যাবৎ তিনি অনুপস্থিত। সেখানে তার কোনো বন্ধু বা আত্মীয় নেই এবং এই দীর্ঘ বছরগুলো ধরে তিনি প্রাচ্যদেশীয় অভ্যাস ও কুচকাওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তিনি যদি অবসর না নেয়ার অথবা ইংল্যান্ড ফিরে না যাওয়ার ইচ্ছা

BanglaBook.org

প্রকাশ না করেন তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না যে, পৃথিবীতে একটি মাত্র দেশের সাথেই তিনি নিজেকে আঁকড়ে রাখতে চান, যেটিকে তিনি নিজের দেশ বলেই বিবেচনা করেন।' অক্টারলোনি সম্পর্কে বিশপ হেবারের এটাই ছিল মূল্যায়ন।

যেসব ইউরোপীয় তাদের ভারতীয় পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিশে গেছে তারা ইউরোপীয় ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে তাদের ভারতীয় শাসকের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। দুজন আইরিশ সৈনিক ভারতে এসেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। সাধারণ নাবিক হিসেবে আসে তারা এবং জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে ভারতের উদ্দেশে পথ করে নেয়। ভারতে তারা ভারতীয় শাসকদের সৈনিক হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয় এবং রূপান্তর কিভাবে হতে পারে তারা যা যথার্থই প্রদর্শন করে।

আলস্টার থেকে আগত টমাস লেগি'র কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্র ও জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ গণনা সম্পর্কে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জয়পুরের বাইরে রাজস্থানের মরুভূমিতে এক পরিত্যক্ত সৌধে নগ্ন ভিক্ষুকের মতো দিন যাপন করতেন। তিনি মধ্য ভারত এবং সিন্ধু এলাকায় ব্যাপক সফর করেন এবং মাঝে মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিক ও কামান নির্মাতার কাজ গ্রহণ করতেন। এর্‌পর পুনরায় সিন্ধুর উজান বেয়ে পামিরের দিকে অগ্রসর হন এবং কাবুল ও বাদাখশান সফর করেন। এক পর্যায়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বিখ্যাত পর্তুগীজ জ্যোতিষী ফ্যাভিয়ার ডি সিলভা'র নাতনিকে বিয়ে করেন। ফ্যাভিয়ারকে পর্তুগীজ রাজা ভারতে পাঠিয়েছিলেন জয়পুরের মহারাজা জয় সিংকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে। জয় সিং দিল্লির বিখ্যাত মানমন্দির জন্তর মন্তরের নির্মাতা।

এক পর্যায়ে লেগির সাথে সাক্ষাৎ ঘটে জেমস টডের। টড 'অ্যানালস এন্ড এন্টিকুইটিস অফ রাজস্থান' গ্রন্থের প্রণেতা। যিনি রাজস্থানের সংস্কৃতির সাথে নিজেকে এতোটাই একাত্ম করে ফেলেছিলেন যে, ভারত প্রেমিক অক্টারলোনি পর্যন্ত অভিযোগ করেন যে, টড রাজপুতদের সাথে বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে স্বয়ং অতিরিক্ত রাজপুত। লেগির মধ্যে টড তার মতোই ভারতীয় সংস্কৃতিতে আগ্রহ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দুজনকে গভীর রাত পর্যন্ত ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্র ও ভবিষ্যৎ গণনা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। টমাস লেগি টডের কাছে প্রকাশ করেন যে তার বিশ্বাস, তিনি হিন্দুকুশ পর্বতের গভীরে স্বর্গীয় উদ্যান 'গার্ডেন অফ এডেন' আবিস্কার করেছেন। তিনি টডকে মধ্য এশিয়ার অতি প্রাচীন একটি কাহিনির আইরিশ ব্যাখ্যা করেন, 'একটি পর্বতের কেন্দ্রস্থলের গভীরে মনোরম এক উদ্যান অবস্থিত, যা পরিপূর্ণ সুস্বাদু ফলে। উদ্যানের এক প্রান্তে সুবর্ণ ইটের স্তূপ, আরেক প্রান্তে রৌপ্য নির্মিত ইট।' টড লেগিকে তার পরিত্যক্ত সৌধে ফিরিয়ে নিয়ে যান, যেখানে তিনি

BanglaBook.org

ভিক্ষুকের মতো জীবনযাপন করতে থাকনে। এরপর বেশিদিন তিনি জীবিত ছিলেন না। ১৮০৮ সালে তার মৃত্যু হয় এবং যে সৌধে তিনি থাকতেন সেখানেই তাকে কবরস্থ করা হয়।

টমাস লেগির আরেক স্বদেশবাসী জর্জ টমাসের শিকড় ও আয়ারল্যান্ডের বিপরীত প্রান্তে। লেগির মতো তিনিও উত্তর ভারতের রাজাদের অধীনে চাকরি করেন। যথাসময়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি দিল্লির পশ্চিম দিকে মেওয়াতি ভূখণ্ডে নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফল হন এবং সম্ভবত তিনি কিপলিং-এর মডেল ছিলেন তার 'দি ম্যান হু উড বি কিং' গ্রন্থে। ব্রিটেনে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন 'দি রাজা ফ্রম টিপেরারি' হিসেবে এবং ভারতে তাকে বলা হত 'জাহাজ সাহিব'। হতে পারে 'জাহাজ' তার জর্জ নামের ভারতীয় অপভ্রংশ অথবা অতীতে তিনি নৌবাহিনীতে ছিলেন বলে তার এ নাম দেওয়া হয়।

হরিয়ানায় নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর জাহাজ সাহিব একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন নিজ অর্থ ব্যয়ে এবং একটি হারেমও প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তিনি ইংরেজি বলা ভুলে গিয়েছিলেন। তার কর্মজীবন শেষে তাকে যখন তার আত্মজীবনী লেখার জন্যে ডিকটেশন দেয়ার জন্যে বলা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'ফারসিতে বলতে পারলেই শুধু এটা সম্ভব হতে পারে।' তার মাতৃভাষার চাইতে ফারসিতেই তিনি অধিকতর স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিলেন। উইলিয়াম ফ্রাংকলিন নামে যে ব্যক্তিটি শেষ পর্যন্ত অশিক্ষিত ছিলেন, তিনি ফারসি এবং হিন্দুস্থানি ভাষা অবলীলায় বলতে, পড়তে ও লিখতে পারতেন। তাতে কোনো জড়তা থাকত না। তার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুত্র জনি টমাস পুরনো দিল্লিতে খ্যাতিমান উর্দু কবিতে পরিণত হন এবং মিনিয়েচার চিত্রে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও শেষদিকে মোগল অভিজাতদের অনুকরণে চুল ছাঁটা অবস্থায় তাকে দেখা যায়।

BanglaBook.org

এ ধরনের পরিবর্তন হয়তো ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠ মহলে সাধারণ ব্যাপার ছিল। কিন্তু ১৭৮০-এর দশকের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনো কর্মকর্তা যদি কলকাতা, মাদ্রাজ অথবা বোম্বেতে কিংবা বাংলার বড় কোনো সেনানিবাসে অবস্থান করত তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে তার ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ কমই ঘটতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতা দৃশত তাদের কাছে ইউরোপের বিচ্ছিন্ন কোনো এলাকা হিসেবেই বিবেচিত ছিল।

রাবার্ট ক্লাইভ লিখেছেন, 'কলকাতা বিশ্বের সবচাইতে বাজে জায়গাগুলোর একটি। যৌনতৃষ্ণা মেটানো এবং বিলাসিতা এখানে কল্পনা ছাড়িয়ে যায়। এ শহরে যদি এক মাসের মধ্যে বিপুল পরিমাণে সম্পদ আহরণ করা যায়, তাহলে এখানে মুহূর্তের মধ্যে তা হারানোও কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। তাস খেলতে বসেই নিঃশেষ হওয়া সম্ভব। রোগব্যাধির কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে

মৃত্যু এখানে সাধারণ ঘটনা এবং যখন তখন মৃত্যুর উপস্থিতি মানুষকে নিষ্ঠুর করে ফেলেছে। মৃত আপনজনের জন্যে তারা ক্ষণিক শোক প্রকাশ করে। পরে উন্মত্তের মতো তার অশ্ব ও অন্যান্য সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।'

কলকাতার কেন্দ্রস্থলে রাইটার্স বিল্ডিং যেখানে অবস্থিত, সেখানেই এসে উঠতো কোম্পানির অফিসাররা এবং তাদের প্রশিক্ষণও হত সেখানে। এ প্রশিক্ষণ ব্রিটিশ পাবলিক স্কুলের পড়াশুনার চাইতে ভিন্নতর ছিল, তাদের মধ্য থেকেই বাছাই করা হত কোম্পানির রাইটাইদের এবং তারা রাইটার্স বিল্ডিংকে হুগলি নদীর বাঁকে অবস্থিত ভবনের চাইতে টেমসের তীরে বলে ভাবতো। ডিনারের পর তাদের প্রিয় কোরাস 'অ্যালাস এন্ড অ্যালেক-দি-ডে' পরিণত হয়েছিল 'এ লাস এন্ড এ লাখ এ ডে' অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য নিয়ে রাইটাররা ভারতে এসেছিল এই সংক্ষিপ্ত কোরাসের মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি ছিল।

এ সময়ে কলকাতাভিত্তিক এ রাইটাররা কৃত্রিম ভারতীয়ের মতো আচরণ করত। তার মধ্যে ছিল পালকিতে চড়ে বেড়ানো, বাইজি নাচ দেখতে যাওয়া ও হুক্কা টানা। বাস্তবিক পক্ষে ১৭৮০-র দশকে হুক্কায় ধূমপান ইংরেজদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল, এমনকি কলকাতায় সে সামান্য কয়েকজন ব্রিটিশ মহিলা বাস করত তাদের মধ্যেও।

তবুও মানুষের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কলকাতায় একজন ইংলিশম্যানের পক্ষে ভারতীয়দের সাথে অথবা ভারতীয় সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার একমাত্র উপায় ছিল যদি কোনো ব্রিটিশ ভারতীয় বিবি বা সঙ্গিনি গ্রহণ করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধেক অংশে কোম্পানির অধিকাংশ কর্মচারি তাই করেছে বলে মনে হয়। ১৭৭০ থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত সময়ের 'বেঙ্গল উইলস' লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত আছে, যার প্রতি তিনটির মধ্যে একটিতে ভারতীয় স্ত্রী বা সঙ্গিনী অথবা তাদের জন্ম দেওয়া সন্তানদের প্রসঙ্গ রয়েছে। কোনো সন্দেহ ছাড়াই ধারণা করা যায় যে, অনেক ব্রিটিশ কর্মচারীই ভারতীয় স্ত্রী বা সঙ্গিনী রাখত এবং এ সম্পর্কে আইনগত কোনো দলিল রাখতে চাইত না।

ব্যাপারটি এত সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, লক্ষ্মৌর উর্দু কবিরা পুরনো দিনের জনপ্রিয় হিন্দুস্তানি রোমান্টিক কবিতা রচনা পরিত্যাগ করেছিল, যেসব কবিতায় মুসলিম যুবকের হিন্দু তরুণীর সাথে মিলনের করুণ পরিণতির বর্ণনা থাকত। তারা লিখতে শুরু করল 'মসনভী' বা দীর্ঘ কাব্য, যাতে উল্লেখ থাকত হিন্দু মেয়েরা ইংরেজরা প্রেমে পড়েছে এবং একই সাথে নিন্দিত হচ্ছে। রজব আলী বেগ সুরুর এর 'দি স্টোরি অফ ওয়ান্ডর্স'-এ প্রেমকাতর এক ইংরেজ সম্পর্কে লিখেছেন : 'অভিজাত বংশের এবং উচ্চ পদে নিয়োজিত এক সুদর্শন ইংরেজ যুবকের মাথায় ছিল প্রেমের তীব্রতা, তার হৃদয় ছিল প্রেমের আগুন।' সেই ইংরেজ যুবক এক হিন্দু দোকানির কন্যার গভীর প্রেমে পড়ে। কিন্তু

BanglaBook.org

মেয়েটির অভিভাবকরা এই প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে ইংরেজ যুবকের হৃদয় ভেঙে যায় এবং এক পর্যায়ে উন্মাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বেগ সুরুর লিখেছেন : 'সে ধূলির শয্যায় আশ্রয় নেয় এবং বেদনায় কাঁদতে থাকে...।' কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে বোম্বের আধুনিক ছায়াছবির মতো। যখন মৃত ইংরেজের কফিনসহ শোক মিছিল রাস্তা অতিক্রম করছিল তখন তার হিন্দু প্রেমিকা তার বাড়ির দোতলার জানালা থেকে কফিনের ওপর লাফিয়ে পড়ে এবং গুরুতর আহত হয়ে মারা যায়। বেগ সুরুর এভাবে কাহিনির পরিসমাপ্তি টেনেছেন—

> "উদ্দাম প্রেমের তীব্র আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন দুজনকে এক করে। উপস্থিত সকলে এ দৃশ্যে হতবাক হয়ে যায় এবং যাদের মধ্যে আবেগ অধিক ছিল তারা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। প্রেমিক-প্রেমিকার দুর্ভাগ্যজনক এই পরিণতি সম্পর্কে শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েটির বাবা-মা এত বেদনাহত হন যে, তারা শোকে মারা যান। এ থেকেই বুঝা যায়, প্রেম কী করতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার মৃতদেহ পাশাপাশি কবরস্থ করা হয়। মেয়েটির অভিভাবকরাই এ গরিণতির জন্যে দায়ী। হাজার হাজার মানুষ তাদের সমাধি সৌধ দেখতে আসে।"

তখনকার বহু উইল হৃদয়স্পর্শীভাবেই রজব বেগ সুরুর এর 'মুসনভী'ও সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় পক্ষ থেকেই প্রেমের বন্ধন এবং আনুগত্য সে সময়ে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার ছিল না। নিশ্চিতভাবেই বহু উইলে তাদের বন্ধু এবং পরিবারের প্রতি অনুরোধ করা হয়েছিল তাদের সঙ্গিনীদের প্রতি খেয়াল রাখার জন্যে। উইলে সেসব মহিলাকে উল্লেখ করা হয়েছে 'সুপ্রিয়া' (Well Beloved), 'সুযোগ্য বান্ধবী' (Worthy Friend) অথবা 'মধুর ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভদ্রমহিলা' (This Amiable and Distinguished) হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে উইলগুলোতে ইংরেজ সাহেবদের দেশীয় বিবিদের অত্যন্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিছু উইলে চুক্তিনামার উল্লেখ আছে—অষ্টাদশ শতাব্দীর বিবাহ-পূর্ব চুক্তির মতো এবং বহু মহিলা এই চুক্তি বলে তাদের ইংরেজ স্বামীর মৃত্যুর পর প্রভূত অর্থ, ভৃত্যসহ বাড়ির মালিকানাও লাভ করেছেন। ১৭৮২ সালে মেজর টমাস নেইলর-এর মৃত্যু হয়। তিনি তার সঙ্গিনী মাকলুম পাটনার জন্যে চল্লিশ হাজার রুপি রেখে গিয়েছিলেন। এছাড়া ছিল বাহরামপুরে একটি উদ্যানসহ বাংলো, গরুর গাড়ি, অলংকার, পোশাক এবং তার সকল পুরুষ ও মহিলা ভৃত্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আরেক ব্যবসায়ী ম্যাথু লেসলি তার চার বিবির প্রত্যেকের জন্যে একটি করে বাড়ি ও বিশ হাজার করে রুপি রেখে গিয়েছিলেন।

ভারতীয় সঙ্গিনী বা রক্ষিতা রাখার অর্থ নিশ্চিতভাবে কোনো ব্রিটিশের ভারতের প্রতি সহানুভূতি অথবা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তার দুর্বলতা প্রমাণ

BanglaBook.org

করে না। বরং এ থেকে তারা বহু দূরে ছিল। অবশ্য তখন এটা স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল যে, এভাবে নারী সংসর্গের ফলে কোনো পর্যায়ে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটবেই, এমনিক কলকাতায় যে ইংরেজ সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়েছে সেখানেও। ভারতে আগত নতুন কোনো ইংরেজের ভারতীয় বিবি গ্রহণের প্রভাব সম্পর্কে টমাস উইলিয়াম লিখেছেন,...'তাদের কর্মজীবনের প্রথম দিকে তরুণরা এদেশের মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের পছন্দের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে সেসব মহিলার রুচি, সমাজ, রীতিনীতির প্রতিও আকর্ষণ জন্মে, যা অতি দ্রুত অন্যান্য আকর্ষণকে ছাড়িয়ে যায়।' এর কিছুকাল পর অভিযাত্রী রিচার্ড বার্টন একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন, 'একজন ভারতীয় সঙ্গিনী তার সঙ্গীকে যে শুধু ভারতীয় কথা বলতে শিখায় তা নয়, দেশি জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে তোলে।

একটি সময় ছিল, যখন ইংরেজরা পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখাতো না, তখন ভারতীয় রমণীরা তাদেরকে নিয়মিত গোসল করার আনন্দের সাথে পরিচিত করে তোলে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ইংরেজি শ্যাম্পু শব্দটি 'ম্যাসাজ'-এর হিন্দি শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং তখনই এই শব্দ ইংরেজিতে যুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে চুল ধোয়ার ক্ষেত্রে সাবানের পরিবর্তে অন্য কোনো উপাদান ব্যবহৃত হত, ক্রমে তা ইংরেজ অভিজাতরা আয়ত্ত করে।' যারা ইংল্যান্ডে ফিরে যেত, তারা নিয়মিত গোসল ও শ্যাম্পু ব্যবহার অব্যাহত রাখায় পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাদের অসচেতন স্বদেশবাসীর মধ্যে শোভন বিবেচনা করত। এদিক থেকে তখনকার বাংলায় বসবাসকারী ইংরেজরা মহিলাসূলভ হয়ে উঠেছিল। কলকাতার কিছু ইংরেজ স্বাস্থ্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে খৎনা করিয়েছিল বলে জানা যায়—এর পিছনে ধর্মীয় কারণও থাকতে পারে, যা তাদের ভারতীয় স্ত্রী ও সঙ্গিনীরা-জরুরি বিবেচনা করত।

ভারতীয় প্রভাবের কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু কর্মচারী নিরামিষ ভোজীতে পরিণত হয়। তখনকার এক উপন্যাসে কলকাতার ইংরেজ নবাবের দেশে ফিরে যাওয়ার চমকপ্রদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, 'তার হিন্দু স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিভাবে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি আর ইংরেজ বা ভারতীয় কোনটাই ছিলেন না, খ্রিস্টান বা হিন্দুও ছিলেন না। খাবারের ব্যাপারে তিনি হয়ে পড়েছিলেন ব্রক্ষার ভক্ত, খেতেন ভাত, ফল, আলু এবং অন্যান্য সবজি। গো হত্যাকে তার মনে হত মানুষকে হত্যার মতো ব্যাপার।' এ শুধু উপন্যাসে সীমাবদ্ধ ছিল না, আরও অনেক ইংরেজ নবাবের বর্ণনা থেকেও এটা সুস্পষ্ট ছিল। এসব বর্ণনাকারীর মধ্যে ছিলেন কলকাতার মেয়র ও ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডি থেকে পরিত্রাণ লাভকারী জন জেফানিয়া এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ভারতীয় ভাস্কর্য সংগ্রহকারীদের অন্যতম ব্যক্তি আইরিশ সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল

BanglaBook.org

চার্লস হিন্দু স্টুয়ার্ট। স্টুয়ার্ট ভারতের বিভিন্ন স্থানে সওয়ার বা অভিযানে গেলেও তার ভারতীয় বিবিকে সাথে রাখতেন। এছাড়া একটি গাড়িতে থাকত তার সন্তানেরা। পালকিতে থাকত তার সদ্যজাত শিশু। হিন্দু পরিবারের জন্যে উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত এবং রান্নার যাবতীয় পবিত্রতা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাচক নিয়োগ করেছিলেন।

তখনকার সকল উইলে যে সুখী প্রণয় বা দাম্পত্য সম্পর্কের বিবরণ ছিল, এমন নয়। অনেক উইলে ভারতীয় বিবিদের সাথে শীতল দায়িত্বহীন সম্পর্কের বর্ণনা রয়েছে। ১৭৮২ সালে আলেকজান্ডার ক্রফোর্ড চট্টগ্রামে লিখিত তার উইলে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে, কিভাবে তার কুকুর ও ঘোড়াগুলোর যত্ন নিতে হবে। কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে এই বর্ণনার পর হঠাৎ মনে পড়ার মতো করে উল্লেখ করেছেন, ‘আমার মনে হয়, আমার মহিলাটিকে দুই হাজার রুপি প্রদান করলে সে আমার সন্তানদেরকে আপনার তত্ত্বাবধনে রেখে লালন করতে পারবে।’ পশুর ক্ষেত্রে যেমন নামের প্রয়োজন হয় না, তেমনি মহিলাটির কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং ভালো কোনো বক্তব্যও আর নেই। ইংরেজরা সেসব উইল রেখে গেছে সেসব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বহু ইংরেজ ধারাবাহিকভাবে এক নারীতে আসক্ত থাকলেও একটির পর একটি সঙ্গিনী বদলাতো। কখনো খুব দ্রুতই বদলাতো। বেশ কিছু সংখ্যক ইংরেজ এক সাথে দুই বিবি রাখত। স্বল্প সংখ্যক ইংরেজ বিরাট হারেমের অধিকারী ছিল। সমাসাময়িক ভারতীয় অভিজাতদের চাইতেও বড় ছিল তাঁদের হারেম। এ ধরনের একটি হারেমের বর্ণনা দিয়েছেন টমাস উইলিয়ামসন। তার লিখিত ‘ইস্ট ইন্ডিয়া ভাদে মেকাম’ তরুণ কোম্পানি অফিসারদের জীবনের আদর্শ গাইড ছিল, বিশেষ করে যারা ভারতে আসত তাঁদের জন্য। উইলিয়ামসন কোম্পানির এক কর্মচারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, যিনি অন্তত ষোলোজন রক্ষিতা রেখেছিলেন। তাকে যখন বলা হয়েছিল যে, এদের সবার সাথে তিনি কি করেন, তিনি বিড়বিড় করে শুধু বলেন, ‘আমি ওদেরকে শুধু সামান্য ভাত খেতে দেই এবং চারপাশে ঘুরঘুর করতে দেই।’

উইলিয়াম হিকি তার বাঙালি বিবি জামদানির সাথে যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন তা কলকাতার ইংরেজ নবাবদের ক্ষেত্রে উত্তম একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। সে সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল শুধুমাত্র রক্ষিতা হিসেবে তাকে রাখার মধ্য দিয়ে। হিকির এক প্রতিবেশী ইংল্যান্ডে ফিরের যাওয়ার পর তিনি জামদানিকে পেয়েছিলেন। স্মৃতিকথায় হিকি লিখেছেন, ‘আমার বাড়িতে কার্টারের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এক সুন্দরী হিন্দুস্থানি বালিকা আসত, যার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতাম আমি। যে অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল এবং বুদ্ধিমতি। কার্টার বাংলা ছেড়ে চলে যাবার পর আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার জন্যে। সে আমার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়।’ তাদের সম্পর্ক দ্রুত

BanglaBook.org

গভীর হয়। 'সেদিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত জামদানি আমার সাথে ছিল। তার ব্যতিক্রমী আচার-আচরণ, সৌজন্যের কারণে আমার সব বন্ধু তাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করত। এশিয়ার অধিকাংশ রমণীর মতো সে অচেনা লোকদের সামনে নিজেকে আড়াল করত না। বরং আমার পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিত আনন্দের সাথে। কিন্তু কখনো মদ স্পর্শ করত না।'

জামদানি হিকির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন বেন মি'রও অতি প্রিয় ছিল। মি এক চিঠিতে লিখেছেন, 'অতি ভদ্র ও মিশুক জামদানির প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। তার শোভন ব্যবহার ও মার্জিত আচরণ আমরা উপভোগ...এবং তার অধিক ঝাল সহযোগে রান্না করা তরকারির স্বাদ গ্রহণ করি।' হিকি'র স্মৃতিকথা মাঝে মাঝেই মি'র এ ধরনের চিঠির উল্লেখ রয়েছে, যিনি তার পাওনাদারের এড়াতে ইউরোপে পালিয়ে যান এবং কখনো কখনো সেখান থেকে জামদানির জন্যে উপহার পাঠাতেন। প্যারিস থেকে তিনি লিখেন, 'বিলম্বে হলেও আমি প্যারিসে কিছু অলংকার পেয়েছি, যেগুলো পেলে আমি নিশ্চিত সে প্রশংসা করবে এবং ওয়াহ্! ওয়াহ্! বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে। অলংকারগুলোর মধ্যে আছে ব্রেসলেট, নেকলেস, ইয়ারিং। তার প্রতি আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং আমি অনুনয় করছি, সে যেন এগুলো আমার জন্যে হলেও পরিধান করে।'

হিকি অসুস্থ হয়ে পড়ল জামদানি তার পাশে বসে থাকত গভীর উৎকণ্ঠায়। ব্যথা বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রতিটি লক্ষণ সে প্রত্যক্ষ করত। হিকি সুস্থ হয়ে উঠার পর কলকাতা থেকে সাড়ে সাত মাইল দূরে গার্ডেন রিচে একটি বিরাট বাড়ি ক্রয় করেন। নদীর তীরে খোলামেলা মনোরম চত্বরসহ বাড়ি, যেখানে নৌকায় অথবা গরুর গাড়িতে সহজে পৌঁছা সম্ভব। হিকি সেখানে চারটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাগ করেন নিজের জন্যে, জামদানি ও তার মহিলা পরিচারিকাদের ব্যবহারের জন্যে, যাতে কারো গোপনীয়তার ব্যাঘাত না ঘটে এবং সকলে আরামে থাকতে পারে। জামদানি সেখানকার আভিজাত্যে এত মুগ্ধ হয় যে, অবশিষ্ট জীবন সেখানে অবস্থানের চাইতে তার কাছে আর কোনো কিছুই এত সুখকর না। হিকি জামদানির জন্যে উপরের কামরাগুলো ছেড়ে দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

কিছুদিন পর জামদানি গর্ভধারণ করে। প্রতিনিয়ত তার পেট স্ফীত হচ্ছিল...সে একান্তে তার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছিল যে, তার গর্ভস্থ শিশুটি অবশ্যই 'একজন ছোট উইলিয়াম সাহেব হবে।'

'৪ আগস্ট পর্যন্ত তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল এবং সকালে নাশাতার সময়ও আমার সাথে হেসেছে, কথা বলেছে প্রফুল্ল চিত্তে। আমি গুরুত্বপূর্ণ একটি মালমলার নিস্পত্তি করতে আদালতে চলে যাই। আদালতে পৌঁছার পর এক ঘণ্টার বেশি হয়নি, আমার কয়েকজন ভৃত্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার সাথে দৌড়ে উপস্থিত হয় এবং আমাকে জানায় যে বিবি সাহেব মারা যাচ্ছে। তখনই

আমি বাড়ি পৌঁছে দেখতে পাই যে, বেচারি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে এবং দৃশ্যত দুপাটি দাঁত চোয়ালে শক্তভাবে আটকে গেছে। শক্তি খাটিয়েও দুপাটি বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হলো না। সে সদ্য প্রসব করেছে ফর্সা ত্বকের অধিকারী সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশু।'

হিকি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এক ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড প্রসব বেদনায় জামদানি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। দেশি এক দাই প্রসব করানোর দায়িত্বে ছিল। কারণ হিকির ইউরোপীয় ডাক্তার হেয়ার তখন অনুপস্থিত ছিলেন। দাই প্রচণ্ড ব্যথার কারণ হিসেবে জামদানিকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়েছে যে, তার জমজ সন্তান হবে, এ জন্যেই ব্যথার এই প্রচণ্ডতা। এতে বেচারি জামদানি আরও ভীত হয়ে পড়ে এবং আর্তচিৎকার করে সংজ্ঞাহীন পয়ে পড়ে।

'আমি বাড়িতে পৌঁছার পাঁচ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হন ডাক্তার হেয়ার। জামদানির অবস্থা দেখে তিনি অতি বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তিনি কি করবেন স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। শক্তিশালী ও অত্যন্ত কার্যকর ওষুধ প্রয়োগ করার আধ ঘণ্টা পর জামদানির জ্ঞান ফিরে এল এবং সে মুখ খুললো। নিজে সান্ত্বনা লাভের মতো উৎসাহিত হলাম তার অবস্থা উন্নতি হতে দেখে। আমাকে সে বললো, সে যে সেরে উঠবে তাতে তার সন্দেহ নেই। ডাক্তার হেয়ারও আমাকে আশ্বাস দিলেন বিপজ্জনক অবস্থা পার হয়ে গেছে এবং এখন সবকিছু আমাদের ইচ্ছামতোই হবে। এই আশ্বাসের পর আমি আবার আদালতে ফিরে গেলাম। আমাকে আবার তড়িঘড়ি তলব করা হলো আমার আদালত ফিরে গেলাম। আমাকে আবার তড়িঘড়ি তলব করা হলো আমার মৃতপ্রায় প্রিয়ার পাশে উপস্থিত হতে। দ্বিতীয় দফা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি সে। তার সংজ্ঞা আর ফিরে এল না। রাত নয়টা পর্যন্ত নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ না করে সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।'

ভগ্নহৃদয় হিকি লিখেছেন, 'এভাবেই কোনো পুরুষের ভাগ্যে জোটে এমন এক ভদ্র প্রেমময়ী নারীকে আমি হারালাম।' কলকাতার আদালতে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করতে হিকির বেশ ক'মাস সময় লেগেছিল।

হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সংস্কৃতি ব্রিটিশদের কাছে মুসলমাদের চাইতে অধিক অনতিক্রম্য প্রমাণিত হয়েছে। এর কারণ আংশিকভাবে এটা হতে পারে যে, হিন্দুরা ব্রিটিশদের অধিকতর অস্পৃশ্য বিবেচনা করেছে, তাদের সাথে খেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং এভাবে সম্ভাব্য সামাজিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনভাবে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। কিন্তু এ পরিস্থিতি সত্ত্বেও বহু হিন্দুকে ব্রিটিশের প্রশংসা করা থেকে ফিরিয়ে রাখেনি। বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে বরং দেখা যাবে যে, কলকাতায় ব্রিটিশদের প্রাথমিক দিনগুলোতে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের চাইতে হিন্দুরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

BanglaBook.org

১৭৭৫ সালের মার্চে তেইশ বছর বয়স্ক কোম্পানির আসার নাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড তার 'এ কোড অফ জেন্টো ল'জ'-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে 'হিন্দুদের বিজ্ঞতা' সম্পর্কে প্রথম জানার সূত্রে ব্রিটেনে সাড়া ছিল চমকে উঠার মতো। এ সংক্রান্ত তখনকার এক সাময়িকীতে প্রকাশিত পর্যালোচনা ছিল এ রকম:

'ব্যাপারটি যে সেরা তাতে সন্দেহ নেই—আমরা বিবেচনা করি যে, বিশ্বের এই আলোকিত অংশও (ইউরোপ) সংকীর্ণতা নোংরামি থেকে পুরোপুরি উঠতে পারেনি নানা কুসংস্কার ও ধর্মীয় যাজকত্বের কারণে। আধুনিক দর্শনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অংশ 'উদারতার একটি পর্যায়ের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি' ব্যাপক কল্যাণ সাধন করতে পারেনি, যা কিছু অমার্জিত, অশিক্ষিত হিন্দু ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে মি. হলহেড তার দেশের জন্যে যথার্থই সেবা করেছেন এবং সাধারণভাবে বিশ্বের প্রতি। তিনি তার কাজ দিয়ে যা করেছেন তা দরিদ্রদের লুণ্ঠন করে সকল নবাব (ইংরেজ) যা করেছে, তার চাইতে বেশি অবদানের।...সম্পদ কখনোই একমাত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ পণ্য নয়, যা ব্রিটেনকে ভারত থকে আমদানি করতে হবে।'

এডমন্ড বার্ক এই যুক্তির সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি হেলহেডের বইটি পাঠ করেন এবং চার্লস জেমস মাক্সের মতে এরপর তিনি হিন্দুদের প্রতি প্রশংসার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং পবিত্র অনুষ্ঠানাদির প্রতিও শ্রদ্ধা পোষণ করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বার্ক ঘোষণা করেন, 'হিন্দুধর্মের উৎপত্তি যেখানেই হোক না কেন, সেই দেশটি বিকশিত হচ্ছে।' তখনো যুক্তির যুগ ছিল এবং বিশ্বাসের প্রতি আস্থা হারানোকে খ্রিস্টধর্মের সংকীর্ণ ও অসহনশীলতাকে ইউরোপের বাইরের সভ্যতার মাঝে ক্রমবর্ধমান স্বার্থ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অথচ হলহেড দাবি করেছেন এ ধরনের বিশ্বাস হিন্দুধর্মের কেন্দ্রস্থলে বরং আনুকূল্য পাবার মতো।

এই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি যোগ দেন কলকাতায় স্থাপিত নতুন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপ্রতি স্যার উইলিয়াম জোনস। কলকাতায় পৌঁছার ছয় সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে তিনি জনা ত্রিশেক উৎসাহী লোককে জড়ো করতে সক্ষম হন। যারা এশিয়ার ইতিহাস, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও পুরাতাত্ত্বিক বিষয়, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে সবচেয়ে আলোকিত ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত ওয়ারেন হেস্টিংস। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে নতুন আগ্রহ ব্যক্ত করে তিনি ঘোষণা করেন, 'সত্যিকার অর্থে আমি ভারতকে আমার নিজের দেশের চেয়েও একটু বেশি ভালোবাসি।' জোনস এবং হেস্টিংসের অধীনে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। কারণ, এই প্রতিষ্ঠিনের মাধ্যমেই স্থানীয় বাঙালি

BanglaBook.org

বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার গভীরতম শিকড় সন্ধানের পথ উন্মুক্ত এভাবেই তুলনামূলকভাবে অজ্ঞাত এক সভ্যতা সম্পর্কে ইউরোপকে শিক্ষিত করে তোলার আশাবাদ সৃষ্টি হয়। হেস্টিংস এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এ ধরনের গবেষণা স্বাধীনভাবে উপযোগী এবং নিজেদের অহংকারের বোধ দূর করার জন্যে প্রয়োজনীয়। কারণ ভারত থেকে ব্রিটিশ আধিপত্য যখন গুটিয়ে নিতে হবে তখনো ভারতীয় ক্লাসিকস সভ্যতা টিকে থাকবে।'

বেশ আগে জোনস কলকাতা থেকে গঙ্গার উজানে কৃষ্ণনগরে তার বসতি স্থাপন করেন, যেখানে তিনি সাদা সুতি কাপড় দিয়ে তৈরি স্থানীয় ভারতীয় পোশাকে অভ্যস্ত হন এবং সম্পূর্ণ গাছপালা দিয়ে তৈরি একটি বাড়ি ভাড়া নেন। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, যারা তাকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেন। সংস্কৃতকে তিনি গ্রিক ভাষার চাইতে বোধগম্য এবং অন্য যে কোনো ভাষার চাইতে পরিশীলিত বলে ভাবতেন। সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে জোনস প্রতিদিন তার বিস্ময় আবিস্কার করতেন। তিনি লিখেন, 'আমি গোপির প্রেমে পড়ে গেছি। কৃষ্ণ আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং রাম, অর্জুন, ভীম ও মহাভারতের অন্যান্য বীরের ভক্তে পরিণত হয়েছি। যারা আমার দৃষ্টিতে ইলিয়াডের অ্যাজাক্স অথবা অ্যাচিলেসের চাইতে সেরা।'

জোনসের অনেক চিঠিই মনে হয় ভারত থেকে লেখা। এক বন্ধুকে তিনি লিখেছেন, 'আমি তোমাকে বলছি যে, ঝর্ণা ও নদীগুলোর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শিগ্‌গির আমি মা গঙ্গা এবং ভগবান যমুনার তীরের পানে যাচ্ছি।' তিনি তার এক বার্তাবাহককে অভিনন্দন জানান সুরক্ষিত একটি গীতিকাব্য পাওয়ার কারণে। হিন্দুস্থানে প্রচলিত একটি গানও তিনি শিখে ফেলেন। একদিন তিনি চিঠি পাঠাচ্ছিলেন বেনারসের পণ্ডিতদের কাছে, যাতে তিনি একজন বিশেষ দেবতার অবতার হওয়া ও বিভিন্ন নামকরণের ওপর জানতে চেয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতার ডাক্তারদের পরমর্শ দেন রোগ নিরাময়ে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি অনুসরণের। জোনস দাবি করেন, তিনি ভারতে গ্রিসের আর্কেডিয়া নগরী আবিষ্কার করেছেন। তার কাছে বাল্মিকী নতুন হোমার এবং রামায়ণ হচ্ছে নতুন ওডেসি। এ সম্ভাবনাগুলো যেন সীমাহীন ছিল।

তাদের এ ধরনের কৌতূহল ও উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও কলকাতার খুব স্বল্প সংখ্যক সংস্কৃতবিশারদই তাদের হিন্দুবাদে আগ্রহকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বাইরে নিতে দেননি। জোনস চার্চ অফ ইংল্যান্ডের সক্রিয় সদস্য হিসেবেই ছিলেন, তবু তিনি পুনর্জন্মের হিন্দু ধারণার প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করতেন : 'আমি হিন্দু নই, কিন্তু আমি হিন্দুদের পুনর্জন্মের ধারণাকে অতুলনীয়ভাবে যুক্তিগ্রাহ্য, নিষ্ঠাবান এবং মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখার অতি উত্তম পন্থা বলে মনে করি। এর তুলনায় পাপের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর অনন্তকাল ধরে শাস্তির ধারণা অধিকতর

ভীতিকর।' কিন্তু প্রাথমিক সময়ের আরও কিছু ইংরেজ বুদ্ধিজীবী আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের সামাজিক পদ্ধতির কারণেই হিন্দু হিসেবে দীক্ষিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। হিন্দু হতে হলে তাকে অবশ্যই হিন্দু হতে হবে। ধর্মান্তরের কোনো ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই। অবশ্য একথা 'হিন্দু স্টুয়ার্টকে' কেউ বলেছিল বলে মনে হয় না।

১৭৮০-এর দশকে ভারতে আগত এই আইরিশম্যান সম্পর্কে বেশি কিছু জনা যায় না। তখন তিনি বিশ বছর বয়সের নিচের যুবক। মনে হয়, ভারতে আসার পরই তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কলকাতায় উপস্থিতির এক বছরের মধ্যে প্রতিদিন সকালে তার বাড়ি থেকে গঙ্গা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে স্নান ও গঙ্গা নদীকে পূজা করতেন হিন্দু প্রথা অনুসারে, যা তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন। এশিয়াটিক জার্নালে তার প্রতি শোক জ্ঞাপন করে লেখা হয়, 'জেনারেল স্টুয়ার্ট এই দেশের ভাষা, আচরণ ও রীতিপ্রথা এত উৎসাহ ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ ও গবেষণা করে এসবের সাথে এত অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন যে, এর ফরে তার নাম হয়ে যায়, 'হিন্দু স্টুয়ার্ট। এ নামেই তিনি আমাদের পাঠকদের কাছে পরিচিত। স্টুয়ার্ট স্বয়ং তার লেখায় নিজেকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতেন দীক্ষিত হিন্দু হিসেবে।

স্টুয়ার্টের সমসাময়িক সামরিক ব্যক্তিরা, এমনকি যারা উৎসাহী ভারত প্রেমিক ছিলেন, তারাও বুঝে উঠতে পারতেন না যে, তাদের সেনাপতি কি হতে যাচ্ছেন। এক পর্যায়ে হিন্দু স্টুয়ার্টকে মধ্য ভারতের বৃহত্তর অশ্বারোহী শিবিরের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। সেখানে তিনি দেখতে পান যে, তার সহকারী হচ্ছেন জেমস কার্কপ্যাট্রিকের পুরনো বন্ধু উইলিয়াম লিনাইস গার্ডনার, যিনি কার্কপ্যাট্রিকের মতোই প্রায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। গার্ডনার তার এক জ্ঞাতি ভাইকে যে চিঠি লিখতেন তাতে ভারতের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মে দীক্ষিত দুজন সেনাধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই অদ্ভুত সামরিক ঘাঁটির জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন।

হিন্দু স্টুয়ার্ট সম্পার্কে তার সহকারীর চিঠিগুলোতে প্রথম উল্লেখ ছিল যে, তার সাবেক জেনারেল যখন বিদায় নিচ্ছিলেন তখন ঘোষণা করেন, স্টুয়ার্ট তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। গার্ডনার লিখেছেন, 'আজ সকালে জেনারেল ওয়াটসন বিদায় নিলেন। অত্যন্ত সদাশয় ও দয়ার্দ্র চিত্তের মানুষ তিনি। আমি আনন্দিত, কারণ তিনি যে বিদায়ী নৈশভোজগুলোতে যোগ দেবেন তাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে কে কয় বোতল মদ পান করতে পারবে তা নিয়ে তার আনুগত্যের পরিমাপ। তার উত্তরাধিকারী জেনারেল স্টুয়ার্ট, আমার ধারণা তার উদরের ক্ষমতা ও মেধা শক্তির ন্যাপারে অহংকারী হতে পারবেন না। কারণ, তিনি নিয়মিত পূজা করেন এবং গো-মাংস বর্জন করেন।'

BanglaBook.org

এরপর থেকে গার্ডনারের চিঠিতে নিয়মিতই থাকত স্টুয়ার্টের বর্ণনা। তাকে গার্ডনার উল্লেখ করতেন, 'জেনারেল পণ্ডিত' অথবা 'পণ্ডিত স্টুয়ার্ট' বলে। একবার গার্ডনার উল্লেখ করেন : 'জেনারেল এক আজব মৎস্য। তিনি আমাকে চাকলা ঘাটে তার কাছে যাওয়ার জন্যে লিখলেন, যেখানে হিন্দুরা স্নান করে—বিশেষ করে মহিলারা। আমি জানতাম, আমার পরিচিত যে কোনো মানুষের চাইতে তিনি বেশি কৌতূহলী। এই স্থানে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করতে যাচ্ছিলেন। প্রতিটি হিন্দুকে তিনি শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন 'জয় সীতারামজি', বলে।' গার্ডনারের মতে, আরেকবার জেনারেল স্টুয়ার্ট কুম্ভ মেলায় স্নান করার জন্যে তাকে কমান্ড থেকে এক সপ্তাহ ছুটি নিতে হয়েছিল। আরেকবারের ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন, কীভাবে সাউগরে অনুষ্ঠিত অশ্ব মেলায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে তার এক বন্ধু প্রত্যাবর্তন করেছেন। মেলায় তিনি স্টুয়ার্টকে ডজনখানেকে নগ্ন ভিক্ষুক পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখেন। তার হাত দুটি ছিল মাথার ওপর এবং ভিক্ষুকরা তাকে আশির্বাদ দিচ্ছিল।

স্টুয়ার্ট যে শুধু ভারতীয় ধর্মগুলোর অনুরাগী ছিলেন তা নয়, তিনি হিন্দু মহিলাদের প্রতি এবং তাদের পোশাকের রুচির প্রতিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরগুলোতে তিনি কলকাতার 'টেলিগ্রাফ'-এ ধারাবাহিকভাবে কিছু নিবন্ধ লিখেন, যাতে তিনি ইউরোপীয় মহিলাদের শাড়ি পরিধানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার যুক্তি ছিল ভারতীয় শাড়ি সমাসময়িক ইউরোপীয় ফ্যাশনের চাইতে অনেক আকর্ষণীয়। তিনি সতর্কও করেছিলেন যে, শাড়ি না পরলে ব্রিটিশ মহিলারা কিছুতেই ভারতীয় মহিলাদের সাথে সৌন্দর্যের পাল্লায় টিকবে না। তিনি লিখেছেন—

> "সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মহিলা তুলনামূলকভাবে আকৃতিতে ছোট। কিন্তু তাদের চেহারা লাবণ্যে ভরা। চোখ পরিপূর্ণ, দৃঢ়তায় তাদের বোধের পরিচয় মেলে। তাদের ত্বক মসৃণ, পবিত্র এবং তাদের ভঙ্গিমা ঐশ্বর্যময়। সার্বজনীনভাবে তারা আকর্ষণীয়।...নতুন কাটা ঘাসের স্বাদু গন্ধ তাদের নি:শ্বাসের সুবাসের চাইতে মধুর নয়...আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী মহিলাদের দেখেছি, এত সুগঠিত তাদের অঙ্গ, যেন স্বর্গীয়ভাবে তৈরি, একই রকম তাদের চোখের প্রকাশ। যে কাউকে স্বীকার করতে হবে যে, ইউরোপের খ্যতিমান সুন্দরীদের চাইতে তারা কিছুতেই হীন নয়। আমার নিজের পক্ষ থেকে বলতে হয়, আমি ইতোমধ্যে তাম্র বর্ণের এক মুখের উজ্জ্বলতার ব্যাপারে ভাবতে শুরু করেছি, যা ইউরোপীয় ফ্যাকাসে বিবর্ণ ত্বকের তুলনায় আমার কাছে সীমাহীনভাবে অগ্রাধিকারযোগ্য।"

হিন্দুদের সকল ব্যাপারে স্টুয়ার্টের আবেগ অস্বাভাবিক হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং হিন্দু রীতিনীতিতে তার অংশগ্রহণের মধ্যে কৃত্রিমতা

BanglaBOOK.org

ছিল না। তাছাড়া সে যুগের অন্যে কাগজপত্রে কোম্পানির অফিসারদের পূজায় অংশগ্রহণ, মন্দিরে উপঢৌকন প্রদান এবং বিভিন্ন রকম উৎসর্গে অংশ নেয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। জেমস গ্রান্ট বেনারসের দুর্গা মন্দিরে একটি ঘণ্টা প্রদান করেছিলেন। মন্দিরটির উলটোদিকে গঙ্গার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গ্রান্ট তার স্ত্রী সন্তানদেরসহ মৃত্যুমুখে পতিত হতে মন্দিরের পুরোহিতরা তাদের নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন বলে তিনি মন্দিরে একটি ঘণ্টা দান করেন। প্রায় একই সময়ে ব্রিটিশরা অ্যামিয়েন চুক্তি সম্পাদন উপলক্ষে কালি মন্দিরে গমণ করে সামরিক বাদ্য বাজিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে।

হিন্দু ধর্মের নানা বিবরণীতে খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের প্রতি স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিছু ব্রাহ্মণের পরামর্শে জেনারেল রিচার্ড ম্যাথিউ তাক্কোলাম মন্দিরে এক হিন্দু মূর্তির কাছে প্রার্থনা করেন তার যন্ত্রণাদায়ক পেটের পীড়া থেকে মুক্তি পাবার আশায়। এক তামিল ইতিহাসের অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের বিবরণ অনুসারে ম্যাথিউ তার পেটের ব্যথা থেকে সফলভাবে নিরাময় লাভ করেছিলেন এবং এরপর উদার হাতে মন্দিরে দান করেন। জেনারেল মন্দিরের কাছাকাছি স্থানে তার শিবির সংস্থাপন করলে এ ঘটনা প্রকাশ পায়। যেখানে তার সৈন্যরা মন্দিরের ঝর্না থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানিতে নিয়োজিত নীচু জাতের হিন্দুরা মন্দিরে প্রবেশ করলে পানির যে ধারা হাতির শূঁড়ের আকৃতিবিশিষ্ট একটি গোমূর্তির মুখ দিয়ে সশব্দে নির্গত হত তা রহস্যজনকভাবে বন্ধ হয়ে যায়—

> "এরপর জেনারেল প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি মন্দিরের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে 'হোম' অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় বহন করবেন, যাতে গরুর মুখ দিয়ে পুনরায় পানি নির্গত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাকে উত্তর দেন যে, তারা আর আগের মতো পানি ঝরাতে পারবেন না। এতে জেনারেল ব্রাহ্মণদের ওপর ক্রুদ্ধ হন এবং তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে বলে নিজেও তার তাঁবুতে ফিরে আসেন।
>
> সে রাতেই ভদ্রলোকের পেটে ভয়াবহ যন্ত্রণা শুরু হয় এবং তার জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। তার বিশ্বাস হয়, এর কারণ হচ্ছে বলপূর্বক মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিটি অংশে ঘোরাফেরা করা। তিনি পূজারিদের ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে প্রশ্ন করেন। তারা তাকে পরামর্শ দেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে, যার মাধ্যমে তিনি আরোগ্য লাভ করবেন। পরদিন সকালে জেনারেল ম্যাথু মন্দিরে গিয়ে দেবতার সামনে দাঁড়ান এবং প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি তাঁবুতে ফিরে আসেন। সে মুহূর্তেই তার পেটের ব্যথা বিদূরিত হয়। এরপর তিনি মন্দিরে এক হাজার ব্যাগ দান করেন এবং পূজারিদের সকলকে প্রার্থনা করতে বলেন। জেনারেল কিছু গ্রামবাসীকেও ভাতা মঞ্জুর করেন। পূজারিয়া বেশ কিছু গরু নিয়ে আসে মন্দিরে এবং

BanglaBook.org

> 'পুণ্যাচরণ' করে, যাকে বলা যায় পবিত্রকরণ অনুষ্ঠান। তারা ব্রাহ্মণদের সমবেত করে ভগবানের নামে তাদেরকে ভোজ দেয়। এরপর আবার গো-মূর্তির মুখ দিয়ে সশব্দে পানি ঝরতে শুরু করে।"

লেখক আরও উল্লেখ করেছেন যে, 'জেনারেল ম্যাথু হ'মাস সেখানে অবস্থান করেন এবং গরুর মুখ দিয়ে নির্গত পানি আনতেন পান করার জন্যে। জেনারেল যখন সেই স্থান ত্যাগ করেন, তখন তার রক্ষিতাকে সেখানে রেখে আসেন।' জেনারেল স্টুয়ার্ট অথবা জেনারেল ম্যাথিউ-এর মতো কোম্পানির সকল অফিসার সাধারণভাবে ভারতের জন্যে এবং বিশেষভাবে হিন্দু ধর্মের প্রতি এতোটা আগ্রহ পোষণ করেননি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকদের মধ্যে তুখোড় সমালোচক ছিলেন চার্লস গ্রান্ট। তিনি ছিলেন ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টানদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রথম এবং তিনি কোম্পানির বোর্ডরুমে সরাসরি তার মৌলবাদী ধর্মীয় অভিমত উত্থাপন করতেন। তার মতে, 'তারা (হিন্দুরা) যে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তা থেকে মুক্ত করতে তাদেরকে পুরোপুরি একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে।' ১৭৮৭ সালে তিনি সার্বজনীন ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে ভারতীয়দের উল্লেখ করে তাদের ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে মিশনারি অভিযান পরিচালনার প্রস্তাব দেন। কয়েক দশকের মধ্যে প্রাথমিকভাবে শ্রীরামপুরে স্থাপিত ডেনিশ মিশনারি স্থাপনা হিন্দুদের সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণা মৌলিকভাবে পরিবর্তনে সূচনা করে। তারা আর প্রাচীন জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয় না, যেভাবে জোনস এবং হেস্টিংস ভাবতেন। বরং নতুন প্রজন্মের ব্রিটিশদের কাছে তারা বিবেচিত হতে থাকে ধর্মীয় চিন্তার দিক থেকে অতি গোঁড়া হিসেবে। ব্রিটিশরা ধারণা করে যে, তাদের অনেকে আগ্রহের সাথে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রতীক্ষা করছে এবং এর মাধ্যমেই তারা সভ্যতার পথে আসবে।

গ্রান্টের মিশনারিদের মধ্যে ছিলেন রেভারেন্ড আর এইনসাইল। ব্রিটেনে মুদ্রিত এবং ইভানজেলিক্যাল বিশ্বাসের ধারকদের মাঝে বিতরণ করা 'ব্রিটিশ আইডলট্রি ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক ধর্মীয় বাণীতে এইনসাইল উড়িষ্যায় তার এক মন্দির পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন, আমি যেন মৃত্যুর উপত্যকা দেখেছি। এক সমাবেশেও তিনি একথা বলেন, 'আমি অন্ধকার গুহা দেখেছি।' তার বাণী প্রায় বিশ পৃষ্ঠা জুড়ে ছিল। তাতে তিনি তার প্রত্যক্ষ করা 'পাপপূর্ণ ও নোংরা দৃশ্যের' বর্ণনা দিয়ে তার হতাশা ব্যক্ত করেছেন যে, কোম্পানির অফিসাররা হিন্দদের প্রথা পালনে সহযোগিতা করা ছাড়া আর কিছুই করছে না। উড়িষ্যার বিখ্যাত জুগ্গারনট শোভাযাত্রা সম্পর্কে এইনসাইলের মন্তব্য, 'এর মূর্তি সজ্জার কাজ করেছে ব্রিটিশ কর্মচারীরা।' উচ্চারণের অযোগ্য আতঙ্ক...'ইউরোপীয় ভদ্রলোকরা কি এ ধরনের উৎসবে উৎসাহ প্রদান, মূর্তির উদ্দেশে উপহার দান এবং প্রায়ই পূজায় নিয়োজিত হচ্ছে না?'

অত্যন্ত স্পষ্টভাষী মিশনারি ছিলেন রেভারেন্ড আলেকজান্ডার থম্পসন, যিনি জীবনভর হিন্দুধর্মের নিন্দা করে অবসর জীবনে দীর্ঘ একটি বিবরণী লিখেন, 'দি গভর্নমেন্ট কানেকশন উইথ আইডলট্রি ইন ইন্ডিয়া।' থম্পসনের মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের কোম্পানির অফিসারদের অতি উৎসাহের কারণেই বড় ধরনের হিন্দু পুনর্জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৯০-এর দশকের দিকে ফিরে তিনি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে—

> "সরকারের প্রধান কর্মকর্তারা এক অদ্ভুত শ্রেণির লোক। ১৭৯০ ও ১৮২০ সালের মধ্যে বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং ভারতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল, তারা আসলে একদল অধার্মিক লোক ছিল, যারা হিন্দু ধর্মকে খ্রিস্টবাদের চাইতে বেশি অনুমোদন করেছে এবং বাইবেলের চাইতে কোরআনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কেউ মিশনারিদের ঘৃণা করেছে এবং অনেকে মুর্তিপূজারিদের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে মুর্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।"

'ব্রাহ্মণ প্রভাতিক ব্রিটিশরা' মিশনারিদের সাথে সংঘাত ছাড়া পিছু হটেনি। ইভানজেলিক্যাল মিশনারিদের অসহিষ্ণুতাকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে হিন্দু স্টুয়ার্ট বেনামিতে একটি লিফলেট প্রকাশ করেন, 'এ ভিন্ডিকেশন অফ হিন্দুস'। এতে তিনি হিন্দুদের খ্রিস্টান হিসেবে দীক্ষিত করার যে কোনো উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন এই যুক্তিতে যে, 'নৈতিক কারণের বড় নীতির দিকটিও যদি দেখা যায় তাহলেও কোনো সভ্য সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে মানুষকে সঠিক পথে আনতে হিন্দুবাদকে সংশোধন করতে খ্রিস্টবাদের করণীয় সামান্যই আছে।' হিন্দু পুরাকাহিনি, যেগুলো নিয়ে মিশনারিরা নিয়মিতই হাসিঠাট্টা করত, সে সম্পর্কে স্টুয়ার্ট লিখেন, 'যখনই আমি আমার চারপাশে তাকাই, বিশেষ করে হিন্দু পুরাকাহিনির বিশাল সাম্রাজ্যে, তখন আমি রূপক বর্ণনার মাঝে আবিষ্কার করি নিজেকে এবং আমি প্রতি মুহূর্তে তার মাঝে নৈতিকতা দেখতে পাই। প্রতিটি কাহিনির মাঝে এবং যতক্ষণ আমি আমার নিজস্ব বিচার বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে পারি, এই পুরাকাহিনিগুলোকে মনে হয়, বিশ্বের সবচাইতে পরিপূর্ণ ও নৈতিক রূপকের বর্ণনা হিসেবে।' তিনি একথাও লিখেছেন, 'চারটি বেদ লিখিত হয়েছে এমন এক যুগে যখন জঙ্গলে বসবাসকারী আমাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরের ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলেন এবং কোনো সন্দেহ নেই যে, আত্মার অনৈতিকতার নীতির কথা সর্বপ্রথম জানা যায় হিন্দুস্থানেই।'

হিন্দুধর্মের পক্ষে এ ধরনের যুক্তি দিয়ে স্টুয়ার্ট বুঝাতে চেয়েছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিভাবে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পুরোদস্তুর লিফলেট যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অজ্ঞাত

BanglaBook.org

বেঙ্গল অফিসার-এর ওপর ক্রুদ্ধ আক্রমণ চালানো হয়, তাকে 'বিধর্মী' ও 'মূর্তিপূজারি' বলে।

মিশনারিরাই যে শুধু স্টুয়ার্টের বিরুদ্ধে লেগেছিল তা নয়, তার কিছু সহকর্মীও সামনভাবে উষ্মা প্রকাশ শুরু করেছিলেন। একজন শংকিত অফিসার লিখেন, 'পাঠকের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও, এ মুহূর্তে কোম্পানির চাকরিতে নিয়োজিত একজন জেনারেল আছেন, যিনি হিন্দুদের সকল প্রথা পালন করেন, তাদের মন্দিরে পূজা করেন, তাদের মূর্তি সাথে বহন করেন এবং তার সাথে কিছু ভিক্ষুক থাকে, যারা তার খাবার তৈরি করে দেয়। তাকে পাগল বিবেচনা করা হবে না, তার মূর্তি ভিক্ষুক এবং শাস্ত্রগুলো যদি সরিয়ে ফেলা হয়।

এমনকি পর্যটকরা পর্যন্ত জেনারেল স্টুয়ার্টের ক্রমে ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ার পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন। এলিজাবেথ ফেনটন তার জার্নালে লিখেছেন, 'একবার এক পরিস্থিতিতে আমাকে বিস্মিত হতে হয়েছিল একজন ইংলিশম্যান, যার জন্ম ও শিক্ষা লাভ হয়েছে খ্রিস্টভূমিতে, যিনি মূর্তিপূজারির স্তরে নেমে গেছেন, তিনি হচ্ছেন একজন জেনারেল এস...। তিনি কয়েক বছর ধরে এক ধর্মের আচরণে অভ্যস্ত হয়েছে, আদৌ যদি সেটা কোনো ধর্ম হয়ে থাকে। সাধারণভাবে তাকে মানসিকভাবে উন্মাদ বলে মনে করা হয়, কিছুতেই সক্ষম লোক হিসেবে নয়।' দম বন্ধ করার মতো আতঙ্কে ফেনটন আরও লিখেছেন, 'যাদের কাছে এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে প্রতিভাত হয় যে, তিনি অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাহলে বলার কিছু নেই, কিন্তু কেউ যদি খ্রিস্টবাদের আলোতে বসবাস করে থাকে তাহলে তার উচিত স্বেচ্ছায় এ ধরনের আচরণের নিন্দা করা।'

BanglaBook.org

হিন্দু স্টুয়ার্টকেই শুধু সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে তা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষে উনবিংশ শতাব্দী সূচিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র ভারত জুড়ে ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। হিন্দু ধর্মের প্রতি যেসব ইংরেজ উৎসাহ প্রদর্শন করে আসছিল এবং ভারতীয় আচার-আচরণ ও তাদের ভারতীয় স্ত্রী গ্রহণ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সন্তান ইত্যাদি নিয়ে দুর্বল ছিল, তাদের জন্যে পরিস্থিতি ক্রমে শীতলতায় পর্যবসিত হচ্ছিল।

ডেভিড হেয়ার নামে এক স্কটিশ ঘড়ি নির্মাতা, যিনি কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তাকে খ্রিস্টান মতে কবরস্থ করতে অস্বীকৃতি জানানো হয় এই যুক্তিতে যে, তিনি খ্রিস্টানের চাইতে বরং বেশি হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। আরও অনেকে, যারা ভারতীয় জীবনাচরণ গ্রহণ করেছিলেন তাদের পদোন্নতি বন্ধ হয়ে যায়। বিহারে নিয়োজিত এক ট্যাক্স কালেক্টর ফান্সিস গিলান্ডার নিজেকে বোধ গয়ায় মন্দিরের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং মন্দিরে একটি ঘণ্টা দান করেন। লন্ডন

থেকে কোম্পানির পরিচালকরা গভর্নর জেনারেলকে তাদের আশঙ্কার কথা লিখেন যে, 'খ্রিস্টানরা বিধর্মীদের রীতি পালন করছে। কিছুদিন পর ফ্রেডারিক শোর দেখতে পান যে, তিনি ভারতীয় পোশাক পরিধান করায় কলকাতায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অতি রুষ্ট হয়েছে এবং সরকারিভাবে নির্দেশ জারি করা হয় যাতে কোম্পানির কোনো অফিসার-কর্মচারী যাতে ইউরোপীয় পোশাকের বাইরে অন্য কোনো পোশাক পরিধান না করে। পরের বছর সেনাবাহিনী অনুরূপ নির্দেশ দেয় যে, ইউরোপীয় অফিসাররা হোলি উৎসবে যোগ দিতে পারবে না। নতুন পরিস্থিতিতে মূর্তি পূজারিদের উৎসব, সেই সাথে জুয়া খেলা, রক্ষিতা রাখা, মাতলামি কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। ভারতে ইংরেজদের ওপর একটি পর্দা ফেলে দেওয়া হচ্ছিল।

১৭৮০-র দশকের শেষ দিকেই সর্বপ্রথম ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত পদমর্যাদার ধারণায় বাধার সূচনা হয়। মিশ্র রক্তের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা নতুন অসহিষ্ণুতার যন্ত্রণা বেশি অনুভব করতে থাকে। ১৭৮৬ সালে নতুন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানির চাকরি থেকে ভারতীয় স্ত্রী গ্রহণকারী কোনো ব্রিটিশের সন্তানের অধিকার হরণ করে একটি আইন প্রণয়ন করেন। আমেরিকার ইয়র্কটাউনে জর্জ ওয়াশিংটনের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কর্নওয়ালিস সদ্য ভারতে এসেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ভারতে এমন একটি ঔপনিবেশিক শ্রেণি গড়ে তুলবেন, যাতে ভারতে কেউ ব্রিটিশ শক্তিকে তুচ্ছ বিবেচনা করতে না পারে।

এই মানসিকতা নিয়ে কর্নওয়ালিস ১৭৮৬ সালে ব্রিটিশ সৈনিকদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সন্তানদের শিক্ষার জন্যে ইংল্যান্ডে গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, যা তাদেরকে কোম্পানির চাকরি লাভের অযোগ্য করে। ১৭৯১ সালে আরেকটি আদেশবলে বাবা-মা'র যে কোনো একজন ভারতীয় হলে তাদেরকে কোম্পানির বেসামরিক, সামরিক বা নৌ-শাখার কোনো একটিতে চাকরির পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৯৫ সালে আরও আইন পাস হয়, যাতে বাবা-মার দুজনই ইউরোপীয় না হলে শুধুমাত্র কোম্পানির পাইপ বাদক, ড্রামবাদক, নৌকা চালক ছাড়া অন্য সব চাকরির জন্যে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ পিতাদের মতো তাদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সন্তানদের জমির মালিকানার অধিকার হরণ করা হয়। এভাবে সকল লোভনীয় চাকরির সংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা নিজেদেরকে সামাজিক অবস্থানের এক অতি হীন পর্যায়ে দেখতে পায়। এক শতাব্দী পর্যন্ত পরিস্থিতি চলতেই থাকে এবং ততোদিনে তারা ছোটখাটো কেরানি ও ট্রেন চালকের সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হয়েছে।

কোম্পানির যেসব কর্মচারী আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিল, তারা ভারতে তাদের জন্যে সীমিত সুযোগ দেখে তাদের সন্তানদের কোনোভাবে নিজ দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে এবং মিশ্ররক্তের অনেক সন্তান সফলভাবে ব্রিটিশ উচ্চ

BanglaBook.org

শ্রেণিতে নিজেদেরকে উন্নীত করে। অনেকে উচ্চ সরকারি পদ লাভেও সক্ষম হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড লিভারপুল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত ছিলেন। তবুও অনেক কিছুই নির্ভর করত গাত্র বর্ণের ওপর। কলকাতায় নিয়োজিত এজেন্ট জন পামার ওয়ারেন হেস্টিংসকে তার তিনটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নীতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেন, 'বড় দুজন প্রায় ইউরোপীয় শিশুদের মতোই ফর্সা....তাদেরকে ইংলান্ডে পাঠানো যেতে পারে। ছোটটি যদি একই রঙের হত তাহলে আমি এই পার্থক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতাম না। কিন্তু প্রতিদিন আমি ওদের লালন পালন করতে গিয়ে বাড়িতে একজন দেশি সন্তান বড় করার ক্ষতিকর পরিণতির কথা ভাবি, তখন আমার মাঝেই প্রশ্ন জাগে যে, কি করে আমার পক্ষে তৃতীয়টিকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর সুপারিশ করা সম্ভব । শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, 'কালো' শিশুটি ভারতেই থাকবে এবং তাকে কেরানি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। অন্য দুটিকে ব্রিটেনে পাঠানো হবে তাদের ভাগ্য গড়ার জন্যে।'

কলকাতায় নতুন এবং দ্রুত বিকশিত এসব নিয়মের শিকার যে শুধ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাই হয়েছে তা নয়। কনওয়ালির্নসের অধীনে সকল অ-ইউরোপীয় কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়ামস্থ সদর দফতরের ক্রমবর্ধমান বদরাগী অফিসারদের দ্বারা অপদস্থ হয়েছে। ১৭৮৬ সালে জন পামারের পিতা উইলিয়াম পামার, যিনি পরবর্তীতে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলেন তিনি তার বন্ধ ডেভিড এন্ডারসনকে ভারতীয় অভিজাতদের ব্যাপারে কলকাতায় সদ্য আগত কর্নওয়ালিসের আচরণবিধির বিষয়ে হতাশা ব্যক্ত করে লিখেন। তিনি জনান, 'তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয় অত্যন্ত শীতল ও অসৌজন্যমূলকভাবে এবং আমি আপনাকে নির্দ্বধায় বলতে পারি যে, তারা এসব লক্ষ করে এবং হজম করে। আমার সন্দেহ নেই যে, যখন সুযোগ আসবে তখন তারা এর প্রতিক্রিয়া দেখাবে।'

এই নতুন বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্কের সকল দিককে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ' বেঙ্গল উইলসে' দেখা যায় যে, উইল এবং তালিকায় প্রদর্শিত ভারতীয় 'বিবির' সংখ্যা এ সময়ে হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে প্রতি তিনটি উইলের মধ্যে অন্তত একটিতে ভারতীয় স্ত্রীর উল্লেখ ছিল। ১৮০৫ থেকে ১৮১০ সালে মধ্যে তা হ্রাস পেয়ে প্রতি চারটি উইলের একটিতে ভারতীয় বিবির কথা বলা হয়েছে। ১৮৩০-এর মধ্যে প্রতি ছয়টিতে একটি এবং শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ভারতীয় স্ত্রীর প্রসঙ্গ একবোরে হারিয়ে যায়।

টমাস উইলিয়ামসনের 'ইস্ট ইন্ডিয়া ভাদে মেকাম'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২৫ সালে এবং এতে ভারতীয় বিবিদের উল্লেখ একেবারেই মুছে ফেলা হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখকের জীবনী ও

BanglaBook.org

স্মৃতিকথায় যেসব স্থানে ভারতীয় বিবির উল্লেখ ছিল, সেগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুনরায় সম্পাদনা করা হয়, যাতে পরবর্তী আর কোনো সংস্করণে ব্রিটিশদের ভারতীয় বিবি রাখার দৃষ্টান্ত না থাকে। যেমন কিং কলিন্স নামে পরিচিত জন কলিন্স, যিনি সিন্ধিয়ার মারাঠা দরবারে রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি হারেম থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন বলে মেজর ব্ল্যাকিস্টনের 'টুয়েলভ ইয়ার্স মিলিটারি এডভেঞ্চার্স ইন হিন্দুস্থান-এর প্রথম সংস্করণে উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে তার উল্লেখ ছিল না।

ইংলিশম্যান, যারা ভারতীয় আচার অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেসবও ক্রমে অদ্ভুত বিবেচিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বছরগুলোতে মুসলমানদের অনুকরণে যারা মাথায় পাগড়ি ও আচকান পরতো, তাদের বিদ্রূপ করা হত। ব্রিটিশদের ভোজ অনুষ্ঠানে ঝোলবিশিষ্ট তরকারি আর গ্রহণযোগ্য ছিল না। খাবার সীমাবদ্ধ ছিল ইউরোপ থেকে প্রেরিত কৌটায় রাখা স্যামন, লাল হেরিং মাছ, পনির, রাসবেরী জ্যাম, শুকনো ফল ইত্যাদিতে। যেহেতু এগুলো সংগ্রহ কখনো কখনো কঠিন ছিল, অতএব দামও সেভাবে বেড়ে যেত। পাজামা দিবাভাগে পরার চাইতে কোনো ইংরেজ রাতে পরতো। ১৯১৩ সালের মধ্যে টমাস উইলিয়ামসন তার 'দি ইউরোপিয়ান ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কিভাবে হুক্কা বা পাইপ ইংরেজদের মধ্যে আর সর্বজনীনভাবে ব্যবহার হত না। সময় এই বিলাসিতাকে খাটো করে দিয়েছিল যে, তিনজনের মধ্যে একজনকেও ধূমপান করতে দেখা যেত না। ভারতীয় বিবিরা যেভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে ইউরোপীয়দের হুক্কা ব্যবহারও সে পথে যাচ্ছিল।

তবুও কলকাতার ক্ষেত্রে যা সত্য ছিল তা কোম্পানির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সর্বত্র সত্য ছিল না। বিশেষ করে যারা তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের প্রাচীরের বাইরে বাস করত। একজন তরুণ রাইটার যদি মেধাবী হয়, ভাষাগুলো শিখতে পারে এবং তার পরীক্ষায় যদি ভালো করে তাহলে তাকে বিভিন্ন স্বাধীন ভারতীয় রাজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো রেসিডেন্সিতে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। সেখানে তিনি নিজেকেই কয়েক শত মাইল এলাকার মধ্যে একমাত্র শিক্ষিত ইউরোপীয় হিসেবে দেখতেন। সেক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে তিনি যদি নিজেকে ইন্দো-ইসলামিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধ কেন্দ্র হায়দারাবাদের বা লক্ষ্মৌর মতো জায়গায় থাকেন। অথবা উদয়পুরের মতো প্রাণবন্ত কোনো রাজপুত দরবারে নিয়োজিত হন তাহলে নিজের প্রয়োজনই তাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সংগ্রহে, তার কথা বলা ও চিন্তা করার পদ্ধতি এবং ভারতীয় পরিবেশ থেকে তার যৌন সঙ্গী খুঁজে নিতে বাধ্য করবে।

ভারতীয় পোশাক পরিধান, ভারতীয় নারীদের বিয়ে করা এবং উন্নততর অ্যাংলো-মোগল জীবনযাত্রা সবসময়ই জনপ্রিয় ছিল এবং প্রেসিডেন্সি শহরের

নীরস জগতের চাইতে মোগল সংস্কৃতির মহান কেন্দ্রগুলোতে তাদের রূপান্তর অনেক বেশি নাটকীয় ছিল। ১৭৯০-এর দশক থেকে ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশদের মধ্যে একটি বিভাজন গড়ে ওঠে—কলকাতায় যা কিছু গ্রহণযোগ্য ও যথার্থ বিবেচনা করা হত এবং বিভিন্ন ভারতীয় দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেসিডেন্সিতে যা যথাযথ আচরণ বলে বিবেচনা করা হত; এটিই ছিল বিভাজন। যেমন, ভারতে ব্রিটিশ কমান্ডার ইন-চিফ-এর স্ত্রী লেডি মরিয়া নুগেন্ট দিল্লি সফরকালে তিনি কিছু বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। তিনি দেখতে পান যে, শুধুমাত্র দিল্লির রেসিডেন্ট স্যার ডেভিড অক্টারলোনিই যে দেশিয় হয়ে গিয়েছেন তা নয় আরও অনেকেই তার মতো হয়ে গিয়েছিলেন। তার সহকারী উইলিয়াম ফ্রেজার ও এডওয়ার্ড বরং রেসিডেন্টের চাইতেও অধিক ভারতীয় হয়েছেন বলে তার মনে হয়েছে। তার বর্ণনা অনুসারে, আমি এখন মেসার্স গার্ডনার ও ফ্রেজার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, যারা এখনও আমাদের দলে আছেন। তারা মস্ত ঢিলেঢালা জামা পরেন বরং দুজনের কেউ গরু অথবা শূকরের মাংস খান না। খ্রিস্টানের চাইতে তারা বেশি হিন্দু হয়ে গেছেন। তাদের দুজনই চালাক এবং বুদ্ধিমান। এ দেশে তারা আগেভাগে এসে নিজস্ব মতামত ও সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। এতে তারা প্রায় এদেশীয়ই হয়ে গেছেন। তাদের সাথে কথাবার্তায় মনে হয়েছে যে, আমার কথার কোনো প্রভাবই তাদের ওপর পড়ছে না। তারা যে ধর্ম গ্রহণ করেছে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং তাদের পরিধেয় বস্ত্র, দাঁড়ি ইত্যাদি তাদের বন্ধুদের বিস্মিত করবে তাও বলেছি। এসব নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করেছি এবং আশা করি তারা বিষয়গুলো নিয়ে ভাববে।

দুটি পৃথক বিশ্ব গড়ে উঠছিল এবং সাংস্কৃতিক ভুল বুঝাবুঝির এই ব্যবধানের মধ্যেই পতিত হয়েছিলেন জেমস কার্কপ্যাট্রিক। সেই ব্যবধান যদি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরগুলোতে বেশি হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ ছিল একজন ব্যক্তির প্রভাব।

১৭৯৭ সালে ৮ নভেম্বর ছোটখাটো এক আইরিশ অভিজাত ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলার গভর্নর জেনারেল ও সুপ্রিম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে। প্রায় তিনশ বছর ধরে ইউরোপীয়রা ভারতীয় উপমহাদেশে আসছে এবং নিজেদেরকে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে নানাভাবে সম্পৃক্ত করেছে। সেই প্রক্রিয়া মনে হচ্ছিল শেষ হওয়ার পথে। কারণ ইউরোপীয়রা ক্রমে ভাবতে শুরু করেছিল যে, ভারত থেকে তাদের শেখার মতো কিছু নেই। তারা বরং এখান থেকে কিছু আবিষ্কারের প্রতি ঝোঁক হারিয়ে ফেলছিল প্রতিনিয়ত। ভারতকে তারা নির্মম, নিষ্ঠুরদের স্থান এবং লাভজনক ইউরোপীয় সম্প্রসারণের ক্ষেত্র হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল, যেখানে সকলের স্বার্থে ঐশ্বর্য ও সম্পদ আহরণ করা যায়। এটি

BanglaBook.org

পরিবর্তনের এবং বিজয় অর্জনের স্থান, পরিবর্তিত হবার অথবা এখানকার বাসিন্দাদের বিজয়ী করার স্থান নয়।

নতুন এই রাজকীয় ধ্যানধারণা অনুসারে কাজ করতে শুধু যে লর্ড ওয়েলেসলিই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তা নয়, বরং তার অধীনস্ত সকলকে এই লক্ষ্যে পরিচালিত করতেও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। তার রাজকীয় নীতি ব্রিটিশ রাজ্যের মূল অবকাঠামোকে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিরাট ভূমিকা রাখে, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। তিনি তার সাথে নিয়ে এসেছিলেন উগ্র বর্ণবাদী ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গি, যা ব্রিটিশ নীতির দীর্ঘস্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

## ২.

খাড়া রোমান নাক, ঘন কালোভুরু এবং প্রশস্ত কপাল শোভিত সাঁইত্রিশ বছর বয়স্ক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও উচ্চাভিলাষী ছোটখাটো গড়নের তরুণ রিচার্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৮ সালের জানুয়ারির এক দিনে উত্তমাশা অন্তরীপে (কেপ অফ গুড হোপ) অবতরণ করেন। তার উজ্জ্বল নীল চোখ, দৃঢ় থুতনি এবং দীর্ঘ জুলফি সকলের চোখে পড়ার মতো। তুলনামূলকভাবে তার মুখ ছোট এবং পেঁচার মতো চকচকে চাহনির মাঝে প্রকাশ পায় তার বুদ্ধিদীপ্ত ভাব এবং সম্ভবত তার নিষ্ঠুরতাও। কিন্তু তার চেহারার মাঝে একটি দুর্বলতা এবং এক ধরনের ভ্রান্তিও লক্ষ্য করার মতো ছিল, যা তার সকল চিত্র ও ছবিতে পরিস্ফুট। তার এই দুর্বলতাকে আড়াল করতেন ঔদ্ধত্যের মুখোশ দিয়ে।

ওয়েলেসলিকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন কেপ গ্যারিসনের কমান্ডার এন্ড্রু বার্নার্ড। তাকে দেখেই বার্নার্ড তার দুর্বলতা সম্পর্কে আঁচ করেন এবং তার স্ত্রী অ্যানির কাছে মন্তব্য করেন, 'ওয়েলেসলির চরিত্র অসামঞ্জস্যতায় পূর্ণ। তিনি চতুর হলেও দুর্বল ও অহংকারী...তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, নিয়োগকর্তার সন্তুষ্টি বিধান পর্যন্ত তিনি তা পালন করবেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রিয়ভাজন হবার চাইতে তিনি বরং সকলের বিরাগভাজন হবেন।' এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যথার্থ। ওয়েলেসলি ভারতে কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৃষ্টি করেননি। তার সহকর্মীরা, এমনকি তার ছোট ভাই আর্থারও প্রায়ই বেকায়দায় পড়ত তাকে সামলাতে। কিন্তু তার প্রতিভা ও সামর্থ্যের প্রতি কারো সন্দেহ ছিল না।

একটি বিষয়ে বার্নার্ডের ধারণা ভুল ছিল। ওয়েলেসলি তার নিয়োগকর্তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সন্তুষ্ট করেননি। তাদেরকে সন্তুষ্ট করার কোনো উদ্যোগও নেননি তিনি। কোম্পানির কার্যকলাপের ওপর দৃষ্টি রাখার জন্যে ১৭৮৪ সালে গঠিত বোর্ড অফ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্টকে ওয়েলেসলি একান্তে যে চিঠিপত্র পাঠাতেন তাতে নিজের ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পেত এবং কোম্পানিকে অবজ্ঞা করে লিখতেন, 'ইন্ডিয়া হাউজের বিরক্তিকর গর্ত'। যদিও তিনি পরিচালকদের জন্যে একটি সাম্রাজ্য অর্জন করে দিয়েছেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে কোম্পানিকে দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শুধু থেকেই এটা স্পষ্ট ছিল যে, তিনি আরও উচ্চভিলাষী লক্ষ্য স্থির করেছিলেন এবং কোম্পানিকে লাভজনক করা যে তার দায়িত্ব ছিল, সেই ব্যবসায়িক চেতনাকে তিনি গ্রাহ্যই করেননি।

BanglaBook.org

কোম্পানির পরিচালকদের কাছেও অজ্ঞাত ব্যাপার ছিল যে, ওয়েলেসলি তার মনে দুটি লক্ষ স্থির করেই ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে নির্ভিঘ্ন করতে এবং উপমহাদেশে শেষ ফরাসি অবস্থান থেকে তাদেরকে উৎখাত করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এজন্যে তিনি শুধুমাত্র বোর্ড অফ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট হেনরি ডুন্ডাসকে আস্থায় নিয়েছিলেন, যার ফরাসি বিরোধী চেতনা ওয়েলেসলিকে অবহিত করা হয়েছিল নতুন গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভারতে রওয়ানা হওয়ার আগে। ডুন্ডাস বিশেষভাবে ওয়েলেসলিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'ফরাসিদের প্রভাব দ্বারা দূষিত সেইসব ভারতীয় শক্তিকে উৎখাত করতে—যেমন মহীশূরের টিপু সুলতান, হায়দারাবাদের নিজাম আলী খান এবং হিন্দু প্রধানরা, যারা বিশাল মারাঠা ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে—তাদের সকলে ফরাসিদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী গঠন করেছে এবং তাদের সাথে কিছু ব্রিটিশ পক্ষত্যাগীও আছে। যারা সকলে মিলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধাচরণ এবং ফরাসিদের পক্ষাবলম্বন করতে পারে।

কেপ অফ গুড হোপে জাহাজ মেরামত এবং নতুন পাল তোলার পর ওয়েলেসলির ফ্রিগ্রেট 'এইচএমএস লা ভার্জিনি' বিপজ্জনভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ওয়েলেসলি ইংল্যান্ডে থেকে ভয়ংকর সমুদ্র পথ অতিক্রম করে এসে কেপ হোপে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়ার পাশাপাশি ভারতে তিনি কি করবেন তা ঝালিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। তার প্রতিটি দিনের সূচনা ঘটত বাংলা থেকে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে কেপ হোপে যাওয়া রাজ প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে। অ্যানি বার্নার্ড তাদের বলতেন 'ইয়েলো জেনারেল' বলে। তারা একে একে ওয়েলেসলিকে ভারতে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়ার জন্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। আরও অনেকে যারা উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইংল্যান্ডে যাচ্ছিলেন তারাও নতুন গভর্নর জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলার সর্বশেষ অবস্থা বয়ান করেন। অ্যানি বার্নার্ড-এর জার্নাল অনুসারে এবং ইয়েলো জেনারেলদের মতে, 'কিছু ক্যাপ্টেনও ছিলেন যারা সরকারের জন্যে বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা উত্তমাশা অন্তরীপে যাত্রা বিরতি করে এবং গভর্নর জেনারেলের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি যখন জানতে চান যে তারা কি বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা তাকে সেগুলো দেখায়। এর ফলেও তিনি বাংলার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে যে তিনি কতোটা পটু তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তার এসব তৎপরতাম মাধ্যমে।' এই বৈঠক এবং বিবরণী জানার পর ওয়েলেসলি সন্ধ্যাগুলো অতিবাহিত করতেন তার সম্মানে স্থানীয় ওলন্দাজদের আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ নৈশভোজে অংশ নিয়ে। রন্ধনশৈলীতে তাদের নৈপুণ্য যথার্থই কাঙ্ক্ষিত ছিল। এ সম্পর্কে বার্নার্ড লিখেন---

"তাদের অন্যতম প্রিয় একটি খাদ্য পশুর পাকস্থলি ও ম্যাকারোনি (নুডলস)....। কিন্তু তারা আরও খাদ্য দিয়ে তাদের খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং শেষ খাদ্য থাকে গ্রন্থি। একটি পরিবার আমাদের অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু সবচাইতে আশাভঙ্গের কারণ ঘটে ষাড়ের মাথার মতো বড় আকৃতির বাছুরের মাথা পরিবেশেন করা হলে, যেটি কান এবং সদ্য গজানো শিংসহ সিদ্ধ করা হয় এবং দাঁতগুলো দেখে মনে হয়, কোনো দন্ত চিকিৎসকেরে চাইতেও নিপুণভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দাঁতগুলো। খাবার সমাপ্তি ঘটে পাখির বাসার স্যুপ দিয়ে... এর চাইতে দুর্গন্ধযুক্ত খাবার আমি আর কখনো খাইনি।"

নৈশভোজ শেষে বার্নার্ডের আশ্রয়ে ফিরে ওয়েলেসলি কূটনৈতিকভাবে ভোজপর্ব সম্পর্কে বলতেন, চব্বিশ পাউন্ডের জন্যে আমার গরুত্বপূর্ণ বন্ধুর শুভ্র দাঁত দেখা থেকে বিরত থাকতে পারি না।

অ্যানি বার্নার্ড তার ডায়েরি ও চিঠিতে তার মহিমান্বিত অতিথির বিনোদন ও ইচ্ছা পূরণের জন্যে যেসব বিষয়ের আয়োজন করেছিলেন সেসবের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন এডমিরাল, বিচারক ও গভর্নরদের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে লর্ড ওয়েলেসলির সঙ্গে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করতেন ওলন্দাজদের আমন্ত্রণে। 'এমনকি একটি ভোজে মোজাম্বিকের গভর্নর সুগঠিত দেহের অধিকারী এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ওয়েলেসলিকে সোনা দিয়ে মোড়া হাতলযুক্ত একটি ছড়ি ঘুষ দিতে চেয়েছিল।' কিন্তু অ্যানি একজন লোকের কথা কখনো উল্লেখ করেননি। উত্তমাশায় ওয়েলেসলির ওপর সন্দেহাতীতভাবে যার অধিক প্রভাব ছিল, তিনি মেজর উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক।

১৭৯৮ সালের মধ্যে জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিকের বড় ভাই উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিককে তার চুয়াল্লিশ বছর বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক মনে হত। কাজের ব্যাপারে তার হতাশা, দাম্পত্য জীবনে সমস্যা এবং দীর্ঘ বছর ধরে যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির ছাপ তার চেহারায় পরিস্ফুট ছিল। শিল্পী টমাস হিকির অঙ্কিত তার দুটি চিত্র এখনও টিকে আছে। ১৭৮৭ সালে আঁকা প্রথম চিত্রে বিসদৃশ সত্ত্বেও তার চেহারায় দৃঢ়তা বুঝা যায়, এক হাতে কলকাতায় তার সদ্য স্থাপিত এতিমখানার দলিল। তার চেহারায় কিছুটা অনুসন্ধিৎসু, কিছুটা অনিশ্চিত এবং সপ্রশ্ন প্রকাশ, যেন তিনি দর্শকদের কিছু বুঝাতে চেষ্টা করছেন। তাকে কিছুটা অধৈর্যও মনে হয়, যেন চিত্র আঁকার জন্যে বসে থাকার চাইতে অনেক ভালো কিছু করণীয় আছে তার। বারো বছর পর ১৭৯৯ সালে আঁকা হয়েছে তার দ্বিতীয় চিত্রটি, অর্থাৎ ওয়েলেসলির সাথে সাক্ষাতের এক বছর পর। কিন্তু ছবিতে তার যে পরিবর্তন তাতে মনে হয়, মাঝখানে ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। তার প্রথম ছবিতে তার অবাধ্য চুল কপাল থেকে অনেক পিছিয়ে

BanglaBook.org

গেছে। তার চোখের নিচে ভাঁজ পড়েছে এবং তিনি ওজন হারিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছেন। দ্বিতীয় ছবিতে তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে এবং সম্ভবত কিছুটা বিভ্রান্ত। শুধুমাত্র খাড়া নাক ও ঠোঁটের দৃঢ় অভিব্যক্তির এবং সামান্য অধৈর্যভাবে থেকে প্রথম চিত্রের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছার তিন সপ্তাহ পর ওয়েলেসলি তার প্রথম চিঠি লিখেন লন্ডনে ডুন্ডাসকে। চিঠির প্রায় পুরোটাই ছিল কার্কপ্যাট্রিকের প্রসঙ্গ। কার্কপ্যাট্রিকের সঙ্গে তার আলোচনা শুধু ত্রিশ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সাথে আরও চল্লিশ পৃষ্ঠার বিবরণী সংযুক্ত ছিল। চিঠির বিবরণীতে যে বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা ছিল তা শুধুমাত্র ওয়েলেসলি ডুন্ডাসের জন্যেই উদ্বেগের বিষয় ছিল না, বরং সামনের দিনগুলোতে কার্কপ্যাট্রিক ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্যেও উৎকণ্ঠার ব্যাপার ছিল। তা হলো ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে ফরাসিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

ওয়েলেসলি লিখেছেন, 'ভারতে পৌঁছার পরপর আমার প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে আপনি যে সুপারিশ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দেশীয় রাজারা বর্তমানে যে পদ্ধতি সার্বজনীনভাবে অনুসরণ করছে তার ওপর সতর্ক নজর রাখা—তাদের অধীনে নিয়োজিত ইউরোপীয় ও আমেরিকান অফিসারের সংখ্যা, যাদের অধীনে দেশিয় সৈন্যরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং ব্রিটিশ বাহিনীর সিপাহীদের মতো শৃঙ্খলা বজায় রাখছে।

আকস্মিকভাবেই আমি এখানে এসে মেজর কার্কপ্যাট্রিককে দেখি, যিনি বিলম্বে হায়দারাবাদের রেসিডেন্সি হিসেবে নিয়োজিত এবং পূর্বে তিনি সিন্ধিয়ার দরবারে ছিলেন এবং আমি এখানে অবস্থানকালে তার কাছ থেকে নিজামের অধীনে ইউরোপীয় ও আমেরিকান অফিসারদের সম্পর্কে এবং তাদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি।'

ওয়েলেসলি উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের কাছে নিজামের সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত ভাড়াটে ফরাসি সৈন্যদের ব্যাপারে অনেকগুলো প্রশ্নের লিখিত উত্তর জানতে চেয়েছিলেন, বিশেষ করে রেমন্ড নামে একজন ফরাসি ব্যাপারে, যিনি ফ্যান্সের কট্টর এক সশস্ত্র গ্রুপ জ্যাকোবাইন তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তিনি যে উত্তর পান তাতে বেশ সন্তুষ্ট হন এবং কোনোরকম সংশোধন না করেই যাবতীয় তথ্য পাঠিয়ে দেন ডুন্ডাসের কাছে। তাছাড়া তিনি কার্কপ্যাট্রিককে অনুরোধ জানান তার ইংল্যান্ড ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে কলকাতায় তার সামরিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভূগছিলেন, যা ভারতে আসার পরই হয়েছিল। গ্রন্থি ফুলে যাওয়া ও বাতব্যাধির গুরুতর যন্ত্রণাদায়ক রোগ তাকে কাবু করে ফেলেছিল। কিন্তু ওয়েলেসলি তাকে চাকরি গ্রহণের প্রস্তাব দেয়ায় তাকে কলকাতা থেকে ৭০ মাইল দূরে উষ্ণ প্রস্রবণে গোসল

BanglaBook.org

করার মাধ্যমে আরোগ্য লাভের শর্তে তাকে চাকরি নিতে হলো। এই দায়িত্ব গ্রহণের ফলে শুধু যে তার পেশা জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়েছিল তাই নয়, তার ছোট ভাই, যাকে তিনি হায়দারাবাদের ভারপ্রাপ্ত রেসিডেন্ট হিসেবে রেখে যান, তার জীবনেও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল।

বেশ কয়েক বছর পর উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক অবসর গ্রহণ করে ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার পর ওয়েলেসলি উত্তমাশা অন্তরীপে তার অবস্থানের কথা স্মরণ করে লিখেন, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবার ক্ষেত্রে তিনি যে কার্কপ্যাট্রিকের কাছে ঋণী তা স্বীকার করতে তার দ্বিধা নেই। তার দেয়া তথ্যই গভর্নর জেনারেল হিসেবে প্রথম দু'বছরে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছিল। তিনি লিখেন—

> "প্রাচ্যদেশীয় ভাষার ওপর কার্কপ্যাট্রিকের দক্ষতা, ভারতের আচার-আচরণ, প্রথা ও আইন সম্পর্কে তার জানাশোনা আর কারো সাথেই তুলনীয় নয়। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান, তাদের নীতি, সংস্কার ও স্বার্থ এবং ভারতের নেতৃস্থানীয় সকল রাজনৈতিক ব্যক্তি সম্পর্কে তার তথ্য কোম্পানির বেসামরিক ও সামরিক পর্যায়ে অদ্বিতীয়...। তার এসব যোগ্যতা তাকে আমার বিশেষ আস্থাভাজনে পরিণত করেছে। আমার পক্ষ থেকে তার জন্যে আর কোনো সুপারিশ বা পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই।"

BanglaBook.org

ওয়েলেসলির মতে কার্কপ্যাট্রিকের মধ্যে মেধার যে বিকাশ ঘটেছিল তা তার জন্মগত বা পৃষ্ঠপোষকের প্রভাবে নয়। কিন্তু ওয়েলেসলির এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো ধারণাও ছিল না যে, কার্কপ্যাট্রিক তার জীবনে কতোটা অবদান রেখেছিলেন অথবা কীভাবে এর শুরু হয়েছিল। কারণ উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক বাস্তবে জেমস অ্যাচিলেস-এর সহোদর ছিলেন না, বরং অবৈধ সৎ ভাই ছিলেন। আয়ারল্যান্ডে জনৈক মিসেস বুথের গর্ভে তার জন্ম, যার ভাই ছিল তখনকার একজন পরিচিত সন্ত্রাসী। বুথের সাথে উইলিয়ামের পিতার সংক্ষিপ্ত সময়ের সম্পর্ক ছিল। তাদের পুরো শৈশব জুড়ে উইলিয়ামের বৈধ দুই সৎ ভাই জর্জ ও জেমস অ্যাচিলেস তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন।

কার্কপ্যাট্রিক ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা মাদ্রাজ ক্যাভালরির কর্নেল জেমস কার্কপ্যাট্রিক 'সুদর্শন কর্নেল' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই খ্যাতি শুধু তার সুন্দর চেহারা ও 'ঘন ধূসর চোখের' কারণেই ছিল না, বরং তার উদ্দাম প্রেমময় জীবনের কারণেও ছিল। ব্লুমসবারির অভিজাত কন্যা জেন মারিয়া স্ট্রাচি অর্থাৎ লিটনের মায়ের বিয়ে হয়েছিল উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের নাতির সঙ্গে। বংশবৃত্তান্ত নিয়ে খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে সুদর্শন কর্নেলের শিকড় সন্ধানে স্ট্রাচিকে বেশ ক'মাস ব্যয় করতে হয়েছিল। ধার্মিক ভিক্টোরীয় মহিলা,

যিনি জনহিতকর কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন, তিনি এই অনুসন্ধানে যা আবিষ্কার করেন তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি জানতে পারেন, সুদর্শন কর্নেল ১৭৩০ সালে সাউথ ক্যারোলিনার চার্লসটাউনে এক বাগানে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তার পরিবার পালিয়ে এসেছিল ১৭১৫ সালে জ্যাকোবাইট অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার শিকারে পরিণত হয়ে ডামফ্রাইশায়ার থেকে। লেডি স্ট্র্যাচির জন্যে আরও চমকে উঠার মতো ব্যাপার ছিল, যখন তিনি জানতে পারেন যে, কর্নেলের মা সম্ভবত ইউরোপীয় ও আফ্রিকান পিতামাতার সন্তান ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই পরিবার ব্রিটেনে ফিরে আসে। যেখানে সুদর্শন কর্নেল উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে থাকেন। যা সামরিক বৈশিষ্ট্যের চাইতে বরং কামনা চরিতার্থ করার জন্যে কার্যকর ছিল।

উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের জন্ম হয় যখন তার চব্বিশ বছর বয়স্ক পিতা অবিবাহিত ছিলেন। আয়ারল্যান্ডের বোর্ডিং স্কুলে রেখে তাকে পড়াশোনা করানো হয়। আর্থিকভাবে তাকে সহায়তা করলেও কর্নেল তাকে প্রকাশ্যে পুত্র বলে স্বীকার করতেন না। উইলিয়ামের চার বছর বয়সে কর্নেল ভারতে গিয়ে মাদ্রাজ ক্যাভালরিতে যোগ দেন। উইলিয়াম বড় হলে কর্নেল তার অবৈধ পুত্রের জন্যে কোম্পানির সামরিক ক্যাডেটশিপ সংগ্রহ করে দেন। কিন্তু ভারতে তাদের মধ্যে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। কারণ, কর্নেলের ভারতে সামরিক জীবন মাত্র আট বছর স্থায়ী ছিল এবং উইলিয়াম যখন ১৭৭১ সালে ভারতে আসেন তার বহু আগেই কর্নেল ভারত ত্যাগ করেন।

ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার আগে সুদর্শন কর্নেল নতুন মাদ্রাজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ড. এন্ড্রু মুনরোর বড় কন্যা ক্যাথারিন মুনরোকে বিয়ে করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ডা. মুনরো বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন। হিস্টিরিয়া রোগের ক্ষেত্রে ফলদায়ক চিকিৎসার জন্যে তিনি গর্বিত হলেও তিনি পরিচিত ছিলেন তার তিরিক্ষি মেজাজ এবং কোনো কিছুতে স্নায়বিক দুর্বলতা হতে পারে এমন কিছুর প্রতি অত্যন্ত বিমুখতার কারণে। এক পর্যায়ে কোম্পানির উনিশজন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেন তার আচরণে আপত্তি জানিয়ে। তারা বিশেষ করে উল্লেখ করেন যে, তাদের একজন দাঁতের স্কার্ভি রোগ সারাতে তার কাছে পাউডার চেয়েছিলেন। মুনরো তার সহকর্মীকে লিখেন, 'ওই বেহায়া যা চায়, তাকে তা দিয়ে দাও, যাতে সে আমাকে বিরক্ত না করে।'

ডা. মুনরোর হাসপাতাল সম্পর্কে সমসাময়িক এক বিবরণীতে দেখা যায়, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ। একজন ভিজিটিং সার্জনের মন্তব্য, 'পেপ্রসিডেন্সি হাসপাতালে যে ধরনের অনিয়ম হচ্ছে তা আগে আমি কখনো শুনিনি।'

BanglaBook.org

তিনি আরও লিখেন, 'আমার সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে আমি প্রায়ই দেখতাম, দুজন বা তিনজন অসুস্থ ব্যক্তি অচৈতন্য অবস্থার পড়ে আছে এবং আমার অধীনে ছিলনা এমন কিছু রোগী সম্পর্কে শুনেছি। রোগীরা জোট বাঁধবে, এটা সাধারণত ঘটে না। অথবা প্রহরীদের সাথে মিশে নিষিদ্ধ পল্লিতে গিয়ে রাতের অধিকাংশ সময় কাটায়, সব ধরনের বাজে কাজ করে। এসবের পরিণতিতে হাসপাতালে দাঙ্গায় দৃশ্যের অবতারণা ঘটে এবং রাতে দ্বিধার সৃষ্টি হয়। হাসপাতালের ছায়াদার কোনায় অথবা খালি অংশ দিনের বেলায় খেলার ও মুষ্টিযুদ্ধের স্থানে পরিণত হয়।'

এসব সত্ত্বেও সুদর্শন কর্নেল ও মুনরোর সুন্দরী কন্যার মধ্যে বিয়ে দৃশ্যত প্রেমপূর্ণ ছিল এবং দুই বছরের মধ্যে ক্যাথারিন কর্নেলের দুই পুত্র জর্জ ও জেমসের জন্ম দেয়। জর্জ জন্মগ্রহণ করে ১৭৬৩ সালের ১৫ জুলাই এবং জেমস ১৭৬৪ সালের ২২ আগস্ট। ফোর্ট অফ মাদ্রাজের সেন্ট মেরী'স চার্চে দুজনের খ্রিস্টান নাম রাখা হয়, যেখানে কর্নেল ও ক্যাথারিনের বিয়ে হয়েছিল। জেমস অ্যাচিলেসের বয়স যখন দেড় বছর তখন তার মা আকস্মিক জ্বরে মারা যান মাত্র ২২ বছর বয়সে। অথবা সম্ভবত তার পিতার নিপীড়নও আংশিকভাবে দায়ী ছিল। নিঃসন্দেহে এরপর জর্জ ও জেমসকে লালন পালনের দায়িত্ব পড়ে হিন্দুস্থানি আয়াদের ওপর, তিন বছর পর তাদের পিতার ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত। সুদর্শন কর্নেল তার প্রণয়লীলার সুযোগ কখনো হাতছাড়া করেননি। আবার এক অবৈধ সন্তানের পিতা হন কর্নেল, এবার এক কন্যার। বোট হাউজে জনৈকা মিসেস পেরিনের সাথে সংক্ষিপ্ত প্রণয়ের ফল ছিল এটি। পেরিনের স্বামী ছিলেন আর্কটের নওয়াবের অধীনে নিয়োজিত পর্তুগীজ ইহুদি সেনাধ্যক্ষ।

জর্জ এবং জেমস শৈশবে ইংল্যান্ডে কীভাবে কাটিয়েছেন সে সম্পর্কে আর্কাইভে কোনো তথ্য নেই। তাদের পিতা আবারও প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এবার সুমাত্রায় ফোর্ট মার্লবরোর অধিনায়কত্ব নিয়ে। শুধু এটুকু জানা যায় যে, এ সময়ে দুজনকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে এটনে পাঠানো হয়েছিল, যেখানে তাদের সমবয়সী রিচার্ড ওয়েলেসলির সমসাময়িকরাও অবশ্যই ছিল এবং তাদের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয় ফ্রান্সের বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ছুটির সময়ে তারা কেন্টের ক্রুমলির কাছে হোলিডেলে তাদের দাদার কাছে আসত। তাদের দাদা ততোদিনে ক্যারোলিনার বাগান বিক্রি করে দিয়েছেন, জ্যাকোবাইটদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন, বিলম্বিত এবং কিছুটা অসফলভাবে লেখকের জীবন বেছে নিয়েছেন। তার রাজনৈতিক রচনাগুলো 'অত্যন্ত নীরস' প্রমাণিত হয় এবং তার উল্লেখযোগ্য লেখা হিসেবে প্রমাণিত হয় একটি ছোট চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা। ১৭৭৯ সালের মার্চে এগারো বছর ইংলান্ডে কাটিয়ে পনেরো বছর বয়সে জেমস তার জন্মস্থান ভারতে ফিরে

BanglaBook.org

আসেন। তিনি যেহেতু তার বড় সৎ ভাই সুদর্শন কর্নেলের সাথে ছিলেন, অতএব তার চেষ্টায় তাকে তিনি মাদ্রাজভিত্তিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাডেটশিপের ব্যবস্থা করেন।

অনিবার্যই ছিল যে, এবার উইলিয়াম ও জেমসের সাক্ষাৎ হবে। লেডি স্ট্র্যাচির কাছে কর্নেলের যে ডায়েরি ও চিঠিগুলো ছিল তার সবই হারিয়ে গেছে, যার ফলে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কী ঘটে থাকতে পারে। তিনি তার এক আত্মীয়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন বলে জানা যায়: 'জেমস অ্যাচিলেস যখন ভারতে যায় এবং উইলিয়াম যেখানে ছিল ভারতের সেই অংশেই যায়, তাদের পিতা চিঠি লিখে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, সে যাতে তার নামেরই এবং তরুণ ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় করে নেয়। এর স্বল্প পরই তিনি জেমসকে লিখেন যে উইলিয়াম 'তোমার ভাই'। পরবর্তী এক চিঠিতে তিনি জেমসকে তিরস্কার করেন তার নিজের ভাইকে (অবৈধ) অগ্রাহ্য করার জন্য। তার মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেন যে, একজন পিতার কাছে তার বৈধ ও অবৈধ সন্তানের প্রতি কতব্যে কোনো পার্থক্য থাকে না এবং তিনি মনে করেন, জেমস তার সাথে একমত হবে যে, তারা উভয়ে যাতে বৈধতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পুত্রের শ্রেষ্ঠত্বই অগ্রগণ্য।'

উভয়ের বয়সের ব্যবধান দশ বছরের এবং অভাবিত সাক্ষাৎ যা ১৭৮৪ বা ১৭৮৫ সালের মধ্যে হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়—দুই সৎ ভাই অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হন। তাদের চিঠিপত্র থেকে বুঝা যায় যে, দুজনের আবেগের শূন্যতা পূরণে এ সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল। দুজনের মধ্যে উইলিয়াম বয়সে বড়। কিন্তু তাকে মনে হত দুর্বল ও নিরাপত্তাহীন। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, শৈশবের ভালোবাসা শূন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রকৃতিই সম্ভবত এজন্যে দায়ী।

উইলিয়ামের পেশাজীবনের শুরুটাও লক্ষ করার মতো—নিঃসঙ্গ, বিষাদক্লিষ্ট এক কিশোর হাতে কোনো অর্থ না নিয়ে ভারতে এসেছে। কোনো পৃষ্ঠপোষক বা পরিচিত কেউ নেই। ১৭৭০-এর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন ক্যানাওয়েকে লেখা চিঠিতে এসব প্রকাশ পেয়েছে। এক্সেটারের এক ব্যবসায়ীর পুত্র গ্রামার স্কুলের ছাত্র তার ভাইয়ের সাথে ১৭৭২ সালে ভারতে আসেন, যাদেরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাডেটশিপ দেয় তাদের জ্ঞাতি ভাই রিচার্ড পাক। ভারতে পৌঁছার সময়েই দুই ভাই প্রায় মারা পড়েছিলেন যখন তাদের জাহাজ গঙ্গার মোহনায় এসে ভেঙে যায়। তারা শুধুমাত্র পরনের কাপড় ছাড়া শূন্য হাতে গভর্নর হেস্টিংস-এর সামনে উপস্থিত হন। এমন বিপর্যয়কর সূচনা সত্ত্বেও দুই ভাইয়ের পরিচিত অনেকে ছিল। জন ক্যানাওয়ে শিগগির উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিককে ছাড়িয়ে যান। স্কুলে কার্কপ্যাট্রিক জনের এক বছরের সিনিয়র ছিল। এতে তাদের বন্ধুত্বে বাধা সৃষ্টি হয়নি এবং দুজনের চিঠিপত্রে পূর্বের আবেগই প্রকাশ পেয়েছে।

BanglaBook.org

১৭৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি কার্কপ্যাট্রিক উইলিয়ামকে লেখে, 'তুমি আমার প্রতি ভালোবাসার যে প্রমাণ দিয়েছ, তাতে আমি আনন্দিত...এবং আমি তোমাকে বলতে চাই, তোমার মতো বন্ধুর অনুপস্থিতি আমি সারাক্ষণ অনুভব করেছি'। এক বছর পর এই সুর আরও আবেগময় ছিল, 'তুমি তোমাকে জানো এবং আমাকেও। তোমার জন্যে আমার ভালোবাসায় সন্দেহ করার কিছু নেই।' ১৭৭৭ সালের এক চিঠিতে ঘনিষ্ঠতা আরও রোমান্টিক রূপ নেয়। 'আমি নীরস, বাজে এবং বিষন্ন...এবং তোমাকে ছেড়ে আসার পর থেকে আমার মন ভীষণ খারাপ। এখনও আমার মন ভালো হয়নি এবং মন খারাপই থাকবে।' তিনি আরও লিখেছেন,'তোমার সাথে বিচ্ছেদের পর থেকে আমি যাতনার মধ্যে আছি' এবং ক্যানাওয়ের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর থেকে 'আমার প্রতিশ্রুতি শান্তি' বিনষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

কার্কপ্যাট্রিক শেষ পর্যন্ত এক চিঠিতে তার তীব্র অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন—

"প্রিয় জ্যাক,

গতরাতে তুমি চলে যাওয়ার পর দু'মিনিটও অতিবাহিত হয়নি, আবার তোমাকে দেখার ইচ্ছা হয়েছে আমার। মনে হয়েছে, তোমাকে বলার জন্যে আমার কতো শতো কথা আছে, যা তুমি যখন আমার সাথে থাকো তখন বলা হয় না। সত্যি বলতে কি, তুমি আমাকে ছেড়ে যাও, কিন্তু অর্ধেক সুখী করে। কারণ, যদিও আমাদের পারস্পরিক এবং পরীক্ষিত ভালোবাসা অত্যন্ত আনন্দের, যার কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু তোমার তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়ার কারণে আমি আমার আবেগ রোধ করতে পারি না। প্রিয় বন্ধু আমার! যদি তুমি আমার প্রকৃতি জানতে তাহলে আমাকে একটি পুরো রাত অসহনীয় অবস্থার মধ্যে রেখে চলে যেতে না।

আমার একটি হৃদয় আছে, যদিও তা অত্যন্ত দুর্বল অনুরাগ সহ্য করতে সক্ষম, কিন্তু নীরব নৈর্ব্যক্তিকতার ওপর প্রভুত্ব করতে পারে না। প্রিয় জ্যাক, আমার ভালোবাসার ক্ষেত্রে তুমিই মুখ্য এবং তুমি যখন নিষ্ঠা ও প্রিয় বন্ধুর মতো আচরণ করো, তখন আমি সকল পরিস্থিতিতে তোমাকে আনন্দ দিতে প্রস্তুত থাকবো।

আমার মনের কথা খোলামেলা তোমার কাছে প্রকাশ করলাম, যা সত্যিকার ভালোবাসার দাবি।

তোমাকে আমার বিদায় জানাচ্ছি
ডব্লিউ কার্কপ্যাট্রিক
সোমবার রাত"

এ ধরনের মানসিক যন্ত্রণার প্রকাশ সম্বলিত চিঠির ব্যাখ্যা করা কঠিন। বিশেষ করে উইলিয়াম যখন ক্যানাওয়েকে এ ধরনের চিঠি লিখছিলেন, সেই একই সময়ে বসবাস করছিলেন এক ভারতীয় মহিলা দুলারি বিবির সাথে, যার গর্ভে তিনি দুই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সন্তানের জন্ম দেন এবং যার সাথে তার জীবনের

BanglaBook.org

শেষ সময় পর্যন্ত তিনি সম্পর্ক রেখেছিলেন। যদিও মাঝে এক ইংরেজ রমণীকে বিয়ে করেছিলেন, যার নাম মারিয়া পাউসন—এ বিয়ে টিকেছিল বারো বছর। ক্যানাওয়ের সাথে কার্কপ্যাট্রিকের কোনো ধরনের দৈহিক সম্পর্ক ছিল প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং যথার্থই সম্ভব হতে পারে যে, ছেলের রোমান্টিক সম্পর্ক পুরোপুরি নিষ্কাম প্রেমে পরিণত নয়। কিন্তু সমভাবে এ সম্ভাবনাও আছে যে, উইলিয়ামের বিষন্নতা অংশত তার দ্বৈত আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার সমস্যার কারণেও হতে পারে।

১৭৮৪ সালে অর্থাৎ তের বছর ভারতে অবস্থানের পর উইলিয়াম ইংল্যান্ডে ফিরে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাতে তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয়। তিনি সাথে নিয়ে আসেন তার দুই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সন্তান রবার্ট এবং সেসিলিয়াকে। তখন তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে সাত ও চার বছর। তাদেরকে তিনি সুদর্শন কর্নেলের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। কর্নেল সম্প্রতি সুমাত্রা থেকে অবসর নিয়ে হোলিডেলে এসেছেন, যেখানে জেমস ও জর্জ বড় হচ্ছিল। কিন্তু উইলিয়াম কখনো এটা দেখেননি। যদিও তার পিতা সন্তানদের নিতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু পিতা ও পুত্রের মধ্যে সাক্ষাৎ সফল হয়নি। উইলিয়াম লন্ডন থেকে ক্যানাওয়েকে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি আমার পিতা এবং অন্যান্য সম্পর্কিতদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে দেখলাম। কিন্তু পিতাকে আগের মতো না দেখে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। হতাশা এবং অন্যান্য দুর্ঘটনা তার ভাগ্যে জড়িয়ে ছিল। সে কারণেই তার মেজাজ মর্জি ভালো দেখিনি, যার ফলে আমি দ্রুত ভারতে ফিরে আসাই উপযুক্ত বিবেচনা করেছি। তা না হলে আমার অস্বস্তি আরও বাড়বে।'

পিতার সাথে হতাশাব্যঞ্জক সাক্ষাতের বেদনার বিপরীতে উইলিয়াম একটি আনন্দময় মাস অতিবাহিত করেন একটানা ক্যানাওয়ের বাড়িতে। বন্ধুকে লিখেন, 'আমার ভ্রমণের ইতিহাস এবং তোমার পরিবারের বর্ণনা সংরক্ষণ করব, সেই সুখের মুহূর্তের জন্যে যখন আমি আবার আমার প্রিয় জ্যাকের সাথে আলিঙ্গনের আনন্দ উপভোগ করব। এখন শুধু তোমাকে এটুকু জানাতে চাই যে, আমি তাদের সাথে একটি মাস আনন্দে কাটিয়েছি। তখন শুধু তোমার অনুপস্থিতিই প্রবলভাবে অনুভব করেছি।' কিন্তু ইংল্যান্ড সফরের ফলেও উইলিয়াম যে কারণে ভারত ত্যাগ করেছিলেন সেই বিপত্তি দূর হয়নি। ভারতে তার মেধা ও পদমর্যাদা তাকে ক্রমে সম্মানের অবস্থানে এনে দিয়েছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডে তিনি কেউ নন। তদুপরি তিনি এক লম্পট নবাবের অস্বীকৃত ও অবৈধ সন্তান। আরও একটি ব্যাপার হলো, তিনি দরিদ্র। ভারতে যারা তার বন্ধু তারা এক ভিন্ন শ্রেণির এবং ভিন্ন অর্থনৈতিক মর্যাদার। ক্যানাওয়ের পরিবারের সাথে অবস্থান করার পর কখনো ইংল্যান্ডে আসার ব্যাপার যে তার পক্ষে অসম্ভব সহসা তার এ উপলব্ধি জাগে, বিশেষ করে সেজন্যে আগে তাকে

BanglaBook.org

বিত্তবান হতে হবে। ক্যানাওয়েকে লেখা এক চিঠিতে তিনি তার অনুভূতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন—

> "...এটা বর্ণনা করা অসম্ভব যে ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমি কতোটা অধৈর্য হয়ে পড়েছি। কারণ এটা নয় যে, আমার কাছে এখানে থাকার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই, যা আছে ইংল্যান্ডে ভালোভাবে অবস্থানের মতো পর্যাপ্ত নয়। অর্থ ছাড়া ইংল্যান্ড স্বর্গের চাইতে বরং নরক তুল্য, বিশেষ করে যারা ভারত থেকে আসে। এখানে আমার গুটিকতক বন্ধু আছে, যাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যে সমাজে আমি শ্রদ্ধার পাত্র, ইংল্যান্ডে এক বছর কাটালে তা আর অক্ষুন্ন থাকবে না। কারণ এখানে লোকজন যেহেতু বিত্তবান, কীভাবে আমার পক্ষে তাদের সাথে মেলমেশা করা সম্ভব অথবা সমান বিত্তবান না হয়ে কী করে আমাকে তাদের সমকক্ষ ভাব সম্ভব? এ পরিস্থিতি যথার্থই বেদনাদায়ক—যা প্রকাশ করার মতো নয়। সেজন্যে যত শিগগির সম্ভব আমি ভারতে ফিরে আসব এবং আমার অবশিষ্ট জীবন কাটাবো। আমি বিত্তবান না হওয়া পর্যন্ত (যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়) আমি যে সমাজের সবকিছু ভালোবাসি তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখব।"

উইলিয়ামের চিঠিগুলো খুবই চমৎকারভাবে লিখিত এবং অসংখ্য ক্লাসিক্যাল ও প্রাচ্য সাহিত্যের পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে ক্যানাওয়ের সাথে তিনি প্রায়ই ফারসি সাহিত্য নিয়ে, হাফিজের প্রতিদ্বন্দ্বী কবির কবিতার অনুবাদ, শাহনামার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করতেন। নিজের শেখা ফারসি, বাংলা ও হিন্দি ভালো করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতেন। কিন্তু তার সকল চিঠিপত্রে এবং প্রাচ্যের ভাষা শেখা সত্ত্বেও উইলিয়ামের লেখায় ভারতের প্রতি তার দুর্বলতার অনুভূতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাস্তবিক পক্ষে অনেকের কাছে উইলিয়াম ভারতীয়দের প্রতি তার ঔদ্ধত্যের কারণে খ্যাতি পেয়েছিলেন। ভারতের প্রতি অনুরাগী জেনারেল উইলিয়াম পামার, যিনি গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সামরিক সচিব ছিলেন, তিনি লক্ষ্মৌর রেসিডেন্ট থাকাকালে ১৭৮৬ সালে এ খবর শুনে শংকিত হন যে, মারাঠি নেতা মাহাদজির সিন্ধিয়ার দরবারে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিককে রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পামার লিখেছেন, কার্কপ্যাট্রিককে সেই স্থানের জন্যে নির্বাচন করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। তার মন ভারত বিদ্বেষে পরিপূর্ণ।'

জেনারেল পামার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাই হয়েছিল। সিন্ধিয়ার দরবারে কার্কপাট্রিকের মেয়াদ সফল হয়নি। তার শৈশবই তাকে বিশেষভাবে স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। পূর্বের রেসিডেন্ট জেমস এন্ডারসন উইলিয়ামের নিয়োগের খবর পেয়ে তাকে একটি চিঠি লিখেন। তিনি উইলিয়ামকে সতর্ক

BanglaBook.org

করে দিয়েছিলেন যে মারাঠা হিন্দু কৃষক শ্রেণির আচরণ ভদ্র মুসলিম মোগলদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছিলেন—

> "এর আগে এখানে আমার অবস্থানের সময় আমি চিন্তা না করে পারিনি যে, সিন্ধিয়া আমার প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগ প্রদর্শন করবে। অভিজ্ঞতাই আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল যে, আচরণ ও রীতিপ্রথার দিক থেকে মারাঠারা মুসলমানদের চাইতে ভিন্ন, যাদের সাথে আমি অভ্যস্ত ছিলাম।—সিন্ধিরা তার মনোযোগের ঘাটতি দেখাবে, খবরাদি প্রেরণে, বিভিন্ন বিষয়ে জানাতে এবং ভদ্রতা বা সৌজন্য বিনিময়ে; যা তুলনামূলকভাবে ভদ্র মুসলমানরা কঠোরভাবে অনুসরণ করে।"

কিন্তু এই সতর্কতায় কোনো লাভ হয়নি। সিন্ধিয়া দিল্লিতে তার শিবির সংস্থাপন করেছিলেন এবং উইলিয়াম সেখানে পৌঁছার এক মাসের মধ্যে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের কাছে অভিযোগ করতে লাগলেন যে, সিন্ধিয়া এবং তার দরবারের অভিজাতরা অভদ্র ও তাতে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছে। তিনি লিখেন, 'তার দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্টের উপস্থিতি নিপীড়নমূলক।' সিন্ধিয়া কলকাতায় পাল্টা অভিযোগ করেন উইলিয়ামের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের উল্লেখ করে।

কর্নওয়ালিস মহীশূরের টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন। সেজন্যে সেই মুহূর্তে কোম্পানি ও মারাঠাদের মধ্যে কোনো ধরনের সংঘাতের পরিস্থিতি দেখতে আগ্রহী ছিলেন না। বরং তাদের সাথে এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রিতে উপনীত হতে চাইছিলেন। অতএব তিনি উইলিয়ামকে লিখে পাঠালেন যে, 'সিন্ধিয়া ও তোমার মধ্যে শীতল সম্পর্কের খবর জানতে পেরে সত্যিই দুঃখিত।' সেই সাথে তাকে নির্দেশ দিলেন মারাঠা দরবারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে। চিঠির শেষ দিকে তিনি তার অবস্থানকে আরও খোলামেলা প্রকাশ করেন, 'তোমার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে অবশ্যই এই চিঠির বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আমি সিন্ধিয়ার সঙ্গে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব এড়াতে চাই। অতএব, তুমি যে অভিযোগ উত্থাপন করেছো, তা যাতে কোনোভাবেই তার কাছে ধরা না পড়ে। তোমার ব্যক্তিগত সমস্যার ব্যাপারেও তুমি সতর্কতার সাথে তাদের সাথে চলার চেষ্টা করবে।'

চিঠিতে এর চাইতে খোলামেলাভাবে প্রকাশ করা যায়নি। কিন্তু সেটিও বিলম্বিত হয়ে গিয়েছিল। ১৭৮৭ সালের ২৪ জানুয়ারি পরিস্থিতি চরমে পৌঁছলো। উইলিয়ামের দেহরক্ষীদের একজন যমুনায় সাঁতার কাটতে গিয়েছিল, সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ হয় এক ধোপার। ধোপা সিন্ধিয়ার জামাতার কাপড় কাচছিল। উইলিয়ামের দেহরক্ষী সৈনিকটি ধোপাকে অস্পৃশ্য

BanglaBook.org

বিবেচনায় তাকে ঘাট থেকে সরে থাকতে বলে তার সাঁতারের সময়। ধোপা তার কথা মানতে অস্বীকার করে। দেহরক্ষী ক্রুদ্ধ হয়ে ধোপার ওপর আক্রমণ করে বসে এবং লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। সে সময়েই একদল মারাঠা সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিল, তারা ধোপার পক্ষ নিয়ে দেহরক্ষীকে আচ্ছামতো ধোলাই দেয়। পরিস্থিতি গুরুতর মোড় নেয়। বিকেলের মধ্যে দুই পক্ষের আরও কিছু সৈনিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং দু'পক্ষেরই কয়েকজন গরুতর আহত হয়। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিককে নিজের নিরাপত্তার জন্যে পুরনো দিল্লির ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ ত্যাগ করতে হয়। সফদর জং এর মাজারে সাময়িকভাবে স্থাপিত শিবির থেকে তিনি সিন্ধিয়ার কাছে দাবি জানান হামলাকারীদের গ্রেফতার করতে এবং আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা করতে। কিন্তু সিন্ধিয়ার পক্ষ থেকে কোনো কিছুই করা হয়নি।

দীর্ঘ দশ মাস ধরে অচলাবস্থার পর অক্টোবরে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক তার বন্ধ ক্যানাওয়েকে লিখেন, 'সিন্ধিয়ার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা অসম্ভব বিবেচনা করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে লর্ড কর্নওয়ালিস সম্মত না হওয়ায় আমি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তিনি পদত্যাগ করেন এবং বিস্মিত হন যে গভর্নর জেনারেল সাথে সাথে তার পদতদ্যাগপত্র গ্রহণ করেন। তার বিস্ময় উৎকণ্ঠায় পরিণত হলো যখন তিনি তার অবস্থান ত্যাগ করে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন। তার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে যে কর্নওয়ালিস উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্যে উইলিয়ামকেই দোষারোপ করেছেন, সিন্ধিয়াকে নয়। কর্নওয়ালিসের মতে, একজন শক্তিশালী প্রতিবেশীর সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সম্পর্ক নষ্ট করার জন্যে উইলিয়ামই দায়ী।

এক বছর পরও কার্কপ্যাট্রিক নতুন কোনো নিয়োগ পাননি এবং বড় ধরনের বিপর্যয় তার পদমর্যাদার ওপর আঘাত হয়ে নামে। ক্যানাওয়ে যখন হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন, উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক তাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখিত চিঠিতে একথাও উল্লেখ করেন, 'অমর্যাদাকর ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়ে আমার বৈশিষ্ট্য ও সৌভাগ্য ধ্বংস হতে চলেছে।'

হায়দারাবাদে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর ক্যানওয়ে সহানুভূতির সাথে উত্তর দেন। তার ভাইয়ের সাথে মতবিনিময়কালে ক্যানওয়ে মন্তব্য করেন যে, তার ধারণা, কার্কপ্যাট্রিকের আচরণ সম্মানজনক, কিন্তু আত্মঘাতী : 'এখন এ দেশে কার্কের ভবিষ্যৎ আর সম্ভাবনাময় নয়।' ১৭৮৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি একথা লিখেন—

> "আমি বর্তমানে যে পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছি তার চাইতে লোভনীয় পদে থেকেও তার নীতির কঠোরতার কাছে নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। একগুঁয়েমির কারণ পর্যাপ্ত স্বাধীনতার সুনিশ্চিত অবস্থা নস্যাৎ করে দিয়েছে

(ইংল্যান্ডে অবসর জীবন কাটানোর মতো যথেষ্ট পুঁজি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে), যা চার পাঁচ বছরেই অর্জিত হতে পারত। এক মুহূর্তের জন্যেও এবং জটিল পরিস্থিতিতেও আমি তার মতো হুট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না। সম্ববত তা না করে আমি ভুল করেছি। কিন্তু আমি মনে করি নিজের স্বার্থের কোনো ক্ষতি না করেই আমি আমার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হবো।"

উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের নিঃসঙ্গতা ও কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত না থাকায় অবস্থা আরও শোচনীয় হলো। তিন বছর আগে ১৭৮৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ইংল্যান্ড থেকে তার ফিরে আসার কয়েক মাস পর এবং স্বল্পদিনের ঘনিষ্ঠতা শেষে তিনি মারিয়া পাউসনকে বিয়ে করেছিলেন, যাকে লেড স্ট্র্যাচি বর্ণনা করেছেন 'ইয়র্কশায়ারের অভিজাত' হিসেবে। রোমনের অঙ্কিত মারিয়ার এক চিত্রে তাকে সুন্দরি, কামনাপূর্ণ ঠোঁট, দীর্ঘ লালচে চুলবিশিষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত মহিলা হিসেবে মনে হয়। মারিয়া এবং কার্কপ্যাট্রিকের দাম্পত্য সম্পর্কের ফল হিসেবে জন্ম নেয় চারটি সন্তান। কিন্তু তাদের বিয়ে সফল হয়নি।

মারিয়া প্রথমদিকে স্বামীর সাথে সিন্ধিয়ার দিল্লির শিবিরে ছিলেন। কিন্তু শিগ্‌গির তিনি আগ্রায় চলে যান, যেখানে তিনি তাজমহলের প্রাচীর সংলগ্ন তাজগঞ্জে বসবাসের জন্যে মোগল দরবারের অনুমতি সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। তার অনুরোধ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন তাকে অপমান করা হয়েছে বলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। এরপর তিনি শিশু সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় চলে যান। কর্নওয়ালিসের ডেপুটি জন শোরের কাছে কার্কপ্যাট্রিক স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, 'ব্যক্তিগত যুক্তি প্রদর্শন ও পীড়াপীড়ি করে আমি সম্ভবত তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হবো।' কিন্তু কার্কপ্যাট্রিক এজন্যে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেন নি। এরপর তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, বিব্রতকর কোনো পরিস্থিতি যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে তিনি খেয়াল রাখবেন। ১৭৮৮ সালের শেষ দিকে সিদ্ধান্ত হয় যে, মারিয়া ইংল্যান্ড ফিরে যাবেন তার সন্তানদের নিয়ে এবং বাথ এ বসবাস করবেন।

তাদের দাম্পত্য ঝড় চলতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তী আরও নয় বছর ধরে তিনি তার স্ত্রীকে প্রেমপূর্ণ চিঠি লেখা অব্যাহত রেখেছিলেন। কিন্তু মারিয়ার উত্তর ক্রমেই সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট হয়ে আসছিল। ১৭৯৪ সালের মধ্যে উইলিয়াম অভিযোগ করতে থাকেন যে, মারিয়ার চিঠি 'অপর্যাপ্ত-তাড়াহুড়ো করে লেখা এবং প্রায়ই অস্পষ্ট এবং স্বামী ও সন্তানের পিতার প্রতি কোনো রকম অনুভূতি শূন্য। অথচ এগুলো সহজেই বিস্তারিত উল্লেখ করা যায় এবং আমি যা সহজাত কারণেই আশা করতে পারি। সে জন্যে প্রিয় বালিকা, আমার সাথে তড়িঘড়ি করে চিঠি লেখা বন্ধ রাখতে বলছি। তাছাড়া পেনি পোস্টে (পোস্ট কার্ড) আমাকে না লিখে বহু হাজার মাইল দূরে অবস্থানরত

BanglaBook.org

একজন স্বামীর মনের মতো করে লেখা আশা করছি।' পরবর্তী বছর থেকে মারিয়া স্বামীর চিঠির উত্তর দেওয়া পুরোপুরিই বন্ধ করে দেন। ১৭৯৭ সালে উভয় পক্ষ আইনসম্মতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের সম্মতি দেয়, 'মারিয়ার দুর্ব্যবহারের' কারণে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের সন্তান চারটি মেয়েকে 'সুদর্শন কর্নেলের' দায়িত্বে বিভিন্ন জ্ঞাতি ভাইবোনদের সাথে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মারিয়া এবং উইলিয়ামের মধ্যে আবার কখনো দেখা হয়েছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। উইলিয়ামের নাতি-নাতনিদের নিঃসন্দেহে বলা হয়েছে যে, সর্বশেষ সন্তানের জন্মের পরই মারিয়ার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তার উইলে মারিয়ার কাছে একটি অনুরোধ পাওয়া যায় যে, মারিয়া তার প্রাপ্য যা পাবে তা যাতে তাকে দেওয়া হয়। আরও বিস্ময়ের ব্যাপারে যে, মারিয়া ভারতে বাস করছে বলে জানা যায়, দৃশ্যত তার নতুন প্রেমিকের সাথে।

১৭৮৭ থেকে ১৭৯২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বাথ-এ মারিয়ার অনুপস্থিতির সময়ে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের পেশাদারী জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ক্যানাওয়েকেও অত্যন্ত অনিয়মিত লিখতেন। ব্যাখ্যা করতেন যে, তিনি আর খুব বেশি লিখেন না। 'আমার হতাশার বোঝা আমার হৃদয়ের এত কাছে যে,আমি আর কোনো বিষয়েই মনস্থির করতে পারি না। তাছাড়া, তুমিও যেহেতু আমাকে কোনো স্বস্তি দিতে পারছো না, আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাকে কোনো আঘাত না দিতে।' মনক্ষুন্ন, বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি স্বল্প বেতনের সামরিক দায়িত্বে ফিরে যান।

উইলিয়ামের ভাষাগত মেধা তার জন্যে দ্বিতীয় আঘাত বয়ে এনেছিল। ১৭৯২ সালে তাকে নেপালের এক প্রতিনিধি দলের নেতা নিয়োগ করে পাঠানো হয়। পূর্বে হিমালয়ের এসব দুর্গম অঞ্চলে কেউ যায়নি। নয়াকোটে তিনিই প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে গমন করেন, যেখানে নেপালি রাজারা শাসন করতেন। যদিও তার মিশন কোনো কূটনৈতিক সাফল্য বয়ে আনেনি, কিন্তু নতুন ভূখণ্ডে এ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। উইলিয়াম পরবর্তীতে তার ভ্রমণের ওপর-'এ ডেসক্রিপশন অফ দি কিংডম অফ নেপাল' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেটি ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে। তাছাড়া এ অভিযানের ফলে কর্নওয়ালিসের সাথে তার এক ধরনের সমঝোতাও হয়, যিনি তার সম্পর্কে লিখেন, 'আর কেউ তার চাইতে সামর্থ্য, বিজ্ঞতা ও সতর্কতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করতে পারত না।'

এ অভিযান কার্কপ্যাট্রিকের মর্যাদার অনুকূলে কাজে লাগে এবং ১৭৯৩ সালের মার্চে তিনি মারিয়াকে ইংল্যান্ডে লিখেন, 'আমার বন্ধু ক্যানাওয়ে সামনের ডিসেম্বরে অবসর নিচ্ছে তার স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে এবং আমার বন্ধু জন শোর যদি কর্নওয়ালিসের পরিবর্তে গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ লাভ করে, তাহলে আমি যে হায়দারাবাদ রেসিডেন্সিতে ক্যানাওয়ের

BanglaBook.org

স্থলাভিষিক্ত হবো, তাতে সামান্যই সন্দেহ আছে। ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুক, প্রিয়তমা। আমি আর কিছু লিখতে পারছি না।' নভেম্বরের মধ্যেই দুটি নিয়োগ সম্পন্ন হলো এবং কার্কপ্যাট্রিক মারিয়াকে লিখলেন যে তার সম্ভাবনা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন তার আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য দাঁড়াবে এবং 'আমি আশা করি কয়েক বছরের মধ্যে আমার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে, যার ফলে আমি যোগ্য বলে বিবেচিত হবো।' তাছাড়া, 'আমার কন্যাদের বেসরকারি স্কুলে পড়ানোর সুযোগও ঘটবে।'

তিনি সর্বশেষে সংবাদ পাঠান, 'কলকাতা থেকে আমি ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর স্থলপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছি। এছাড়া সেখানে আমার ভাই জেমস সেনাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত। আমি আশা করছি সে আমার সাথে এগিয়ে যাবে এবং স্যার জন ক্যানাওয়ে তার জন্যে সে পদটি নিশ্চিত করে রেখেছেন। তার যে মেধা ও সুযোগ আছে তা আমার অধীনে কোনো কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনে অধিকতর সহায়ক হবে। আমি মনে করি যে আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবে না।'

১৭৯৩ সালে জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক প্রথম দর্শনে ছিলেন তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট, জটিল চরিত্রের সৎ ভাইয়ের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। সহজ সাবলীল এবং উদার, প্রচেষ্টাহীনভাবে সকলের বন্ধু হবার যোগ্য। জেমসের চেহারায় তারে পিতার সুন্দর চেহারার ছাপ, যদিও তার মায়ের গাত্রবর্ণ অধিকতর উজ্জ্বল। তার ঠোঁট পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল নীল চোখ এবং খড়ের রঙের মতো সোনালি চুল তার কাঁধ পর্যন্ত লম্বিত, যা তা স্বাভাবিক দৈর্ঘের চাইতে তখন দীর্ঘ ছিল। তার সমসাময়িকদের মতে তিনি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ ছিলেন। তাছাড়া তার দেহ সুগঠিত ও দেখতে সুদর্শন। কিন্তু স্বভাবে তিনি স্পর্শকাতর। ভাইয়ের মতো তিনি অব্যাহত আশ্বাসের প্রয়োজন অনুভব করতেন।

BanglaBook.org

ঊনত্রিশ বছর বয়সে জেমস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চৌদ্দ বছর অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু নিজেকে দক্ষ সৈনিক হিসেবেও প্রমাণ করতে পারেননি। কিন্তু তার মাঝেও ছিল উইলিয়ামের মতো ভাষার ওপর দখল। ফারসি ও হিন্দির ওপর তিনি তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া দক্ষিণের ভাষা তামিল ও তেলেগু অনর্গল বলতে পারতেন। সম্ভবত মায়ের মৃত্যুর পর শৈশবে মাদ্রাজে ভারতীয় আয়াদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার তার ভাষা শেখার স্বাভাবিক সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু এর বিপরীত রিপোর্ট ছিল যে, তখনকার বহু ব্রিটিশ শিশু হিন্দুস্তানি ভাষায় কথা বলে তাদের পিতামাতাকে

চমকে দিত। কারণ তারা তাদের আয়াদের ভাষাকেই প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ করত।

ভাষাগত দক্ষতাই জেমসকে তার ভাই উইলিয়ামের মতোই সামরিক পেশা থেকে ভিন্নতর দিকে ঠেলে দিতে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু উইলিয়ামের সাথে তার বৈপরীত্য ছিল যে, তার প্রাচ্য বিষয়ে শিক্ষা ভারত সম্পর্কে জন বুলের মতো বিমুখ করেনি। শুরু থেকেই দেশটি সম্পর্কে ভালোবাসার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে থাকেন জেমস, যেখানে তার জন্ম হয়েছে এবং যে দেশে তিনি জীবনের প্রথম বছরগুলো কাটিয়েছেন। অজ্ঞাত নামে তার আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলো ১৭৯২ সালে 'মাদ্রাজ কুরিয়ার'-এ প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি সেখানে নিজেকে বর্ণনা করতেন ফারসি. হিন্দি ভাষায় লিখতে ও কথা বলতে অভ্যস্ত একজন অফিসার হিসেবে, যিনি এদেশের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তাদের রীতিপ্রথার সাথে ঘনিষ্ঠ।

এই পক্ষপাতিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল একজন ভারতীয় বিবির সঙ্গে তার সম্পর্ক যার সাথে তিনি বহু বছর যাবৎ বসবাস করেছেন এবং সেই বিবি তার পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন। ১৭৯১ সালে জেমস তার পুত্রকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান তার এক বছরের অসুস্থতাকালীন ছুটি কাটানোর জন্যে গেলে। সেখানে 'সুদর্শন কর্নেলের' ব্যবস্থাপনায় বৈধ, অবৈধ বহুজাতিক শিশুদের সাথে থাকার সুযোগ পায় জেমসের পুত্র। সন্দেহ নেই তার নিজ দেশের পড়শিদের জন্যে এ খবর শুভ ছিল না।

ভারতীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পাশাপাশি ভারতের সৌন্দর্যের প্রতি জেমসের নান্দনিক দুর্বলতাও ছিল, যা তার পত্র বিনিময়ের প্রতিটি পর্যায়ে স্পষ্ট। যেসব এলাকার ওপর নিয়ে তিনি অতিক্রম করেছেন সেসব এলাকার প্রশংসা করে তিনি বারবার লিখেছেন। ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসার পরপর পুরো ভূখণ্ডের মনোরম সৌন্দর্য অবলোকন করার মনোমুগ্ধকর বর্ণা দিয়েছেন, 'দিনের যে কোনো সময় খালি মাথায় কোনোরকম সমস্যা ছাড়াই সুর্যালোকে কাটাতে পারো।' তিনি বিশেষ করে ব্যাঙ্গালোরের কাছে টিপু সুলতানের গড়ে তোলা মোগল আমলের মতো প্রমোদ উদ্যানের উল্লেখ করেছেন, 'এ উদ্যান আমাকে প্রচুর আনন্দ দেয়। রুচি ও পরিকল্পনার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্যানে। অসংখ্য সাইপ্রেস গাছ যেগুলো প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে আছে, এত দীর্ঘ ও সুন্দর গাছ আমি আগে কখনো দেখিনি।'

এক মাস পর তার রেজিমেন্ট যখন মহীশূনেররর তৃতীয় যুদ্ধে টিপু সুলতানের দ্বীপ রাজধানী সেরিঙ্গাপতমে হামলা করে এবং ইউরোপীয়দের নিহতের সংখ্যা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌছে, 'রাজধানীর আশেপাশে বিশ মাইল এলাকা জুড়ে অসংখ মৃতদেহ পচে যখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল' তখনও জেমসের চোখ শহরের সৌন্দর্য অবলোকনে থেমে থাকেনি। 'দ্বীপে অবস্থিত প্রাসাদ ও

BanglaBook.org

উদ্যানগুলো ব্যাঙ্গালোরের প্রাসাদ ও উদ্যানের চাইতেও সুন্দর—এগুলো আকৃতিতে বিশাল, আরও রুচির পরিচায়ক এবং জাঁকজমকপূর্ণ। আমাদের পরিখা থেকে প্রধান প্রাসাদ উদ্যানের বহির্ভাগ দেখতে পেয়েছি এবং আন্দাজ করেছি যে, প্রাচীরের ওপারে সৌন্দর্য এবং যুদ্ধ মোকাবেলার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আরও ব্যাপক হবে।'

তিনি টিপু সুলতানের মোগল ধরনের প্রাসাদ উদ্যান 'লালবাগ'কে তার পুরো ঐশ্বর্যের সময় দেখেছেন প্রাসাদ দখলের আগের দিন। একদিন পরই পিতাকে লিখেছেন, 'হায়! যুদ্ধের শিকারে পরিণত হতে হলো এই উদ্যানকে। প্রাসাদটিকে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পরিণত করা হয় এবং দখল বজায় রাখার প্রয়োজনীয় রসদ মজুত করতে উদ্যানকে বিনষ্ট করে ফেলা হয়। দীর্ঘ ও রাজসিক সাইপ্রেস গাছ শোভিত পুরো রাস্তার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কমলা, আপেল, চন্দন এবং অন্যান্য সুগন্ধি ছড়ানো গাছ গোলাপ, বেলি ফুলের ঝোপ যেন পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে।'

শত্রুর গোলবর্ষণের মাঝেও জেমস কর্কপ্যাট্রিক কৌশলে টিপু সুলতানের পিতা হায়দার আলীর সদ্য নির্মিত মাজার দেখতে যান এবং নির্মাণ কৌশলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, যদিও তার বিচারে সেটি, সব দিক থেকেই আগ্রার তাজমহলের চাইতে নিচু মানের। কৌতূহলের সাথে তিনি যোগ করেন, হায়দারের সমাধি সৌধ সম্পর্কে আমি যে তথ্যগুলো পেয়েছি, সেগুলো এখানে উল্লেখ করছি। বলা হয়ে থাকে যে, এটি নির্মাণে মক্কার মাটি অথবা মহানবীর পবিত্র রওজার ধূলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেজন্যে এই মাজারের দুর্লভ গুণ ও অমূল্য গুরুত্ব রয়েছে।' একজন লেখক এই মন্তব্য গুলোকে ব্যঙ্গাত্মক বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, জেমসের মন্তব্যে কোনো রসিকতা ছিল না। যদিও সুদর্শন কর্নেলের কাছে মহানবীর রওজার ধূলি নিঃসন্দেহে অদ্ভুত মনে হয়েছে। যিনি তার পুরো পেশাদারী জীবনে ধর্মীয় ব্যাপারে খুব কম আগ্রহ দেখিয়েছেন, মুসলিম স্থাপনা সম্পর্কে আরও কম।

যদি নান্দনিকভাবে এবং আবেগের দিক থেকেও জেমসের চিঠিতে ভারতের প্রতি বিরাট ভালোবাসা দেখানো হয়ে থাকে, তাহলে তা তার পুরো জীবনেই নির্ধারিত এবং অব্যাহত ছিল। এই পর্যায়ে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সেভাবে গড়ে উঠেনি। পরবর্তী জীবনেও তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থের ব্যাপারে মনোযোগী হতে পারেননি এবং কোম্পানিকে বিবেচনা করেছেন বিশ্বাসের অযোগ্য ও ভারতে রাজনীতিতে আগ্রাসী শক্তি হিসেবে কিন্তু ১৭৯০-এর দশকের প্রথম দিকে তিনি ভারতের শাসকদের প্রতি ইংরেজদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করতেন যে, তারা ' মেয়েসুলভ এবং বিলাসী স্বেচ্ছাচারী, যাদের অসংগঠিত স্বেচ্ছাচার তাদের দেশকে শক্তিহীন এবং অগ্রগতির সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করবে।' এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষভাবেই কোম্পানির

দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী ছিল, যারা ভারতে পাশ্চাত্যের জীবনধারা প্রচলন ও তা একটি সেনাবাহিনীর দ্বারা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিল এবং ভারতে অবস্থানকারী অধিকাংশ ব্রিটিশ বিশ্বাস করত যে, তারা উপমহাদেশের জন্যে আশীর্বাদ বয়ে এনেছে।

এ সময়ে জেমস তার বাড়িতে যেসব চিঠি লিখেছেন তাতে টিপু সুলতানের সীমাহীন উচ্চাভিলাষ এবং চরম নিষ্ঠুরতার কথা থাকত। কিন্তু তিনি যে টিপু সুলতানের মধ্যে বহু গুণের সমাহার দেখে তার প্রশংসা করতেন, তার সহযোগীদের কাছে তা অস্বাভাবিক ছিল। তিনি লিখিছেন, 'টিপু জন্মগ্রহণ করেছেন শিবিরে এবং সেখানেই বেড়ে উঠেছেন। এক মহান শিক্ষকের (তার পিতা হায়দার আলী) কাছে তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখেছেন। টিপুর মধ্যে একজন সৈনিকের সাহসিকতা ও কঠোরতার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং মার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে তার সাফল্য তার পিতার চাইতেও বেশি। অনেক যুদ্ধে ব্রিটিশের পশ্চাদপসরণ ও পরাজয় টিপুর বাহুবলের পর্যাপ্ত প্রমাণ। তিনি যদি শান্তির কৌশলের প্রতি দুর্বল হতেন তাহলেও তিনি নিজ ক্ষমতাবলেই জয়ী হতেন। তার পুরো সময়ই ছিল যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অথবা প্রকৃত যুদ্ধে। তদুপরি, জেমস টিপুর সাহসিকতা ও প্রতিরোধের চেতনায় বিস্মিত হয়েছেন। 'কোম্পানির সফল পালটা হামলার পরও টিপুর দৃঢ়তা অথবা একাগ্রতায় কিছুমাত্র ভাটা পড়েনি। যদিও চারটি বাহিনী পুরো শক্তি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাতেও তার আত্মসমর্পণের কোনো প্রস্তাব পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।'

অথচ জেমসের বড় ভাই উইলিয়াম টিপু সুলতানকে বিবেচনা করেছেন একটি ক্যারিক্যাচার হিসেবে। তার মতে, 'টিপু এক চক্ষুবিশিষ্ট দৈত্য, প্রাচ্যের স্বেচ্ছাচারী শাসনের সম্ভাব্য সবচেয়ে জঘন্য অবতার।' তার কাছে টিপু 'নিষ্ঠুর ও নির্মম শত্রু', 'অসহিষ্ণু গোঁড়া,' 'ক্রুদ্ধ অন্ধ ধার্মিক', নিপীড়নকারী ও নীতিজ্ঞানবর্জিত শাসক'..'রক্তাক্ত স্বেচ্ছাচারী, বিশ্বাসঘাতক আলোচক' এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক বিচারে 'অতি কৃপণ'। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই ভিন্ন ধারণা দুই ভাইয়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ মতানৈক্যের বীজ বপন করে।

মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধে জেমস বিনা আঘাতে নিজেকে রক্ষা করেন। কিন্তু তিন মাস পর নিজের আর্দালির আঘাতে গুরুতর আহত হন। একদিন সকালে তিনি শিবিরের শয্যা থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পান লোকটি তার ট্রাংক থেকে চুরি করছে। মোগল বংশের উত্তরাধিকারী এই আর্দালি দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে পর মুহূর্তেই আবির্ভূত হয় জেমসের দুটি তরবারি হাতে নিয়ে। জেমস অজ্ঞাত পরিচয় দিয়ে 'মাদ্রাজ' কুরিয়ারে' এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> "প্রতিরোধহীন এবং প্রায় নগ্ন অবস্থায় সে বিছানা থেকে উঠে...হাতের ওপর দুটি মারাত্মক আঘাত এসে পড়ে, যদিও তাতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়, পুরো হাত কেটে ফেলা থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এই আঘাতে হাত অকেজো

> হয়ে পড়ায় তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে আরও দুটি আঘাত এসে পড়ে তার ওপর। রক্তপিপাসু অতৃপ্ত দুষ্কৃতিকারী, যখন মনে হয় যে, তাকে শেষ করে ফেলেছে তখন আরও কাউকে আঘাত করা যায় কি না সেজন্যে আশপাশে দেখে। কিন্তু নাগালের মধ্যে কাউকে না পেয়ে এবং সে যে কাজ করেছে তা যে সন্দেহাতীতভাবে ক্ষমার অযোগ্য তা উপলব্ধি করে তার ছোরা বের করে এবং বেপরোয়া ভঙ্গিতে নিজের অনুতাপহীন বুকে একের পর এক আটটি আঘাত হানে।”

এই হামলা জেমসকে দারুণভাবে আলোড়িত করে এবং ভারতে তার জীবন নিয়ে ভাবিয়ে তোলে। এ সময়ে তিনি সুদর্শন কর্নেলকে লিখেন যে, চৌদ্দ বছর ধরে চাকরির পর তিনি কোথায় অবস্থান করছেন। তিনি আর আশাবাদী ছিলেন না। তিনি লিখেন, ‘আমার পদোন্নতির সম্ভবনা এ মুহূর্তে অনেক দূরে। কারণ পদাতিকদের তালিকায় আমার ওপর একশ লেফটেন্যান্ট রয়েছে (যারা তার আগে পদোন্নতি পেয়েছে)। এ অবস্থা যদি বজায় থাকে তাহলে আমি যৌক্তিক কারণেই বছরে দশ কদমের বেশি অগ্রসর হওয়ার আশা করতে পারি না। সেক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পেতে আমার দীর্ঘ দশটি বছর লেগে যাবে—বলা যায় তেইশ বছরের চাকরি, অথবা দাসত্বের পর আমি সেই পদে যেতে পারবো।’ অথচ তার মেধাবী ভাই দশ বছর ভারতে অবস্থান করেই এ পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

যুদ্ধের শুরুর দিকে জেমসের পক্ষে সুপারিশ সম্বলিত চিঠি ছিল, যার ন্যূনতম কোনো প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। তিনি জেনারেল স্যার উইলিয়াম মেডোজকে তার চিঠি প্রদান করেন, কিন্তু ‘ ছোট্ট জেনারেল ভীষণভাবে ব্যস্ত ছিলেন শত্রুর দুর্গ ও অন্যান্য স্থাপনার ওপর হামলার সাফল্যের সাথে জড়িতদের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে। অতএব আমি তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করতে পারি না।’ তার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন, ‘কর্নেল ম্যাক্সওয়েলের বিরাট প্রভাব ছিল লর্ড কর্নওযালিসের ওপর।’ কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে জেমসের সম্ভাবনা খুব ভালো ছিল না এবং তিনি শেষ পর্যন্ত তার পিতাকে অনুরোধ করেন তার ভাগ্য পরিবর্তনে তার প্রভাব খাটাতে। হঠাৎ করে বাড়িতে আরাম আয়েশের ঘাটতি পড়ায় তিনি কর্নেলকে জানান তার জন্যে ‘কিছু ভেজিটেবল সিরাপ পাঠাতে’, যা খেতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। দীর্ঘ অভিযানের সময় সবজির ঘাটতি তাকে বিরক্ত করে তুলতো।

যখন তিনি পদোন্নতির যাবতীয় আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তার ঠিক চার মাস পর সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এবং যেখান থেকে তিনি আদৌ আশা করেননি, সেখানে থেকে খাটান প্রভাব তার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো। জুলাই মাসে তার ভাইয়ের বন্ধু, যিনি সম্প্রতি নাইটহুড পেয়েছেন, স্যার জন ক্যানাওয়ে হায়দারাবাদ থেকে তাকে লিখলেন সেখানেই অবস্থান করতে এবং তার পক্ষ

BanglaBook.org

থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিলেন। জেমসের অনুরোধে ক্যানাওয়ে জেমসের কমান্ডিং অফিসারের কাজে হস্তক্ষেপ করে জেমসকে পূর্ব উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বিশাখাপতমে ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে ত্রিশ মাইল দূরের উপজাতি এলাকা বিজয়নগরমে বদলি করানোর ব্যবস্থা করলেন আগস্ট মাসের মধ্যে। বিজয়নগরম এখনও দূরবর্তী দারিদ্র পীড়িত এলাকা এবং বৃক্ষহীন পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত, যেখানে মাঝে মধ্যে দেখা যায় উপজাতি গ্রাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্থানটি আরও দুর্গম ছিল, কোনো সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্র থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। তবুও অন্তত জেমসের জন্যে উত্তম সূচনা ছিল।

বিজয়নগরমে জেমসের নিয়োগের মাত্র তিন মাস পরই কালকাতা থেকে উইলিয়াম জেমসকে লিখলেন হায়দারাবাদে রেসিডেন্ট হিসেবে তার নতুন নিয়োগের কথা। তিনি ভাইকে আমন্ত্রণ জানান তাকে কোনো দায়িত্ব নিয়ে তার সাথে যোগ দেয়ার জন্যে। বিষয়টি নিয়ে তাকে ভাবতে বলেন এবং যখন তাদের সাক্ষাৎ হবে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলেও জানান। বাংলা থেকে হায়দারাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে তিনি বিশাখাপতমের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবেন।

পূর্ব উপকূল ধরে উইলিয়ামের যাত্রা খুব মন্থর ছিল। মরিশাস থেকে আগত ফরাসি দস্যুদের জাহাজের অব্যাহত আনাগোনায় তার পক্ষে নৌপথে অগ্রসর অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ নৌপথে যাওয়াই দ্রুততর হতো। অনুকূল আবহাওয়ায় দশ দিনে মসলিপত্তমে যেতে পারতেন তিনি, এরপর পুরাতন গোলকুণ্ডা রোড ধরে গেলে হায়দারাবাদে পৌঁছতে লাগতো এক সপ্তাহ। কিন্তু নৌপথ বিঘ্নসংকুল হওয়ায় তিনি উট এবং হাতির পিঠে উঠে যেতে বাধ্য হন এবং ধীরে ধীরে পূর্বাঞ্চলীয় ঘাট, পাহাড়ের চূড়া এবং সেগুনের বন, নীল জলধারা এবং বঙ্গোপসাগরে পতিত নদীগুলো অতিক্রম করতে হয় তাকে। অবশেষে বারোমাণ্ডেল উপকূলের উত্তর প্রান্তে বিশাখাপতমে সাক্ষাৎ হয় দুই ভাইয়ের।

সে বছরের ক্রিসমাসের প্রাক্কাল ছিল তুলনামূলকভাবে উষ্ণ। জেমস তার গ্যারিসন ডিউটি থেকে অব্যাহতি নেন একটু পীড়াপীড়ি করে এবং উইলিয়ামের সাথে সাাক্ষৎ করতে যান। সেই রাতে জেমসের পরামর্শে দুই ভাই উইলিয়ামের নামে একটি চিঠি লিখে জেমসের কমান্ডিং অফিসারের কাছে তাকে হায়দারাবাদে বদলি করার বিষয়টি অনুমোদন করতে।

দুই ভাই একত্রে ক্রিসমাস কাটান, সম্ভবত প্রথমবারের মতো। কিন্তু খুব শিগগির স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোম্পানির সামরিক আমলাতন্ত্রের জটিলতা কাটাতে যতটা সময় লাগার কথা, তার চাইতেও বেশি সময় লেগে যাবে জেমসকে বদলি করতে। অতএব, দু'ভাই সম্মত হন যে, জেমস বদলির পূর্ব পর্যন্ত বিজয়নগরমেই থাকবেন এবং উইলিয়াম একাই হায়দারাবাদে নিজাম ও

তার পুরনো শত্রু মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধের ঘনঘটা শুরু হয়েছিল এবং এ পরিস্থিতিতে যত শিগ্‌গির সম্ভব উইলিয়ামের হায়দারাবাদ উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়েছিল।

একমাস পর উইলিয়াম হায়দারাবাদে পৌঁছে নিজাম আলী খানকে পেলেন না। তিনি দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন রাজধানী বিদরে গেছেন। হায়দারাবাদ ও মারাঠা সীমান্তের নিকটবর্তী বিদর দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। বলা হয়, সেখানে তিনি বিশাল এক সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। হায়দারাবাদে বসে থেকে সোমবাতি, পাটনার আলু, রাসবেরী ও চেরির ব্র্যান্ডি, মটর শুঁটি, ভালো কফি, হুক্কার পাইপ ইত্যাদি আয়েমের মধ্যে থাকার চাইতে উইলিয়াম তার হাতির পিঠে উঠে বসলেন আশি মাইল দূরবর্তী বিদরের উদ্দেশ্যে।

যে রাস্তা দিয়ে তিনি অতিক্রম করছিলেন তার দু'পাশের প্রকৃতিই সাক্ষ্য দিচ্ছে পূর্ববর্তী দেড়শ বছর ধরে সেই এলাকার ওপার দিয়ে বয়ে যাওয়া অস্থিতিশীল ও ভয়াবহ পরিস্থিতির ইতিহাস। বিস্তৃত সমতল যেগুলো ছিল ফসলের ক্ষেত ও তুলার বাগান সেখানে মাঝেমধ্যেই দেখা যায় সুরক্ষিত গ্রাম এবং ভস্মীভূত দুর্গ। সমসাময়িক এক ইংরেজ পর্যটকও তার নৈরাশ্যবাদী মন্তব্য করেছেন, 'যে ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে আমি অতিক্রম করেছি, এর চাইতে বিষণ্নতা আর কোনকিছুতে হতে পারে না। পরিত্যক্ত গ্রাম, জনশূন্য রাস্তা এবং আগে চাষাবাদ হত এমন দৃশ্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আগে যা ছিল তা দেখতে পেলে বর্তমান করুণ অবস্থার একটি তুলনা করা যেত।' একই পর্যটক প্রত্যক্ষ করেছেন, 'আমরা অশ্বরোহী কিছু লুটেরাও দেখেছি আমাদের যাত্রাপথে।' যদিও তারা তার সশস্ত্র প্রহরীদের কারণে তাদেরকে এড়িয়ে গেছে।' এটা শুধু সে অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে ইংরেজদের বিবরণ ছিল না। ভারতীয় পর্যটক আব্দুল লফিত শুস্তারি, যিনি হায়দারাবাদের এক শক্তিশালী বংশের সাথে সম্পর্কিত এবং ১৭৯৪ সালে কলকাতায় নিজামের উকিল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তিনিও বর্ণনা করেছেন, 'রাজধানীর চারপাশের গ্রাম, বিশেষ করে মারাঠা সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকাগুলো অধিকতর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে।' তার মতে, 'বিদ্রোহী শুক্র এবং নিপীড়ক কর আদায়কারীদের কারণে সমগ্র দেশ ধ্বংসের মুখোমুখি। লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে এবং অত্যন্ত করুণ অবস্থায় কাটাচ্ছে। যারা পালাতে পারেনি তারা দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে। নেতৃত্ব ভেঙে গেছে, সরকারের আইন আর কাজে লাগছে না...ধ্বংস এত ব্যাপক এবং পরিত্যক্ত বাড়িঘর এত অধিক যে, এখানে যদি অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হয়, তবুও ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের চাইতে এখানকার পরিস্থিতি হবে শোচনীয়।'

চারদিন ধরে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা অতিক্রমের পর উইলিয়ামের চোখে পড়ল বিদরের দুর্দান্ত প্রতিরক্ষা প্রাচীর।

BanglaBook.org

দেড়শ বছরের অবক্ষয় ও অবহেলার পর বিদরে এখন ভারতের সবচেয়ে সুন্দর দুর্গ অবস্থিত। এছাড়া এটি অতুলনীয়। এক বিশাল শিলা পর্বতের ওপর নির্মিত দুর্গটি দাক্ষিণাত্যের সমতল থেকে খাড়া উঠে গেছে। প্রতিটি দিকেই মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত কালো কালো পর্বত চূড়া এবং নিচে খাড়া নেমে যাওয়া উপত্যকা চোখে পড়বে, যা দেখে মনে হবে সীমাহীন গম্বুজ ও প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে ফটক, বুরুজ ও খিলান এবং সুরক্ষিত পরিখা। এই প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর মাঝখানে বিদর এক মরূদ্যান। সাদা তুলা ফলানো মাঠ এবং কূপের পানি সিঞ্চিত উর্বর কালো মাটি। যেখানে গরু দিয়ে চাষী চাষ করছে এবং তার চাষকৃত ক্ষেতের পাশে পাম গাছ, পেয়ারার বাগান, যা দূর্গপ্রাচীরের বাইরে প্রা যেন অদ্ভুত এক বৈপরীত্য।

এক দিকে নদীর তীরে ধোপাদের ঘাটে কাপড় আছড়ানোর শব্দ ভেসে আসে, অন্যদিকে খানিক দূরে পদ্মশোভিত একটি হ্রদ, যার কোনার দিকগুলোতে নির্মিত হয়েছে গম্বুজশোভিত ছত্রী। আরও দূরে বৃক্ষশূন্য খোলা প্রান্তরে সেচের খাল, যা ছাড়িয়ে চোখে পড়বে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্বেত গম্বুজ। এতে মধ্যযুগীয় একটি ছাপ স্পষ্টই ধরা পড়বে। এসবের মাঝেই আছে দুজন সুফির সমাধি, যেখানে অসংখ্য লোকের সমাবেশ ঘটে, যারা দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত শেখদের কাছে নিজেদের কল্যাণ কামণা করতে আসে।

১৭৯৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ কলকাতা ত্যাগ করার তিন মাস পর উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক এবং তার সফরসঙ্গী ও রক্ষীদল, রাজকীয় গোরস্থান অতিক্রম করে বিদরে প্রবেশ করেন বিশাল গোলকুণ্ডা গেট দিয়ে। তারা একটির পর একটি শহর ও দুর্গ বেষ্টনী অতিক্রম এবং মধ্যযুগীয় দাসদের দ্বারা পাথর কেটে তৈরি বেশ কিছু পরিখা অতিক্রম করেন। সংকীর্ণ, ভিড়ে পূর্ণ রাস্তা, সুফিদের মাজার ও মসলার দোকান, ঘোড়া ও হীরক ব্যবসায়ী, বস্ত্র বিক্রেতা এবং বিদরের হস্তশিল্পীদের কারখানায় হাতুড়ি পেটানোর শব্দ, হুক্কা টানার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নবাগতরা লক্ষ করে সৈন্য সমাবেশের প্রস্তুতি। কারণ সমগ্র ভারত থেকে বহু লোক শহরে জড়ো হয়েছিল সেনাদলে চাকরির আশায়।

অনুকূল সময়ে দাক্ষিণাত্যের বাজারগুলো পরিপূর্ণ থাকত প্রাচ্যের মিশ্র লোকদের দ্বারা। কিন্তু এ মুহূর্তে বিদরে বিশেষ করে বিভিন্ন শ্রেণির ভাড়াটে অশ্বরোহী সৈন্যদের দ্বারা পূর্ণ; হাদ্রামাউত থেকে আগত আরব, পাঞ্জাবের শ্মশ্রুমণ্ডিত শিখ, বিশাল পাগড়িধারী আফগান ও পাঠান এবং গঙ্গার সমতল অববাহিকা অঞ্চল থেকে আগত পাঠান বংশোদ্ভূত রোহিলারা। বাজারে যারা ঘুরছিল, তাদের মধ্যে নিজামের নিয়মিত পদাতিক সৈন্যরাও ছিল। লাল কোট পরা সিপাহীরা ফরাসি সেনাপতি মাইকেল জোয়াচিম রেমন্ড তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন। এছাড়া তাদের মাথায় তিন কোনাবিশিষ্ট টুপি, সাদা সার্ট ও সূচোলো

BanglaBook.org

অগ্রভাগবিশিষ্ট জুতা। উইলিয়ামের নুতন সহকারী উইলিয়াম স্টুয়ার্ট, যপার সাথে হায়দারাবাদেই তার প্রথম সাক্ষাৎ, তিনি নিজামের প্রস্তুতিতে রীতিমতো প্রভাবিত: 'সিন্ধিয়ার বাহিনী, আমি যা দেখেছি তার চাইতে নিজামের সেনাবাহিনী অনেক বড় দেখাচ্ছে। তার পদাতিক সৈনিকের সংখ্যা কম, কিন্তু অশ্বারোহী চল্লিশ হাজার। তারা দেখতেও চমৎকার, সৈন্যরা ভালো পোশাকে সজ্জিত এবং তাদের সেনাধ্যক্ষরা নিজেদেরকে দীর্ঘ আলখিল্লায় সজ্জিত করেন, যাতে সৈন্যরা তাদের সহজে শনাক্ত করতে পারে। কেউ কেউ দুটি আড়াআড়ি তরবারি খচিত জ্যাকেটও পরে। অন্যেরা ব্যবহার করে একটি তরবারির প্রতীক। অনেকের টুপিতে হলুদ বা লাল রং -এর পালক।'

বাজারে বিচিত্র এই মিশ্রণ রাস্তার স্থাপত্যেও পতিফলিত, যেসব রাস্তা সাধারণত ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকে। যেক্ষেত্রে বাজার এবং দুর্গগুলো ভারতীয় স্থাপত্যকলা অনুসরণে করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক কাঠামোতে ইসলামী স্থাপত্য কৌশল থেকে অনুপ্রেরণা স্পষ্ট। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্যের উত্তর ভারতের মোগল স্থাপত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষাকেও ছাড়িয়ে সরাসরি বহু দূরের অটোম্যানদের টালির কাজ অথবা ট্রান্সওক্সিয়ানার স্থাপত্য রীতি ধার নিয়েছে। হাতির পিঠ থেকেই কার্কপ্যাট্রিকের চোখে যা পড়ে তাতে বিদরকে তার মনে হয় তৈমুর বংশের শাসনামলের বোখারা ও সমরখন্দের এক বিচ্ছিন্ন অংশ বলে তৈমুর স্বয়ং তরমুজের গাত্রের সারির মতো গম্বুজ পছন্দ করতেন এবং উজ্জ্বল রঙের টালির কাজ। অটোম্যানদের ছুরির কাজে বসানো নীলকান্ত মণির মতো চকচকে নীল টালির ব্যবহার ব্যাপক। এমনকি সাফাভি আমলের মতো খোলা মাঠে স্থাপিত মাদ্রাসার স্থাপত্য কৌশল অনুপম।

বাজারে ভিড়ের মাঝ দিয়ে ধীর ধীরে কয়েক মাইল অতিক্রম করার পর উইলিয়ামের নেতৃত্বে ইংরেজ দলটি দুর্গের অভ্যন্তরের চত্বরে পৌছলো। বিদর থেকে প্রেরিত উইলিয়ামের প্রথম চিঠি ছিল সংক্ষিপ্ত এবং প্রয়োজনীয় সরকারি কথাবার্তায় সীমিত। তাতে শুধু উল্লেখ ছিল, প্রধান উজির আরাস্তু জাহ সকল দৃষ্টান্ত ও সৌজন্য পরিহার করে তাকে সোজা বন্ধুসুলভভাবে নিজামের দরবারে নিয়ে যান এবং তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠভাবে সম্ভব ততোটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে নিজাম কতোটা আগ্রহী ছিলেন।

অবশ্য উইলিয়াম স্টুয়ার্ট এ সময়ের নিজামের দরবারে সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছেন। নিজাম এবং তার উজির সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'নিজাম অত্যন্ত মার্জিত এবং মনোযোগী। তার উজির চতুর, কিন্তু নিরলস, তার কাজই হচ্ছে তার প্রভুর মনোতুষ্টির জন্যে সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন। তিনি দু'হাতে নিজের দাড়ি আঁকড়ে থাকেন এবং মনে করেন, এর মাধ্যমে তিনি যা খুশি করতে পারেন।'

BanglaBook.org

কিন্তু এই দুজন লোক সম্পর্কে স্টুয়ার্টের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, যারা তাদের রাজ্যকে নিশ্চিত বিলুপ্তির পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছেন। বত্রিশ বছর আগে ১৭৬২ সালে নিজাম আলী খান যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন খুব কম সংখ্যক লোকই ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, বিবাদে লিপ্ত দাক্ষিণাত্যের সেনাবাহিনীর মধ্যে তার পক্ষে প্রায় একা হায়দারাবাদকে পরবর্তী পঁচাত্তর বছরের জন্যে সকল উত্থান-পতনের মধ্যেও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

স্টুয়ার্ট যদিও নিজাম আলী খান ও তার উজিরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু নিজামের দরবারে তারা আসলে কী করতে চান সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন এবং তার বর্ণনায় ভারতীয় রীতি ও মধ্যপ্রাচ্যের রীতিগুলোকে মিলিয়ে ফেলেছেন: পান খাওয়া, ছোট্ট কাপে ভারতীয় রীতিতে কফি পান ইত্যাদি। তার বর্ণনায়—

> "প্রধানগণ তাদের নজর পেশ করার পর 'আব গাহে' চলে গেল কুর্নিশ করে। এরপর তাদের দরবারে প্রবেশের অনুমতি থাকলেও আসন গ্রহন করতে পারে নো। মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের দরবারে আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি, এখানে কায়দা কানুন ও জাঁকজমক আরও অধিক। নিজামের পরিবারের মধ্যে ধুমপানের রীতি নেই, কিন্তু তিনি পান গলধঃকরণ করেন। কারণ তার দাঁত নেই বলে চিবুতে পারেন না। তিনি প্রচুর কফি পান করেন এবং বেশ তপ্ত কফি। দরবারের মাঝখানে একটি পাত্র আছে আগুন রাখার জন্যে, যাতে পরিবেশনকারীরা মাঝে মধ্যেই কফি গরম করতে পারে এবং তারা আকিক পাথরের কাপে পরিবেশন করে। নিজামের তত্ত্বাবধানে অনেক মহিলা, যারা দু'শ সন্তানের জন্ম ছেলে দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে ত্রিশজন এখনও জীবিত। এর মধ্যে সাতটি ছেলে এবং ২৩টি মেয়ে। ঘোষিত উত্তরাধিকারীকে তার পিতার মতোই বৃদ্ধ দেখায় (যার বয়স ৬২ বছর), কিন্তু আমি ধারণা করেছিলাম তার বয়স ৩৭ বছরের বেশি নয়।
>
> দরবারে বসে সাধারণত রাতের বেলায়। রৌপ্য বাতিদানে মোম ও তেলের বাতি জ্বলে এবং এক একটি বাতির মাঝখানে নীল আধারে নীল রঙের বাতি স্থাপন করায় দরবারে চমৎকার রূপ ধারণ করে। কিছু সুগন্ধি অম্বর নিজামের কাছাকাছি অবস্থানে জ্বলতে থাকে, যার গন্ধ কড়া যে, অবসাদ এনে দেয়।
>
> সকল প্রধান ও সর্দার অলংকার ধারণ করেন, যেমন পাগড়িতে, গলায় মুক্তার হার, হাতে বাজুবন্দ, এমনকি ভারতে মহিলারা কব্জিতে যে চুড়ি পরে তেমন চুড়ি বা কঙ্কন। এখানকার মুসলমানরা দেখতে হিন্দুদের মতোই দাড়ি কামানো এবং মাথার পাগড়ি ছোট, পেশোয়ারের মতো দীর্ঘ আলখিল্লা এবং কানের কাছ পর্যন্ত চুল ছাঁটা। যেন নিয়মিত চুল সেখানে থাকে।"

BanglaBook.org

যে অট্টালিকায় দরবার বসে সেখানে সমবেত হওয়াও জাঁকজমকের আরেক প্রতিষ্ঠান। দুর্গের বাইরের কঠোর দর্শন এবং দুর্গের অভ্যন্তরে মসজিদের জটিল সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক বিস্মিত, হতচকিত। শুধু মসজিদের সৌন্দর্য নয়। অন্যান্য প্রাসাদগুলোও চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ। দাক্ষিণাত্যের নির্মাণ শিল্পীরা অভ্যন্তরীণ কারুকাজে যেসব সামগ্রী ব্যবহার করেন তাতে টালির কাজ, কাঠের সূক্ষ্ম কাজ এবং দেয়াল চিত্র অন্যতম। এসব বৈচিত্র্যের মধ্যে রঙ্গিন মহলের সাথে আর কোনোটির তুলনা হয় না। মধ্যযুগের ভারতের স্থাপত্যে এ এক বৈশিষ্ট্য। এমন এক রঙ্গিন মহলেই নিজমের সাথে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের সাক্ষাৎ ঘটে। দরবারের প্রাচীর জুড়ে টালি বসানো এবং মাঝে মাঝে আরবীয় ধাঁচের নকশা। আগ্নেয়গিরির উদ্ভূত গ্রানাইট এত সহজে স্থাপন করা হয়েছে, যেন এগুলো প্লাস্টারের মতো নরম।

পরিবেশ অতি শোভন ও পরিমার্জিত যা দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ মিনিয়েচার চিত্রে প্রতিফলিত। নিজামের দুজন দরবারি শিল্পী ছিলেন রায় ভেঙ্কটচেলাম এবং তাজালি আলী শাহ। হায়দারাবাদের দরবারে প্রবীণ অভিজাতদের সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন তারা। তাদের অঙ্কিত চিত্রে আছে ফোয়ারা থেকে পানি ঝরার দৃশ্য, উড়ন্ত টিয়া পাখি এবং আম গাছের ডাল থেকে ডেকে উঠা ময়ূর।

মনোরম এই উদ্যান দৃশ্য থেকে কিছুতেই আন্দাজ করা সম্ভব নয়, যে, নগরীর বহির্ভাগে যে কোনো সময় মারাঠারা হামলা চালাতে পারে এবং অগ্নিসংযোগ ও লুটপাঠ করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে এই শান্ত শৈল্পিক দৃশ্য সেখানে বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত, যা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় পুরো সময় জুড়ে দাক্ষিণাত্যে বিরাজ করেছিল। নিজামের পিতা নিজাম-উল-মুলক ১৭২৪ সালে মোগল সাম্রাজ্যের হাত থেকে প্রায় খসে পড়া দাক্ষিণাত্যের প্রদেশ থেকে আলাদা স্বাধীন রাজ্য হায়দারাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন কঠোর, কিন্তু অত্যন্ত সংযমী ব্যক্তিত্ব। তার আদর্শ ছিল ধার্মিক মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব। যিনি চিত্রকলার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং বিশেষ করে কোরআনের বিধান বহির্ভূত মিনিয়েচার চিত্র অঙ্কনের দক্ষতার। অভিজাতদের ওপর তিনি দৃষ্টি রাখতেন এবং পবিত্র মহররম মাসে যারা অবৈধ কাজে লিপ্ত হত গুপ্তচরদের মাধ্যমে তাদের ব্যাপারে খবর সংগ্রহ করতেন। যে কোনো নৃত্য, বিশেষ করে বাইজি নাচের আয়োজন করতে হলে দরবার থেকে বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করতে হত।

নিজাম-উল-মূলক অত্যন্ত দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি বরং আরও মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। মোগলরা যেভাবে ঘুষ দিয়ে বা ষড়যন্ত্র করে উদ্দেশ্যে হাসিল করত, তিনি কখনো তা করেননি। দিল্লির

BanglaBook.org

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে তিনি যখন সরে আসেন তখনো তিনি মোগল সম্রাটের প্রতি নামে মাত্র আনুগত্য বজায় রাখার নীতি বজায় রেখেছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে হায়দারাবাদের জনগণ আকবর ও শাহজাহানের সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে বিবেচনা করে নিজেদেরকে মোগল বলেই উল্লেখ করত। নিজাম-উল-মূলক মারাঠাদের ওপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন গুপ্তচর নিয়োগ করে ও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে। তার অনুসারীদের তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। 'সম্রাট আওরঙ্গজেব তার বিশাল সেনাবাহিনী এবং হিন্দুস্থানের সমুদয় সম্পদ ব্যয় করেও তাদেরকে পরাজিত করতে পারেনি। বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এসব অভিযানে কোনো ফললাভ হয়নি। কূটনীতির মাধ্যমে আমি তাদেরকে আমার প্রতি অনুগত ও আস্থাশীল রেখেছি।

১৭৪৮ সালে তার মৃত্যুর পর সতর্কতার সাথে গড়ে তোলা তার এই কাঠামো ভেঙে পড়তে থাকে তার পুত্ররা ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ লিপ্ত হওয়ায়। এ লড়াই এ তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী শক্তিগুলো, বিশেষ করে মারাঠাদের সাথে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা চালায়। এ চেষ্টা ছিল উত্তর-পশ্চিমে মারাঠাদের সাথে এবং পূর্বদিকের পন্ডিচেরিতে ফরাসিদের সাথে। শেষ পর্যন্ত নিজাম আলী খান, যিনি তার পিতার অবৈধ সন্তান, নিজেকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বড় ভাই সালাবত জংকে বিদরের কারাগারে নিক্ষেপ করেন, যেখানে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।

এ সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, হায়দারাবাদ রাজ্য বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়। কারণ মারাঠা, ফরাসি, ব্রিটিশ এবং মহীশূরের হায়দার আলী শকুনের মতো হায়দারাবাদের প্রান্তসীমায় পৌঁছে যায় নিজামের ভূখণ্ডের এক একটি অংশ নিজেদের স্বার্থে দখল করার উদ্দেশে। তবুও হায়দারাবাদ ভেঙে পড়েনি। এজন্যে পুরো কৃতিত্ব নিজাম আলী খানের কূটনৈতিক তৎপরতার এবং সতর্কভাবে পরিকল্পিত মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টিতে তার সাফল্যের। সামরিকভাবে হায়দারাবাদ ছিল দাক্ষিণাত্যের দুর্বলতম রাজ্য। বিশেষ করে নিজাম আলী খানের দায়িত্ব গ্রহণের সময়ে। কিন্তু যখন তার মৃত্যু হয় তখন দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। দুর্বল একটি অবস্থান থেকে হায়দারাবাদকে ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে তার সাফল্য ছিল অসামান্য। হায়দারাবাদের সাথে বন্ধুত্ব ছাড়া কোনো শক্তির পক্ষে ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না।

১৭৯৪ সালে কার্কপ্যাট্রিক ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম বারের মতো সাক্ষাৎ করেন। নিজামের বয়স ষাট বছরের ওপর, দীর্ঘ, কৃশ দেহ, যিনি তার দাঁত ও মাথায় চুল হারিয়েছেন। কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি ও দক্ষতার গুণে তার দরবারে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সাথে তার দরবারেই আলোচনা করছেন এবং বাইরের শক্তির

দুর্বলতাগুলো আঁচ করছেন। সমসাময়িককালে আঁকা এক মিনিয়েচার চিত্রে তাকে বৃদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে—রোগা, মুখে হালকা ভাঁজ পড়া এবং দাড়ি কামানো অবস্থায়, তিনি পিছনের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছেন তার সিংহাসনে, এক পাশে রাখা আছে একটি তরবারি ও পিকদানি। তাকে মনে হয় বিজ্ঞ এবং সতর্ক, তার উজিরের সাথে গভীর আলোচনায় মগ্ন। তার পরনে প্রায় স্বচ্ছ মসলিনের জামা এবং শক্ত করে আঁটা পাগড়ি, যা মণিমুক্তা দিয়ে সাজানো। তার কোমরবন্দ অলংকৃত এবং অনেকগুলো গোলাপি মণি পাগড়িতে জ্বলজ্বল করছে। জেমস কার্কপ্যাট্রিক, যিনি তাকে ভালোভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি তার সম্পর্কে লিখিত চিত্র এঁকেছেন—

> “তার আকৃতি দীর্ঘ এবং দেহাবয়বে এখনও দৃঢ়তার ছাপ পরিস্ফুট, যৌবনে তিনি অসীম শক্তিধর ছিলেন। তার গায়ের রং কালো এবং চেহারা কখনো সুদর্শন ছিল না, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাকে চিন্তাক্লিষ্ট এবং বিচক্ষণ মনে হয়। তার ভঙ্গিমা রাজসিক এবং মর্যাদাবান। কথাবার্তায় রাজকীয় শোভন তার প্রকাশ রয়েছে, যার ফলে তার সামনে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ হওয়া যায়। কেউ যখন কথা বলে, তখন তিনি তার মর্যাদা বিস্মৃত হন না অথবা তিনি যে বংশে জন্মেছেন তার গৌরবের কথাও ভুলে যান না।
>
> তাকে সাধারণভাবে একজন রাজন্য বলে বিবেচনা করা হয় বলে আমার বিশ্বাস, যিনি যদিও পর্যাপ্ত মেধার অধিকারী নন, কিন্তু নিজেকে বিভিন্ন সময় প্রমাণ করেছেন যে, প্রাচ্যে রাজ্য শাসনের মতো প্রয়োজনীয় গুণাবলির কোনো ঘাটতি তার মাঝে নেই। যোদ্ধা হিসেবে তার ঘাটতি বিপুলভাবে পূরণ হয়েছে রাজনীতিবিদ হিসেবে তার দক্ষতার মধ্য দিয়ে।”

সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের মতে হায়দারাবাদের শাসকদের অসমান্য দক্ষতার গুণেই তারা দাক্ষিণাত্যের রাজনীতির জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে নিজাম আলী খানের সুযোগ্য উজির আরিস্তু জাহের অবদান রয়েছে। কঠোর প্রকৃতির রাজনীতিবিদ হলেও অরিস্তু জাহ অত্যন্ত মার্জিত রুচির সম্পন্নও ব্যক্তিত্ববান ছিলেন। তিনি শিল্পী ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, যে কারণে নিজাম-উল-মুলকের কৃচ্ছ্রতার যুগের পর শিল্প সাহিত্য দারুণভাবে বিকশিত হয়। সম্ভবত তার কারণেই বহু গুরুত্বপূর্ণ মিনিয়েচার চিত্র এখনও টিকে আছে। চিত্রগুলোতে তাকে দীর্ঘ ধূর্ত-দর্শন মানুষ হিসেবে দেখা যায়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ছলনাপূর্ণ চেহারা, বাঁকানো নাক এবং সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি। সব চিত্রে তাকে তার সমসাময়িকদের চাইতে বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসেবে দেখানো হয়েছে, যার মাথায় লাল রঙের ছোট পাগড়ি, বুকের ওপর সাধারণ মুক্তার হার এবং পান হাতে আরেকটি মুক্তার ব্রেসলেট। হাতে ধরা সুবর্ণ হুক্কার নল। তখনকার

BanglaBook.org

হায়দারাবাদি বিবরণীতে বলা হয়েছে, 'তিনি কখনো হুক্কার নল হাতছাড়া করতেন না এবং তার সুগন্ধি তামাকের গন্ধ দরবারের সেরা বৈশিষ্ট্য ছিল হুক্কায়। ধূমপানের অভ্যাস তার এত প্রিয় ছিল যে, আরিস্তু জাহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এডওয়ার্ড স্ট্রাচেও বিস্মিত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন: 'উজির উপযুক্ত প্রাচ্যদেশীয় ঢং-এ ধূমপান করছিলেন। তিনি তার হুক্কা হাতে ধরে ছিলেন না অথবা নলের মুখ ধারণ করার জন্যে মুখও খুলছিলেন না। তার ভৃত্য তাকে লক্ষ করছিল এবং সে নলটা তার মুখের কাছে নিয়ে যায়। যখন সময় আসে সে নলটা মুখে পুরে দেয় এবং টান করছেন, এটা মনে হলো না। তিনি কথা বলতে শুরু করলে লোকটি নল সরিয়ে নেয়। উজির যখন একটু নড়েচড়ে বসেন এবং থুথু ফেলবেন বলে মনে হয়, তখন তার বিশস্ত পরিচারকদের একজন তার দু'হাত মেলে তার মুখের সামনে ধরে এবং মুখভর্তি থুথু হাতে ধারণ করে। এরপর অত্যন্ত যত্নের সাথে একটি কাপড়ে মুছে এবং ভাঁজ করে রাখে পুনরায় তৈরি থাকে যে তার মনিব আরও থুথু ফেলবেন কিনা। সে থুথু যত জঘন্যই হোক না কেন।'

দরবারে নিজাম এবং আরিস্তু জাহ ছাড়াও তৃতীয় একজন লোক ছিলেন, যিনি কার্কপ্যাট্রিক ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং জেমসের বিয়ের কারণে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হন। লোকটির নাম মীর আলম, যিনি আরিস্তু জাহর একান্ত সচিব হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও অভিজাত বংশোদ্ভূত ছিলেন। জন ক্যানাওয়ে যখন হায়দারাবাদে পৌঁছেন তখন মীর আলমকে উজিরের তোষামোদকারীদের একজন হিসেবে দেখতে পান।। তিনি লিখেছেন: 'আমার মনে হয় না যে, উজিরের ওপর তার তেমন কোনো প্রভাব আছে, কারণ উজিরের প্রতিটি ইঙ্গিত ও মতামতকে তিনি অন্ধ ভৃত্যের মতো গ্রহণ করেন।'

মীর আলম সফলতার সাথে কলকাতায় এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন এবং লর্ড কর্নওয়ালিসের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম হন এবং তিনি তাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে নিজামের উকিল হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন, যার মাধ্যমে ব্রিটিশদের সাথে নিজামের সম্পর্কের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফরে মীর আলম ক্রমে আরিস্তু জাহের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করেন, বিশেষ করে মারাঠাদের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে। মীর আলম প্রকাশ্যে এ দ্বন্দ্বের বিরোধিতা করতে থাকেন। যা তিনি তুলনা করেন অপ্রয়োজনীয়ভাবে 'ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোড়ার শামিল।'

নিজাম আলী খান তার শাসনামলের অধিকাংশ সময় ধরেই চেষ্টা করেছেন মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াতে এবং তার পিতার উপদেশ অনুসরণ করেছেন সশস্ত্র যুদ্ধের মোকাবেলার চাইতে কূটনীতির মাধ্যমে তাদের প্রশমিত রাখতে। কিন্তু এখন, কিছুটা তার উজিরের প্রভাবে তিনি তার আগের নীতি পরিবর্তনের

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তার নতুন পদাতিক রেজিমেন্টের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত মারাঠাদের সঙ্গে বুঝপড়া সম্ভব বলে মনে করছেন। এ কারণেই তিনি এবং আরিস্তু জাহ উইলিয়ামের মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন, যাতে কোম্পানির সেনাবাহিনী তাদের পাশে থাকে। নিজামের উপদেষ্টাদের মধ্যে আরিস্তু জাহ অধিকতর ব্রিটিশ প্রেমিক ছিলেন এবং নিজামের দরবারে শুধু তিনিই কোম্পানির প্রকৃত ও ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি সম্পর্কে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তার ধারণার পক্ষে অধিকাংশ উপদেষ্টা ঐক্যমত্য পোষণ করেননি এবং পায়গাহ অভিজাতদের নেতৃত্বে দরবারের আরেকটি শক্তিশালি অংশ, যারা নিজামের দেহরক্ষী দলের নিয়ন্ত্রণ করত তারা বরং তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে কোনো গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়নি যে, তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে মারাঠাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের পক্ষে। তৃতীয় একটি পক্ষ চাইছিল যে, নিজাম টিপু সুলতান ও ফরাসিদের সঙ্গে মৈত্রী করুক।

একটি বষয় দরবারের কেউ জানত না যে, নতুন গভর্নর জেনারেল জন শোর মারাঠাদের বিরুদ্ধ সাহায্য করার জন্যে নিজাম যে অনুরোধ করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক হায়দারাবাদ রওয়ানা হওয়ার আগে জন শোর তাকে ১৭৯০ সালে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ওপর অটুট থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে মারাঠা, কোম্পানি এবং নিজাম মিত্র হিসেবে একত্রে কোম্পানির সবচেয়ে বড় শত্রু টিপু সুলতানকে বিচ্ছিন্ন রাখবে, যিনি এই মৈত্রীর বাইরে। ঘটনাচক্রে দেখা যায় যে, জন শোরের জন্যে এটি ছিল বিরাট এক ভুল এবং সে ভুলের কারণে রাজ্য হিসেবে হায়দারাবাদ প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল এবং দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে কোম্পানির দুর্বল উপস্থিত আরও বিপদাপন্ন হয়ে উঠেছিল।

উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক প্রথম দিকে নিজামের দরবারে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সেটি তার ব্যক্তিত্বের ভাষাগত সামর্থ্যের কারণেই শুধু নয়। হায়দারাবাদের দরবারে মারাঠা উকিল গোবিন্দ কৃষেণ পুনায় একটি খবর পাঠান: 'উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারি ফারসি ভষায় তিনি দক্ষ, সমানভাবে সেই ভাষায় বলতে ও লিখতে পারেন, হিসাবের খুঁটিনাটি বুঝেন এবং সরকারি কাজকর্ম ভালোভাবে জানেন। তাছাড়া জ্যোতির্বিদ্যায় তার জ্ঞান আছে। বলা যায়, তিনি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ।' উইলিয়াম ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে মুহূর্তে নিজামের উজির বুঝতে পারবেন যে, মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনায় ব্রিটিশরা যোগ দেবে না, সে মুহূর্তেই নিজামের দরবারে তার জনপ্রিয়তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী কয়েক মাস ধরে নিজাম ও মারাঠাদের মধ্যে আলোচনা চলল এবং পাশাপাশি উভয় পক্ষই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক এ

BanglaBook.org

পরিস্থিতিতে জন শোরকে লিখলেন যে, 'তিনি ব্রিটিশের নিরপেক্ষতার নীতি সম্পর্কে নিজাম ও আরিস্তু জাহকে বুঝাতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।'

তিনি হায়দারাবাদিদের এ বিষেয়েও বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, মারাঠাদের শক্তিশালি পদাতিকদের মোকাবেলা করার মতো অবস্থা ব্রিটিশ সৈন্যদের নেই। মারাঠা সৈন্যরা ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সেরা সামরিক ব্যক্তিত্ব কোমাতে, বেনোট ডি বোনের দ্বারা আধুনিক ফরাসি সামরিক কুশলতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তাদের 'আগুণ ও লৌহ প্রাচীর'-এর জন্যে খ্যাত, যা তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সুশিক্ষিত ভারতীয় বাহিনীর ওপর বিপর্যয় ঘটিয়েছে। আরিস্তু জাহ কার্কপ্যাট্রিককে লিখেন যে 'বিপদ এতটা আসন্ন নয়, আমি মনে করি, হয়তো ডি বোনের একটি ব্রিগেড তার বিরুদ্ধে মোতায়েন করা হতে পারে। এক্ষেত্রে আমার শুধু একটাই আশংকা যে, পরিস্থিতি আমাদের জনগণকেই মোকাবেলা করতে হবে এবং আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হব।'

ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কার্কপ্যাট্রিক উপলব্ধি করলেন যে, তার প্রেরিত বার্তা তিনি বুঝাতে পারছেন না—শুধু নিজামই নয়, বিদর দুর্গের সকলেই পুরোপুরি আশ্বস্ত যে, মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিজয় তাদের হাতের মুঠোয়। প্রতি রাতে নর্তকিরা আসন্ন বিজয়ের আনন্দে নৃত্য ও সংগীতে দরবার মাতিয়ে রাখে। আরিস্তু জাহ দরবারে ঘোষণাই করে দিয়েছেন যে, 'তারা যখন পুনা দখল করবেন তখন তার মারাঠা প্রতিপক্ষ 'মারাঠা মেকিয়াভেলি' বলে পরিচিত নানা ফাদনাভিকে লেংটির মতো এক টুকরা বস্ত্র এবং পানিভর্তি একটি লোটা হাতে দিয়ে বেনারসে নির্বাসনে পাঠানেব গঙ্গার তীরে বসে মন্ত্র পাঠ করতে।' উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক জন শোরকে লিখেন: 'মনে হচ্ছিল আরিস্তু জাহের মাথায় ঝড় উঠেছে। যা আছড়ে পড়তে খুব বেশিদিন লাগবে বলে মনে হয় না,..। যখনই এটা ঘটুক, আমি এর পরিণতি নিয়ে শংকিত।'

কার্কপ্যাট্রিকের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। ১৭৯৪ সালের ডিসেম্বরে যখন খবর এল যে, তার ভাই জেমস অবশেষে বিজয়নগরম থেকে হায়দারাবাদে বদলির আদেশ পেতে সফল হয়েছেন এবং ইতোমধ্যে হায়দারাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন, তখনই যুদ্ধের ঘোষণা হলো। নিজামের বিশাল সেনাবাহিনী বিদরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বের হয়ে মারাঠা রাজধানী পুনা অভিমুখে যাত্রা করল যুদ্ধাভিযানে।

এ যুদ্ধ যতটা সংক্ষিপ্ত ছিল, ততটা ছিল ভয়াবহ। তিন মাস ধরে নিজামের বাহিনী ধীরে ধীরে মানজিরা নদীর তীর দরে অগ্রসর হয়ে পুনার দিকে। মারাঠা বাহিনীও অনুরূপ মন্থর গতিতে মোগলদের (হায়দারাবাদিরা নিজেদের মোগল বলত) দিকে এগুতে থাকে। দুই বাহিনীর মধ্যে মারাঠা বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা কিছু বেশি, প্রায় এক লাখ ত্রিশ হাজার, অন্যদিকে নিজামের বাহিনীতে প্রায়

BanglaBook.org

নব্বই হাজার মারাঠা সৈন্যরা অধিকতর অভিজ্ঞ এবং তাদের নেতৃত্ব উত্তম। দুই বাহিনী পদাতিক ও অশ্বরোহীতে বিভক্ত, যদিও নিজামের বাহিনীতে ব্রিটিশ ধাঁচের লাল কোট পরিহিত মহিলাদের একটি পদাতিক রেজিমেন্ট ছিল। তাদেরকে আনা হয়েছিল প্রাথমিকভাবে নিজামের মহিলাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। হারেমবাসীরা দীর্ঘ অভিযন এসেছিল হাতির পিঠে আচ্ছাদিত হাওদায় চড়ে।

পুনার উদ্দেশে মন্থর যাত্রার সময়ে প্রায়ই উভয় পক্ষে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোনো আলোচনাই সফল হয়নি। শেষ দিকে নিজাম তার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তিনি মারাঠাদের ভুখণ্ড দখল করতে অভিযানে যাচ্ছেন না। দীর্ঘস্থায়ী শিকার অভিযানে তার ভূখণ্ড অতিক্রম করছেন। প্রতিটি আলোচনায় যুদ্ধের চাইতে আলোচনা এবং ষড়যন্ত্রের চাইতে যুদ্ধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। নিজামের দরবারে চমকদার সামাজিক সৌজন্যের মতোই তার সামরিক কৌশলও যেন বিস্তৃত এবং দরবারী ঢং-এর, দাবার চালের মতো মন্থর, যেন আসল যুদ্ধ নয়, যেখানে জীবন্ত সৈনিক আসলেই মারা পড়তে যাচ্ছে।

আলোচনা যখন চলতে থাকে উভয় পক্ষই একে অন্যের সেনাবাহিনীতে ভাঙন ধরানোর জন্যেও যথেষ্ট সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে ঘুষ দিয়ে এবং গোপন গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর মাধ্যমে। আরিস্তু জাহ এই চেষ্টায় বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করেন (এক কোটি রুপি বলে গুজব ছিল) সিন্ধিয়া ও তার বিখ্যাত ফরাসি ব্রিগেডকে মারাঠা পক্ষ ত্যাগ করানোর জন্যে। কিন্তু তার উদ্যোগ সফল হয়নি। নানা ফাদনাভিও একইভাবে অর্থ ব্যয় করেন, তবে স্বল্প পরিমাণে—প্রায় সাত লাখ রুপি বলে শোনা গিয়েছিল। নানা'র প্রচেষ্টা ছিল নিজামের বাহিনীর মারাঠা ও টিপু সমর্থকদের আরিস্তু জাহের বিরোধিতায় লিপ্ত করানো। আরিস্তু জাহের সাবেক অনুচর মীর আলমও নানা'র ঘুষ গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। পুনারায় নিযুক্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যার চার্লস ওয়ারে ম্যালেটের ধারণা মীর আলমের আচরণে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, কারণ আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি মারাঠা দরবারে এসেছিলেন এবং তার সন্দেহের কথা উইলিয়ামকেও জানিয়েছিলেন। কার্কপ্যাট্রিক জন শোরকে লিখেন, 'পুনায় তিনি সামান্য কাজই করতে পেরেছেন। কিন্তু স্যার চার্লস ম্যালেটের ব্যাপারে আরিস্তু জাহের সন্দেহ প্রায় চিরস্থায়ী, যার কারণ আমি কখনো আবিষ্কারে সক্ষম হইনি। বরং এ ধরনের সন্দেহ শুধু পরিস্থিতিকে জটিল করতেই সাহায্য করে।'

আরিস্তু জাহ ইতোমধ্যে তার সকল প্রচেষ্টা নিয়োগ করে কার্কপ্যাট্রিককে তার পক্ষে টানতে—আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনা বাহিনীর সাহায্য পেতে, বিশেষ করে নিজামের সঙ্গে হায়দারাবাদে যে দুটি ব্রিটিশ রেজিমেন্ট মোতায়েন ছিল। কিন্তু উইলিয়াম তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন

করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি জানান, 'এই যুদ্ধে কোম্পানি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে।'এমনকি তিনি আরিস্তু জাহের এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও কঠোরতা অবলম্বন করেন যে, হায়দারাবাদের বাহিনীর জন্যে কোনো পদ্ধতি গ্রহণ উত্তম হবে। কারণ এ উপদেশ দেয়া যথার্থ হবে না বলে তিনি তাকে জানিয়ে দেন।

শেষ পর্যন্ত ১৭৯৫ সালের ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় নিজামের সেনাবাহিনী মোরি ঘাট নামে পরিচিত এক পর্বতে পৌঁছে এবং সেখান থেকে তারা তাকিয়ে দেখে যে, নিচে মারাঠা বাহিনী তাদের থেকে এক দিনের দূরত্বে শিবির স্থাপন করেছে। পরদিন সকাল আটটায় নিজাম তার বাহিনীকে নির্দেশ দেন পর্বত থেকে নিচে অবতরণ করতে, যেখানে মারাঠা বাহিনী তাদের অপেক্ষায় ছিল।

দুপুরের খাবার পর বেলা ২টার দিকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। ফরাসিদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাবাহিনী প্রথমবারের মতো যুদ্ধে লিপ্ত হলো। ফ্রাঁসোয়া ডি রেমন্ড ফরাসি রিপাবলিকান পতাকার অধীনে তাদের মারাঠা প্রতিপক্ষের মধ্যবর্তী অবস্থানে ধীরে ধীরে এগুতে পারছিলেন। মারাঠা পক্ষে ফরাসি ডি বোনোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যরা লড়ছিল ফরাসি বোর্বো পতাকার অধীনে। উইলিয়ামের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপারে ছিল যে, রেমন্ডের গড়ে তোলা বারোটি নতুন রেজিমেন্ট উচ্চতর অবস্থান থেকে অত্যন্ত কার্যকর হামলা পরিচালনা করছে এবং ডি বোনের মারাঠাদের ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। তার জন্যে আরও বিস্ময়কর ছিল মোগল মহিলা রেজিমেন্টের পরদর্শিতা, যারা সমান দ্রুততায় পর্বত থেকে তাদের বন্দুক হাতে নেমে মারাঠা অবস্থানের ডানদিকে সফল হামলা চালায়। রাতের অন্ধাকার নেমে এলে রেমন্ডের বাহিনী ছেড়ে যায় 'পায়গাহ' অশ্বারোহী দল। অবশিষ্ট বাহিনী মারাঠাদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষেণের মুখে পশ্চাদপসরণ করে। কিন্তু ইতোমধ্যে নিজামের বাহিনীর বড় অংশ মোরি ঘাট থেকে তিন মাইল দূরে এক নদীর তীরে তাদের কাঙ্ক্ষিত শিবির স্থাপনের জায়গায় উপনীত হয়। পরদিন সকালে সম্ভাব্য যুদ্ধের উত্তর প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে।

তখন কেউ নিশ্চিত ছিল না যে, ভুলটা কোথায় হয়েছে। কিন্তু সেই রাতে এগারোটার পর নিজামের শিবিরে আকস্মিকভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন সকালের গোলযোগপূর্ণ বিশৃঙ্খলার অবস্থা সম্পর্কে উইলিয়াম লিখেন:

'আমার মনে হলো, যেন এক ধরনের স্বপ্ন। এতটাই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং তাদের কাছেও কল্পনাতীত ও হতবাক হওয়ার মতো। যৌক্তিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয় যে, শত্রুর সাথে সামান্য মোকাবেলার পর নিজামের বাহিনীতে কী ঘটেছিল। কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরদার নিহত হয়েছে এবং সম্ভবত একশো জন সৈনিক। অথচ নিজামের বাহিনীর অনুকূলে ছিল পরিস্থিতি। কিন্তু রাত ১১ টার দিকে নিজাম অথবা তার উজির অথবা দুজন একত্রে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেন পিছু হটার।...এর পরণতি যা হতে পারে সর্বত্র ভীতি ছড়িয়ে পড়া এবং

BanglaBook.org

রসদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি...কিন্তু এত শুধু সাময়িক পরিণতি। কিন্তু রাজ্যের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার জন্যে যে কত বড় হুমকি তা সহজে অনুমেয়। কিন্তু মনে হয়, নিজাম পুনা সরকারের সকল দাবি মেনে নিয়েছিলেন।'

আসলে যা ঘটেছিল, সে সম্পর্কে কার্কপ্যাট্রিক পরবর্তীতে জানতে পারেন যে, মারাঠা বাহিনীর অব্যাহত গোলাবর্ষণে নিজামের মহিলাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ করে নিজামের প্রধানা স্ত্রী বখশি বেগম হুমকি দেন যে, নিজাম যদি পুরো হারেমকে ছোট্ট ও অর্ধ ধ্বংসপ্রাপ্ত খার্দলা দুর্গের আশ্রয়ে নিয়ে না যান, তাহলে তিনি প্রকাশ্যে তার বোরখা খুলে ফেলবেন। দুর্গটি মোরি ঘাটের ঠিক পাদদেশে অর্থাৎ সম্মুখ বাহিনীর অবস্থান থেকে তিন মাইল পিছনে। ব্যাখ্যার অসাধ্য নিজামের এই পিছু হটার বিশৃঙ্খলার মধ্যে পানির সন্ধানে বের হওয়া মারাঠাদের একটি ছোট দলের সঙ্গে সন্ধ্যায় অন্ধকারে গুলি বিনিময় হয়, যার ফলে নিজামের বাহিনীর মধ্যে আরও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তারা দ্রুত খার্দলা দুর্গ প্রাচীরের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়। পেছনে ফেলে যায় তাদের বন্দুক, রসদবাহী উট, বারুদের গাড়ি এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী।

পরদিন সকালে মারাঠারা বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় যে, মোগলরা যে শুধু তাদের কৌশলগত অবস্থান ত্যাগ করেছে তাই নয়, তাদের আগ্নেয়াস্ত্র, রসদ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং নিজেরা আশ্রয় নিয়েছে দুর্বল এক অবস্থানে। চার্লস ম্যালেট তার সরকারি বিবরণীতে সেই সকলের কথা লিখেন, 'নিজামের বাহিনীর অকল্পনীয় পশ্চাদপসরণে আমরা এর পরিণতির কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছি, যার কারণে শুধু যে তার ব্যক্তিগত মানমর্যাদা ও সরকারের গুরুত্ব ধূলিসাৎ হয়েছে তা নয়, বরং তার নিজের ও সেনাবাহিনীর অস্তিত্বও বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।'

তাদের বিস্ময় মারাঠাদেরকে নিজামের বাহিনীর ওপর পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সকাল দশটার মধ্যে তারা নিজামের বারুদবাহী চারশো গাড়ি, দুই হাজার উট এবং পনেরোটি ভারী কামান নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। বেলা এগারোটার মধ্যে তারা হায়দারাবাদের পুরো বাহিনীকে ঘেরাও করে এবং ষাটটি কামান দিয়ে দুর্গের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। কোনো যুদ্ধই হয়নি, কিন্তু নিজামের পক্ষ থেকে করণীয় কিছুই ছিল না।

পরদিনই সকালেই দুর্গের অভ্যন্তরে রসদের ঘাটতি পড়ে এবং মারাঠারা একজন দূত প্রেরণ করে শর্ত স্থির করার জন্যে। উইলিয়াম লিখেছেন, 'পানি ও খাদ্যের জন্যে সৈন্যদের দুর্দশা প্রতি ঘণ্টায় বৃদ্ধি পাচ্ছিল।' নিজামের সঙ্গীদের সঙ্গে তিনি নিজেরও দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যে লোকটি মারাঠা দূত হয়ে আসেন তিনি গোবিন্দ কৃষেণ।

বাইশ দিন ধরে আলোচনা অব্যাহত থাকে। হায়দারাবাদ শিবিরে প্রতিদিন পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি ঘটছিল। কারণ মারাঠারা অবরোধ ক্রমেই

BanglaBook.org

জোরদার করছিল। নিজামের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে মারাঠারা প্রতিদিনই তাদের দাবি বৃদ্ধি করছিল। নিজামের পক্ষের অনেকেই সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছিল যে, অবরোধ ভাঙার জন্যে প্রবল প্রতিরোধ ঘাটতির কারণ হায়দারাবাদের বাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান চক্রান্ত। এ সন্দেহ পরে গিয়ে স্থিত হয় মীর আলম ও মারাঠা সমর্থক গায়গাহ্ অভিজাতদের ওপর। সন্দেহ আরও প্রবল হয় যখন মারাঠাদের প্রধান দাবিতে পরিণত হয় নিজামের ইংরেজ সমর্থক উজির ও যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিকল্পনাকারী আরিস্তু জাহের আত্মসমর্পণ। কারণ যাই হোক না কেন, হায়দারাবাদের ওপর বিপর্যয়ের মাত্রা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যায়। উইলিয়াম বর্ণনা করেন, 'মারাঠাদের সকল দাবির কাছে নতি, স্বীকার করতে হয় নিজামকে এবং তিনি আর স্বাধীন শাসক হিসেবে থাকেন না।'

উইলিয়ামের তখনকার লেখা বহু চিঠি হারিয়ে গেছে। কারণ যেসব পত্রবাহক এগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের অনেকে মারাঠাদের হাতে ধরা পড়েছে এবং টহলদানকারী পিণ্ডারি অশ্বারোহীদের হাতে নিহত হয়েছে। যে চিঠিগুলো যথাস্থানে পৌঁছেছে তাতে দুর্গের অভ্যন্তরের পরিস্থিতির এবং কার্কপ্যাট্রিকও যে তার গুটিকয়েক ইংরেজ সঙ্গীদের দুর্দশার শিকার হন সেই চিত্র পাওয়া যায়।

দুর্গে পানির যে উৎস তার পানি সবুজ ও ময়লাযুক্ত। সেই পানি পানে দুর্গ রক্ষাকারীদের আমাশয়ের সৃষ্টি হয়। তদুপরি এক কাপ পানি খাওয়া যেত এক রুপিতে। সপ্তাহ শেষে খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এক মুঠি ডালের দাম হয়ে উঠে আকাশচুম্বি। সৈন্যরা দুর্গের তেঁতুল গাছগুলো কেটে ফেলে এবং সেসব গাছের পাতা, বাঁকল ও কাঁচা ফল খেতে থাকে। এগুলো শেষ হয়ে যাবার পর ক্ষুধা নিবারণের আর কিছু ছিল না। খাদ্যের অভাবে কিছু সৈন্য মারা যায়। অন্যেরা মারা পড়ে তন্দ্রায় এবং দুর্গে ছড়িয়ে পড়ে কলেরা। দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষে উইলিয়ামের দলের তৃতীয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। মার্চের ৩০ তারিখে তিনি কলকাতায় লিখেন :

> "প্রতি ঘণ্টায় আমি যে দুর্দশা প্রত্যক্ষ করছি, তা আমার হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে। তবুও আমার ক্ষুদ্র মহলটিকে রক্ষা করতেও আমি অসমর্থ। আমি নিজেকে আশ্বস্ত রেখেছি যে, স্যার জন শোর আমার আবেদনের প্রতি বিমুখ হবেন না, যা আমি আমার সাথে যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের পক্ষ থেকে লিখছি। কেবল ঈশ্বরই জানেন যে, কখন এবং কোথায় তাদের দুদর্শার পরিসমাপ্তি ঘটবে। ইতোমধ্যে আমি আমার সঙ্গীদের চৌদ্দ বা পনের জনকে কবরস্থ করেছি বিশৃঙ্খলা শুরু হওয়ার পর থেকে। আমাদের অবস্থা করুণ। আমি ভালো থাকলেও ভালোভাবে সেরে উঠার জন্যে সমুদ্র যাত্রা অতি প্রয়োজন। কারণ ইতোপূর্বে আমি বাতজ্বরে ভুগেছি।"

BanglaBook.org

উইলিয়াম আসলে এই গুরুতর পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন নিজের অসুস্থতার কারণে। অবরোধের আগে পুরো বর্ষাকাল তাকে কাটাতে হয়েছে তাঁবুর নিচে এবং দিনের পর দিন তাকে তার শিবিরে শয্যায় অবস্থান করতে হয়েছে বাতের ব্যাথা থেকে উপশম লাভের জন্যে আফিম সেবন করে। তার দলের অন্যদের এবং তাদের ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর জন্যেও পরিস্থিতি ছিল শোচনীয়। এমনকি তারা বিদর ছেড়ে আসার আগেও কার্কপ্যাট্রিক তার দুটি হাতি ও দুটি উট হারিয়েছিলেন। এখন তার সঙ্গি সৈন্য ও ভৃত্যদের যারা বেঁচে আছে, তারাও অসুস্থ এবং রেসিডেন্সিতে যে ইংরেজ চিকিৎসক ডাক্তার উরে আছেন তার পক্ষেও সামান্যই করণীয় আছে। বিশেষ করে গুরুতর অসুস্থ উইলিয়ামের সহকারী স্টুয়ার্টের ক্ষেত্রে, যে উচ্চ জ্বরে ভুগছিল এবং কখনো সেরে উঠেনি। অক্টোবর পর্যন্ত এ অবস্থায় কাটিয়ে তার শক্তি শেষ হয়ে যায়।

নিজামের জন্যে পরিস্থিতির অবসান ঘটে ১৭ এপ্রিল। একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মারাঠাদের হাতে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দৌলতাবাদ, আহমেদনগর, সোনাপুর এবং বার্ষিক পঁয়ত্রিশ লাখ রুপি রাজস্ব আদায়ের উপযুক্ত বিশাল ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার সম্মতি দেয়া হয় চুক্তির শর্তবলে। নিজামের হাতে থাকে শুধু হায়দারাবাদ রাজ্যের একটি অংশ, প্রতিরোধহীন সীমান্ত। এছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুই কোটি রুপি প্রদানে সম্মত হতে হয় তাকে। শর্ত অনুযায়ী হায়দারাবাদকে তার ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেকটা ছেড়ে দিতে হত, কিন্তু এর বিনিময়ে মূল্য হিসেবে মারাঠারা দাবি করল উজির আরিস্তু জাহকে তাদের কাছে সমর্পণ করতে হবে। অতএব আরিস্তু জাহকে তার পুরনো শত্রু মারাঠা প্রধানমন্ত্রী নানা ফাদনাভির কাছে হস্তান্তর করা হলো। সমসাময়িক হায়দারাবাদি ইতিহাসবিদ গোলাম হোসেন খান পুরনো দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে সাক্ষাতের একটি বর্ণনা লিখে গেছেন—

> "নানা ফাদনাভি আরিস্তু জাহকে প্রথম কথা বলেন: 'নওয়াব সাহিব, আপনি এক কোটি রুপি ঘুষ হিসেবে ব্যয় করেও খুব বেশি কিছু হাসিল করতে পারেননি, পেরেছেন কী? অন্যদিকে আপনার সরকারের ওমরাহদের ঘুষ দিতে সাত লাখ রুপি ব্যয় করে অত্যন্ত ভালো ফল লাভ করেছি—এর ফলে এমনকি আমাদের আনন্দের বৈঠকটি সম্ভব হচ্ছে।'
>
> আরিস্তু জাহ বিষণ্নভাবে উত্তর দেন: 'ভাগ্য এমনই ছিল!'
>
> 'মহামহিম', নানা বলতে থাকেন, 'এই অভিযানে আপনি আমাকে একটি 'ধুতি' ও লোটা দিয়ে বেনারস পাঠাতে চেয়েছিলেন...এখন তো পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হয়ে গেছে। এখন আপনার উদ্দেশ্য কী?
>
> আরিস্তু জাহ উত্তর দেন: 'ভালো কথা, আপনি আমাকে সেক্ষেত্রে মক্কায় আল্লাহর পবিত্র ঘর কা'বায় পাঠাতে পারেন।'

BanglaBook.org

'ভগবান চাইলে, আমরা অবশ্যই আপনাকে আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে পাঠাবো এবং এই পাপীও বেনারসে যাবে। তাহলে আমরা দুজনই আধ্যাত্মিকভাবে লাভবান হবো। কিন্তু প্রথমে আপনাকে কিছুদিনের জন্য আমাদের সরকারের মেহমান হতে হবে। আপনার সাথে আলোচনা করতে এবং পনাকে আনন্দ দিতে, সেটাই কি ভালো হবে না?'

'বাস্তবিকপক্ষে তাই হবে', আরিস্ত জাহ উত্তর দেন।

এরপর দুজনই উঠে মারাঠা শিবিরের দিকে এগিয়ে যান। দুই প্রধান উজিরের হাতে হাত...। সেখানে থেকে তারা এক পর্যায়ে তারা পুনায় যান, যেখানে আরিস্ত জাহকে পুরনো ধ্বংসপ্রায় এক উদ্যানে আটকে রাখা হয়। জায়গাটি তার জন্যেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। ইংরেজদের যুদ্ধ কৌশলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক হাজার তরুণকে বন্দুক হাতে এবং এক হাজার ভাড়াটে আরব সৈন্যকে মোতায়েন করা হয় উদ্যানের চারপাশে। গালিচা বিছানোর জন্যে বেয়ারার ও ভৃত্য মিলিয়ে প্রায় একশ পরিচারক নিয়োগ করা হয়, তাকে সাহর্যে দেয়ার জন্য। পদমর্যাদাহীন লোকজনকে শুধু উদ্যান কারাগারে প্রবেশ করতে দেয়া হত। ভেতরে প্রবেশকারী অথবা ভেতর থেকে যারা বাহিরে বের হয়ে আসত তাদেরকে তল্লাশি করা হত এবং কারো কাছে লিখিত কোনো কাগজ পাওয়া গেলে তা জব্দ করা হত।"

১৭৯৫ সালে ২৪ এপ্রিল উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক এবং তার রক্ষীদল নিজামের পরাজিত সেনাবাহিনীর কয়েকদিন আগে হায়দারাবাদে ফিরে আসেন বিধ্বস্ত অবস্থায়। তিনি দেখতে পান তার ভাই জেমস রেসিডেন্সিতে অপেক্ষা করছে।

দুই ভাইয়ের মধ্যে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল ষোলো মাস আগে। পূর্ব উপকূলের বিজয়নগরমে ক্রিসমাসের সময় এবং তখনকার পরিস্থিতি ছিল আশাব্যঞ্জক। উইলিয়ামের পেশাদারী জীবনে হঠাৎ পরিবর্তন আসে এবং তিনি তার প্রভাব খাটানো মতো অবস্থায় উন্নীত হন। ছোট সৎ—ভাইকে সাহায্য করার মতো পৃষ্ঠপোষকতার নতুন ক্ষমতা আসে তার কাছে। হায়দারাবাদ তার জীবনে ভারো একটি সুযোগ এনে দিয়েছিল এবং তার ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, দুই ভাইয়ের জন্যে আরও ভালো সুযোগ আসবে হায়দারাবাদে ব্রিটিশ প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হায়দারাবাদিদের পরাজয়ের প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে, নিজামের ভূখণ্ডের দীর্ঘস্থায়ীত্বের ব্যাপারে গুরুতর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তদুপরি মিত্রদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশের ব্যর্থতার কারণে কোম্পানির ওপর নিজামের আস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পরিবর্তে তিনি রেমন্ড এবং ফরাসিদের দিকে তাকালেন তার রক্ষাকারী হিসেবে, আর এভাবেই ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল। এ

পরিস্থিতি ছিল কোম্পানির জন্যে অত্যন্ত বিপর্যয়কর। যখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং বিজয়ী ফরাসি সেনাবাহিনী বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ড দখল করে এখন উত্তর ইতালির ওপর প্রবল। চাপ সৃষ্টি করছিল। তাছাড়া আরিস্তু জাহের নির্বাসন ও কারারুদ্ধ থাকার কারণে ব্রিটিশরা হায়দারাবাদে তাদের আসল উকিলকেই হারিয়ে ফেলেছিল। দরবারে এখন যারা ওমরাহ্ তারা কোম্পানির ঘোর বিরোধী। উইলিয়াম গুরুতর অসুস্থ এবং আরোগ্যের জন্যে তার ছুটির প্রয়োজন। তার সহকারী স্টুয়ার্টের রোগমুক্তির সম্ভাবনা নেই। এ পরিস্থিতিতে দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎ আনন্দময় ছিল না।

হায়দারাবাদে নিজামের ফিরে আসার এক মাসের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলও যে, ফরাসিরা সাফল্যের সাথে ব্রিটিশদের শূন্য অবস্থানগুলো পূর্ণ করে নিচ্ছে। নিজাম বলেছেন যে, হায়দারাবাদে অবস্থানরত ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ান গুলোকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয় তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন এবং উইলিয়ামকে সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন কিছু যুক্তিসহ যে, তার প্রধান শত্রু মারাঠাদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে তারা যখন কোনো কাজেই লাগছে না, অতএব এত বিপুল ব্যয়ে তাদেরকে এখানে রাখার কোনো যুক্তিই নেই। ১৩ মে উইলিয়াম ও জেমস একসাথে গেলেন নিজামের সাথে সাক্ষাতের জন্য। তিনি জন শোরকে জানান, 'নিজাম যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা প্রধানত তার মধ্যে সৃষ্ট কিছু প্রশ্ন এবং ইউরোপে বিরাজমান অবস্থা পর্যালোচনার ভিত্তিতে...। পুরো পরিস্থিতি থেকে এটা উপলব্ধি করা সহজ যে, কিছু ফরাসি তাকে মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়ে তার মাঝে এ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, কোনোকিছুই তার জাতিকে রক্ষা করতে পারবে না।'

এর পরবর্তী চিঠিগুলোতে হায়দারাবাদের দরবারে ফরাসিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং রেমন্ডের বাহিনীর পক্ষ থেকে ব্রিটিশ স্বার্থের ওপর গুরুতর হুমকি সৃষ্টির উল্লেখ ছিল। নিজাম তখন তাকে দশ হাজার সৈনিকের বাহিনী গঠনের অধিকার দিয়েছেন।

নভেম্বর মাসে রেমন্ড নিজামের কনিষ্ঠ পুত্র আলী জাহের দ্বারা সংঘটিত বিদ্রোহ অত্যন্ত দ্রুত ও দক্ষতার সাথে দমন করেন। তার উদ্যান অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। উইলিয়াম বোম্বেতে তার বন্ধু জোনাথন ডানকানকে লিখেন—

> "মাত্র তিন বছর আগে রেমন্ড ছিল সম্পূর্ণ অখ্যাত এক ব্যক্তি। কিন্তু এখন সে কমপক্ষে দশ হাজার সুশৃংখল সেনাবাহিনীর প্রধান, যারা গোলা নিক্ষেপে ভালোভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত, সেই অফিসাররাও ফরাসি। আমর একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই লোকটি ব্রিটিশদের সম্পর্কে অত্যন্ত হীন চিন্তা করে, যা থেকে তুমি সহজেই ধারণা করতে পারো যে, সে আমার অস্বাচ্ছন্দের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

আলী জাহের এর বিদ্রোহ দমনের পুরস্কার হিসেবে নিজাম রেমন্ডকে পুরস্কৃত করেন তাকে দরবারের ওমরাহ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেন এবং 'আজদহার-ই-জং' ও 'মুতাহওয়ার-উল-মুলক' (যুদ্ধে অজগর ও রাজ্যের সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি) খেতাবে ভূষিত করে। তাকে হায়দারাবাদের একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ গোলকুণ্ডার কাছে বিশাল এলাকার জায়গির প্রদান করেন।

পরবর্তী বছর পরিস্থিতি মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে দাঁড়ায়। টিপু সুলতানের দ্বীপ দুর্গ শ্রীরঙ্গপতমে ফরাসি রিপাবলিকান অফিসাররা প্রজাতন্ত্রের আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে 'মহীশূর জ্যাকোবিন ক্লাব' গঠন করেছে মর্মে খবর শুনে ব্রিটিশ পক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এর মাধ্যমে তারা টিপু সুলতানের রাজধানীতে 'স্বাধীনতার একটি বৃক্ষ' রোপণ করবে। ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো যে টিপু সুলতান নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে যাচ্ছেন, যাকে তিনি তার দেশকে স্বাধীন করতে ও ব্রিটিশদের বহিষ্কার করতে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এমনকি প্যারিসে তার দূত প্রেরণ করেছেন সম্ভাব্য চুক্তির খসড়াসহ, যাতে তিনি ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে একটি মৈত্রীর প্রস্তাব দিয়েছেন।

একটি বিষয় স্পষ্ট যে, টিপুর সৈন্যদের প্রশিক্ষণদানকারী ফরাসি অফিসারদের সাথে রেমন্ডের যে শুধু নিয়মিত যোগযোগ ছিল তাই নয়। পণ্ডিচেরি ও মরিশাসে ফরাসী বিপ্লবী কমান্ডের সাথেও তার যোগাযোগ ছিল। ১৭৯৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর উইলিয়াম গভর্নর জেনারেল জন শোরকে সাংকেতিকভাবে লিখেন: 'ফরাসি শিবিরে নিয়োজিত তার গুপ্তচররা জানতে পেরেছে যে, রেমন্ড বিলম্বে হলেও ফরাসি ডাইরেক্টরি থেকে কমিশনপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এ খবরও জানা গেছে যে, টিপু সুলতান বিপুল পরিমাণ রসদ ম্যাঙ্গালোরে উদ্দেশে প্রেরণ করেছেন ফরাসিদের ব্যবহারের জন্যে, যা এখন প্রতিদিন বন্দরে পৌছবে বলে আশা করা হচ্ছে। খবরটি যদি মিথ্যাও হয়, ফরাসিদের আগ্রহ ও তাদের অবস্থান সম্পর্কিত ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।'

জন শোরও সাংকেতিভাবে উত্তর দেন যে, কোনোভাবে রেমন্ডের সুনাম ক্ষুন্ন করা এবং তাকে নিজামের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজনে পরিণত করা সম্ভব কি না। কিন্তু ইতোমধ্যে হয়তো কার্কপ্যাট্রিক ভ্রাতৃদ্বয় গোপনে এই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। কিন্তু উইলিয়াম উত্তর দেন যে, পরিকল্পনাটি তার কাছে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হয়। 'এতে তার কোনো সমস্যার চাইতে বরং আমার সুনাম ক্ষুন্ন হওয়ার বিপদ আছে।' তিনি পরামর্শ দেন, রেমন্ডের প্রভাব ক্ষুন্ন করার একটিই উপায় আছে। তা হচ্ছে, নিজামরে সঙ্গে একটি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা। যাতে মারাঠাদের কোনো মহলের

ক্ষেত্রে তাকে ব্রিটিশ সাহায্যের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকবে। তাহলেই হয়তো নিজাম নিজেকে যথেষ্ট নিরাপদ বিবেচনা করে ফরাসি রেজিমেন্টের নির্ভরতা হ্রাস করতে পারেন। আগের মতোই জন শোর সাংকেতিকভাবে এ ধরনের কোনো চুক্তির সম্ভাবনা যাচাই এর অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান।

এই পরিস্থিতির মাঝে স্বাস্থ্যগত কারণে উইলিয়াম পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তার রেসিডেন্ট পদ থেকে। ১৭৯৭ সালের গ্রীষ্মের প্রথম দিকেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, হায়দারাবাদে ব্রিটিশ অবস্থানের অনিশ্চিত অবস্থা সত্ত্বেও তিনি তার অসুস্থতার কারণেই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নন। কয়েক মাস ধরেই তিনি জন শোরকে জানিয়ে আসছেন যে, 'বাতজ্বর এবং পেটের পীড়ায় আমি মারাত্মকভাবে ভূগছি... আমার পক্ষে হয়তো আর বছরখানেক হায়দারাবাদে থাকা সম্ভব হবে। এখনও আমি প্রায়ই ব্যথায় এত কাতর হয়ে পড়ি যে, দীর্ঘদিন আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। বিশেষ করে অব্যাহত ঠান্ডায় আমার অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে পড়ে এবং আমার দু'হাতের অবস্থা এমন হয় যে, সে পরিস্থিতি মৃত ওজন ছাড়া আর কিছু নয়। এর ফলে শুধু যে মনের ওপর চাপ পড়ে তা নয়, শরীরের ওপর দিয়েও মারাত্মক ধকল যায়।'

১৭৯৬ সালের শেষ দিকে জন শোর তাকে উপকূলের দিকে যেখানে তার স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো হবে বলে মনে হয় সেখানে অবকাশ কাটানোর অনুমতি দেন। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক নভেম্বরে সুদর্শন কর্নেলকে লিখেন, 'আমি শুধুমাত্র ইউরোপে শান্তি ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছি, আর কোনো কিছুর নয়, যার ওপর বিশ্বের এই অংশে আমাদের সকল রাজনীতি নির্ভর করছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনে আমার শারীরিক অবস্থায় উন্নতি হয় কিনা দেখা যাক... কেপ অফ গুড হোপই হয়তো ভালো হবে আমার ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্যে।'

কিন্তু উইলিয়াম যে শুধ: শান্তির আশায় অপেক্ষা করছিলেন তা নয়। হায়দারাবাদ ত্যাগ করার আগে আরও একটি বিষয়ে জন শোরের সাথে স্থির করার ছিল তার! হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট হিসেবে তার ছোট ভাই জেমস কার্কপ্যাট্রিককে স্থলাভিষিক্ত করা। ১৭৯৫ সালের অক্টোবরে উইলিয়ামের সহকারী স্টুয়ার্টের মৃত্যুর পর থেকে জেমসই প্রকৃতপক্ষে উইলিয়ামের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল—হায়দারাবাদে আসার আগে সামান্য একজন লেফটেন্যান্ট থেকে রেসিডেন্টের সহকারী হওয়া বিরাট ব্যাপার, যিনি এখানকার অন্ধ্র প্রদেশ ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী উপজাতি এলাকার অজ্ঞাত এক গ্যারিসনে দায়িত্ব পালন করছিলেন তার জন্যে। কিন্তু জেমস হায়দারাবাদে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তার ভাষাগত দক্ষতার সাথে মোগল সংস্কৃতির প্রতি তার দুর্বলতা ও আকর্ষণ এক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল।

BanglaBook.org

জেমস খুব দ্রুত নিজামের সাথে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। নিজাম প্রথমে তার প্রতি মনোযোগী হন এবং পরে বিশ্বাস স্থাপন করেন। হায়দারাবাদে তার সফলতার পেছনে যে কারণটি কাজ করেছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, বহু বছর পর তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন নিজামের প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, নিজাম ও তার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তা নিজামকে বুঝতে দিয়ে এবং তাকে হাস্য কৌতুকের মধ্যে রেখে। জেমস এমনকি হায়দারাবাদের তীব্র শীতে নিজামকে উষ্ণতার আমেজ দিতে একটি বিশেষ লেপ তৈরির নির্দেশ দিয়ে প্রসঙ্গটি কলকাতায় পাঠানো চিঠিতে একথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, 'আপনি ধারণা করতে পারবেন না যে, এই উদ্যোগ তার কতটা মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল এবং আমি একথা বলতে পারি যে, এভাবেই আমি তার উষ্ণ হৃদয় জয় করেছিলাম।'

বহু দল ও মতে বিভক্ত এবং কৌশলগত অবস্থানে গোয়েন্দা তৎপরতার অপরিহার্যতার ক্ষেত্রেও জেমস নিজেকে সফল প্রমাণ করেছিলেন। হায়দারাবাদে জেমস তার প্রথম দুই বছরে গুপ্তচরদের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি দরবার, ফরাসি শিবিরের খবর পর্যন্ত পেতেন এবং তার গুপ্তচরদের মধ্যে মেথর থেকে শুরু করে নিজামের মহলে বিভিন্ন জ্যেষ্ঠা বেগমদের প্রহরী, রেমন্ডের কিছু অফিসার, এমনকি নিজামের সরকারি ইতিহাসবিদ ও শিল্পী তাজাল্লি আলী শাহও ছিলেন।

উইলিয়াম তার ছোট ভাইয়ের তৎপরতায় মুগ্ধ এবং কিছুটা বিস্মিতও হয়েছিলেন। তিনি জন শোরকে লিখেন, 'আমি সততার সাথে স্বীকার করছি যে, আমি অখ্যাত একজন লোক ছিলাম এবং আমি বিশ্বাস করি, সে নিজেও তাই ছিল তার মেধাও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও। তবুও যেহেতু কয়েকটি মাস কার্যভার তার ওপর ছেড়ে দেওয়ার সে সবকিছু গুছিয়ে নিতে পেরেছি।' হায়দারাবাদ রেসিডেন্সিতে একত্রে অবস্থানের কারণে দুই ভাইয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। উইলিয়াম জন শোরকে জানান যে, তার ভাইকে যদি রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে, কেপ অফ গুড হোপের আবহাওয়া যদি তার বিধ্বস্ত শরীর সারিয়ে তুলতে না পারে তাহলে সে তাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করবে এবং তিনি কোম্পানি থেকে পুরোপুরি অবসর গ্রহণ করবেন। 'তার ভ্রাতৃত্বের ভালোবাসার প্রতি আমার এতটা ভরসা আছে এবং আমার সন্তানদের প্রতিও স্নেহশীল। অতএব তার জীবন আমার চাইতেও সীমাহীনভাবে সেরা। সে যদি রেসিডেন্ট হিসেবে চাকরি লাভ করে তাহলে আমি নিজেকে অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করব।'

এ পরিস্থিতিতে জেমসকে ভারপ্রাপ্ত রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হলো, সেই দায়িত্বে নবীন হিসেবে, যাতে সে তার যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ

পায়—উইলিয়াম এরপর স্বাস্থ্যা পুররুদ্ধারের জন্যে কেপ অফ গুড হোপে চলে যান ১৭৯৭ এর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে। পরবর্তী জানুয়ারি মাসেও উইলিয়ামের স্বাস্থ্যের আশানুরূপ কোনো উন্নতি হয়নি। তখন তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো ইংল্যান্ডে থেকে ভারতে যাওয়ার পথে কেপ-এ যাত্রাবিরতিকারী সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির সাথে। পরিচয়টা হলো অ্যানি বার্নাডের বাসভবনে। দুজনের আলোচনা দ্রুত জমে উঠে, দুজনই ভারতে ফরাসিদের উপস্থিতিরি ঘোর বিরোধী এবং ভারতে ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপার একগুঁয়ে।

লর্ড ওয়েলেসসি উইলিয়ামকে তার সামরিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়ার পর উইলিয়াম কলকাতায় তার বন্ধু কর্নেল জন কলিন্সকে লিখেন, 'লর্ড ওয়েলেসলির সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে এখানে তার আসার পর থেকেই। আমি তার সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছি হায়দারাবাদের রাজনীতি সম্পর্কে....ভারতীয় বিষয়ে নতুন হয়েও তিনি বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত এবং অত্যন্ত আগ্রহী। সহজ আচরণের ব্যক্তি তিনি।' গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, উইলিয়াম লর্ড ওয়েলেসলিকে নিজামের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করার সুস্পষ্ট একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন, যা করতে জন শোর সবসময় অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

যথাসময়ে উইলিয়াম তার ভাই জেমস কার্কপ্যাট্রিককে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেন এবং তাতে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, নিজামের সাথে কীভাবে আলোচনার সুচনা করতে হবে। কয়েকদিন পর ওয়েলেসলি স্বয়ং জেমসকে লিখেন। ফরাসিদের ওপর একহাত নেওয়ার সুযোগ পাবেন বলে জেমস উত্তেজনা অনুভব করতে থাকেন এবং বিগলিতভাবে লর্ড ওয়েলেসলিকে লিখেন, 'নতুন গভর্নর জেনারেলের বিজ্ঞ ও উদার প্রস্তাব ও ব্যক্তিত্বসূলভ নির্দেশনার জন্যে।'

উইলিয়ামের কাছে জেমস আন্তরিক একটি উত্তর দেয়, 'আমার বলার প্রয়োজন নেই, প্রিয় ভাই বিল, আমি জানি আমার প্রতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির (লর্ড ওয়েলেসলি) দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। তুমি আমার হৃদয়ের কথা জানো এবং এ ব্যাপারে আমার অনুভূতি সম্পর্কে তুমি যথার্থ ধারণা করতে পারবে...।'

BanglaBook.org

# ৩

হায়দারাবাদে ব্রিটিশ রেসিডেন্সির প্রাচীরের ওপর দিয়ে জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক মুসি নদীর পানে তাকিয়ে দেখেন, বর্ষাকালে এ নদী হয়ে উঠে বিক্ষুব্ধ উত্তাল, আবার গ্রীষ্মে শান্ত, পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার মতো ক্ষীণধারা। নদীর তীর থেকে খানিক দূরেই গড়ে উঠেছে বিশাল শহর হায়দারাবাদ। সাত মাইল দীর্ঘ প্রাচীরের স্থানে স্থানে ফাঁকা স্থান এবং পর্যবেক্ষণ বুরুজ এবং দিগন্তে মনোরম শ্বেত মসজিদ ও প্রাসাদ, সৌধ ও সমাধি, গম্বুজ ও মিনার গ্রীষ্মের সূর্যালোকে উজ্জ্বল দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পরবর্তী একশো বছরে আংশিকভাবে হীরক ব্যবসার মুনাফার কারণে হায়দারাবাদ ভারতের সম্পদে সমৃদ্ধ শহরগুলোর অন্যতম ছিল। নিঃসন্দেহে মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে এটিই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর। সুলতান কুলি কুতুব শাহ ১৫৯১ সালে নতুন শহর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন যে শহর হবে বিশ্বে অতুলনীয় এবং স্বর্গের এক প্রতিকৃতি। ১৬৫০-এর দশকের শেষ দিকে যখন ফরাসি পর্যটক এমডি থেভেনো হায়দারাবাদ অতিক্রম করেন তখন তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে সুলতানের পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। তিনি লিখেন, 'বিশাল, পরিচ্ছন্ন, সুপরিকল্পিত নতুন নগরী হায়দারাবাদ জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ও উদ্যানে পরিপূর্ণ। মাইলের পর মাইল দীর্ঘ বাজারে বণিক, মহাজন, জুয়েলারদের গুঞ্জন এবং নগরী জুড়ে আছে অসংখ্য দক্ষ কারিগর।'

প্রাচীর ছাড়িয়ে যে দৃশ্য তাও সমভাবে মনোরম। সবদিকেই শহর ছাড়িয়ে যে বিশাল বিস্তার, সেগুলো জুড়ে আছে প্রাসাদ, উদ্যান এবং মনোরম প্রকৃতি। দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত গোলকুণ্ডা দুর্গ, যার পাদদেশে মহান কুতুব শাহী মাজার। ইউরোপীয় বণিকরা দলে দলে এখানে আসত বিপুল মুনাফা অর্জন করতে...এই রাজ্যকে বলা হত হীরকের দেশ। বণিকদের একজন ছিরেন ইংরেজ উইলিয়াম মেথওল্ড, যিনি মসলিপতমের সমুদ্রবন্দরে সুলতানের প্রতিনিধি ছিলেন। গোলকুণ্ডার তার প্রথম সময়কালে তিনি কেমন বিস্মিত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছেন—

> "এ শহরের বাতাসে মধুর সুবাস ছড়িয়ে আছে। পানি সহজে পাওয়া যায়, মাটি উর্বর, যা ভারতের সেরা বলে মনে করা হয়। রাজার প্রাসাদের কথা আর কি বলব, যার বিশালত্ব ও সৌন্দর্য, যারা ভারতে সফর করেছে তাদের কাছে মোগল এবং অন্যান্য রাজার প্রাসাদের চাইতেও ছাড়িয়ে

BanglaBook.org

> যায়।....পাথরের তৈরি প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগে, গরুত্বপূর্ণ স্থানে সোনার পাত বসানো, যেগুলো সাধারণত লোহা দিয়ে করা হয়। জানালার রড, বোল্ট বা এ ধরনের জিনিসগুলো এবং রাজা যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন, সেখানে সোনা ব্যবহার করেছেন। এই রাজা হাতির সংখ্যা ও অলংকারের পরিমাণের দিক থেকে ভারতের সবচেয়ে ধনী রাজা হিসেবে বিবেচিত। তিনি বিয়ে করেছেন বিজাপুরের রাজার কন্যাকে এবং এছাড়াও তার আরও তিনটি স্ত্রী এবং কমপক্ষে এক হাজার রক্ষিতা আছে। এখানে মার্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হচ্ছে বহুসংখ্যক মহিলা রাখা এবং অদ্ভুত একটি বিষয় হচ্ছে, আমাদের মহান রাজার তিনটি রাজ্য থাকা সত্ত্বেও যে একটি মাত্র স্ত্রী এটি তাদের দৃষ্টিতে শোচনীয় এক ব্যাপার... ।"

মোগল দিল্লি এবং গোলকুণ্ডার মধ্যে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতের পর সম্রাট আওরঙ্গজেব এব পর্যায়ে ১৬৮৭ সালে হায়দারাবাদ দখল করে ধ্বংসযজ্ঞ চালান। শিয়া মসজিদ ও আশুরা খানাগুলোকে সেনাবাহিনীর ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করেন শহরের শিয়া স্থাপনাগুলোর প্রতি তার চরম ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার প্রকাশ হিসেবে। এরপর হায়দারাবাদ সাময়িক সময়ের জন্যে হলেও ম্লান হয়ে যায়। সে আমলে সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল নতুন মোগল শহর আওরঙ্গাবাদের ওপর এবং আশি বছর ধরে হায়দারাবাদের ওপর বিরাজ করেছিল সাবেক গৌরব ও ঐশ্বর্যের ছায়া, নগরীর প্রাসাদ ও বিশাল বাড়িগুলো হয়ে গিয়েছিল জনশূন্য, পরিত্যক্ত। ১৭৬২ সালে নিজাম আলী খান দায়িত্ব গ্রহণের পর হায়দারাবাদকে আবার সেই অঞ্চলের রাজধানীতে পরিণত করা হয় এবং নতুন রাজ্য গোলকুণ্ডার কুতুব শাহী সালতানাতের রাজ্যের চাইতে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের অনেক বেশি ভূখণ্ড জুড়ে ছিল।

সে সময়ে মাঝেমধ্যেই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সত্তেও হায়দারাবাদে শিগ্‌গির তার সাবেক ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক ফিরে আসে। কুতুব শাহী আমলের প্রাসাদ ও সরকারি ভবনগুলো সংস্কার করা হয়। মসজিদগুলো পুনঃনির্মিত হয়, উদ্যানগুলোকে নতুন বৃক্ষরাজিতে সাজানো হয় এবং নগর প্রাচীরকে আরও শক্তিশালী করা হয়। ১৭৯০-এর দশকের মধ্যে আড়াই লাখ জনসংখ্যা অধ্যুসিত হায়দারাবাদ আবার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র এবং দাক্ষিণাত্য ইন্দো-মুসলিম সভ্যতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রে পরিণত হয়। যা ছিল চতুর্দশ শতকে এই অঞ্চলে প্রথম মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার পর সর্বশেষ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার স্থান।

হায়দারাবাদের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল চারমিনার। চারটি খিলানশোভিত বিশাল এক ফটক, যার ওপরে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজসহ চারটি মিনার। দুটি প্রধান বাজার এসে মিশেছে এখানে এবং গোলকুণ্ডা দুর্গ থেকে যে রাস্তাটি এসেছে সেটির সাথে মিলিত হয়েছে

মসলিপতম থেকে আগত রাস্তাটি। একজন পর্যটক লিখেছেন, 'এখানে সব ধরনের ঔষুধ, সকল প্রকার মসলা, বই, কাগজ, কালি, কলম, সুতি ও রেশমি বস্ত্র, সব রঙের সুতা, তরবারি, তীর ও ধনুক, তূণ, ছুরি, কাঁচি, চামচম কাঁটাচামচ গ্লাস ছোটবড় সূচ, আসল ও নকল পাথর...সংক্ষেপে কেউ যা চায় সই পাওয়া যায়।'

এখানে মধ্যপ্রাচ্যের সকল অঞ্চল থেকে, এমনকি ফ্রান্স হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, চীন থেকে ব্যবসায়ীরা আসে মসলার বাজার থেকে মসলার কিনতে, যেখানে লবঙ্গ, গোলমরিচ, আদা, দারুচিনি স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, বস্তায় পর বস্তায় নানা সামগ্রী, সুগন্ধি চন্দন কাঠ এবং উজ্জ্বল কমলা রঙের হলুদের পসরা উন্মুক্ত। অনেক ব্যবসায়ী হায়দারাবাদে আসে রৌপ্য ও তামা কিনতে, দামেশকের বিখ্যাত ক্ষুরধার তরবারি, সোনার চমৎকার গহনা ও দাবার ছক কিনতে।

রাস্তায় দীর্ঘ আলখেল্লা পরিহিত পারসিক ও আরবীয় ব্যবসায়ীদের ভিড়ের মাঝে দেখা যায় দিল্লি ও লক্ষ্মৌ থেকে আগত পাগড়ি পরিহিত মোগলদের, গোয়া থেকে আসে পর্তুগিজ অশ্ব ব্যবসায়ী এবং মসলিতপম থেকে ওলন্দজ জুলেলাররা। একসাথে তারা বাজারে ঘুরাফেরা করে। নগরীর বিখ্যাত সব খাবার দোকানে ভিড় করে বিভিন্ন স্বাদের খাবার উপভোগ করতে, অথবা সুগন্ধির দোকানে দীর্ঘ সময় কাটায়, যেখানে বিভিন্ন মৌসুমে ব্যবহার করার মতো উপযুক্ত সুগন্ধি পাওয়া যায়। তাপ ও আর্দ্রতার মাত্রা অনুযায়ী সুগন্ধির উপাদান পরিবর্তণ করা হয়।

এসব দোকানের সারির পরই সোনা ও রুপার ব্যবসায়ীদের দোকান, যা বাজারের সকল অংশের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। হীরার দোকানও আছে এখানে। প্রাচীনকাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত গোলকুণ্ডার বিখ্যাত হীরক খনিগুলোই ছিল বিশ্বে হীরক সরবরাহের একমাত্র উৎস। এখনও তা নিঃশেষ হয়ে যায়নি এবং এই খনিগুলোর কোনোটি থেকেই কাহিনিতুল্য 'কোহিনূর', 'হোপ' এবং 'পিট' হীরক উৎপাদিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ১৭৮৫ সালে নিজাম আলী খান ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জকে কূটনৈতিক উপহার হিসেবে ১০১ ক্যারেটের হেস্টিংস হীরক পাঠিয়েছিলেন, যা সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেই আকৃতির হীরক বরাবর দুর্লভ, এমনকি হায়দারাবাদেও। কিন্তু কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে হীরকের কারখানা ও দোকানগুলো কিছুতেই সম্পদের একেবারে ছোটভাণ্ডার নয়। কবুতরের রক্তের মতো লাল টকটকে রুবি এবং গুইসাপের গায়ে বিক্ষিপ্ত উজ্জ্বল সবুজ রঙের মতো এমারেল্ড চমৎকারভাবে বসানো হয়েছে তরবারি ও ছুরিকায়, কোরআনের পাণ্ডুলিপিতে এবং সেই কোরআন বাঁধাই করা হয়েছে সোনার হরফে লিখা ছাপাসহ। এছাড়াও পাওয়া যায় অলংকৃত চামর ও বাজুবন্দ, যা নয় ধরনের

BanglaBook.org

সৌভাগ্যের পাথর দিয়ে তৈরি এবং তাতে হলুদ বর্ণের পোখরাজমণি ও বিড়ালের চোখ সদৃশ বৈদূর্যমণি থাকে।

প্রাসাদের বিস্তৃত সারি সুরু গলির পাশ ঘেঁষে চলে গেছে মোগলপুরা, শাহগঞ্জ ও ইরানি গলিতে। কিছু সুদৃশ্য প্রাসাদও রাস্তার দিক থেকে সাদামাটা। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলেই কারুকাজের জাঁকজমকে সমৃদ্ধির ঘোষণা দেবে। কোনো কোনো প্রাসাদ সুবিশাল। এক হতবিহ্বল ব্রিটিশ পর্যটকের মতো, কিছু প্রাসাদ বার্লিংটন হাউজের চাইতে তিনগুণ দীর্ঘ এবং প্রাসাদের আঙিনা ছাড়িয়ে উদ্যানের বিস্তার। রাস্তার ভিড় অতিক্রম করে উদ্যানে প্রবশে করলেই শীতল ও শান্ত পরিবশে। উদ্যানের প্রবেশ পথ থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত পথ জলধারা শোভিত এবং মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরে নির্মিত ফোয়ারা। উদ্যানে আমগাছ, খেজুর বীথি, নারিকেল ও ডুমুর গাছ, কলা, কমলা এবং অন্যান্য ফল বৃক্ষ...এছাড়া বৃত্তাকার পানির আধার ও তার চারপাশ ঘিরে সুগন্ধি ছড়ানো ফুলের বাগান।

ভারতের যেখানে ধনী লোকদের বসবাস, সেখানে সবসময় প্রচুর দরিদ্র মানুষও থাকে। হায়দারাবাদের প্রাসাদ ও মসজিদের অনুপম স্থাপত্য জাঁকজমকপূর্ণ বহিরাবরণের প্রমাণ হলেও এরই আড়ালে লুকানো আছে চৌর্যবৃত্তি, অসুস্থতা, ক্ষুধা ও ব্যথা বেদনা। বহু বছর আগে উইলিয়াম স্টুয়ার্ট এই শহরে উপনীত হওয়ার পর সীমাহীন সমৃদ্ধি ও চরম দারিদ্র দেখে হতবাক হয়েছিলেন। নিজামের রাজ্যে এ পরিস্থিতি পর্যটকরা লক্ষ করেছেন বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। স্টুয়ার্ট ১৭৯০ সালে লিখেছিলেন: 'সম্ভবত, এই দরবারে জাঁকজমক ও দুর্দশা ভারতের অন্য যে কোনো স্থানের চাইতে অধিক বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত। আমার আগে যিনি ছিলেন তার কাছে আমি নিজামের শানশওকত সম্পর্কে শুনে ধারণা করেছি যে, তার আস্তাবলে চারশো হাতি আছে, কয়েক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, যাদের প্রত্যেকের বেতন একশো রুপির বেশি, যারা ভালো অশ্বরোহী ও মাহুত। অন্যান্য ওমরাহরাও জাঁকমজমকের অধিকারী। কিন্তু আমি দেখলাম, সরদার বা প্রধানরা ছাড়া বাদবাকি সবাই দুর্দশাগ্রস্ত ও করুণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত। খাদ্যশস্য এক রুপিতে পনেরো সেরের চাইতে সস্তা নয় এবং আমি এখানে পৌছার পর এক রুপিতে কখনোই বারো সেরের অধিক পাওয়া যায়নি। দরিদ্ররা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে।'

বিশাল বাজারের পেছনেই নোংরা রাস্তা ও অপরিচ্ছিন্ন গলি, যেখানে ইঁদুরের আস্তানা, পকেটমার ও নিচু স্তরের বেশ্যাদের ভিড়। শাহী আস্তাবলের দিক যে রাস্তা সেটি পরিচিত 'মুতরি গলি' অর্থা' প্রস্রাবের রাস্তা হিসেবে এবং যে রাস্তাটি প্রাসাদের প্রধান ফটক থেকে এগিয়ে গেছে সেটি শুধুমাত্র ঘোড়া ও গাড়ি চলার উপযোগী। এই রাস্তার পাশে বসে আছে ভিক্ষুক, কুষ্ঠরোগী, ঘোড়া, চলতে অক্ষম ও অন্ধ লোকজন। অক্ষম সিপাহী পরিণত হয়েছে ভূমিহীন

কৃষকে, মানসিক রোগগ্রস্ততরা সুফিদের দরগাহ থেকে বের হয়ে এসেছে কোনো উপকার না পেয়ে। প্রাসাদ থেকে মক্কা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে তারা সারিবদ্ধভাবে বসে থাকে, ভিক্ষার জন্যে চিৎকার করে এবং অতিক্রমকারী পালকির দিকে তাদের ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত প্রসারিত করে। তাদের ভাগ্য ভালো পালকি থেকে নিক্ষিপ্ত হয় কিছু রৌপ্য মুদ্রা।

এসব লোক এবং অন্যান্য হায়দারাবাদি লোকদের জন্যে উৎসব আয়োজিত হয়। চারমিনারের এক দিকে আছে 'ময়দান-ই-দিলখুশা।' ঈদ এবং মহানবীর জন্ম ও মৃত্যুদিবস 'মিলাদুন্নবী' উপলক্ষে ময়দান পরিস্কার করে ভিস্তিওয়ালারা পানি ছিটিয়ে তপ্ত মাটি শীতল করে। এরপর টানানো হয় শামিয়ানা এবং পুরো শহরবাসীর মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আতশবাজির ব্যাপক আয়োজন করা হয়।

কাছেই শহরের বিখ্যাত 'দারুল শিফা' অর্থাৎ চিকিৎসা কেন্দ্র। চারশো শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল চালু করা হয়েছে, যেখানে রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয় এবং এটি ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার বিখ্যাত এক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এর পাশেই বিশাল এক উদ্যান 'বাগ-ই- মোহাম্মদ শাহী,' যেখানে ভেষজ ও সুগন্ধি গাছ রোপন করা হয়েছে এবং ফুলগাছও আছে যার সুবাস রোগীর রোগ নিরাময়ে সহায়ক বলে বিশ্বাস করা হয়।

এর বাইরেও অন্য রকম গন্ধ আছে এবং ভিন্নতর উদ্যান। বাজারে যে মসলা বিক্রি হয় তার কড়া ঝাঁঝ এবং 'মুতরি গলি' থেকে ভেসে আসা প্রস্রাবের কুটু গন্ধ। কাছাকাছি রাস্তার পাশের স্টল থেকে সকল দুর্গন্ধকে ছড়িয়ে আসে কাবাবের সুবাস এবং আরেকটি গন্ধ যা হায়দারাবাদের বিশেষত্ব বলে খ্যাত, হালকা আঁচে রান্না করা বিরিয়ানির গন্ধ। একজন দেশপ্রেমিক দিল্লিবাসীও মুহূর্তের জন্য তার মোগল রাজধানী ঐশ্বর্য ভুলে স্বীকার করেন, 'সত্য বলতে কি, হায়দারাবাদের চাইতে ভালো খাবার ভারতের আর কোথায়ও পাকানো হয় না।'

রেমন্ডের ফরাসি অফিসারদের একজনের কাছে খাবারের এই গন্ধ ছিল অপ্রতিরোধ্য। তিনি লিখেছেন: 'নানরুটি, হাঁসের কলিজা এবং কচি হাঁসের গোশত দিয়ে পাকানো ভুনা ছাড়াও সবচেয়ে উপাদেয় হচ্ছে ঘি-এর সাথে হাঁসের গোশত ও সব ধরনের মসলা মিশিয়ে সিদ্ধ করা চাল, যা আমরা তৃপ্তির সাথে খেতাম।'

কেপ অফ গুড হোপে লর্ড ওয়েলেসলির সঙ্গে আলোচনার সময়ে জেমসের ভাই উইলিয়াম হায়দারাবাদে অ্যাংলো-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে সেখানে বিরাজিত পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেন, যেখানে ফরাসি বিপ্লবীদের ত্রিরঙা পতাকার ক্রমবর্ধমান তরঙ্গের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে ইউনিয়ন জ্যাক পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কিছুটা ভিন্ন ছিল।

BanglaBook.org

বিভিন্ন উৎসের তথ্য থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ১৭৯০-এর দশকের শেষদিকে জেনারেল রেমন্ডের অধীনস্থ ফরাসি অফিসাররা এবং হায়দারাবাদে মোতায়েন তাদের ব্রিটিশ প্রতিপক্ষ ও ব্রিটিশ রেসিডেন্সির কর্মকর্তা কর্মচারীরা সকলে কমবেশি সকলেই হায়দারাবাদের পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছিল। অনেকে হায়দারাবাদি ধরনে জীবনযাপনও করছিল।

১৭৯৭ সালে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক যখন হায়দারাবাদ ত্যাগ করেন, তখন তার ভাই জেমস হায়দারাবাদের পোশাক পরতে শুরু করেছিলেন, যাকে আর্থার ওয়েলেসলি বর্ণনা করেছেন, 'সুন্দর বস্ত্রে তৈরি একজন মুসলমানের পোশাক' বলে। শুধুমাত্র ব্রিটিশ সামরিক অফিসারদের অভ্যর্থনা জানাতে অথবা নিজামের দরবারে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে যখন ব্রিটিশ রেসিডেন্টের জন্যে ইংলিশম্যানের পোশাকে উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা থাকত—এর বাইরে তিনি সমসময় হায়দারাবাদি পোশাকই পরতেন। তিনি হুক্কায় ধূমপান করতেন, 'ভারতীয় স্টাইলে গোঁফ রেখেছিলেন এবং খাটো করে চুল ছাঁটতেন ও নখে মেহেদি লাগাতেন' বলে বিস্মিত এক দর্শনার্থী তার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া জেমস খাবার গ্রহণ শেষে প্রাচ্য দেশীয়দের মতো ঢেকুর তোলার অভ্যাসও রপ্ত করেছিলেন, যা কখনো কখনো রেসিডেন্সিতে আগত দর্শনার্থীদের চমকে দিত। 'এছাড়া অন্যসব কাজে শব্দ তোলার প্রবণতাও সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে'। সম্ভবত গলা পরিষ্কার করা বা নাক পরিষ্কার করতে ভারতীয়দের সশব্দ কসরতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি অনুসরণ করতেন উৎসাহের সাথে। সমসাময়িক হায়দারাবাদি ইতিহাসবিদ গোলাম ইমাম খান তার 'তারিখ-ই-খুরশীদ জাহি'তে উল্লেখ করেছেন—

> "আমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, রেসিডেন্ট জেমস কার্কপ্যাট্রিকের এ দেশের প্রতি বিরাট ভালোবাসা ছিল এবং বিশেষ করে হায়দারাবাদের লোকজনের জন্যে। তিনি প্রধান উজিরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নিজামের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন, যিনি তাকে সম্বোধন করতেন 'প্রিয় পুত্র' বলে। বলা হয়ে থাকে যে, অন্যান্য অনেক ইংরেজ যারা অহংকারী এবং খুঁতখুঁতে স্বভাবের তাদের বিপরীতে কার্কপ্যাট্রিক অত্যন্ত আন্তরিক ও বন্ধুসুলভ ব্যক্তি। তার সাথে যে কেউ সামান্য সময় কাটিয়েছে তার মধুর ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়েছে। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি অন্যকে বুঝার সুযোগ দেন যে, তিনি তাকে বহু বছর যাবৎ চিনেন এবং তাকে পুরনো বন্ধু ও পরিচিত হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি এই অঞ্চলের ভাষা অনর্গল বলতে পারেন এবং দাক্ষিণাত্যের বহু নীতিপ্রথা অনুসরণ করেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি হায়দারাবাদের মহিলাদের সঙ্গে এত সময় কাটিয়েছেন যে, তিনি এই মহলের জীবন পদ্ধতি ও আচরণের সাথে অত্যন্ত পরিচিত এবং এ শহরকে

BanglaBook.org

> তিনি নিজের বলেই গ্রহণ করেছেন। সেই মহিলাদেরকেও ধন্যবাদ, যাদের সাহচর্যে তিনি সবসময় আনন্দিত থাকতেন।"

মুসি নদীর অপর তীরে ফরাসি সেনানিবাসেও একই ধরনের অবস্থা বিরাজ করছিল। জেনারেল রেমন্ড তার সিপাহীদের দ্বারা মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন শুরু করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। যদিও অনেকে তাকে হিন্দু বলে গ্রহণ করেছিল। তার সহকারী জীন পিয়েরে পীরনও মুসলিম হতে চাইছিলেন বলে জানা যায়, যদিও তিনি মুসলিম হয়েছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। ফরাসি বাহিনীর চিকিৎসক ক্যাপ্টেন বার্নার্ড ফ্যান্টম আয়ুর্বেদী ও ইউনানী শাস্ত্রে বিশেষত্ব অর্জন করেছিলেন। তার সাতটি ভারতীয় বিবি ছিল, যাদের মধ্যে প্রথম বিবি ছিলেন মোগল শাহজাদা ফিরোজ শাহের কন্যা। দরবারে ফ্যান্টমকে বলা হত ফুলুটান সাহেব বলে—তার বিজ্ঞতার কারণেই এই নাম দেওয়া হয়। ফারসি শব্দ 'ফুলুটান'-এর অর্থ প্লেটো। পরবর্তীতে তিনি মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহের অধীনে চিকিৎসকের চাকরি নেন। তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি বংশ রেখে যান, যিনি উর্দু ও ফারসি সাহিত্যে খ্যাতনামা কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে জার্গিস শায়েক ও সুফি উল্লেখযোগ্য এবং অধিকাংশ ফরাসি এবং বহু ব্রিটিশ হায়দারাবাদি মহিলাদের বিয়ে করেছিলেন অথবা তাদের সাথে বসবাস করতেন। যার ফলে সেসব মহিলার বড় পরিবার সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের শিকড় হায়দারাবাদেই। দুটি সরকারি বিবরণীতে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক এই চিত্র প্রেরণ করেছিলেন যে, দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন ইউরোপীয় শিবিরগুলোতে বসবাসকারীরা ধীরে ধীরে তাদের পরিপার্শ্বস্থ পরিবেশের সাথে মিশে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে মোগল ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ বিশেষভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। ১৮০১ সালের একজন দর্শনার্থী লিখেন, 'মেজর কার্কপ্যাট্রিকের জায়গাটি আংশিক ব্রিটিশ রুচির এবং খানিকটা হিন্দুস্থানের রুচি সম্বলিত। হিন্দুস্থানি অংশ পুরনো প্রমোদ উদ্যানে, যেখানে রেসিডেন্সি নির্মিত হয়েছে। এর কেন্দ্রস্থলে মোগল স্টাইলে নির্মিত বিশাল 'বরাদরি' বা প্যাভিলিয়ন, যা ব্রিটিশরা রূপান্তরিত করেছে ডাইনিং হল ও চিত্তবিনোদনের স্থানে। কাছেই মোগলের মতোই মহল বা থাকার জায়গা, যেখান থেকে বাইরেই পুরনো সাইপ্রেস গাছের দুই সারির মাঝ দিয়ে রাস্তা। এই প্রান্ত দিয়ে বিভিন্ন জলাধার, ফোয়ারা এবং ফুলের কেয়ারি। প্রমোদ উদ্যানের এসব অংশই টিকে আছে।'

ষোড়শ শতাব্দীতে হায়দারাবাদের প্রতিষ্ঠাতা কুতুব শাহী সুলতানদের শানামলে মুসি নদীর তীর জুড়ে মোগল স্টাইলের সুবিশাল জাঁকজমকপূর্ণ উদ্যানে সজ্জিত ছিল। উদ্যানে দেশিয় অট্টালিকা এবং স্থানে স্থানে ছত্রী।

ধ্বংসপ্রায় এই উদ্যান সারি উত্তর দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উদ্ভূত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অনেকগুলো উদ্যানের জায়গা দখল করে নিয়েছে গ্রামবাসীরা এবং ধানক্ষেতে পরিণত করেছে। পুরো এলাকা জুড়ে ছিল তানা শাহের প্রমোদ উদ্যান। এডওয়ার্ড স্ট্রাচে লিখেছেন—

> "রেসিডেন্সির কাছেই, এক মাইল দূরত্বের মধ্যে প্রাসাদ ও উদ্যানের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত, যেগুলো সাবেক আমলে জাঁকজমকে পূর্ণ ছিল। এটি এখন পরিচিত তানি শাহের বাগান হিসেবে। তানি শাহ ছিলেন কুতুব শাহের রাজবংশের সর্বশেষ শাসক। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি শিকার শেষ করে এখানে তার তাঁবু স্থাপন করতেন, ঘুমাতেন এবং একদিন স্বপ্নে তিনি সুন্দর একটি প্রাসাদ, উদ্যান, ফোয়ারা ও জলাধার দেখতে পান। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি নির্দেশ দেন যে, তার স্বপ্নে দেখা উদ্যানের অনুরূপ উদ্যান নির্মাণের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে।"

কুতুব শাহী উদ্যানের ধ্বংসাবশেষ যদি ব্রিটিশ রেসিডেন্সির হিন্দুস্থানি অংশের মতো হয়—যা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো নতুন ও পুরনো ধাপে মিশ্রিত বাংলো, আস্তাবল তাহলেও সেই আমলের ছাপ কিছুটা পাওয়া যায়। এই অট্টালিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটি তা দ্বিতল এবং রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ব্যবহার জন্যে নির্ধারিত। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন খার্দলা অভিযানের সময় তার অনুপস্থিতিকালে। ফলে তত্ত্বাবধান করার মতো কেউ ছিল না। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এবং অতি অল্প ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়। মাত্র চার বছর পরই অট্টালিকাটি প্রায় ধ্বংসের মুখে উপনীত হয়। এক বছরের মধ্যে জেমস উইলিয়ামকে লিখেন অট্টালিকাটি সংস্কারের জন্যে তহবিল চেয়ে—

> "রেসিডেন্সিতে তোমার নির্মিত দ্বিতল ভবনটির দ্বিতীয় তলা বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। সব জায়গায় ফাটল ও ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে এটি ধসে নিচের তলায় পতিত না হয় তা রোধ করার জন্যে এবং নিচের তলাও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত তা সংস্কার করার উদ্যাগ নিয়েছি। গত দুই-তিন মাস বর্ষায় ভবনটি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি বাসযোগ্য রাখার যে সাময়িক ব্যবস্থা নিয়েছি তা স্থায়ী নয়, উপযুক্তও নয়। আশা করি তুমিও চাইবে না যে আমার বাস করার স্থান আরামদায়ক না হোক। আমার অনুমিত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করে এর অবসান ঘটানো হোক।"

যদিও রেসিডেন্সি স্টাফদের জন্যে তৈরি বাংলোগুলো পাশ্চাত্যের ধাঁচে, তবুও সেসবের মধ্যে প্রাচ্যদেশীয় একটি বৈশিষ্ট্য লর্ড ওয়েলেসলিকে অথবা লন্ডনে তার নিয়োগকর্তাদের বিস্মিত করে থাকবে। তা হলো প্রতিটি বাংলোর সঙ্গে

BanglaBook.org

ভারতীয় স্ত্রী ও রক্ষিতাদের জন্যে পৃথক জেনানা মহল। জেমস তার এক বন্ধুর কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, পরিপূর্ণ একটি জেনানা মহলের চাইতে এগুলো অত্যন্ত ছোট। কারণ জেনানা মহল শুধু স্ত্রী বা রক্ষিতাদের জন্যেই নয়, খোজা, পরিচারিকা ও আয়াদের সংস্থানের জায়গা সম্বলিত হওয়া আবশ্যক। কার্কপ্যাট্রিকর এক ইংরেজ দর্শনার্থীকে কমপক্ষে এক ডজন মহিলার সাথে অবস্থান করতে হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কজন 'বিবি' এবং কজন বিবিদের পরিচারিকা তা অস্পষ্ট।

এসব বিবি ভারতীয় সামাজিক অবস্থানের বিভিন্ন পর্যায় থেকে এসেছে এবং রেসিডেন্সি স্টাফদের সাথে তাদের সম্পর্কেও সেভাবে গড়ে উঠেছে। বিবি সংগ্রহের একোবারে প্রাথমিক পর্যায় ছিল বাজারের সাধারণ বেশ্যাদের মধ্য থেকে নির্বাচন। অথবা শহরের বিখ্যাত দরবারিদের মাধ্যমে। ১৮০১ সালের আগস্টে পুনায় যাওয়ার পথে হয়াদারাবাদ রেসিডেন্সিতে যাত্রা বিরতি করেন ব্রিটিশ পর্যটক মাউন্ট স্টুয়াট এলফিনস্টোন। তিনি তার ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন, 'যে বেশ্যাকে আমি রাখতে যাচ্ছিলাম, তার আসার কথা ছিল, কিন্তু সে আসেনি।'

হায়দারাবাদে অন্য ব্রিটিশ অফিসার ও সৈন্যরা ভারতীয় সামাজের উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে একক সম্পর্ক রাখতেই অধিক আগ্রহী ছিল।। হায়দারাবাদের ব্রিটিশ কমান্ডার লে. কর্নেল জেমস ডালরিম্পেল বিয়ে করেছিলেন মসলিপতমের নওয়াবের কন্যা মোতি বেগমকে। এই বিয়েকে বিবেচনা করা হয় সমপর্যায়ের এবং সমমর্যাদার বিয়ে এবং তারা তাদের পাঁচ সন্তানকে লেখাপড়া ও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বিভক্ত করতে সম্মত হয়েছিলেন। যার ফলে ছেলেদেরকে খ্রিস্টান হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্যে পাঠানো হয় মাদ্রাজ এবং এক পর্যায়ে তাদেরকে স্কটল্যান্ডের ইস্ট লোথিয়ানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের একমাত্র কন্যা নূর জাহ বেগম হায়দারাবাদে মুসলিম হিসেবে বেড়ে ওঠেন এবং ভারতেই রয়ে যান। এক পর্যায়ে তার বিয়ে হয় তার পিতার সিপাহী সাদুবেগ নামে এক কুবলাই হাবিলদারের সঙ্গে।

একইভাবে উইলিয়াম লিনেয়াস গার্ডনার, যিনি ১৭৯৮ সালে নিজামের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি ক্যাম্বের নওয়াবের কন্যা বেগম শাহ মনজিল-উল-নিসাকে বিয়ে করেন। গার্ডনার সম্ভবত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাকে বিয়ে করার জন্যে। তার এক বছর আগে সুরাটে দুজনের মদ্যে সাক্ষাৎ হয়, যখন চৌদ্দ বছর বয়স্কা মনজিল তাদর প্রাসাদে এক অভ্যুত্থানের কারণে মায়ের সঙ্গে পালাচ্ছিল। একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্যে যখন আলোচনা চলছিল, তার ফাঁকে গার্ডনার হয়তো নওয়াবের কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকবেন। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন—

"আলোচনা চলাকালে আলতোভাবে যখন পর্দা উঠানো হয়, তখন আমি যা দেখলাম তাতে মনে হলো, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কালো চোখ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে চুক্তি নিয়ে কিছু ভাবা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। ওই সুন্দর উজ্জ্বল চোখ আমাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল। আমি পুলক অনুভব করলাম যে, এই সুন্দর সৃষ্টি তার গভীর কালো প্রেমময় চোখ নিশ্চয়ই আমার ওপর নিবদ্ধ রেখেছে...। পরবর্তী দরবারে আমার উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা আবার চরমে পৌঁছলো সেই চোখ দেখে। সে চোখ রাতের বেলায় স্বপ্নে এবং দিনে আমার কল্পনা জুড়ে থাকত। আবার পর্দা উঠলো আলতোভাবে, আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

আমি সেই শাহজাদিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম। তার আত্মীয়রা প্রথমে হতবাক হলো এবং আমার প্রস্তাব নাকচ করে দিল...। এরপর বিস্তারিত আলোচনার পর শাহজাদির হাত আমার হাতে দেবার সিদ্ধান্ত হলো। বিয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকলো। আমি বললাম, 'মনে রেখ, আমাকে বঞ্চিত করার উদ্যোগ নিষ্ফল হবে। আমি ওই চোখ আবার দেখবো এবং আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।'

বিয়ের দিন, আমি কনের মুখের ওপর থেকে পর্দা উঠলাম এবং আমাদের মাঝখানে যে আয়না স্থাপন করা হয়েছিল তাতে তার চোখের প্রতিফলন আমাকে মাতাল করে দিল। আমি হাসলাম, তরুণী শাহজাদি হাসলো।"

তাদের বিয়ে ছিল সুখের এবং দীর্ঘস্থায়ী। বহুবছর পর আগ্রার কাছে খাসগঞ্জে তার স্ত্রীর প্রাসাদে বাস করছিল এই আংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারটি। সেখানে তার পুত্র জেমস বিয়ে করে মোগল সম্রাটের এক ভাগ্নিকে। গার্ডনার লিখেছিলেন তার জ্ঞাতি ভাই এডওয়ার্ডকে—

"খাসগঞ্জে আমরা অত্যন্ত সুখে কাটাচ্ছিলাম। আমি পড়তে ভালোবাসতাম এবং আমার বাগানের পরিচর্যা করতাম। বেগম এবং আমি আমাদের ২২ বছরের দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতায় পরস্পরের চেতনার সাথে পরিচিত ছিলাম, শান্তি ও পরিতৃপ্ত ছিল আমাদের মাঝে। ...পুরুষের একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। আমার বয়স যত বাড়ছিল, আমার এই বোধও বাড়ছিল। বার্ধক্যে কোনোকিছুকে ভালোবাসার মতো, সেবা পাওয়ার মতো কিছু না থাকলে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। ছোট শিশুকে বাড়ি পূর্ণ এবং তাদের সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তের চিন্তা, তাদের নীল চোখ, উজ্জ্বল চুল আমাকে খানিকটা উৎকণ্ঠিত করে তোলে যে, আমি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারব কিনা।"

তিনি সে চিঠিতে আরও যোগ করেন যে, 'খুব কমসংখ্যক পুরুষই পারিবারিক তৃপ্তি সম্পর্কে নিজেকে অভিনন্দিত করে।' আট বছর পর তিনি রসিকতা করে

BanglaBook.org

লিখেন, 'আমার ত্রিশ বছরের বৈবাহিক জীবন এবং এর মাঝে আরেকটি বিয়ে না করার বিষয়টি মুসলমানদের বিস্মিত করে এবং সব মহিলা আমার দিকে ভিন্নভাবে তাকায়। তারা তিন বা চারজন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পছন্দ করে না, যদিও পুরুষেরা এই রীতিতে সন্তুষ্ট।'

যদি এমন হত যে, হায়দারাবাদে সুন্দরী মুসলিম বেগমদের ঘাটতি আছে, তাহলে তাদের ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের জন্যে হয় বেগম সংগ্রহে ঘাটতি পড়ত এবং তারদেকে ভিন্নতর চিন্তা করতে হত। হায়দারাবাদ তখনো ফ্যাশন দুরস্ত অথবা সামাজিক ভাবে উচ্চাভিলাষী ইউরোপীয় মহিলাদের উপযোগী জায়গা হয়ে উঠেনি। কলকাতা, মাদ্রাজ বা বোম্বের মতো হায়দারাবাদে বহুসংখ্যক চিত্রশিল্পী ছিল না, নাচ বা অশ্বচালনা শিক্ষা দেওয়ার শিক্ষক ছিল না, বল ড্যান্স, কনসার্ট, মুখোশ নৃত্য কোনোকিছুই ছিল না। একঘেঁয়েমি ও একাকিত্ব অবসাদ এনে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট অথবা এনে দেয় এক ধরনের তিক্ততা, রুডইয়াড কিপলিং যা তুলে ধরছেন একশো বছর পর তার মিসেস হকসবীস ও মিসেস রিভার্স চরিত্র। 'বিশ্বের জাতিগুলোর মধ্যে আমাদের দেশের ফর্সা রমণীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।' রেসিডেন্সিতে পৌছার পর জেমস কার্কপ্যাট্রিকের তরুণ সহকারী হেনরী রাসেল লিখেন, 'আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্যজনক যে, আমরা পাচ্ছি অতি নিকৃষ্ট অংশ...মিসেস এস.. যে পরিবেশে নিশ্বাস নেয় তা নিজে নষ্ট করে, যে পথ দিয়ে হাঁটে তা নিজেই দূষিত করে।' তার বান্ধবী মার্গারেট ড্যালরিম্পেল অর্থাৎ জেমস ড্যালরিম্পেলের জ্ঞাতি ভাই স্যামুয়েলের স্ত্রী মনে হয় কিছুটা ভালো ছিল এবং তার মতো তিক্ত স্বভাবের মেয়ে এলফিনস্টোনকে বিস্মিত করেছিল।

জাক্তার জর্জ ওরের স্ত্রী মিসেস ওরে, যিনি খার্দালায় উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের সাথে অবরুদ্ধ ছিলেন, তিনি বরং উপরে বর্ণিত দুজনের চাইতে কম বিষাক্ত ছিলেন। অবশ্য জেমসের মনে হয়েছে, 'তার সম্পর্কে পূর্ব ধারণা করা কঠিন এবং তাকে মনে হয় আবেগশূন্য যা অন্য কোনো মহিলার ক্ষেত্রে আমি আগে দেখিনি। কিন্তু তার অযোগ্যতা ছিল দৃশ্যত তার অপূর্ণ ক্ষুধা। স্বামীর সাথে মিলে সে যা খেত তা রেসিডেন্সির অন্য সব স্টাফ মিলে যা খেত তার সমান। কার্কপ্যাট্রিক তাদের বিয়ের পরপরই লিখেন, 'তরুণ দম্পতির চা ও চিনির চাহিদা, কমপক্ষে আমার দ্বিগুণ। খানসামা আমাকে জানায় যে, বেশ ক'টি মুরগি তাদের সকালের নাশতার জন্যে তাকে নিয়মিত ঝলসে দিতে হত। বিকেলে নাশতায় দুটি মুরগির স্যুপ। তার ফলে পরিণতি যা হয়েছিল তা মহিলার জীবন বিপন্ন করার মতো। যাহোক, এখন তার এ অভ্যাস দূর হয়েছে এবং তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তবুও খানসামাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিদিন তাকে বাছুরের পায়ের জেলি সরবরাহ করতে। তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, হায়দারাবাদে বাছুরের পায়ের জেলি কতটা ব্যয়বহুল হতে পারে।' পরবর্তী সময় কার্কপ্যাট্রিক মিসেস ওরের অসুস্থতার প্রসঙ্গ লিখেছেন

যে, 'তিনি তার ক্ষুধা কমে যাওয়ার অভিযোগ করতেন। কিন্তু প্রতিদিন 'মুরগির মাংস, ভাত, দুধ, মাখন, সবজি ইত্যাদি ছাড়াও কেক খেতেন। এসবের বাইরে হাঁস ও খাসির মাংস তো ছিলই।'

এই তালিকা থেকে মনে হতে পারে যে, হায়দারাবাদ রেসিডেন্সিতে রান্নাবান্না ইউরোপীয় ধাঁচে হত। কিন্তু নিজাম জানতেন যে জেমস ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় খাবার পছন্দ করে এবং তিনি তাকে নিয়মিত হায়দারাবাদের বিশেষত্ব বেগুন দিয়ে তৈরি এক ধরনের খাবার পাঠাতেন, যা জেমসের প্রিয় ছিল। এছাড়া, ইউরোপীয় খাবার রান্না সত্ত্বেও রেসিডেন্সির রান্নাঘরে নিয়ম চালু ছিল যাতে ভারতীয় পবিত্রতার রীতি কিছুতেই ক্ষুন্ন না হয়। সেখানে কঠোরভাবে ভারতীয় জাতি প্রথা অনুসৃত হত, যাতে ভারতীয় অতিথিরা তাদের এড়িয়ে না চলে সেজন্য। পরবর্তীতে হেনরী রাসেল যখন রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন, তিনি তার ভাইকে লিখেন যে, জেমস যে নিয়মগুলো চালু করেছিলেন, তা তিনি পুনরায় সেভাবে চালু করতে চেষ্টা করছেন। তিনি লিখেন, অন্যান্য আরও কিছু অগ্রগতির মধ্যে রেসিডেন্সিকে পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছি, মেথর ও চামারদের হাত থেকে এবং এ ধরনের অন্যান্য ভ্যাগাবন্ডদের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে আমি কর্নেল কার্কপ্যাট্রিকের নিয়ম অনুসরণের চেষ্টা চালাচ্ছি। আমি বাবুর্চিদের ঠিকভাবে পরিচালনা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু রহিম খান আমাকে বলেছে যে, মেথরদের এখনও সেসব স্থানে যেতে দেওয়া হয়, যেখানে তাদের যাওয়া উচিত নয় এবং তারা সেগুলো স্পর্শ করে, যা তাদের স্পর্শ করা উচিত নয়।

রেসিডেন্সি স্টাফদের বিলাসিতা জর্জীয় ইংল্যান্ডের রীতিনীতির সাথে মোগলদের শেষ আমলের রীতি প্রথার সাথে মিশে গিয়েছে। তাস ও জুয়া খেলার প্রতি তারা অবসাদগ্রস্তের মতো জড়িয়ে পড়েছিল। যেন সেন্ট জেমসের মতো রেসিডেন্সি ভদ্রলোকদের একটি ক্লাব। বিলিয়ার্ডের মাধ্যমেও জুয়া খেলা হত রেসিডেন্সির সদস্যদের মধ্যে। এভাবেই তারা অতিবাহিত করত সুদীর্ঘ ও উত্তপ্ত ভারতীয় রাত্রি। মোগলদের মতো প্রতিদিন তারা বালি হাঁস শিকার বের হত। কার্কপ্যাট্রিক হরিণ শিকারে বের হতেন তার পোষা শান্ত চিতা বাঘ সাথে নিয়ে। এডওয়ার্ড স্ট্রাচে লিখেছেন: 'চিতাগুলোকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হত। যখন তারা হরিণের খুব কাছে পৌঁছত তখন চিতার চোখ ও মুখের আবরণ খুলে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। তারা হয়তো দুই বা তিনশো গজ পর্যন্ত দৌড়াত। তারা যদি যথাসময়ে হরিণ ধরতে না পারত তাহলে, আবার আটকে রাখা হত এবং আরেকটি হরিণ ধরার জন্য ছাড়া হত না। অবশ্য চিতা প্রথমবার ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় উদ্যোগে সফল হত। হরিণ ধরতে অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়াত চিতা এবং এক পর্যায়ে হরিণকে থাবা দিয়ে ফেলে দিত। যখন সে ফিরে আসত তখন হরিণের গলা তার মুখে এবং শরীর পায়ের মাঝখানে।

BanglaBook.org

কারো ধারণা করার আগেই সে তার শিকার ছেড়ে দিত এবং মৃত হরিণ গাড়িতে তোলা হত চিতার সাথেই। কিন্তু চিতার নাগাল থেকে দূরে।'

শিকার থেকে ফিরে আসার পর কার্কপ্যাট্রিক হায়দারাবাদের বিখ্যাত বাইজিদের আমন্ত্রণ করতেন নাচ পরিবেশনের জন্য। হায়দারাবাদ রেসিডেন্সির অনেক সদস্যই দাক্ষিণাত্যের নৃত্য ও সংগীতের ভক্ত ও রসিক হয়ে উঠেছিল। অবস্থা এমন ছিল যে, হায়দারাবাদের সবচেয়ে খ্যাতিমান নর্তকী মাহ্ লাকা বাই চান্দা, যিনি উর্দু কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি তার 'দিওয়ান' উৎসর্গ করেছিলেন কার্কপ্যাট্রিকের সহকারীদের একজন ক্যাপ্টেন জন ম্যালকমকে। এর সাথে কিছু রাজনৈতিক যোগসূত্রও ছিল : মাহ্ লাকা বাই ছিলেন মীর আলমের প্রেমিকা এবং হতে পারে যে বিভিন্ন সময়ে নিজাম আলী খানের সাথেও তার প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল এবং উজির আরিস্তু জাহের সাথেও। মাহ্ লাকা তার 'দিওয়ান' ম্যালকমকে উৎসর্গ করায় মীর আলম কেমন অনুভব করেছিলেন—বিশেষ করে এ ঘটনাটি যখন মীর আলমের বাসভবনে এক নাচের অনুষ্ঠান চলাকালে ঘটেছিল; কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে কিছু লিপিবদ্ধ করে যায়নি।

বাইজিদের বিকল্প হিসেবে চিত্তবিনোদনের উপায় ছিল ভাঁড় বা কৌতুকা-ভিনেতাদের আসর। জেমসের শিকার অভিযানের সময় যখন একজনের পর আরেকজন তাদের কৌতুক পরিবেশন করত ব্যাপারটি এলফিনস্টোন খুব আনন্দ সহকারে উপভোগ করতেন। 'তারা অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের মতোই অভিনয় করত।'

কার্কপ্যাট্রিক এবং নিঃসন্দেহে রেসিডেন্সির আরও অনেকেই সন্ধ্যায় শহরের পুরনো অংশে তাদের বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন, যদিও এজন্যে রেসিডেন্সির প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হত। জেমস কার্কপ্যাট্রিক বিশেষভাবে তার বন্ধু তাজাল্লি আলী শাহের বাড়িতে যেতে পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন নিজামের দরবারি চিত্রশিল্পী, কবি ও ইতিহাসবিদ। তার আঙ্গিনার মনোরম প্রাসাদটি ছিল হায়দারাবাদের 'কফি হাউজ' হিসেবে পরিচিত। সেখানে প্রত্যেকের আগমন ঘটত রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার জন্যে। তাজাল্লি শাহের সহযোগিতায় তিনি হায়দারাবাদের অনেক মিনিয়েচার চিত্র সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া তিনি 'মাহফিল' ও 'মুশায়রা'য় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি প্রতি মঙ্গলবার আরিস্তু জাহের বাসভবনে আয়োজিত মোরগের লড়াই দেখতে যেতেন এবং দাবা খেলা ও কবুতর উড়ানোর অনুষ্ঠানেও উজিরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ নিতেন।

জেমস কার্কপ্যাট্রিকের অধীনে রেসিডেন্সির সদস্যরা সারা বছর জুড়ে অনুষ্ঠিত হায়দারাবাদের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিত। তাছাড়া জেমসের তত্ত্বাবধানে রেসিডেন্সির পক্ষ থেকে শহরের সুফি দরগাহগুলোতে নিয়মিত দান করা হত। তিনি স্বয়ং অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। নিজাম অথবা তার উজিরের

BanglaBook.org

সাথে রমজান মাসে ইফতারে অংশগ্রহণ করতেন। দরবারের ওমরাহদের সাথে শিয়া তীর্থ মাওলা আলীর মাজারে যেতেন বার্ষিক 'ওরস' উপলক্ষে এবং মস্তক আবৃত করতেন। মহররমের আশুরা উপলক্ষে অন্য শিয়াদের সাথে শহরের আশুরাখানায় যেতেন।

জেমস কার্কপ্যাট্রিকের সময়ে হায়দারাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রেসিডেন্সির অংশগ্রহণের ফলে যদি ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধ্যান ধারণার সমন্বয় এবং রেসিডেন্সি ও ওমরাহদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এর ফলে কিছু প্রকৃত রাজনৈতিক উপকারও সাধিত হয়েছিল। মোগল সৌজন্যের জটিল রীতির প্রতি ইউরোপীয় অজ্ঞতার কারণে ভারতীয় দরবারে অনাকাঙ্ক্ষিত ও কূটনৈতিক বিপর্যয়কর পরিণতির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, ১৭৫০ সালে নিজাম পণ্ডিচেরির ফরাসি গভর্নরের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সৌজন্য বর্জিত একটি চিঠি পাওয়ার পর হায়দারাবাদ দরবারের সাথে ফরাসিদের সম্পর্ক প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। হায়দারাবাদের তখনকার প্রধান উজির গভর্নরের কাছে কঠোর ভাষায় একটি চিঠি লিখেন : 'আপনার চিঠি নম্রভাবে লিখিত হয়নি। এমনকি রুমের সুলতান (অটোম্যান সুলতান) পর্যন্ত নিজামকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে লিখে থাকেন। একটি সমুদ্র বন্দরের শাসক হিসেবে আপনার ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যের শাসকের মধ্যে কী বিশাল ব্যবধান! আপনি কি সেই ব্যবধানের ভিত্তিতে বিচার করবেন না?' মোগল সমাজে জেমসের ক্রমবর্ধমানভাবে মিশে যাওয়ায় প্রমাণ হয় যে, তিনি সৌজন্যের মৌলিক বিষয়ে কখনো ভুল করতেন না।

একইভাবে হারেমের জীবন সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত জ্ঞানের অর্থ ছিল যে, তিনি বড় ধরনের ভুল করা থেকে নিজেকে এড়িয়ে রাখতেন, যা তার সমসাময়িক অনেকেই করেছে—যেমন তারা মুসলিম হারেমকে শুধুমাত্র প্রাসাদের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং হায়দারাবাদে নিজামের মহিলাদের ক্ষমতাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে। লর্ড ওয়েলেসলিকে লেখা জেমসের প্রথম রিপোর্টে তিনি শুধু নিজাম ও তার উপদেষ্টাদের ব্যাপারেই লিখেননি। বরং বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, নিজামের হারেমে ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ করে। তিনি লিখেছেন, 'নিজামের স্ত্রী ও রক্ষিতাদের মধ্যে দুজন নিয়ন্ত্রণ করেন ' জেনানা' মহল। তারা হচ্ছেন, বখশি বেগম ও তিনাত-উল-নিসা বেগম। বখশি বেগমের হাতেই পুরো মহলের কর্তৃত্ব, যিনি বিতরণের দায়িত্বে এবং দ্বিতীয় জনের ওপর পারিবারিক অলংকার রক্ষার দায়িত্ব যার পরিমাণ কম করে হলেও দুই কোটি রুপি। তারা উভয়েই বয়সে প্রবীণ...এবং নিজামের ওপর উভয়েরই যথেষ্ট প্রভাব: যা তারা কোনো বাজে কাজে লাগিয়েছেন বলে জানা যায় না। তারা দুজনই শ্রদ্ধাভাজন। গত কয়েক বছর ধরে বখশি বেগম সরকারি বিষয়ে তার হস্তক্ষেপ পুরোপুরিই বন্ধ করে দিয়েছেন

এবং নিজেকে নিবেদিত করেছেন দান-খয়রাত ও ইবাদত বন্দেগিতে। তিনাত-ইন-নিসা রাজ্যের ব্যাপারে বেশ মনোযোগী এবং তার প্রতি নিজামের আস্থার কোনো ঘাটতি নেই। মহলে তার যে ক্ষমতা, দরবারেও তাকে একই মর্যাদায় দেখা হয়, যেখানে তার প্রভাব পুরোপুরিই বিদ্যমান।'

জেমসের লেখা থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি নিজামের হারেমের পদমর্যাদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে বয়স্কা মহিলা, যাদের ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে গেছে এবং বিশেষভাবে যারা পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। বিস্ময়করভাবে তারা স্বল্পবয়স্কা ও অধিকতর যৌন সক্ষম বিবিদের চাইতেও ক্ষমতাশালী। হারেমের এই গোপন জ্ঞান তাকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও উত্তরাধিকার সংকটের সম্ভাব্য উত্তরণ সম্পর্কে সফল ভবিষ্যদ্বাণী করার সামর্থ্য এনে দিয়েছিল।

মোগল সমাজ সম্পর্কে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান তাকে হায়দারাবাদ দরবারের রীতিনীতি পালনে এতটাই স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল যে, তার পূর্ববর্তী রেসিডেন্টরা তা যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার পরবর্তীরাও এসব অনুসরণ অসম্ভব বলে বিবেচনা করতেন। অতএব নিজাম যখন একবার অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করলেন, জেমস যে শুধু তার সাথে সাক্ষাৎ ও তখনকার অন্যান্য দূতদের মতো অভিনন্দন জানাতে গেছেন তাই নয়। বরং তিনি যা করেছেন তা কলকাতায় পাঠানো তার রিপোর্ট থেকে বুঝা যায় যে, তিনি কতটা চতুর ছিলেন। তিনি তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন : 'মহান নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তার আরোগ্য লাভে আনন্দ প্রকাশ করে আমি এক হাজার রুপি ভর্তি একটি থলে তার মাথার ওপর দিয়ে তিনবার ঘুরিয়ে আনি এবং ইচ্ছা ব্যক্ত করি যে, তার আরোগ্যের খুশিতে এটি আমার পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসেবে বিবেচনা করা হোক, যা আমি যে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করি সেই সরকারের আনন্দের প্রকাশ হিসেবে। এর ফলে অন্য উপঢৌকনের চাইতে এটি অধিক প্রশংসিত হয় এবং স্বয়ং নিজামও এতে অত্যন্ত উৎফুল্ল হন তার দুর্বল শরীরের সত্ত্বেও।'

এটি খুবই সামান্য সৌজন্য, কিন্তু স্পষ্টতই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ইসলামী পোশাক পরিধান, মোগল কায়দায় সম্বোধন এবং শেখ সাদীর প্রয়োগ করা শব্দ বাছাই ও ফারসি উপাধি গ্রহণ করার মাধ্যমে জেমস কার্কপ্যাট্রিক মোগল দরবারে ব্যবহৃত রাজনৈতিক ভাষার সাথে নিজেকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার মোগল দরবারের রীতিনীতি মেনে নেওয়ার আগ্রহ—নিজামকে 'নজর' প্রদান এবং নিজামের কাছ থেকে 'খিলাত' (দারবারের পোশাক) গ্রহণের গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল।

দরবারের সৌজন্যের সুন্দর দিকগুলো চমৎকারভাবে আয়ত্ত করে এবং অন্যান্য রেসিডেন্টরা যেসব নিয়মরীতির কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার

BanglaBook.org

করেছেন, সেগুলোর সাথে একাত্ম করে জেমস খুব দ্রুত দরবারের আস্থাভাজনে পরিণত হন, যা সেই সময়ের আর কোনো ব্রিটিশ রেসিডেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে কারণে তিনি কূটনৈতিক ফলাফল আহরণেও সক্ষম হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক কেপ অফ গুড হোপের উদ্দেশে রওয়ানা হবার পরপরই সৃষ্ট সংকটময় পরিস্থিতি এবং দরবারে জেনারেল রেমন্ডের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ায় এই ছোটখাটো কূটনৈতিক সৌজন্যগুলো অত্যন্ত জরুরি ছিল।

১৭৯৭ সালের মধ্যে জেনারেল রেমন্ডের ব্যক্তিগত আয় ছিল বিপুল—তাকে যে বিশাল ভূখণ্ডের জায়গির দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার রুপি আয় হত এবং একজন পর্যবেক্ষকের মতে, 'ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার জন্যে তিনি ভারতে ইউরোপীয় ধরনের বিলাসিতা ও জাঁকজমকের মধ্যে থাকার সব রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। রেমন্ডের অধীনস্থ সৈনিকরাও ভালো বেতন-ভাতা লাভ করত। যার ফলে তিনি তার সিপাহীদের প্রতি আস্থার দিক থেকেই যে শুধু ব্রিটিশদের অতিক্রম করেছিলেন তা নয় হায়দারাবাদে অবস্থিত দুটি ব্রিটিশ ব্যাটালিয়নের কিছু সিনিয়র অফিসাদের পর্যন্ত ঘুস দিয়ে বেশি বেতনে ফরাসি বাহনীতে চাকরি গ্রহণে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের এই পক্ষ ত্যাগ ব্রিটিশ অহঙ্কারের ওপর চরম আঘাতের মতো ছিল, বিশেষ করে হায়দারাবাদে। ১৭৯৭ সালে আগস্ট মাসে রিপোর্ট করেন যে, আরও তিনজন ব্রিটিশ অফিসার পক্ষ ত্যাগ করেছে এবং ফরাসিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব রোধ করার জন্যে অবশ্যই কিছু করা প্রয়োজন। তা না হলে আমাদের জন্যে আরও ক্ষতির কারণ হবে। তিনি লিখেন, 'যার বোধ আছে, কিছুতেই তার সন্দেহ হতে পারে না যে, ফরাসিরা এখন তাদের পুরো প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করবে এবং তাদের মিত্রদের নিয়ে ভারতে আমাদের ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে তুলবে।'

১৭৯৮ সালের প্রথম দিকের মাসগুলোতে জেনারেল রেমন্ড নিজামকে আবার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন তার বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে চৌদ্দ হাজারে উন্নীত করতে, যাদেরকে গোলন্দাজিতে পুরো প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং নিজেদের বারুদ কারখানাও স্থাপন করা হবে। কামান ও বারুদ টানার জন্যে থাকবে পাঁচ হাজার ষাঁড়। তার সেনাবাহিনী নিজস্ব বন্দুক, পিস্তল, তরবারিও তৈরি করবে। ফরাসি বাহিনীর ছয়শো জনের একটি ছোট্ট অশ্বারোহী বাহিনী থাকবে। ব্রিটিশদের জন্যে আরও উদ্বেগের বিষয় ছিল যে, রেমন্ড ব্যক্তিগতভাবে দরবারে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। শাহজাদাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিকান্দার জাহ, যিনি তার ভাই আলী জাহের এর বিদ্রোহ ও পরবর্তীতে আত্মহত্যা করার পর সম্ভাব্য দুজন উত্তরাধিকারীর একজনে পরিণত হয়েছেন,

BanglaBook.org

তিনি বিশেষ করে রেমন্ডের এতটাই ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন যে, তিনি রেমন্ডের মাথা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করতেন।

তাছাড়া উদ্বেগজনক লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, রেমন্ড দুটি ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ানের ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে বসতে পারেন। জেমস তার ভাইয়ের কাছে লিখেছিলেন : 'তিন রাত আগে রেমন্ড এগারোটা ও বারোটার মধ্যে ছয়জন সৈন্যসহ একজন হাবিলদার মেজর পাঠিয়েছিলেন ব্রিটিশ শিবিরের অবস্থা যাচাইয়ের জন্যে। সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে ফিরে গিয়ে তার প্রধানের কাছে রিপোর্ট করেছে। আমাদের মধ্যে রেমন্ডের একজন গুপ্তচর আছে। আশা করছি শিগগির সে ধরা পড়বে।'

জেমসের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, ফ্রান্সের প্রতি রেমন্ডের আনুগত্য নিজামের প্রতি আনুগত্যের চাইতে অনেক বেশি। কারণ ফরাসি বাহিনী যুদ্ধ করত তাদের বিপ্লবী ত্রিরঙা পতাকা নিয়ে, নিজামের প্রতীক নিয়ে নয়। রেমন্ডও এব্যাপারে কোনো গোপনীয়তা রাখেননি যে, তার বাহিনী হায়দারাবাদ বলে নয়, বরং নিজামের অধীনে চাকরিরত ভর্তুকিপ্রাপ্ত ফরাসি বাহিনী হিসেবে রয়েছে। তার সৈন্যরা যেসব কামান, বন্দুক ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করত তার মালিক ব্যক্তিগতভাবে রেমন্ড এবং নীতিগতভাবে যখন খুশি তখন তার অস্ত্র ও সৈন্যদের নিয়ে চলে যাওয়ার অধিকারী ছিলেন। জেমসের আশংকা ছিল যে, নিজামের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভ্যুত্থান ঘটনার জন্যে বল প্রয়োগ করা রেমন্ডের জন্যে খুব সহজ।

রেমন্ড ইংরেজ শিবির থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করছিলেন এবং স্পষ্টতই তিনি যে হায়দারাবাদে ইংরেজদেরও হামালা পরিকল্পনা করছিলেন তা লর্ড ওয়েলেসলির সকল সন্দেহকে নিশ্চিত করল। এর পেছনে তিনি বড় ধরনের ফরাসি ষড়যন্ত্র দেখতে পেলেন। জেমসকে তিনি লিখলেন, 'নিজাম, সিন্ধিয়া ও টিপুর অধীনে যেসব ফরাসি অফিসার ও তাদের বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে তারা পুনা (মারাঠা) ও ডেকান (হায়দারাবাদ) রাজ্য ধ্বংস করার মাধ্যমে ভারতে ফরাসি শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়।'

BanglaBook.org

যদিও ওয়েলেসলির তখনকার বহু লেখায় তার ফরাসি ভীতি প্রকাশ পায় কিন্তু রেমন্ডের দ্বারা সৃষ্ট হুমকি সম্পর্কে যথার্থ ধারণাই করেছিলেন। সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত কিছু দলিলপত্রে দেখা যায়, রেমন্ড বাস্তবিক পক্ষেই সিন্ধিয়ার অধীনস্থ ডি বোনোর বাহিনীর অফিসারদের সাথে এবং সেরিঙ্গাপতমে টিপু সুলতানের অধীনে চাকরিরত ফরাসি অফিসারদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিঠিপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে। নিজামের অধীনে চাকরি নেয়ার চৌদ্দ বছর আগে রেমন্ড টিপু সুলতানের অধীনেই ছিলেন।

১৭৯০-এর দশকে রেমন্ড পণ্ডিচরিতে অবস্থিত ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদর দফতরে যেসব চিঠি লিখেছেন তাতে তার দেশপ্রেম, ফ্রান্স ও

বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য এবং তার উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তিনি পণ্ডিচেরির গভর্নর কাউন্ট ডি কনওয়েকে লিখেছেন, 'আমি আমার সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আমি যদি সৌভাগ্যবান হতাম যে, পরিস্থিতি আমাকে আমার দেশের জন্যে আমার ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিচ্ছে।' তার অপর এক চিঠিতে এটাও স্পষ্ট ছিল যে, তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফরাসি শক্তির ঐক্যে বিশ্বাসী। 'রাজধানীতে শুধু আমার বাহিনীই আছে...আমি প্রার্থনা করি যে, আমার অন্যান্য দেশবাসী আপনার অধীনে প্রথম প্রয়োজনেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। এরপর আমার যা শক্তি আছে তা নিয়ে আমি নিজেকে প্রদর্শন করব।

আধুনিক মরিশাস যা ছিল 'আইল ডি ফ্রান্স' গুরুত্বপূর্ণ ফরাসি ঘাঁটি। সেখানকার গভর্নরকে রেমন্ড আরও খোলামেলা তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমি বলতে চাই, আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, আপনি আমাকে যে নির্দেশ দেবেন তা প্রতিপালন করা। আমি যদি ফ্রান্সের কোনো উপকারে লাগতে পারি তাহলে সেজন্যে বারবার আমার রক্তদান করতে প্রস্তুত। এই কর্তব্য পালনে এবং আপনার শুভেচ্ছা লাভের জন্যেই আমি কাজ করি।'

১৭৯৭ সালের গ্রীষ্মের শেষ দিকে পরিস্থিতি জেমসের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল, তখন সেই ভঙ্গুর অবস্থা থেকে হায়দারাবাদে ব্রিটিশদের অবস্থা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। হায়দারাবাদের সাবেক প্রধান উজির আরিস্তু জাহ, যিনি পুনায় দুই বছরের অধিক সময় ধরে কারারুদ্ধ, তিনি নিজামের কাছে চমক সৃষ্টির মতো খবর পাঠালেন যে, তিনি শুধু তার নিজের মুক্তির বিষয় আলোচনা করেই সফল হননি, বরং খার্দলার যুদ্ধে যেসব ভূখণ্ড ও দুর্গ মারাঠাদের হাতে চলে গিয়েছিল, সেগুলো ফেরত দানেও তাদেরকে সম্মত করতে সফল হয়েছেন। নিজামের কাছে তারা যে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল সেই বিরাট দায় থেকেও মুক্তি দিতে তারা সম্মত হয়েছে।

বিস্ময় সৃষ্টি করার খবরের মতোই ছিল কারারুদ্ধ থেকেও আরিস্তু জাহের আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার দক্ষতা। তার সমসাময়িক অনেকের ধারণা, তার পক্ষে এ ধরনের কূটনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে তার দক্ষতার কারণে। এমনকি সে যুগের অন্যতম বুদ্ধিমান ও খ্যাতির অধিকারী মুসলিম পর্যবেক্ষক আব্দুল লতিফ শুস্তারি বিশ্বাস করতেন যে, 'আরিস্তু জাহ গণকবিদ্যা জানতেন এবং তার স্থিতির কারণে তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারতেন—আলকেমির (রসায়ন) সাহায্যে স্বর্ণ তৈরির প্রতি ঝোঁক ছিল তার এবং জ্বিনদের ওপর তার প্রভাব ছিল।' ইতিহাসবিদ গোলাম হোসেন খান আরও স্পষ্টভাবে তার লিখিত 'গুলজার-ই আসাফিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পুনার বাইরে এক উদ্যানে দুই বছর কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকাকালে

BanglaBook.org

কীভাবে তিনি নিজামের দরবারে বিশ্বস্ত এবং মারাঠাদের অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, একমাত্র ইন্দ্রিয়াতীত বিদ্যা ব্যবহারের মাধ্যমেই তার পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব।

> "একটি পানির পাত্রের ওপর ফুঁ দিয়ে তিনি 'তরবারি প্রার্থনা' শুরু করেন। এরপর সেই পানি নিক্ষেপ করেন একটি শুকনো আপেল গাছের ওপর এবং আশা করেন যে, যদি বিশ দিনের মধ্যে গাছ থেকে সবুজ পাতা গজাতে শুরু করে তাহলে চল্লিশ দিনের প্রার্থনার পর তার অভিপ্রায় অনুযায়ী দুর্ভাগ্য কেটে যেতে শুরু করবে। অতএব তিনি মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন এব বাস্তবিক পক্ষেই বিশ দিন পর শুষ্ক আপেল গাছের শাখাগুলো, যেগুলো দেখে মনে হচ্ছিল বহু বছর সেগুলো বৃষ্টির স্পর্শ পায়নি, হঠাৎ করেই সবুজ পাতা গজাতে শুরু করল—বিধাতার শক্তির কি আলৌকিক মহিমা! যারা আরিস্তু জাহের কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারল, তারা আল্লাহর প্রশংসা করল এবং আশাবাদী হলো যে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হবে। অপরদিকে আরিস্তু জাহের হৃদয় দৃঢ় হলো আল্লাহর ক্ষমাশীল অনুগ্রহে। তিনি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন এবং পবিত্র অবস্থায় প্রার্থনা উচ্চারণ অব্যাহত রাখলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। এভাবে তার চল্লিশ দিনের প্রার্থনাকালের অবসান ঘটলো।
> বলা হয়ে থাকে, যে দিন নির্ধারিত চল্লিশ দিবস পূর্ণ হয়, সেদিন একজন খবর আনলো যে, তরুণ মারাঠা পেশোয়া মাধু রাও ছাদ থেকে পতিত হয়ে মারা গেছেন। ঘুড়ি উড়ানোর সময় কার্নিশ থেকে পা পিছলে নিচে একটি ফোয়ারার ওপর পতিত হয় তার দেহ এবং ফোয়ারার অগ্রভাগ বিদ্ধ হয় তার পেটে। আরিস্তু জাহ বিস্মিত হন। কারণ তার প্রার্থনার গোপন উদ্দেশ্য ছিল যে, পুনরায় নেতৃত্ব একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটা উচিত, যাতে তিনি মুক্তিলাভ করতে পারেন। কারণ শাসকের পরিবর্তন না ঘটলে দরবারিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সম্ভাবনা অনিশ্চিত এবং তার মুক্তির সম্ভবনাও ক্ষীণ। আল্লাহ, যিনি সকল ক্ষমতার মালিক তাঁর আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করেছেন এবং তার প্রার্থনা অনুসারেই অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেছেন।'

পুনায় অবস্থানরত ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তারা বিশ্বাস করত যে তরুণ যুবরাজের মৃত্যু দুর্ঘটনা কিংবা কোনো জাদুটোনার কারণে নয়, বরং মাধু রাও-এর ওপর তার অভিভাবকের আরোপিত কঠোর বিধিনিষেধের কারণে হাতাশাজনিত আত্মহত্যা। এ সময় তার অভিভাবকত্ব ছিল মারাঠা মন্ত্রী নানা ফাদনাভির ওপর। মাধু রাও-এর বয়স হয়েছিল একুশ বছর এবং নিজ নামেই রাজ্য শাসনের উপযুক্ততা অর্জন সত্ত্বেও প্রাসাদের চমৎকার খাঁচায় তাকে প্রকৃতপক্ষে আটকে রাখা হয়েছিল। নানা ফাদনাভির গুপ্তচরেরা তার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর দৃষ্টি রাখত। মাধু রাও-এর আত্মহত্যা ছিল তার আটককারীদের ওপর অনিবার্য প্রতিশোধ। তাকে আটক রাখা ছাড়া নানার পক্ষে তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ সম্ভব ছিল না।

BanglaBook.org

উদ্যান কারাগার থেকে আরিস্তু জাহ্ উপলব্ধি করলেন, তার জন্যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে উদ্ভূত দ্বন্দ্বকে পুনার বিভিন্ন উপদলের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিতে কাজে লাগালেন। তার মেধাকে ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত করলেন দক্ষতার সাথে। সাধুরাও-এর মৃত্যুর পরদিনই তিনি নানা ফাদনাভির তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বী দৌলত রাও সিন্ধিয়াকে প্রলুব্ধ করলেন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তাকে একটি চমৎকার ও চৌকস ঘোড়া উপহার দিলেন, যে ঘোড়ার প্রশংসা করেছিলেন সিন্ধিয়া। গুপ্তচরদের মাধ্যমে খবর পেয়ে নানা ফাদনাভি শিগগির আরিস্তু জাহের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আরিস্তু জাহ্ জানতেন নানা তার কাছে আসবেন অন্তত এটা জানতে যে তার কাছে সিন্ধিয়ার আগমনের কারণ কী ছিল। তার সন্দেহ হয়েছিল যে, সিন্ধিয়া হায়দারাবাদের সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করছেন উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে জয়ী হওয়ার জন্যে। গোলাম হোসেন খান লিখেছেন—

> "নানা ফাদনাভি আরিস্তু জাহকে প্রশ্ন করলেন : 'এসব কি হচ্ছে? দৌলত রাও আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন কেন?' আরিস্তু জাহ্ উত্তর দিলেন, 'আপনার গুপ্তচরেরা তো উপস্থিত ছিল, সন্দেহ নেই যে, তারা আমার অতুলনীয় অশ্বের কথা শুনেছেন। তিনি এসেছিলেন ঘোড়াটি নিতে। আর কিছু নয়!' নানা একথা বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানালেন। 'ভগবানের দোহাই, আমাকে সব খুলে বলুন, আমার উদ্বেগ প্রশমিত করুন।'

কিন্তু আরিস্তু জাহ্ এর বেশি কিছু বলতে অস্বীকার করলেন। নানা পীড়াপীড়ি থামাননি। শেষ পর্যন্ত আরিস্তু জাহ্ ইঙ্গিত দিলেন যে সিন্ধিয়া নানার সর্বনাশ ঘটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নানা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, 'আপনি আমার বন্ধু এবং এ যুগের সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি। এ সময়ে আমাকে দেওয়ার মতো আপনার যদি কোনো উপদেশ বলুন। আপনি চুপ করে থাকবেন না।'

BanglaBook.org

আরিস্তু জাহ্ নানা ফাদনাভিকে পরামর্শ দিলেন তার নিজের নিরাপত্তার জন্যে দূরবর্তী কোনো দুর্গে আশ্রয় নিতে। আতঙ্কিত নানা রাতে পুনা ত্যাগ করলেন আরিস্তু জাহের প্রহরায় নিয়োজিত তার আরবীয় সৈনিকদের নিয়ে। পরদিন সকালের মধ্যে আরিস্তু জাহ্ দেখলেন, তার প্রহরায় কেউ নেই এবং পালানোর উপযুক্ত সময় এখনই। কিন্তু তিনি হায়দারাবাদে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে পুনায় অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এক গ্রুপের বিরুদ্ধে আরেক গ্রুপকে কাজে লাগাতে লাগলেন নিজামের সমর্থন আদায় করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ১৭৯৭ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হলো এবং আরিস্তু জাহের অনুরোধে নানা ফাদনাভি মন্ত্রী হিসেবে পুনর্বহাল হলেন। আরিস্তু জাহ্

মারাঠা দরবারের বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে খার্দলার অপমানজনক চুক্তি বাতিল এবং নিজামকে অন্যান্য বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন। আরিস্তু জাহ পূর্ণ মর্যাদায় পুনা ত্যাগ করে হায়দারাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, যেখানে বীর হিসেবে অভ্যর্থনা জানানো হলো। নিজাম তাকে প্রধান উজির পদে পুনর্বহাল ছাড়াও অনেক খেতাব, জায়গীর ও অলংকার দান করলেন।

আরিস্তু জাহের মুক্তি কার্কপ্যাট্রিকের জন্যে অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। এক সপ্তাহ আগে নিজাম ফরাসি ও টিপুপন্থীদের চাপের কাছে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি হায়দারাবাদ থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের বিদায় করে দিতে যাচ্ছেন। আরিস্তু জাহ পুনা ও হায়দারাবাদের মাঝামাঝি অবস্থানে পৌঁছার পর এ খবর পান এবং নিজামের কাছে জরুরি বার্তা পাঠান তার নির্দেশ স্থগিত রাখার জন্যে। নিজাম আরিস্তু জাহের কথা মতো কাজ করেন। কোম্পানির সৈন্যরা ইত্যেমধ্যে উপকূলের পথ ধরেছিল, তারা আবার তাদের পুরনো শিবিরে ফিরে এল এবং হায়দারাবাদে ব্রিটিশ অবস্থান বহাল রইল। কিন্তু আরিস্তু জাহ যথা শিগ্‌গির জেমসকে বুঝতে দিলেন, এজন্যে তাদেরকে মূল্য দিতে হবে। কোম্পানিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা নিজামের সাথে পূর্ণ মিত্রতায় আবদ্ধ হবে কিনা এবং তারা ভবিষ্যতে মারাঠাদের হামলা থেকে হায়দারাবাদকে রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকবে কিনা। তাহলেই কেবল আরিস্তু জাহের পক্ষে রেমন্ডকে কোণঠাসা করতে এবং ফরাসি বাহিনীকে নিষিদ্ধকরণের জন্যে নিজামকে সম্মত করা সম্ভব হতে পারে। উজিরের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জেমস তাকে জানান যে, গভর্নর জেনারেল ইতোমধ্যে তাকে আলোচনা শুরু করার কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। তিনি চুক্তির খসড়া উজিরকে দিতে বিলম্ব করলেন না।

হায়দারাবাদে অন্যান্যের জন্যে আরিস্তু জাহরে মুক্তি আদৌ ভালো খবর ছিল না। মারাঠাদের ঘুষ দিয়ে আরিস্তু জাহের কারাবাস দীর্ঘতর করার জন্যে রেমন্ড হায়দারাবাদ দরবারের ওমরাহদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। আরিস্তু জাহের সাবেক অনুচর মীর আলমও যে এর সাথে জড়িত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কারণ উজিরের অনুপস্থিতির প্রধান সুবিধা ভোগকারী ছিলেন তিনি এবং দরবারের বহু প্রশাসনিক দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। আরিস্তু জাহ নানা ফাদনাভির কাছ থেকে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তার সকল শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প নিয়ে হায়দারাবাদের ফিরে আসেন।

মীর আলমের আচরণে আরিস্তু জাহ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন, যদিও দরবারে তার পদমর্যাদার কারণে তিনি পুরোপুরিই তার কাছে ঋণী। কিন্তু তার কারাজীবন কাটানোর সময় মীর আলম তাকে একটি বারের জন্যেও চিঠি

BanglaBook.org

লিখেননি। এখন থেকে আরিস্তু জাহের ষড়যন্ত্রের বিচক্ষণতা এককভাবে নিবেদিত হবে মীর আলমের ওপর প্রতিশোধ নিতে। জেমসও কিছুটা শংকিত যে, আরিস্তু জাহের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি নিজে জড়িয়ে পাড়েন কিনা।

আরিস্তু জাহ হায়দারাবাদে ফিরে আসার পর মুহূর্তেই থেকে ঘটনার দ্রুত পট পরিবর্তন হাতে লাগল। চুক্তির খসড়া কলকাতায় পাঠানো এবং সেখান থেকে আবার ফিরে আসা ও গোপনিয়তা রক্ষার বিষয়টি একটি সপ্তাহ আলোচনার দ্রুত গতিকে একটু মন্থর করে গিয়েছিল। জেমস কার্কপ্যাট্রিকের একটাই লক্ষ্য হায়দারাবাদ দরবারে প্রভাবের কেন্দ্র থেকে রেমন্ডের পরিবর্তে নিজেকে স্থলাভিষিক্ত করা।

লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল হিসেবে ১৭৯৮ সালের মে মাসের মধ্যে নিজেকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত করার পর তার প্রধান কাজ হিসেবে দেখতে পান উপমহাদেশে থেকে ফরাসি প্রভাব হ্রাস করা। জেমসকে তিনি একের পর এক দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাচ্ছিলেন যাতে তার কর্মক্ষেত্রের সীমানা সম্পর্কে বলে দেওয়া হত। তার দেওয়া নির্দেশিকার বাইরে সামান্য কিছু করার ক্ষমতা তিনি জেমসকে দেননি এবং ওয়েলেসলি এক সময় পুনার রেসিডেন্ট জেনারেল উইলিয়াম পামারকে লিখেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি যে, কার্কপ্যাট্রিক তাকে প্রদত্ত আমার নির্দেশের চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন।' কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের সময় যেহেতু ঘনিয়ে আসছিল এবং নিজাম এক এক করে আরিস্তু জাহের সকল শর্তে সম্মত হচ্ছিলেন, তখন জেমস ক্রমে তার খিটখিটে মেজাজের নতুন প্রভুর নির্দেশের অনুকূলেই ফিরে এলেন। অবশেষে নিজাম কলকাতার দাবির একটি শুধু অগ্রাহ্য করলেন : অবিলম্বে ফরাসি বাহিনীকে সরিয়ে দেওয়া। বৃদ্ধ নিজাম জেনারেল রেমন্ডকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন এবং তিনি তাকে কিছুতেই হারাতে রাজি ছিলেন না। যদিও উজির আরিস্তু জাহ এজন্যে বেশ পীড়াপীড়ি করেছেন। একটি বিষয়ের প্রতি নিজামের যথার্থ ধারণা হয়েছিল যে, কোম্পানির মূল লক্ষ্য রেমন্ডকে ধ্বংস করে দেওয়া।

আলোচনায় যখন গতি সঞ্চারিত হলে ওয়েলেসলি এবং জেমস ক্রমশ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছিলেন যে, বিদ্যমান পরিস্থিতি তাদের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেবে। প্রধান উৎকণ্ঠা, সম্ভাব্য ফরাসি অভ্যুত্থানের এবং এর সাথে বয়োবৃদ্ধ নিজামকে হত্যা করে তার নমনীয় কোনো পুত্রকে তার স্থলাভিষিক্ত করার আশংকা। ১৭৯৫ সালের অক্টোবরে এক পুত্র আলী জাহ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। পরিবারের অরেক প্রবীণ সদস্য দারা জাহ পরের মার্চেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন দুর্ভেদ্য দূর্গ রায়চূড় থেকে। ২০ এপ্রিল লে. কর্নেল জেমস ড্যালরিম্পেল তাকে আটক করার পর বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

BanglaBook.org

এরপর সেপ্টেম্বরে প্রাসাদে সংঘটিত এক ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়, যা ছিল নিজামের বিরুদ্ধে অশুভ যাদুর প্রয়োগ সম্পর্কিত। এ ঘটনাটিকেও আগের দুটি অভ্যুত্থান পরিকল্পনার মতোই গুরুতরভাবে দেখা হয়। উজির এবং জেনানা মহল এ ঘটনা দ্বারা কীভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল তা দেখা যায় কলকাতায় পাঠানো জেমসের এক চিঠিতে—

> "দেখা যায় যে, নিজামের বিরুদ্ধে অশুভ যাদু খাটানো হচ্ছে...ঘটনার উৎস উদ্ধারে এখানো তদন্ত চলছে। প্রাসাদের সন্দেহজনক জায়গা খুঁজে কাঁচের গুঁড়া ও কুকুরের লোম মাখানো কিছু মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলো আবিষ্কৃত হবার পর থেকে নিজাম সুস্থ বোধ করছেন, ভালোভাবে খাচ্ছেন এবং তার ঘুমও ভালো হচ্ছে। কিন্তু কে এই যাদু খাটানোর উদ্যোগ নিয়েছিল এখনো তারা তা বের করতে পারেননি।"

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এধরনের যাদুকে প্রতারণামূলক ভোজবাজি হিসেবে অগ্রাহ্য করলেও হায়দারাবাদে ধারণা প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, নিজামের দিন ঘনিয়ে আসছে।

১৭৯৮ সালের হায়দারাবাদ ছিল অনেকটা যুদ্ধোত্তর বার্লিন বা ভিয়েনার মতো: নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ। যেখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারত না। মাকড়সার জালের কেন্দ্রস্থলে যেভাবে মাকড়সা বসে থাকে, অনুরূপ শহরের কেন্দ্রস্থলে নিজাম অবস্থান করছিলেন তার দক্ষ গুপ্তচরদের ওপর নির্ভর করে। 'খুফিয়া নবীশ' নামে পরিচিত নিজাম আলী খানের গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা ছড়িয়ে থাকত দুর্গ, গ্রাম ও শহরগুলোতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ওমরাহদের প্রাসাদে। তার পিতার মতো তিনিও সম্ভবত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সুফি দরগাহগুলোর পীরদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতেন। রাজ্যের বাইরে মোগল রাজধানী দিল্লি ও মারাঠা রাজধানী পুনা থেকে তিনি প্রতিদিন সংবাদ লাভ করতেন। উভয় স্থানেই একজন করে 'আখবার নবীশ' বা বার্তা লেখক নিয়োজিত ছিল। এই গোয়েন্দা সংস্থার জন্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ থাকত। আরিস্তু জাহের পর প্রধান উজির হিসেবে স্থলাভিষিক্তদের একজন রাজা চান্দু লালকে শুধু কলকাতা থেকে স্পর্শকাতর তথ্য সংগ্রহের জন্যে বার্ষিক সাত লাখ রুপি ব্যয় করতে হত।

গোয়েন্দা তৎপরতা শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের ব্যাপার ছিল না-অপহরণ, গুপ্তহত্যা ও বিষপ্রয়োগের ঘটনাও ঘটাতে হত, যা সেই যুগের ভারতীয় শাসকরা তাদের গুপ্তচরদের দ্বারা নিয়মিত করাতেন। বিষপ্রয়োগে হত্যার ঘটনার দীর্ঘ ইতিহাস আছে ভারতে। প্রাচীন ভারতের মেকিয়াভেলি হিসেবে খ্যাত মহান রাজনৈতিক দার্শনিক চানক্য খ্রিষ্টপূর্ব তিনশো সালে তার 'অর্থশাস্ত্রে' রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে

সুপারিশ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, বিষ প্রয়োগ করতে হবে তার ঘুমের মধ্যে প্রাসাদ পরিচালকের মাধ্যমে। স্বল্প মাত্রার বিষ প্রয়োগ করা অত্যন্ত কার্যকর। আরিস্তু জাহের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত আছে যে, তিনি শুধুমাত্র গুপ্তচর বৃত্তির চাইতে নাটকীয় ধরনের গোয়েন্দা কার্যকাণ্ডকে প্রাধান্য দিতেন। একবার দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হায়দারাবাদ থেকে পালিয়ে নিজামের ভূখণ্ডের বাইরে পুনায় চলে যায়। আরিস্তু জাহ খবর পান যে, সেখান থেকে তারা তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করছে। তিনি এমন এক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবলেন, যা আধুনিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলো করে থাকে। তিনি তাদের দুজনের কর্মকাণ্ডের ওপর কঠোরভাবে নজরদারি করার এবং সুযোগ পেলেই তাদের পাকড়াও করে হায়দারাবাদে প্রেরণের নির্দেশ দিলেন ঘোড়া বা উটের পিঠে উঠিয়ে।

শুধু যে নিজামই হায়দারাবাদে গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন তা নয়, বিভিন্ন গ্রুপের গুপ্তচরেরাও একইভাবে তৎপর ছিল। রেমন্ড অত্যন্ত সফলতার সাথে ইংরেজ শিবিরে একজন গুপ্তচর নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব না হলেও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ফরাসি শিবিরে নিয়োজিত কার্কপ্যাট্রিকের গুপ্তচরের মাধ্যমে জানা গিয়েছিল। টিপু সুলতান যে হায়দারাবাদে ব্রিটিশ রেসিডেন্সির এক কর্মচারীকে উপযুক্ত ভাতার বিনিময়ে তথ্য সরবরাহের জন্যে নিয়োগ করেছিলেন তা জেমসের অজ্ঞাত ছিল। টিপুর নিয়োজিত লোকটি রেসিডেন্সি দফতরের সকল গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র নকল করে পাঠাত পুরো সময় ধরেই। দরবারে টিপু সুলতানের সমর্থক নিজামের ভাগ্নে ফকিরের বেশে এসব দলিল পাঠাতেন শ্রীরঙ্গপতমে। জেমস কোনো এক পর্যায়ে এই ফকিরকে উল্লেখ করেছেন, 'স্বর্গীয় চিকিৎসক' হিসেবে। কিন্তু তিনি ইমতিয়াজকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করেননি, দরবারে তাকেই অধিকতর শক্তিশালী শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

জেমস এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, কলকাতা ও হায়দারাবাদের মধ্যে কোথাও গোয়েন্দা তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, যদিও তিনি তখনো উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি যে, তার নিজের দফতরই এজন্যে দায়ী। কিন্তু রাজনৈতিক স্পার্শকাতর সব চিঠি সাংকেতিক ভাষায় লেখার মাধ্যমে সতর্কতা অবলম্বন করলেন। সম্ভবত এই সতর্কতার ভালো ফলাফল পেয়েছেন। রেসিডেন্সি ঘিরে যে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে তা তিনি ক্রমাগত আবিষ্কার করছিলেন। মীর আলমের জ্ঞাতি ভাই আবদুল লতিফ শুস্তারি যখন জেমসকে কলকাতা থেকে পাঠানো চিঠি তার হাতে পৌঁছার আগেই চিঠিটি সম্পর্কে জানান তখন তিনি অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েন। আরও উদ্বেগজনক খবর ছিল যে, নিজামের অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীতে নতুন নির্বাচিত উইলিয়াম গার্ডনার নতুন চুক্তির কিছু সিদ্ধান্তের বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধারে সক্ষম হন, যা জেমস তখনো জানতে পারেননি। জেমসের মনে হয়, হয়তো মাদ্রাজে এসব তথ্য ফাঁস হচ্ছে। তিনি

তার ভাই উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের কাছে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে লিখেন সেখানকার নিরাপত্তার ত্রুটির কথা বলে। বিশেষ করে তার পরিকল্পনা এত দ্রুত রেমন্ডের হাতে পৌঁছে যাওয়ায় হায়দারাবাদে বিষয়টি খোলামেলা হয়ে যায়। আরও একটি বছর পর্যন্ত জেমস জানতে পারেননি যে, তার কর্মচারীদের মধ্যেই একজন সকল গোপনীয়তা ফাঁস করে দিচ্ছে।

গোয়েন্দাবৃত্তির এই ক্রীড়ায় জেমস কার্কপ্যাট্রিক একেবারে নিরীহ খেলোয়াড় ছিলেন না। হায়দারাবাদে তার প্রথম কাজের মধ্যে একটি ছিল তার নিজস্ব গুপ্তচর নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা। নিজামের মহলেও তার গুপ্তচর তৎপর ছিল। সম্ভবত মহিলা পরিচারিকা অথবা জেননানা মহলের কোনো দাসী, যার দায়িত্ব ছিল মহলের প্রতিদিনের কেলেংকারির খবর সংগ্রহ করা, যা তখনকার এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার বর্ণনা অনুসারে 'পৃথিবীর কাছে তুলে ধরার মতো ঘটনা নয়।' তিনি প্রাসাদের মেথরদেরকেও ঘুষ দিতেন নিজামের অন্তপুরের তথ্য ও দলিল পাচারের জন্যে। সে কারণে তিনি তার চিঠিতে সবিস্তারে উল্লেখ করতেন যে, 'আমার তথ্য প্রাসাদের ভেতর থেকে সংগৃহীত।'

কিন্তু তার চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করে মনে হয় না যে, জেমস গুপ্তচরবৃত্তিতে মেকিয়াভেলির পদ্ধতি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সেজন্য ১৭৯৮ সালের ২৫ মার্চ সকালে জেনারেল রেমন্ডকে যখন মাত্র তিতাল্লিশ বছর বয়সে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন অন্য সকলের মতো জেমসও বিস্মিত হন। তার মৃত্যুতে সন্দেহ করা হয় যে, মন্থর ক্রিয়াশীল কোনো বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল তাকে এবং এর প্রমাণও পাওয়া যায়।

আরিস্তু জাহ সেদিনই সন্ধ্যায় রেমন্ডের বিপুল ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা জারি করেন সময়ের অপচয় না করে।

BanglaBook.org

হায়দারাবাদ শহরের বাইরে মালাকপেটে এক পাহাড়ের ওপর উপযুক্ত গ্রিক সৌধে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার স্থাপিত ও পরিচালিত ফরাসি সেনানিবাসের ঠিক পাশে এর অবস্থান। কবরের পাশেই স্থাপন করা হয় পাথরের চতুষ্কোণ একটি স্তম্ভ। তার সৌধ ও স্তম্ভকে কোনো ধর্মীয় প্রতীক উৎকীর্ণ করা থেকে মুক্ত রাখা হয়। শুধুমাত্র রেমন্ডের হুক্কায় সংযুক্ত একটি চিহ্ন দেয়া হয় সেখানে এবং ইটালিক স্টাইলে উৎকীর্ণ করা হয় ইংরেজি ' জেআর' অক্ষর দুটি।

রেমন্ডের স্থলাভিষিক্ত হন তার সহকারী জীন-পিয়েরে-পিরন, যিনি একটু অমার্জিত এবং তার সাবেক সেনাপতির চাইতে কম ভদ্র। রেমন্ডের মহান গুণাবলী তার মাঝে ছিল না এবং নিজের অনুভূতি ও উচ্চাভিলাষ কোনোটাই গোপন করতে পারতেন না তিনি। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সিন্ধিয়ার চাকরিতে নিয়োজিত তার প্রতিপক্ষকে একটি রিপাবলিকান প্রতীক ও স্বাধীনতা টুপি

পাঠান। পুনার ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা এ খবর পাঠায় কলকাতায়। এর ফলে ফরাসি ভীতিতে আক্রান্ত লর্ড ওয়েলেসলির বিশ্বাস জন্মে যে, ব্যাপক আকারের রিপাবলিকান ষড়যন্ত্র চলছে। অতএব তিনি হায়দারাবাদ থেকে ফরাসিদের হটাতে তার পরিকল্পনাকে দ্রুত কার্যকর করতে উঠে পড়ে লাগেন। রেমন্ডের মৃত্যু সংবাদ কলকাতায় পাঠাতে জেমস লিখেন যে, ফরাসি বাহিনী তাদের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু সত্ত্বেও যথেষ্ট শক্তিশালী—

> "এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন যেসব অফিসার তারা তুলনামূলকভাবে সুশৃংখল এবং উত্তম পদাতিক বাহনী তাদের। তারা শুধু উগ্র রিপাবলিকানই নয়, বরং তাদের চেতনা শত্রুতাকে তাদের সদস্যদের ইংরেজ বিরোধী করে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে আমার মনে হয়, বিশেষ করে তাদের কয়েকশ' দেশীয় অফিসারদের মধ্যে তো বটেই। ফরাসি সৈন্যরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে তা শুধু উত্তমই নয়, আমার সংগৃহীত তথ্য অনুসারে এসব অস্ত্র তাদের কাছে অতিরিক্ত সংখ্যায়ও আছে, যা যে কোনো জরুরি অবস্থায় সরবরাহ করতে পারবে।"

পরবর্তীতে দেখা যায়, ফরাসি বাহিনীর কাছে বাস্তবে আরও বারো হাজার সৈন্য সজ্জিত করার মতো প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ছিল, যা থেকে জেনারেল রেমন্ডের আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। জেমস শিগ্‌গির উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, রেমন্ডের মৃত্যুতে তার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ফরাসি বাহিনীর মাঝে সৃষ্ট অলসতা শনাক্ত করলেন। ছ'মাস পর ফরাসি সেনানিবাস সম্পর্কিত বার্তায় গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ করে, কলকাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হায়দারাবাদের সাথে তার নতুন চুক্তির বিবরণীর ব্যাপারে সম্মতি পাওয়ার পর তিনি উইলিয়ামকে লিখেন, 'পিরনের ওখানে কাজকর্ম বরাবরের মতো চলছে। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিদিনের বিস্তারিত কর্মসূচিতে কোনো পরিবর্তন না এনেই পরিচালিত হচ্ছে। রেমন্ডের সময়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিচালিত হত সবকিছু। কারণ, তিনি বাইরে গুপ্তচর মোতায়েন রাখতেন, কোথায় কী ঘটছে সে ব্যাপারে তাকে নিয়মিত অবহিত করার জন্যে। কিন্তু পিরন একজন গুপ্তচরও নিয়োগ করেনি।'

জেমস আরও লিখেন, 'হায়দারাবাদের বাইরের খবর এটার মতো শুভ নয়। এখনকার খবর হচ্ছে ইউরোপে ফরাসিরা বিজয় লাভ করছে এবং ইংরেজদের পর্যুদস্ত করে ফেলেছে। টিপু সুলতান যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার কোনো এক বন্দরে ১২ হাজার ফরাসি সৈন্য অবতরণ করেছে তার সাথে যোগ দেওয়ার জন্যে।'

এই তথ্যগুলো পরে অতিরঞ্জিত বলে প্রমাণিত হয়। কিছু ফরাসি সৈন্য ও নাবিক আসলেই এসেছে এবং টিপু সুলতান মরিশাসে ফরাসি সেনাপতির কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন দ্রুত আরও সৈন্য পাঠাতে।

BanglaBook.org

আরিস্তু জাহ ইতোমধ্যে হায়দারাবাদ থেকে ফরাসি অফিসারদের অপসারণ করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল একজন আইরিশ ও একজন আমেরিকান অভিযাত্রীর নেতৃত্ব দুটি ভাড়াটে বিদেশি রেজিমেন্ট গড়ে তোলা। এই দুই বিদেশি পুনায় তার উদ্যান কারাগার প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। তিনি আশা করছিলেন, কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এবং যথাসময়ে ফরাসি অফিসারদের আটক করার পর রেমন্ডের বাহিনীর সাধারণ সৈন্যদের দুটি নতুন ইংরেজি ভাষাভাষী বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল ছত্রিশ বছর বয়স্ক আইরিশ মাইকেল ফিংলাসের নেতৃত্বে। জেমসের মতে, মাইকেলের শিক্ষা ও মেধা সামান্য ছিল, কিন্তু জেমসের দৃষ্টিতে সে ফরাসি না হওয়ায় যোগ্যতা ও গুণের অধিকারী ছিল। পুনা থেকে তাকে হায়দারাবাদে আসাতে প্রলুব্ধ করেছিলেন আরিস্তু জাহ এবং অনুপযুক্ত একটি খেতাব দিয়েছিলেন তাকে, 'নওয়াব খুব খার জং, দ্য ফ্যালকন'। জেমস এই উদ্যোগে তেমন কিছু মনে করেননি এবং প্রথম দিকে ফিংলাসকে সদাচারী ও অকার্যকর ভাবতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে সিদ্ধান্ত পালটাতে হয় এবং তিনি ফিংলাস সম্পর্কে লিখেন, 'সে অত্যন্ত দুর্বল ও মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ।'

ফিংলাস তার সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেন তরুণ উইলিয়াম লিনেয়াস গার্ডনারকে, যে সদ্য বিয়ে করেছে ক্যাম্বের বেগমকে। গার্ডনারের জন্ম নিউইয়র্ক রাজ্যের লিভিংস্টোন ম্যানরকে। তিনি এক সুইডিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানীর নাতি ও ব্রিটিশ এডমিরাল অ্যালান গার্ডনারের ভাগ্নে। স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশপ্রেমিকদের বিজয়ের পর মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি নতুন বিশ্বে পালিয়ে আসেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তার পিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং প্রথমদিকে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। জেমস প্রথমে গার্ডনারকে ভেবেছিলেন মর্যাদাবোধসম্পন্ন সুযোগ্য তরুণ হিসেবে। কিন্তু দুই তরুণ বিভিন্নভাবেই এক প্রকৃতির—উভয়েই বিয়ে করেছেন ভারতীয় রমণীকে এবং মোগল সংস্কৃতির প্রতি তারা অনুরক্ত। কিন্তু গার্ডনার যখন নতুন বাহিনীর প্রধান হিসেবে ফিংলাসের স্থলাভিষিক্ত হতে চেষ্টা শুরু করলেন তখন উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে। নভেম্বরের মধ্যে জেমস লিখেন যে, গার্ডনার বেশ কিছু অযৌক্তিক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, তার প্রধানকে শংকিত করার জন্যে যাতে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। এর ফলে গোটা বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বছরের শেষ দিকে গার্ডনার গোপনে হায়দারাবাদ থেকে পালিয়ে যান অন্য কোথাও তার ভাগ্য অন্বেষণে।

BanglaBook.org

আরিস্তু জাহের দ্বিতীয় রেজিমেন্ট গড়ে ওঠে স্বাধীনচেতার প্রবাসী আমেরিকানের নেতৃত্বে। লোকটি ম্যাসাচুসেটসের নিউবারিপোর্টের উগ্র ও তিরিক্ষি মেজাজের ইয়াংকি, যার নাম জন পি বয়েড। আরিস্তু জাহের দ্বারা নতুন দায়িত্ব প্রদানের পর বয়েড ১৮০০ সৈন্যের এক বাহিনী গড়ে তুলে প্রশিক্ষণ দেন। কিন্তু তার আনুগত্যের অভাব ও অযৌক্তিক মনোভাব প্রদর্শনে আরিস্তু জাহ তাকে পদচ্যুত করেন। বয়েড তার সৈন্যদের নিয়ে পুনায় গিয়ে মারাঠা পেশোয়ার অধীনে পুনরায় যোগ দেন।

মারাঠাদের অধীনে স্বাধীনচেতা ভাড়াটেদের মধ্যে থেকেই আরিস্তু জাহ তুলে এনেছিলেন ফিংলাস, গার্ডনার ও বয়েডকে। কিন্তু তারা সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো নয় এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়নি। উইলিয়াম গার্ডনারের অতীত একটু ব্যতিক্রমী ছিল যে, তিনি শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার অনুসারীরা পাশ্চাত্য সমাজে কখনো ভালো কিছু করেনি পর্যায়ের পরিবারের। এমনি একজন ছিল নিচু বংশজাত নেপোলিয়নপন্থী মাইকেল ফিলোজ। আগে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল গর্দভ পরিচর্যাকারী হিসেবে, পরে এক আতশবাজির

দোকানে খণ্ডকালীন কাজ করে। পরে এক বেকারিতেও খণ্ডকালীন সেলসম্যান হিসেবে চাকরি করেছে। সামরিক কোনো দক্ষতাই তার মধ্যে ছিল না। এ ধরনের বহু লোক ভারতে আসে ভাগ্য অন্বেষণে এবং যখন তখন মর্জি মাফিক পক্ষ পরিবর্তন করে। জেমসের মতে, 'ইউরোপীয়রা দেশীয় রাজ্যের চাকরিতে থেকেও নিজেদের এক স্থানে স্থির রাখতে পারে না।' শ্যাভেলিয়র ডুড্রেন্স নামে এক ফরাসি পনেরো বছরে কমপক্ষে সাতবার পক্ষ পরিবর্তন করেছিল।

অধিকাংশ ভাড়াটে সৈন্য ভারতীয় জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং অনেকে ইসলামে দীক্ষিত হয়। জার্মানির হ্যানোভার থেকে আগত কর্নেল এন্থনি ফলম্যান বসবাস করতেন ভারতীয় যুবরাজদের মতো। তিনি একটি হারেম সংরক্ষণ করতেন এবং সব সময় হাতির পিঠে চড়ে বাহিরে যেতেন। তাকে প্রহরা দিত মোগল সৈনিকরা। তার অধীনস্থ সকলে পরিধান করত লাল বর্ণের আলখিল্লা এবং ব্রিটিশ অশ্বারোহী রেজিমেন্টের মতো এক সারিতে কুচকাওয়াজ করে চলত।

এসব বিদেশির মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট উর্দু কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। তাদের একজনের নাম ছিল 'ফারাসু'। জার্মান ইহুদি ভাগ্যান্বেষী সৈনিক গটলিয়েব কোনের বিবাহিত মোগল স্ত্রীর গর্ভে ফারাসুর জন্ম। সমসাময়িক এক সমালোচকের মতে, এই কবি এক উট ভর্তি কাব্য কর্ম রেখে গিয়েছিলেন। অন্যান্যরা লিখতেন তাদের দেশীয় ইউরোপীয় ভাষায় এবং তাদের লেখা চিঠি থেকে নৈরাজ্যপূর্ণ এবং কখনো কখনো তাদের যাপিত

দস্যুবৃত্তিমূলক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। ফলম্যান তার এক ভাড়াটে সৈনিক বন্ধুকে লিখেন, এক রাজার পক্ষ থেকে আরেক রাজার পক্ষে যোগ দেবেন কিনা এমন মানসিক দ্বন্দ্বের সময়: 'আমার বিশ্বাস দেশের এই অংশটি কোনো রাজাকে দিয়ে দেয়া হবে এবং যদি তা ঘটে তাহলে আমি এই কাশ্মিরি অঞ্চলে স্বেচ্ছায় যোগ দেব যেখানে সর্বোত্তম ও সুন্দরী রমণীরা বাস করে...আমি যখনই ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পাবো তখন অবিলম্বে তোমার সাথে যোগ দেব। শীতল রাত এগিয়ে আসছে এবং আমারও বিশ্বাস, তুমি আমার সাথে একমত হবে যে, এ সময়ে সুন্দরী কাশ্মিরি রমণী খুব মন্দ আহরণ হবে না। আসলেই আমি ভাবছি যে, এ হবে অতি উপভোগ্য আনন্দ।'

এ ধরনের বিধি লঙ্ঘনকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থাকায় কোম্পানির সাথে ভাড়াটে সৈন্যদের সম্পর্কে রক্ষা জটিল হয়ে ওঠে। একদিকে তাদের মধ্যে অনেক অভিন্নতা আছে যে, তারা একই সংস্কৃতির দেশ থেকে আগত এবং একে অন্যের সাথে সমন্বয় করার মতো শিক্ষা তাদের আছে। অন্যদিকে জেমসের মতো রেসিডেন্ট, যিনি দরবারে তার মর্যাদা নিয়ে থাকেন এবং স্বপক্ষত্যাগী, অপরাধীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে পারেন না। যারা স্বাধীন বাহিনী গড়ার উদ্যোগ নিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে জেমস উইলিয়ামকে লিখেন—

> "আমি সবসময় একটি নিয়ম স্থির করেছি এবং ভবিষ্যতেও তা পালন করব যে, আমার বাহিনীর যে কোনো সদস্য কারো আমন্ত্রণ বা প্রলোভনে পড়ে, এমকি ফিংলাসের পক্ষ থেকে আহ্বান এলে পক্ষত্যাগ করবে না।
> এর কারণ শুধু এটা নয় যে, আমি নিজেকে রেসিডেন্ট হিসেবে মর্যাদার অধিকারী মনে করি, বরং তাদের দৃষ্টিতে আমি এ রাজ্যের একজন কর্মচারী। যার অর্থ এই নয় যে, এর ফলে আমাদের ঘনিষ্ঠতার কোনো ঘাটতি হবে।"

BanglaBook.org

ফিংলাসের বাহিনীতে অভিযাত্রী সৈনিক ছাড়াও অপরাধী ও পলাতকরা ছিল, যাদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা যেখানে আছে সেখানে এ সমস্যা প্রকট। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে ব্রিটিশ সৈন্যদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সন্তানদের অন্তর্ভুক্তির ওপর লর্ড কর্নওয়ালিসের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৫ সালের মধ্যে ভারতীয় মায়ের গর্ভে জন্মলাভকারী ব্রিটিশ সৈন্যদের বেকার পুত্রদের নিজ দেশে পাঠানোর মতো আর্থিক সঙ্গতিও ছিল না তাদের। ফলে তারা ভারতীয় রাজাদের অধীনে চাকরির সন্ধান করতে থাকে। তাদেরই জন্ম দেয়া মিশ্র বংশধরদের প্রতি ব্রিটিশদের ক্রমবর্ধমান বর্ণবাদী ও বাতিল করে দেওয়ার মানসিকতা ফরাসি জেনারেল বেনোট ডি বোনেকে বিস্মিত করেছিল, যিনি সিন্ধিয়ার বাহিনীতে বিদেশিদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

দিয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা ইউনিট গঠণকারীদের অন্যতম। সদ্য পিতৃহীন এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে আগ্রায় তার এক দুর্গরক্ষক অফিসারের কাছে পাঠিয়ে ছেলেটি সম্পর্কে ডি বোনে বিবরণ দেন, 'তাকে দেখে মনে হয় তার দৃঢ় ইচ্ছা ও উচ্চাভিলাষ আছে। তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো। ইতোমধ্যে আমি তোমার কাছে এ ধরনের আরও বেশ কিছু তরুণকে পাঠিয়েছি। ইউরোপীয় অফিসারদের পুত্র হলেও আমি অবাক হয়ে ভেবেছি যে, তাদের কিছুসংখ্যক পিতা মৃত্যুর সময় এসব সন্তানদের জন্যে কিছু রেখে যায় কিনা। আরও শত শত এমন তরুণ আছে কলকাতায়, যারা চাকরিতে যোগ দিতে চায়। কিন্তু তাদের জন্যে সুপারিশ করার মতো কোনো বন্ধু নেই এবং কলকাতা থেকে আগ্রায় যাওয়ার সঙ্গতি পর্যন্ত নেই তাদের।'

এ সময়ে উইলিয়াম পামার নামে এক তরুণ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হায়দারাবাদে আসেন ফিংলাসের অধীনে আফিসার হিসেবে চাকরি নিতে, যা এটকু অস্বাভাবিক ঘটনা। তিনি ছিলেন উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের পুনায় নিয়োজিত প্রতিপক্ষ জেনারেল উইলিয়াম পামারের পুত্র। তার মা ছিলেন দিল্লির বেগম ফায়জি বক্‌শ। ইংরেজি ও ফরাসির পাশাপাশি পামার ফারসি ও উর্দু বলতে পারতেন অনর্গল। তিনি ভারত ও ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করেন। ইংল্যান্ডে তিনি উলউইচ সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। উইলিয়াম পামার বাড়িতেও মোগল ও ব্রিটিশ সংস্কৃতির চর্চা করতেন এবং পোশাক পালটানোর মতো তিনি এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি অতি বিচক্ষণ এবং নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণে সিদ্ধহস্ত যা পরবর্তীতে তার ভাগ্যকে ব্যাপকভাবে স্ফীত করেছিল।

ফরাসি বাহিনীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন অনিবার্য, যে পরিস্থিতিতে উইলিয়াম পামারের হায়দারাবাদ উপস্থিতিকে তেমন গ্রাহ্য করেননি। তিনি শুধু লক্ষ করেন যে, পামারের গায়ের রং কালো হলেও তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও শিক্ষিত। এরপর উইলিয়াম পামার যে শুধু কার্কপ্যাট্রিকের জীবনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা নয়, তার সম্প্রসারিত পুরো পরিবারেও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

১৭৯৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর নিজাম আলী খান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজামকে তার প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্যে ছয় হাজার নিয়মিত সৈন্য সরবরাহ করবে। এই সংখ্যা ছিল ইতোমধ্যে হায়দারাবাদে মোতায়েন দুটি কোম্পানি ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত। সৈন্যরা থাকবে ব্রিটিশ অফিসাদের তত্ত্বাবধানে, কিন্তু নিজাম তাদেরকে অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, কর আদায় এবং তৃতীয় কোনো পক্ষের হামলা মোকাবেলায় তার রাজ্যের বাইরে অভিযানেও প্রেরণ

BanglaBook.org

করতে পারবেন। এর বিনিময়ে নিজাম কোম্পানিকে বার্ষিক ৪১ হাজার ৭শ ১০ পাউন্ড ভর্তুকি প্রদান, ফরাসি বাহিনী অপসারণ, ফরাসিদের অধীনে যেসব ব্রিটিশ অফিসার আছে তাদেরকে ব্রিটিশ পক্ষত্যাগীদের সাথে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কীভাবে এবং কখন এটা করা হবে যে সম্পর্কে চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর একটি অস্বস্তিকর মাস অতিবাহিত হয়, যখন ছয় হাজার সৈন্যের পুরো চারটি ব্যাটালিয়ন তাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও কামানসহ দেড়শো মাইল দূরবর্তী গুন্টর থেকে হায়দারাবাদে আসতে থাকে। গুন্টর ছিল কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত হায়দারাবাদের নিকটবর্তী শহর, যেখানে কোম্পানির সৈন্যদের সমবেত হওয়ার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি দুমাস আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে ফরাসিদের মোকাবেলা করতে হায়দারাবাদ অভিমুখে যাত্রা করতে অধিক সময় না লাগে।

গোপন চুক্তি সম্পর্কিত গুজব যখন ফাঁস হতে শুরু করে, তখন আরিস্তু জাহ ইংরেজি ভাষী দুই অফিসারের নেতৃত্বাধীন ব্যাটালিয়ন দুটিকে রেসিডেন্সির পাশে শিবির সংস্থাপনের নির্দেশ দেন এবং সম্ভাব্য কোনো ফরাসি হামলা মোকাবেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। চুক্তিতে নিজামের স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও জেমস কার্কপ্যাট্রিক স্বস্তি পাচ্ছিলেন না যে, নিজাম আসলে ফরাসি বাহিনীকে নিষিদ্ধ করবেন কিনা, বিশেষত কোম্পানির নতুন সৈন্যরা যখন পৌঁছবে। সেজন্যে সম্ভাব্য ফরাসি প্রতিরোধ ঠেকাতে তিনি অতিরিক্ত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি উইলিয়ামকে সাংকেতিক ভাষায় লিখেন পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। চিঠিতে তিনি এ আশংকাও ব্যক্ত করেন যে, ফরাসি বাহিনী ভেঙে দেওয়ার পর অফিসার ও সৈন্যরা টিপু অথবা সিন্ধিয়ার পক্ষ নিয়ে ব্রিটিশদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকতে পারে।

সে কারণে জেমস আরিস্তু জাহকে পরামর্শ দেন ফরাসি শিবিরের ওপর কড়া নজর রাখার জন্য এবং তাদেরকে কর আদায়ের জন্যে প্রেরণেও বিরত রাখতে বলেন। এটি নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ একটি কৌশল ছিল। কোনো গুরুতর প্রতিরোধ সৃষ্টি হলে সে পরিস্থিতিতে ফরাসি বাহিনীকে নিরস্ত্র করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

১৭৯৮ সালের ৬ অক্টোবর এক চরম সংকটময় মুহূর্ত। অতিরিক্তি ব্রিটিশ বাহিনী হায়দারাবাদ থেকে আর মাত্র তিনদিনের দূরত্বে, ঠিক তখনই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মিশরে উপস্থিতির চমক সৃষ্টিকারী এক খবর পৌছল। তিনি পরপর আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রো দখল করে নিয়েছেন। নেপোলিয়ন তার লক্ষ্য সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করতেন। তুর্কি যুদ্ধ বিষয়ক এক গ্রন্থের মার্জিনে ১৭৮৮ সালের আগে তিনি লিখেছেন : ‘মিশরের মধ্য দিয়ে

BanglaBook.org

আমরা ভারতে অভিযান চালাবো, সুয়েজের মধ্য দিয়ে প্রাচীন পথ আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে উত্তমাশা অন্তরীপের পথ পরিত্যাগের কারণ সৃষ্টি করব।' এজন্যে খুব বেশি সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে, এমন আশংকাও তিনি দেখেননি : 'ফরাসি তরবারির স্পর্শ শুধু বাণিজ্যিক জাঁকজমকের কাঠামো ধ্বংস করার জন্যেই প্রয়োজন।' কায়রো থেকে তিনি টিপু সুলতানকে একটি চিঠি পাঠান, তার চিঠির উত্তর হিসেবে। যে চিঠিতে টিপু ফরাসি সম্রাটের সাহায্য কামনা ও তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলেন। নেপোলিয়ন উল্লেখ করেন—

> "ইতোমধ্যে আপনি নিশ্চয়ই লোহিত সাগরের তীরে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। আমি এসেছি অসংখ্য সৈন্যের অজেয় এক বাহিনী নিয়ে। ইংল্যান্ডের লৌহ প্রাচীর থেকে আপনাদের মুক্ত করার পূর্ণ ইচ্ছা আমার আছে। মাস্কাট থেকে মোচার পথে অগ্রসর হওয়ার সময় আমি আপনার চিঠির বিষয় এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থা জানতে পেরে অত্যন্ত আগ্রহের সহকারে আপনার সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে উদগ্রীব। আমি এটাও ইচ্ছা করি যে, আপনি আপনার বিশ্বস্ত বিচক্ষণ কোনো ব্যক্তিকে সুয়েজ অথবা কায়রো পাঠাতে পারেন, যার সাথে আমি বিষয়গুলো নির্বিঘ্নে আলোচনা করতে পারি। ঈশ্বর আপনার শক্তি বৃদ্ধি করুক এবং আপনার শত্রুদের ধ্বংস করুক।
>
> আপনার
> বোনাপার্টে"

BanglaBook.org

এই আকস্মিক খবর প্রাচ্যে ব্রিটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধে এক ধরনের কাল্পনিক অভ্যুত্থানের মতো ছিল, যার জন্যে জেনারেল রেমন্ড দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন এবং তিন মাস পর যখন সে অভ্যুত্থান সত্যি সত্যিই ঘটল, তখন তার জন্যে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। তথাপি এ পরিস্থিতি হায়দারাবাদে ঘটনার প্রকৃতিকে দ্রুত পালটে দিল। ফরাসিরা তাদের সেনানিবাসে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠায় হায়দারাবাদে জেমস ও ব্রিটিশদের জন্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করল। পুনরায় ও মারাঠা বাহিনীতে ফরাসিরা প্রস্তুতি গ্রহণ করল তাদের মাতৃভূমির সহায়তা করতে। তাদের রিপাবলিকান সেনাপতি বোনাপার্টের কাছে হামলা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ পর্যন্ত পাঠিয়ে দিলেন। পুনায় বসবাসকারী এক ফরাসি সাবেক বেকারি দোকানের সেলসম্যান লুই বাকোঁ বহু বছর পর লিখেছিল—

> "অনেক ফরাসি অভিযান সম্পর্কে এবং এ অভিযানে সহযোগিতা করার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করছিল।...জেনারেল বোনাপার্টে আলেকজান্ডারের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ভারতে প্রবেশ করতে পারেন, ধ্বংসকারী বিজেতা

> হিসেবে নয়...বরং ত্রাণকর্তা হিসেবে। তিনি ভারত থেকে ইংরেজদের চিরতরে বহিষ্কার করতে পারেন, যাতে তাদের কেউই এখানে অবস্থান করে এদেশবাসীকে অফুরন্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে না পারে। তাদের স্বাধীনতা, শান্তি ও সুখ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা, এশিয়া, ইউরোপ এবং সমগ্র বিশ্বের শান্তির সম্পদ বিষয় আলোচিত হত। এই পরিকল্পনাগুলো শুধু অলস স্বপ্ন বা কল্পনাবিলাস ছিল না। ভারতের সকল রাজা দীর্ঘদিন ধরেই ফরাসি হস্তক্ষেপ কামনা করছিলেন। কিন্তু তাদের শক্তিশালী শত্রু ইংরেজরা এখনো তৎপর... ।"

যদিও তাদের ইংরেজ বিদ্বেষ ছিল তীব্র, কিন্তু হায়দারাবাদে ব্রিটিশরা কোনো বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল না যে, বোনাপার্টের পক্ষ থেকে ভীতির অবসান খুব সহজে অর্জিত হওয়ার নয়। মালাবার বন্দরের প্রহরায় নিয়োজিত ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ইউনিট যে শক্তিশালী ছিল না শুধু তা নয়, লোহিত সাগর থেকে মালাবার পর্যন্ত সমুদ্র পথ খুব সহজ। জেমস তার ভাই উইলিয়ামকে লিখেন, 'এই পথ ধরেই উইলিয়াম লিনেয়াস গার্ডনার হায়দারাবাদে এসেছেন কয়েক মাস আগে। আমি যত বেশী মিশরের অভিযানের কথা ভাবছি, আমাকে ততই অস্বস্তিতে পেয়ে বসছে। ফরাসিরা যদি তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কোনো উদ্যোগ নেয়, তাহলে আমি মোটেও বিস্মিত হবো না। লোহিত সাগর থেকে বড় বড় জাহাজে এসে তারা ম্যাঙ্গালোরে অবতরণ করবে। আমার ধারণা তারা সুয়েজে হাজার হাজার ভেলা পাবে। ক্যাপ্টেন গার্ডনার স্বয়ং একটি ভেলায় উঠে লোহিত সাগর অতিক্রম করেছেন এবং আমাকে বলেছেন যে, দুটি যুদ্ধজাহাজ ব্যাবেলম্যাণ্ডেল প্রণালী অবরোধ করতে যথেষ্ট। এছাড়া সেখানে তিন বা চার মাইল ব্যাসার্ধের একটি দ্বীপ আছে প্রণালীর মুখে। আমার মনে হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই দ্বীপটির ওপের দখল প্রতিষ্ঠা করে সেটিকে যতটা সম্ভব শক্তিশালী করে সেখানে কিছু যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করা অনিবার্য প্রয়োজন বলে আমার বিশ্বাস।'

তিনদিন পর ৯ অক্টোবর নতুন ব্রিটিশ সৈন্যরা হায়দারাবাদে এসে পৌঁছে। এই বাহিনীর সাথে আসেন ক্যাপ্টেন জন ম্যালকম, যিনি জেমস কার্কপ্যাট্রিকের নতুন সহকারী হবেন এবং সে রাতেই রেসিডেন্সিতে আয়োজিত নৈশভোজে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। এক স্কটিশ কৃষকের সতেরো সন্তানের একজন ম্যালকম। কলকাতায় প্রেরিত একটি রাজনৈতিক নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওয়েলেসলি তাকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় তরুণ হিসেবে দেখেতে পান। জেমসের সাথে তার সম্পর্কের চমৎকার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও দুজনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নতর। ওয়েলেসেলি 'সামনে চলো নীতির' অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক ছিলেন ম্যালকম এবং ভারতের

BanglaBook.org

যে কোনো স্থানে যখন সম্ভব তখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও প্রভাব সৃষ্টিতে বিশ্বাস করতেন। এই ধারণার প্রতি জেমস ক্রমবর্ধমানভাবে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তার পরিবর্তিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ম্যালকমের সাথে সম্পর্ক অবনতির কারণ ঘটে।

শিগ্‌গির আরও একটি দুঃসংবাদ আসে যার ফলে শান্তিপূর্ণভাবে ফরাসিদের অস্ত্র সমর্পণ সম্পর্কে জেমস যে আশা পোষণ করছিলেন তা দ্রুত তিরোহিত হয়। ব্রিটিশ সৈন্যরা ভারতে প্রবেশ করে দুভাগে বিভক্ত হয়ে এবং প্রথম রেজিমেন্ট চৌদ্দ তারিখ সন্ধ্যায় ভারি বর্ষণের কারণেই মুসি নদী অনতিক্রম্য হওয়ার আগেই হায়দারাবাদে পৌঁছে। দ্বিতীয় রেজিমেন্ট পরদিন সকালে নদী তীরে উপস্থিত হয়ে দেখতে পায় রাতের মধ্যে নদী স্ফীত হয়েছে নাটকীয়ভাবে। প্রথম রেজিমেন্টের সাথে যোগ দেয়ার কোনো উপায় ছিল না তাদের। এক রেজিমেন্ট ছিল রেসিডেন্সির তীরে, আরেক রেজিমেন্ট নদীর ওপারে ফরাসি সেনানিবাসের কাছে। একই সময়ে জেমস গুপ্তচর মারফত খবর পেলেন যে, পিরন ইতোমধ্যে নিজামের সাথে সম্পাদিত চুক্তির সকল শর্ত সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, যার মধ্যে তার বাহিনীকে বিলুপ্ত করার শর্তও আছে। পিরন যদি ব্রিটিশদের ওপর কোনো উদ্যোগ নিতে চায়, তাহলে এটাই তার জন্য উপযুক্ত মুহূর্তে।

এই জটিল পরিস্থিতিতে, যখন ব্রিটিশ পক্ষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তখন হায়দারাবাদে ব্রিটিশ বাহিনীকে দেখা গেল দুটি ভাগে বিভক্ত অবস্থায়। পরবর্তী অস্বস্তিকর সপ্তাহ ধরে মুসি নদীর পানি অনতিক্রম্য পর্যায়ে বৃদ্ধি পেতে থাকায় নিরাপদে কামান পার করে আনা অসম্ভব ছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত ফরাসিরা দৃশ্যত সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে ছিল এবং বিভক্ত ব্রিটিশ বাহিনীর উপর হামলার কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

প্রাসাদ থেকে নিজামের ফরাসিদের নিরস্ত্র করার কোনো আদেশ জারি করার লক্ষণ না দেখে জেমস কার্কপ্যাট্রিক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি আরিস্তু জাহকে লিখবেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বলবেন চুক্তির শর্ত প্রতিপালনের জন্যে। কয়েকদিন পর্যন্ত তার চিঠির কোনো উত্তর পাওয়া গেল না এবং নিজাম হায়দারাবাদ ছেড়ে গোলকুণ্ডার অধিকতর শক্তিশালী দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এর বাইরে তাকে কোনো পদক্ষেপ নিতেও দেখা গেল না। ষোলো তারিখে জেমস তার ভাইকে লিখেন, 'উজিরের কাছে লেখা চিঠির উত্তরের জন্যে আমি অধীর আগ্রহে অপক্ষো করছি, যেটি শক্ত ভাষায় লেখা হলেও তুমি তা অনুমোদন করবে বলে মনে করছি। চিঠিতে আমি যা চেয়েছি তা হাসিলে যদি সফল না হওয়া যায়, তাহলে আমি শিগ্‌গিরই তাকে দেখে নেব এবং আমার শর্ত পূরণ না হওয়ার পর্যন্ত আমি তাকে ছাড়ব না।' উনিশ তারিখেও জেমস চিঠির উত্তর পেলেন না এবং তার বিশ্বাস হল যে,

BanglaBook.org

শর্ত পূরণ না করা আরিস্তু জাহের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। মিশরে বোনাপার্টের বিজয়ের সংবাদরে প্রেক্ষিতে নিজামকে কোম্পানির সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত সম্পর্কে গুরুতরভাবে পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

কোনো ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিণতি যে এখন ভায়বহ হবে যে সম্পর্কে নিশ্চিত জেমস শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে গোলকুণ্ডায় গেলেন উনিশ তারিখ সন্ধ্যায় এবং উদ্বিগ্ন-দর্শন আরিস্তু জাহকে হুশিয়ারি দিলেন যে : নিজাম যদি শর্ত পূরণে আরও দ্বিধার মধ্যে থাকেন তাহলে তার পক্ষে ফরাসি সেনানিবাসের ওপর হামলা চালানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তিনি তার গুপ্তচরদেরকেও তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। উইলিয়ামকে সাংকেতিক চিঠিতে লিখলেন, 'আমি সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রতিরোধ মোকাবেলার প্রস্তুতির পাশাপাশি ফরাসিদের অকার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছি।' এই লক্ষ্য সাধনের জন্যে তিনি একুশ তারিখে ফরাসিদের মধ্যে ছোটখানো একটি অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত করলেন এই ধারণা করে যে, কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ফরাসিদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা ধ্বংস করবে। তার আরও পরিকল্পনা ছিল ফরাসিদের অকার্যকর করতে। উইলিয়ামকে তিনি লিখেন, 'যে রাতে এই ঘটনা ঘটানো হবে প্রস্তুতি আমি নিয়ে রেখেছি যাতে ফরাসিরা কোনো পদক্ষেপ না নিতে পারে। এমনকি তাদের কামান ও যাতে অকার্যকর হয়ে যায় সেজন্যে কামান টানার জোয়াল পযৃন্ত কেটে ফেলেছি।'

এ ধরনের সহিংস ঘটনার পরিণতি সম্পর্কেও জেমসের হিসাব ছিল। বিশ অক্টোবর রাত দশটার দিকে নিজাম শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক নির্দেশ জারি করলেন যে, তিনি ফরাসি বাহিনীর ইউরোপীয় অফিসারদের বরখাস্ত করেছেন। অতএব সৈন্যরা আর তাদের উর্ধ্বতনদের আনুগত্য করার জন্যে কোনো বাধ্যবাধকতায় নেই। এরপরও যদি কেউ তাদের আনুগত্য করে তাহলে সেসব সৈন্যকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গুলি করে হত্যা করা হবে।

জেমস যে হিসাবটি করেননি তা হচ্ছে, পিরন যে দ্রুত তার সাথে আপোসে আসতে পারে সে সম্ভাবনাটি। সেই সন্ধ্যায় পিরন রেসিডেন্সিতে দুজ৮ন ফরাসি অফিসারকে পাঠালেন কার্কপ্যাট্রিককে একথা জানাতে যে, 'তিনি আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত।' যদিও তিনি জানতেন যে, এ অবস্থা হচ্ছে দাক্ষিণাত্য থেকে তাদের বিদায়। কিন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে ন্যায়সঙ্গত আচরণ আশা করেন। তারা জেমসকে বললেন সকালে একজন ব্রিটিশ অফিসারকে তাদের কাছে পাঠাতে যাতে তারা তাদের সম্পত্তির দায়িত্ব বুঝে নিতে পারে। এ পর্যায়ে এই উদ্যোগের পরিণতি শুভ হয়নি।

জেমসের গুপ্তচরেরা তাকে ফরাসি সেনাানিবাসের-আত্তসমর্পণের প্রস্তাব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত কিছু জানাতে পারল না। অতএব পরদিন সকালে ম্যালকম যখন ফরাসি শিবিরে উপস্থিত হলেন ফরাসি অস্ত্র সংগ্রহ

দেখার জন্যে, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আত্মসমর্পণ প্রস্তাবের পরিবর্তে বরং জেমসের পরিকল্পিত অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সে অভ্যুত্থান জেমসের কাঙ্ক্ষিত উপায়ে ঘটেনি। সিপাহীরা তাদের ঊর্ধ্বতনদের আটক করেছে যখন তারা আত্মসমর্পণ করতে শিবির ত্যাগ করছিল এবং এখন তারা সেনানিবাস প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরও বিপর্যয়কর ব্যাপার হচ্ছে, বিদ্রোহী সিপাহীরা ম্যালকমকে পাকড়াও করে পিরন ও অন্যান্য ফরাসি অফিসারদের সাথে কারারুদ্ধ করে রেখেছে।

জেমস সারাদিন অপেক্ষায় থাকলেন যে, সিপাহীরা বন্দিদের মুক্তি দিয়ে আত্মসমর্পণ করে কিনা। রাতেও কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তাদের মুক্তি দানের। তখন তিনি একটি সিদ্ধান্তে পৌছলেন, যা তার মনে হয়েছিল, শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সিপাহীদের শংকিত করে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করার একমাত্র উপায় বলে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সাড়া পাওয়া গেল যখন মধ্যরাতে জন ম্যালকম পিরন ও অন্য কয়েকজন ফরাসি অফিসারসহ রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হলেন। সিপাহীদের মধ্যে থেকে একটি ছোট গ্রুপ তাদেরকে আটকাবস্থা থেকে মুক্ত করেছে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষত্যাগী ছিল, যারা কোনো একসময়ে ম্যালকমের অধীনে চাকরি করেছে এবং সাবেক অফিসারকে তারা পছন্দ করত।

২২ অক্টোবর সূর্যোদয়ের আগে মুসি নদীর তীরে ফরাসি সেনানিবাসের কাছে আটকে পড়া ব্রিটিশ সৈন্যরা ফরাসি সেনানিবাস ঘেরাও করে তাদের কামান তাক করল ফরাসি অবস্থান থেকে উঁচুতে রেমন্ডের কবরের কাছেই। রেসিডেন্সিতে পৌছা অবশিষ্ট ব্রিটিশ সৈন্যরাও তাদের কামান শক্তিশালী অবস্থানে মোতায়েন করল, পিরনের সেনানিবাস থেকে প্রায় চারশো গজ দূরে। তাদের মাঝখানে শুধু মুসি নদীর ব্যবধান, যে নদীর অতিক্রম করতে পারে শুধু পদাতিকরা। নদীর তীর থেকে কামান কার্যকরভাবে গোলা নিক্ষেপ করতে পারবে।

সকালে ফরাসি বাহিনীর সৈন্যরা জাগ্রত হয়ে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পেল। সকাল নয়টার দিকে জেমস বিদ্রোহীদেরকে তাদের যাবতীয় পাওনা পরিশোধের এবং আত্মসমর্পণ করলে ফিংলাসের বাহিনীতে চাকরির ব্যবস্থা করার প্রস্তাব পাঠালেন। এতে কাজ হলো। তারা এক ঘণ্টার সিকি ভাগ সময়ে তাদের অস্ত্র জড়ো করে নিরাপত্তা সূচক একটি পতাকা উড়িয়ে দিল। জেমসের শর্ত না মানলে অবিলম্বে তাদের ওপর হামলা চালানো হত। সিপাহীরা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত সিদ্ধান্তহীন ছিল। ম্যালকমের নেতৃত্বে দুই হাজার অশ্বারোহী তাদের ডানদিকে অবস্থান নিল। আরও পাঁচশো অপেক্ষায় ছিল। মাঝখানে চার হাজার পদাতিক। বিরাজ করছিল পুরো নিস্তব্ধতা। এরপর ঠিক সাড়ে নয়টায় জেমসের জন্যে স্বস্তির খবর এল যে, সিপাহীরা শেষ পর্যন্ত শর্ত মেনে নিয়েছে।

BanglaBook.org

ব্রিটিশ অশ্বারোহীরা সময় নষ্ট না করে দ্রুততার সাথে অস্ত্রশস্ত্র, গুদাম, বারুদ কারখানা, কামান তৈরির কারখানার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল। ফরাসি সৈন্যরা পতাকার নিচে সমবেত হলো, যেখানে তারা আত্মসমর্পণ করবে। জেমস ভাবলেন, 'কী গৌরবময় এবং একইসাথে করুণ দৃশ্য।' কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতে অবস্থানরত সর্ববৃহৎ ফরাসি বাহিনীর ষোলো হাজার সৈন্যকে নিরস্ত্র করে এক-তৃতীয়াংশের নিচে নামিয়ে আনা হলো সে সংখ্যা। এতে একটি গুলিও খরচ হয়নি। কিংবা একটি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেনি।

জেমস রেসিডেন্সির ছাদ থেকে চোখে দূরবীন লাগিয়ে সারাটা বিকেল ধরে প্রত্যক্ষ করলেন সৈন্যদের অস্ত্র সমর্পণের দৃশ্য। সেই সন্ধ্যায় ক্লান্ত, কিন্তু উৎফুল্ল জেমস তার ভাইকে লিখেন, 'তোমাকে দীর্ঘ চিঠি লেখার মতো অবস্থা এখন নেই...।' কিন্তু তিনি উইলিয়ামকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, 'কীভাবে রেমন্ডের হাজার হাজার সৈন্য অস্ত্র সমপর্ণ করছে। যা আমি আমার বাসভবনের ছাদ থেকে দূরবীন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। এত স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যেন আমি স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত। এ দৃশ্য ছিল আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য।'

দুঘণ্টা পর লিখা এক বিবরণীতে আরও ভালো খবর ছিল : বোম্বে থেকে সদ্যপ্রাপ্ত খবরটি কি উইলিয়াম শুনেছেন। এডমিরাল নেলসনের গৌরবময় নৌ হামলা? নীল নদের যুদ্ধে আবুকির উপসাগরে নেলসন প্রায় পুরো নৌবহরকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। যার পরিণতিতে মিশরে নিরাপদ ঘাঁটি গেছে, সেখান থেকে নেপোলিয়নের ভারত অভিযানের আশা খান খান হয়ে গেছে। পরিস্থিতির অতি চমকপ্রদ মোড় ছিল এ ঘটনা। পূর্ববর্তী দুসপ্তাহ জুড়ে আকস্মিকভাবেই মনে হচ্ছিল ভারত ফরাসিদের উপনিবেশ হতে যাচ্ছে। এখন হঠাৎ করেই আবার দৃশ্যপট পালটে গেছে এবং ফরাসি হুমকির অবসান ঘটেছে। জেমস কলকাতায় লিখেন, ভাবতেই বিস্ময় লাগে যে, মাত্র তিনদিন আগেও পরিস্থিতি যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক ছিল।

পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে লর্ড ওয়েলেসলি জেমসকে লিখেন অভিনন্দন জানিয়ে, তাকে তার ভাইয়ের স্থলে রেসিডেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিক নিয়োগ দিয়ে এবং লন্ডনে লিখে পাঠান তার জন্যে রাজকীয় সম্মান দিতে—যাতে অন্যভাবে বলা যায়, তাকে ব্যারন হিসেবে গণ্য করতে। ওয়েলেসলি অত্যন্ত আনন্দিত—কোম্পানি তাকে পরবর্তী বিশ বছরের জন্যে বার্ষিক পাঁচশো পাউন্ড করে পুরস্কার মঞ্জুর করছে। পুরো কৃতিত্ব আসলে জেমসের। ওয়েলেসলি জেমসকে লিখেন : 'তুমি যে বিচারবুদ্ধি, দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছ, সেজন্যে আমি আনন্দিত।' ইতোমধ্যে ওয়েলেসলি জেমসকে সম্মানসূচক এডিসি নিয়োগ করেন, যা তখন প্রায় অকল্পনীয় এক সম্মান ছিল।

১৭৯৮ সালের ক্রিসমাসের দিনে খবরটি আসে এবং জেমস উইলিয়ামকে লিখেন 'আমার মহামহিম পৃষ্ঠপোষক ও প্রভু ওয়েলেসলির প্রতি আমার

BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আমাকে সম্মানে ভূষিত করার জন্যে। আমি তোমাকে বলতে চাই যে, এজন্যে আমি সামান্যতম গর্বিত নই।'

প্রায় এ সময়েই ১৭৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক সময়ে আরও তাপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে জেমসের জীবনে, যা এক পর্যায়ে জীবনের গতিকে পুরোপুরি পালটে দেয় এবং ওয়েলেসলির সঙ্গে নতুন সম্পর্কও তার কাছে ম্লান হয়ে যায়।

দুই বছর আগে আরিস্তু জাহ যখন পুনায় বন্দি জীবন কাটাচ্ছিলেন এবং মীর আলম নিজামের ব্রিটিশ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা হাতে তুলে নিয়েছিলেন তখন মীর আলম তার এক বয়োবৃদ্ধ পারসিক জ্ঞাতি ভাইকে হায়দারাবাদে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈনিকদের 'বকশি' বা বেতন দানে নিয়োজিত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। তার নাম ছিল বকর আলী খান এবং তার খেতাব ছিল আকিল-উদ-দৌলা বা রাজ্যের সবচাইতে জ্ঞানী ব্যক্তি। বৃদ্ধি কানে একটু কম শুনতেন এবং চোখেও কম দেখতেন। কিন্তু অত্যন্ত মার্জিত এবং হাসিমুখি লোক ছিলেন, যিনি হায়দারাবাদে ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক এবং তিনি গভীর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন এবং উইলিয়াম হায়দারাবাদ ত্যাগ করবার আগে মসলিপতমে তার এক বন্ধুর কাছে বকর আলী খান সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> "এই ভদ্রলোক সকল অফিসারের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তার নিজের যোগ্যতার কারেণে এবং তিনি যে আলমের আত্মীয় সে কারণে। আমাদের জাতির জন্যেও তিনি আন্তরিক এক বন্ধু। তোমার ক্ষমতা অনুসারে তার প্রতি খেয়াল রাখবে, সে অনুরোধ করছি তোমাকে। তুমি তাকে দেখবে হাসিখুশি ও কথা বলার মতো লোক হিসেবে। তোমার যদি ফারসি কবিতার প্রতি দুর্বলতা থাকে, তাহলে তার মতো মজার সঙ্গী আর পাবে না, কারণ বহু বয়েত তার মুখস্থ। রাতের খাবারের পর তিনি তিন গ্লাস মদ পান করেন, যদি তাকে কেউ কু-দৃষ্টিতে না দেখে। মহিলাদের মাঝে তিনি অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল। সংক্ষেপে বলা যায়, তুমি যদিও লক্ষ্মৌর দরবারে গিয়েছো সেজন্যে আমার ধারণা তার সাথে পরিচয়ে তুমি খুশি হবে। এশিয়ানদের মধ্যে তার মতো লোক দুর্লভ।"

বকর আলী খানের এক তরুণী বিধবা কন্যা ছিল, যার নাম শরফ-উন-নিসা। তার স্বামী মেহদী ইয়ার খানের মৃত্যুর পর দুটি কিশোরী কন্যাকে নিয়ে তিনি তার পিতার পরিবারে ফিরে আসেন, যা কিছুটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পিতার মতোই শরফ-উন-নিসাকে ব্রিটিশদের প্রতি অনুরক্ত হিসেবেই দেখা যায়। তিনি কোম্পানির অফিসারদের স্ত্রীদের তার বাসভবনে আমন্ত্রণ

জানাতেন। তারা তার সম্পর্কে বলতেন যে, মহিলা তার সম্প্রদায়ের যাবতীয় কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

যদিও বকর আলী খান শরফ-উন-নিসার দুই কন্যার নানা, কিন্তু তাদের জন্যে তার দায়িত্বশীল থাকার আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবুও বৃদ্ধ অত্যন্ত উদারশীল অগ্রণী হয়ে তার নাতনিদের বিয়ের আয়োজন করেন, যা ভারতে সবসময়ই ব্যয়বহুল একটি ব্যাপার। ১৭৯৮ সালের শেষ দিকে হায়দারাবাদের ওমরাহদের মধ্যে দুই নাতনির বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয় এবং বড় নাতনি নাজির-উন-নিসার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বর মাসে। জেমস কার্কপ্যাট্রিক বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে জেমসের বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং কোনোকিছু ধারণা করার মতো নয়। তিনি শুধু প্রসঙ্গক্রমে উইলিয়ামের কাছে উল্লেখ করেছিলেন যে, বকর আলী খানের স্ত্রী দুরদানা বেগম বিয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্যে তার কাছে কিছু অর্থ ধার চেয়েছিলেন এবং ব্রিটিশদের প্রতি পরিবারটির আনুগত্যের কথা বিবেচনা করে তিনি ধার হিসেবে কাঙ্ক্ষিত অর্থ পাঠিয়ে দেন। উইলিয়ামের কাছে তিনি জানতে চান, 'আমি কি কোনো ভুল করেছি?'

কিন্তু এটা প্রায় নিশ্চিত যে, জেমসের মনে অন্য বিষয়ও আসে যখন তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। কারণ শরফ-উন-নিসার মতে, জেমস ইতোমধ্যে তার সদ্য বাগদত্তা ছোট কন্যা খায়রুন্নিসার অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা কোম্পানির অফিসাদের কারো স্ত্রীর কাছে শুনেছিলেন, যারা তাকে তার মায়ের জেনানায় দেখেছে। এর চল্লিশ বছর পর আশি বছরের বৃদ্ধ শরফ-উন-নিসা স্মরণ করেছেন যে—

> "ইংরেজদের বিষয় তত্ত্বাবধানে নিজামের নিয়োজিত বকশি ছিলেন আমার পিতা। সেই সূত্রে বেশ কিছু ইংরেজ ভদ্রলোক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিতই আসত আমাদের বাড়িতে। এমনি এক অনুষ্ঠানে আসেন কর্নেল ডালাস এবং আরও বিশজন ইংরেজ ভদ্রলোক ও তাদের স্ত্রীরা। ডালাসের স্ত্রী একেবারে অন্তঃপুরে চলে আসেন এবং আমাদের মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমার কন্যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, সে তাকে তার নিজের বোনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর সে আমার কন্যার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে হাশমত জং বাহাদুরের (জেমস কার্কপ্যাট্রিক) কাছে। এরপর কর্নেল কার্কপ্যাট্রিক আমার কন্যাকে কামনা করেন।"

খায়রুন্নিসার তখনকার একটি মাত্র ছবি টিকে আছে, যা ১৮০৬ সালে আঁকা। কর্নেল ডালাসের সম্মানে বকর আলী খানের দেওয়া ভোজের পুরো আট বছর পর। তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর, কিন্তু তাকে দেখে শিশুসুলভ মনে

BanglaBook.org

হয়—সুন্দরী, নমনীয়, লাজুক এক সৃষ্টি, পোর্সেলিনের মতো মসৃণ ত্বক, গোলাকৃতির মুখমণ্ডল, আয়ত কালো চোখবিশিষ্ট। তার ভুরু দীর্ঘ এবং বাঁকা এবং শান্ত মুখ দেখে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে হেসে ফেলবে। মুখে ঠিক নিচে ছোট চিহ্ন, যা তার আসল সৌন্দর্য। মুখের নিচে একদিকে সামান্য সরানো ক্ষুদ্র লাল দাগ, থুতনির ঠিক ওপরেই। তার মুখ দেখে তার নিরীহ ভাব সত্ত্বেও ঠোঁটের ভঙ্গিতে তাকে ছলনাময়ী এবং ঘনকালো চোখে আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

পরবর্তীকালের এক হায়দারাবাদি সূত্র থেকে জানা যায় যে, নাজির-উন-নিসার বিয়ের অনুষ্ঠানেই খায়রুন্নিসাও পর্দার আড়াল থেকে প্রথমবারের মতো জেমস কার্কপ্যাট্রিককে দেখেন—

> "দুর্ঘটনাবশত রেসিডেন্ট এবং বকর আলী খানের নাতনি খায়রুন্নিসা একে অপরকে দেখেন এবং তখনই গভীর প্রেমে পড়েন...বয়োবৃদ্ধ লোকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, কার্কপ্যাট্রিক অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন এবং খায়রুন্নিসার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল পুরো দাক্ষিণাত্য জুড়ে...কিন্তু ধর্মের পাথর্ক্যের কারণে বিয়ে প্রশ্নাতীত ব্যাপার ছিল। মুসলিম আইন অনুসারে একজন মুসলিম পুরুষ কোনো খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু কোনো মুসলিম মহিলাকে খ্রিস্টান পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যাবে না। তদুপরি খায়রুন্নিসা ইতোমধ্যে অন্য কারো বাগদত্তা ছিলেন। কিন্তু তাদের প্রণয়ের কাহিনি জানাজানি হলে একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।
>
> খায়রুন্নিসার আত্মীয়রা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং প্রেমিক প্রেমিকার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের পরস্পরের আবেগ এমন ছিল না যে, ভয় দেখিয়ে বা হতাশার সৃষ্টি করে বিরত করা সম্ভব। তাদের সামনে যে বাধাই এসেছে তা তাদের প্রেমকে আরও প্রবল করেছে...।"

BanglaBook.org

# ৪

প্রাচীন পারসিক শহর শুস্তার আধুনিক ইরান ও ইরাক সীমান্তে অবস্থিত। ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। শহরটির একদিকে জলাভূমি গিয়ে মিলিত হয়েছে দজলা নদীতে, অন্যদিকে শুকনো পাথুরে জাগরস পর্বতশ্রেণি। একটি সরু উপত্যকায় শুস্তার যেন পর্বতের কোলে ঝুলে আছে। ঠিক নিচেই কারুন নদী তার একটি শাখাসহ বয়ে চলেছে।

প্রাচীন যুগে এ শহরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রোমান সম্রাট ভ্যালেরিন ২৬০ সালের যুদ্ধে পারসিক সম্রাট প্রথম শাহপুরকে বন্দি করেন এবং তাকে জীবনের অবশিষ্ট সময় শুস্তারে দাস জীবন কাটাতে হয়, একটি বাঁধ নির্মাণে শ্রম দিয়ে। বাঁধটি এখনও আছে, কিন্তু শহরটি এবং পার্শ্বস্থ এলাকা শ্রী ও সমৃদ্ধিহীন। এককালের উর্বর জমি অনুর্বর পরিত্যক্ত হয়ে গেছে দীর্ঘদিন আগে। দারিদ্র সত্ত্বেও শুস্তার এখনও কোনোভাবে তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। এ শহর বহু প্রজন্ম ধরে কারবালা থেকে লক্ষ্মৌ ও হায়দারাবাদ পর্যন্ত শিয়া জগতে উচ্চ শিক্ষিত কালো পাগড়িধারী সাইয়িদদের প্রেরণ করেছে। তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইউনানী চিকিৎসা ও শিয়া আইনের ক্ষেত্রে। এছাড়া আরও অনেক গুপ্ত রহস্য বিষয়ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের প্রতিভা ছিল। কাব্য ও ক্যালিগ্রাফিতেও তাদের মেধার জন্যে তারা পরিচিত ছিলেন।

১৭৩০ সালের দিকে সাইয়িদ রেজা নামে এক তরুণ শুস্তারি মুজতাহিদ ভাগ্যান্বেষণে মোগল সাম্রাজ্যের উদ্দেশে শুস্তার ত্যাগ করেন। পূর্বমুখী রাস্তা অতি পরিচিত। পারস্যের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ হিসেবে এখনও শুস্তারের যে মসজিদটি টিকে আছে সেটি নির্মিত হয় ৮৬৮ সালে। মধ্যযুগের শুস্তারি বণিকদের ভারত থেকে আনীত কাঠ দ্বারা এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ভারতের বিভিন্ন মুসলিম রাজদরাবারে পারসিকদের স্বাগত জানানো হয়েছে বংশ পরম্পরায়, যেখানে তারা সম্মান লাভ করেছে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক ও সেরা সাহিত্য ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে।

পারসিক বিদ্বান, সৈনিক এবং আরও অনেক পেশার লোকদের কয়েক শতাব্দীর পদাংক অনুসরণ করে সাইয়িদ রেজা দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি মোগল সম্রাটের প্রধান উজির, যিনি নিজেও একজন পারসিক

BanglaBook.org

আবুল মনসুর খান খোরাসানীর অধীনে তার বাসভবনে চাকরি গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে খোরাসানী খেতাব গ্রহণ করেন সফদর জং হিসেবে এবং তার সুন্দর সমাধি এখন দিল্লির অন্যতম দর্শনীয় সৌধ হিসেবে বিবেচিত।

সাইয়িদ রেজা দুই দশক পর্যন্ত মোগল রাজধানীর বিভিন্ন প্রাসাদে কাজ করেন। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্য বিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে অযোগ্য সম্রাটদের আগমনের এবং ক্রমে ক্রমে দিল্লিতে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সাইয়িদ রেজা এ পরিস্থিতিতে শুস্তারে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। করেন। কাবুল ও কান্দাহার হয়ে শুস্তারমুখী রাস্তা যুদ্ধের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এই আশায় যে, সেখান থেকে তিনি পারস্য উপসাগরমুখী কোনো জাহাজ ধরতে পারবেন। কিন্তু হায়দারাবাদে আকস্মিকভাবেই তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে নিজাম আলী খানের পিতা নিজাম-উল-মুলকের। সাইয়িদ রেজার শিক্ষা ও জ্ঞান এবং দৃঢ়তায় নিজাম মুগ্ধ হয়ে তাকে তার পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতেই অবস্থান করতে বলেন। ফলে সাইয়িদ রেজাকে হায়দারাবাদের অবস্থান করতে হয়। তিনি থাকতেন চারমিনারের অদূরেই পারসিক প্রবাসীদের ছোট আবাসস্থল ইরানি গলিতে, জায়গাটি বোখরা বাজারের সরু গলিগুলোর পেছনেই। সেখানে তার স্ত্রী জন্ম দেয় এক পুত্র সন্তান আবুল কাশেমের, ইতিহাস যাকে জানে তার পরবর্তী খেতাব মীর আলম নামে।

বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর সাইয়িদ রেজা সকল জাগতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নিবেদিত হয়েছিলেন নামাজ ও রোজায়। তার এক ভাগ্নের বক্তব্য অনুসারে তিনি সকল সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান, যদিও নিজাম-উল-মুলক তাকে হায়দারাবাদ সরকারের একটি পদ, এমনকি প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার অস্বীকৃতিতে বহাল থাকেন। মৃত্যুর পনেরো বা ষোলো বছর পূর্বে তার মধ্যে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, তিনি নিজেকে অন্যান্যের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেন। ইবাদত কক্ষে একা তার দিন অতিবাহিত করতেন ইবাদত বন্দেগিতে এবং আল্লাহকে অন্বেষণ করে। ১৭৮০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তাকে বিখ্যাত শিয়া দরবেশ শাহ চিরাগের কবরের পাশেই দরিয়া মীর মোমিন নামে খ্যাত গোরস্থানে দাফন করা হয়।

সাইয়িদ রেজার ইন্তেকালের পর চল্লিশ দিনব্যাপী শোক পালনের সময়ই তরুণ মীর আলম প্রথমবারের মতো সাক্ষাৎ করেন আরিস্তু জাহের সাথে। আরিস্তু জাহের বয়স তখন পঞ্চাশের ওপর এবং হায়দারাবাদে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। মীর আলম মাত্র বিশোর্ধ্ব যুবক। শ্রদ্ধাভাজন এক ব্যক্তির মেধাবী কপর্দকশূন্য পুত্র। শোক পালনের তৃতীয় দিবসে আরিস্তু জাহ স্বয়ং যোগ দিতে আসেন শোকে এবং তিনি সাইয়িদ রেজার পুত্রকে এক পাশে ডেকে

BanglaBook.org

নিয়ে তাকে তার পিতার সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করেন। মীর আলম চমৎকার একটি ফারসি কবিতার উদ্বৃতি দিয়ে উজিরের বিজ্ঞতার প্রশংসা করেন। আরিস্তু জাহের চোখ অন্বেষণ করে ফিরত মেধাবীদের এবং ফারসি কাব্যের অনুরাগী ছিলেন তিনি। তার উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয়নি যে, এই যুবক প্রতিশ্রুতিশীল। অতএব তিনি তাকে দরবারে আমন্ত্রণ জানান, তার একান্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ করেন এবং চিঠি ও কার্যবিবরণী তৈরির দায়িত্ব প্রদান করেন।

মীর আলম ছোটখাটো গড়নের এবং আরিস্তু জাহের পাশে দাঁড়ালে তাকে আরও খাটো মনে হত। কারণ আরিস্তু জাহ দীর্ঘদেহী এবং বিপুল বপুসমৃদ্ধ ছিলেন। কিন্তু মীর আলমের বৃদ্ধিদীপ্ত চেহারা, খাড়া নাক এবং হালকা তা দেওয়া গোঁফ তাকে গুরুগম্ভীর মনে হত। পারসিক বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে তার গায়ের রং উজ্জল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতর্ক প্রকাশভঙ্গির কারণে লোকজন তার প্রতি আকৃষ্ট হত। মনে হত যেন তিনি সদা সতর্ক, কোনো সুযোগের জন্যে অপেক্ষামান। কিছু ইউরোপীয় তার সাথে সাক্ষাতের পর এ উপসংহারে উপনীত হয়েছে যে, দরবারে এক চতুর ও উচ্চাভিলাষী যুবকের আবির্ভাব হয়েছে। জেমস কার্কপ্যাট্রিক মীর আলমের সাথে তার প্রথম সাক্ষাতেই বিমুগ্ধ হন এবং ওয়েলেসলিকে লিখেন, 'বিদ্বান হিসেবে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং কাজের মানুষ হিসেবে তার সমযোগ্যতার লোকও খুব কম আছে...তার কাজের ধরন, মর্যাদাবোধ অত্যন্ত শক্তিশালী। সে তার কলম সবসময় কাজে ব্যস্ত রাখে রাজ্যের গুরত্বপূর্ণ দলিল তৈরিতে।'

কিন্তু মসলিম ইতিহাসবিদরা মীর আলমের যোগ্যতাকে তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি। তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও সামর্থ্য সত্ত্বেও তার মাঝে অনুভূতির অনুপস্থিতি ছিল, যেন তার হৃদয়ের কোথাও এক ধরনের শীতলতা ক্রিয়াশীল। বয়স বৃদ্ধির সাথে মীর আলমের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তার এই দুর্বলতার বিষয়টিও আরও বেশি চোখে পড়ে। জেমসের সহকারী হেনরি রাসেল, যিনি পরবর্তীতে মীর আলমকে ভালোভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন তার মনে মীর আলমের যোগ্যতা এবং লেখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সামর্থ্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মীরের কঠোরতাকে তিনি অস্বাভাবিক বিবেচনা করে লিখেছেন, 'হৃদয়গ্রাহী গুণের ঘাটতি আছে তার মধ্যে এবং অদ্ভুতভাবে তিনি আবেগবর্জিত। তিনি তার কর্তব্যের কথা যেমন মনে রাখেন না, তেমনি তার প্রতিপক্ষকে বিস্মৃত হন না। যদিও তিনি নিজেকে জনপ্রিয় বলে মনে করেন এবং অন্যের কাছ থেকে শুভেচ্ছা আশা করেন, কিন্তু তার সহকর্মী বা বন্ধুদের প্রতি সহানুভূতি বা আবেগ প্রকাশ করেন না। সেটি ব্যক্তিগতভাবেই হোক আর যৌথভাবেই হোক।'

BanglaBook.org

তবুও বলা যায়, মীর আলম তার বন্ধু ও পরিবারের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মীর আলমের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও সাফল্যের কথা যখন শুস্তারে তার আত্মীয়দের কাছে পৌঁছাল তখন তাদের অনেকেই ইরান থেকে হায়দারাবাদদে আসার সিদ্ধান্ত নেন তার অধীনে চাকরির আশায়। তাদের মধ্যে ছিলেন তার প্রথম ফুফাতো ভাই বকর আলী খান। তিনি ছিলেন সাইয়িদ রেজার বড় বোনের পুত্র। যিনি মীর আলমের চাইতে প্রায় বিশ বছরের বড়। মীর আলম বকর আলী খানকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে প্রথমে 'মনসবদার' হিসেবে নিয়োগ করেন। এরপর হায়দারাবাদের অত্যন্ত শক্তিশালী এক পরিবারের সুন্দরী কন্যা দুরদানা বেগমের সাথে বিয়ে দেন। যথাসময়ে তার দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একটি পুত্র মেহমুদ আলী খান এবং অপরটি কন্যা শরফ-উন-নিসা। এই শরফ-উন-নিসাই খায়রুন্নিসার মা।

১৭৮৭ সালে আরিস্তু জাহ তার একান্ত সচিবকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে বাংলায় অবস্থিত কোম্পানির সদর দফতরে পাঠান। বকর আলী খান এই মিশনে মীর আলমের সাথে কলকাতায় যান। তাদের সাথে ছিল বিরাট অশ্বারোহী দল, সাতটি সুসজ্জিত হাতি এবং উপহার ও রসদ সামগ্রীবাহী সত্তরটি উট। কলকাতায় হায়দারাবাদের দূতকে অভ্যর্থনা জানান লর্ড কর্নওয়ালিস। গভর্নর জেনারেলের বন্ধুত্বের আগ্রহ দেখে মীর আলম বিমুগ্ধ হন। কর্নওয়ালিস মীর আলমকে হীরক বসানো একটি ছড়ি উপহার দেন।

মীর আলম ও তার জ্ঞাতি ভাই বকর আলী খান তিন বছর কলকাতায় অবস্থান করেন এবং ইংরেজদের আচার আচরণে অভ্যস্ত হন। ইংরেজ অফিসার ও শহরের প্রাচ্যবিদদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক যোগসূত্র স্থাপন করেন। তারা বিশেষভাবে নীল এডমস্টোনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন, যিনি পরে ওয়েলেসলি একান্ত সচিব ও কোম্পানির গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হয়েছিলেন। তারা তাকে একজন চমৎকার সংগীতশিল্পী ও গণিতবিদ হিসেবে দেখেছেন। ফোর্ট উইলিয়ামে সামরিক সম্ভার দেখে তারা অবাক হন : 'ভালোভাবে সংরক্ষিত তিন হাজার রাইফেল ঝুলছে, যেগুলো সংগ্রহ করা সহজ। বারুদখানা পূর্ণ উদ্যমে কাজ করছে। দুই থেকে তিন হাজার কামান সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আরও পাঁচ থেকে ছয় হাজার কামান ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় সংরক্ষিত আছে।' এই পরিদর্শন মীর আলমের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তার কর্মজীবনের পরবর্তী সময়েও তিনি সব সময় মনে করতেন যে, ভারতে ব্রিটিশরা যথার্থই অজেয় বাহিনী এবং হায়দারাবাদ ও মীর আলমের স্বার্থ বিপুলভাবে নির্ভর করে তাদের সাথে যতটা শক্তিশালী ও ঘনিষ্ঠ মিত্রতা স্থাপন করা যায়, তার মধ্যে।

BanglaBook.org

মীর আলম ও বকর আলী খান যখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন তখন তারা শুনতে পান যে, তাদের বংশের আরও একজন সদস্য একটি ব্রিটিশ জাহাজযোগ্যে সদ্য উপস্থিত হয়েছে। তার নাম মীর আবদুল লতিফ শুস্তারি, মীর আলমের আকের চাচাতো ভাই। বকর আলীর মতো তিনিও পারস্য থেকে যাত্রা শুরু করেন মীর আলমের মতো ভাগ্য গড়া যায় কিনা সেই লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু তিনি বকর আলীর মতো শুধু চাকরিতে নিজেকে ব্যস্ত না রেখে তার ভারত সফর ও অভিজ্ঞতার ওপর বিস্তারিত ও উপভোগ্য একটি বিবরণী লিখেছেন 'তুহফাত-আল-আলম' গ্রন্থে—

> "আমি সবেমাত্র ভারতে পৌঁছেছি। আমার আগমনের খবর পাওয়া মাত্র মীর আলম দুই তিন দিন ধরে আমার অবস্থানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে খুঁজে বের করেন। তিনি যখন শহরে থাকেন আমি অধিকাংশ সময় তার সাহচর্যে কাটাই। তার ভ্রাতৃসুলভ অনুগ্রহই আমাকে ভারতে আসার মতো ভয়ঙ্কর উদ্যোগ নিতে উৎসাহী করেছে...আমার এই জ্ঞাতি ভাই দাক্ষিণাত্যের অন্যতম এক আমির হয়েছেন এবং আরব ও পারস্যের বহু দরখাস্তকারী তার সমীপে উপনীত হচ্ছে। লোকজনের এহেন চাপের মধ্যে তিনি মেজাজ খারাপ করেন না এবং সবসময় তাদের সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা সমস্যাকে তরবারির আঘাতে মতো সমাধান করে।"

শুস্তারির 'তুহফাত-আল-আলম' সে যুগের বিবরণী চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছে। একজন হতাশা বিক্ষত প্রবাসী বুদ্ধিজীবীর লিখিত অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনার মতো, যেন ভি. এস নাইপলের লিখা অষ্টাদশ শতাব্দীর পারসিক সংস্করণ। শুস্তারি গ্রন্থটি লিখেন ১৮০২ সালে, যখন তিনি গৃহবন্দি ছিলেন খায়রুন্নিসার সাথে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের প্রণয়ঘটিত কেলেংকারির সূত্রে। পুরো শুস্তারি গোষ্ঠীই তখন অত্যন্ত অমর্যাদাকর অবস্থায় পতিত হয়েছিল। তখন ভারতের জন্যেও অনুকূল কোনো সময় ছিল না। আবদুল লতিফ শুস্তারি লিখেছেন, 'আমি এদেশে আসার পর থেকে যে দুর্ভোগ, যাতনা, রোগব্যাধির শিকার হয়েছি তা বলার মতো নয়। এমনকি কথা বলার মতো বুদ্ধিমান কোনো লোককে পর্যন্ত পাইনি।...হায়, কী করে আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল যে, পরিস্থিতি বর্তমান বিপর্যয়মূলক অবস্থায় উপনীত হবে—হায়দারাবাদের নরকতুল্য এই পরিবেশে আমি আটকা পড়েছি।'

এই অবস্থায় তিনি তার বইটিকে তুলনা করেছেন, 'ভারতের অন্ধকার খাঁচায় আটক ব্যর্থ কান্নায় পাখা ঝাপটানো পাখির' সাথে। তিনি মন্তব্য করেছেন, হায়দারাবাদে টিকে থাকতে হলে চারটি জিনিসের প্রয়োজন : 'প্রচুর সোনা, সীমাহীন ভণ্ডামি, ব্যাপক হিংসা এবং ভুঁইফোড় ব্যক্তিদের তোষামুদ

BanglaBook.org

করার সামর্থ্য—যারা সরকারের তোয়াক্কা করে না এবং প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন পরিবারকে ছুঁড়ে ফেলতে পারে।' সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ও বুদ্ধিবৃত্তিক একগুঁয়েমির উপস্থিতি সত্ত্বেও 'তুহফাত' নিঃসন্দেহে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে লেখা, যা হায়দারাবাদ দরবারের ষড়যন্ত্র ও উপদলীয় কোন্দলের চিত্র সমসাময়িক যে কোনো বিবরণীর চাইতে অনেক বেশি প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছে।

তাছাড়া, খায়রুন্নিসার পরিবারের একটি বিরাট অংশ কীভাবে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের সাথে তার প্রণয়কে মূল্যায়ন করেছে তা জানার সবচেয়ে ভালো উৎস এটি।

আবদুল লতিফ শুস্তারির ভারত যাত্রা শুরু হয়েছিল ঝামেলার মধ্যে দিয়ে। সহজে বিরক্ত হয়ে পড়া এই পারসিক মসলিপতমে পৌঁছার পর তাকে শুভেচ্ছা জানানোর দৃশ্যের আতঙ্কজনক বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে বসবাসকারী ইরানি কিজিলবাস ব্যবসায়ীদের একটি দল তাকে স্বাগত জানায়। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আমি দেখে অত্যন্ত আহত হই যে, প্রায় উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলারা রাস্তায় ও বাজারে যৌনকর্মে লিপ্ত, দেশের অন্যান্য স্থানেও একই দৃশ্য, ঠিক পশু বা কীটপতঙ্গের মতো। আমি আমার অভ্যর্থনাকারীকে প্রশ্ন করি, 'এসব কী ঘটছে?' তিনি উত্তর দেন, 'স্থানীয় লোকজন এসব করছে। তারা এমনই।' আমি প্রথম পা রেখেছি ভারতে, কিন্তু ইতোমধ্যে আমি এখানে আসার কারণে অনুতাপ করছি এবং গ্লানি অনুভব করছি।'

কলকাতা বরং শুস্তারির ভালো লাগে। তিনি কোম্পানির বণিকদের সাদা রং করা মনোরম ভিলা, যেগুলোর কোনো কোনোটি মার্বেল পাথরের মতো রং করা—সেসবের প্রশংসা করেন। মসলিপত্তমের নোংরা পরিবেশে বিরক্ত শুস্তারি কলকাতার ব্যতিক্রমী পরিচ্ছন্নতাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন : 'রাস্তা ও বাজারের জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্যে কোম্পানি সাতশো জোড়া বলদ ও গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। তারা আবর্জনা বয়ে শহরের বাইরে নদীতে নিক্ষেপ করে।'

শুস্তারির বর্ণনার পুরোটাই বিস্ময়করভাবে ইংরেজ প্রীতিতে পূর্ণ। কারণ তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং ব্রিটিশের প্রযুক্তিগত সাফল্যের প্রশংসা করেছেন। 'তুহফাত' বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছে, যার মধ্যে মেরু অঞ্চল অনুসন্ধান, আপেক্ষিকতত্ত্ব, চৌম্বক শক্তি, মানুষ ও বানরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তুলনা, এমনকি নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কেও আলোচনা আছে, যে বিষয়গুলো তিনি উল্লেখ করলেও বিস্তারিত আলোচনাকে প্রাধান্য দেননি, তার গ্রন্থের জন্যে অনুপযোগী বিবেচনা করেছেন। আরও একটি বিষয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, এই যুগের ব্রিটিশরা ভারতের শিক্ষিত লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

BanglaBook.org

"তারা মুসলিম ও হিন্দু নির্বিশেষে শুভ্র দাড়ি বিশিষ্ট বয়োবৃদ্ধ লোক ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত পরিবারের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে। দেশের ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পণ্ডিত, সাইয়িদ, শেখ ও দরবেশদেরকেও তারা শ্রদ্ধা করে। আরও লক্ষণীয় যে, তারা স্বয়ং মুসলিম ও হিন্দুদের সকল উৎসবে অংশগ্রহণ করে, লোকজনের সাথে সহজে মেশে। মহররম মাসে তারা তাজিয়াখানায় প্রবেশ করে, যদিও তারা শোকে অংশ নেয় না। যে কোন ধর্মের অনুসারী পণ্ডিত ও বিদ্বানদের তারা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।"

ব্রিটিশদের মধ্যেও নিশ্চয়ই পার্থক্য এবং তাদের মনেরও প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু আবদুল লতিফ শুস্তারির মতে পারসিকদের কাছে তাদের অনেক শিক্ষণীয় ছিল। যেমন—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং উচ্চতর সংস্কৃতি। শুস্তারি বিশেষভাবে আতঙ্কিত হয়েছেন ব্রিটিশদের চুলের অবস্থা দেখে। 'তারা তাদের দাড়ি কামায়, চুল মোচড়িয়ে বেণী বাঁধে এবং চুলে এক ধরনের গুঁড়া মাখে, যাতে তাদের চুল সাদা দেখায়।' শুধু এর মধ্যে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেননি। আরও লিখেছেন, 'তাদের পুরুষ বা নারী কেউ যৌনকেশ ছাঁটে না, যার ফলে স্বাভাবিকভাবে এগুলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।'

শুস্তারির মতে ইউরোপীয় মহিলারা বিশেষভাবে ভীতকর, অনৈতিক এবং মাথামোটা সৃষ্টি। তিনি লিখেছেন—

"অধিকাংশ ইউরোপীয় মহিলার দেহে কোন লোম নেই। যদি কখনো লোম গজায়ও তাহলে সেগুলো মদিরার রঙের, কোমল এবং খুবই সুন্দর...। মহিলারা বেপর্দা ঘুরাফিরা করে, ছেলে ও মেয়েরা এক সাথে এই স্কুলে পড়াশুনা করে এবং খুবই স্বাভাবিক যে, তারা প্রেমে পড়ে। আমি শুনেছি যে, অনেক ক্ষেত্রে ভালো বংশে জন্মগ্রহণকারী মেয়েরা নিচু বংশের যুবকদের প্রেমে পড়ে এবং কেলেংকারিতে রূপ নেয়, যা কোন হুমকি বা শাস্তি দ্বারাও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এক পর্যায়ে তাদের পিতারা তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। মেয়েরাও নিজ নিজ মর্জি অনুযায়ী চলে, যার সাথে খুশি জড়িয়ে পড়ে। লন্ডনের রাস্তা ও বাজারে অসংখ্য সদ্বংশজাত মেয়ে রাস্তার পাশে বসে থাকে। বেশ্যালয়গুলো বিজ্ঞাপন দেয় দরজায় বেশ্যাদের ছবি টানিয়ে এবং বেশ্যার সব বর্ণনার সাথে এক রাত্রিযাপনের মূল্যও উল্লেখ থাকে।"

শুস্তারির বিশ্বাস, এটি আমেরিকানদের বিভ্রান্তির পরিণতি। বাস্তবিক পক্ষে আবদুল লতিফ শুস্তারির প্রথম মুসলিম লেখক হিসেবে ইতিহাস ঘাঁটা প্রয়োজন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অনৈতিক বিষয়াদির উল্লেখ করার ক্ষেত্রে। তার সময়ের ১৮০ বছর আগে এ ধরনের দৃষ্টান্ত আছে—

BanglaBook.org

> "পাশ্চাত্যে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে অপরিচিত লোকদের সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত রাখতে পারে না।...কিন্তু শুধুমাত্র আমেরিকা বিজয়ের পর ফ্রান্সে মহিলাদের প্রকাশ্যে বসে থাকার বিষয়টি মেনে নেয়ার অসম্মানজনক অভ্যাস ক্রমে ইউরোপের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপ, তামাক, বসন্ত এবং যৌনব্যাধি যা পাঁচ বছর আগেও আমেরিকা ছাড়া বিশ্বে অজ্ঞাত ছিল, সেখান থেকে সেসব সমস্যা অবশিষ্ট বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।"

ভারত পুরোপুরিভাবেই আমেরিকার আতঙ্কের সাথে তুলনীয় ছিল। গুস্তারি উপমহাদেশের বহু বিষয়েই তার ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তার আসল বিষ সংরক্ষিত ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে। কারণ তিনি দেখেছেন, এরা দেশিয় হয়ে গেছে এবং হিন্দুদের বিয়ে করছে অথবা মুসলমানরা হিন্দুতে দীক্ষিত হচ্ছে। হিন্দুদের প্রথাই যে শুধু গ্রহণ করছে তা নয়, তাদের অনৈসলামী অনৈতিকতার সাথেও নিজেদর মিশিয়ে নিয়েছে। তিনি লিখেছেন, "তারা হিন্দুদের হাত থেকে পানি নেয়, তাদের কাছ থেকে তেল কিনে ব্যবহার করে, তাদের রান্না করা খাবার খায়—অন্যদিকে ইংরেজদের সাথে যোগযোগ স্থাপন এড়িয়ে চলে, যারা অন্তত চেহারার দিক থেকে কেতাবে উল্লেখিত মানুষের মতো এবং যারা ধর্ম ও আইনকে শ্রদ্ধা করে।"

একটি মাত্র বিষয় গুস্তারিকে আতঙ্কিত করেছে, তা হচ্ছে ভারতে পুরুষদের চাইতে মহিলাদের আচরণ। হিন্দু ও মুসলিম রমণী নির্বিশেষে তারা সৌন্দর্যবোধ জানে না বলে তার চোখে ধরা পড়েছে এবং তারা তাদের কল্পনায় আসে এমন যাবতীয় স্বাধীন আচরণ করে। মুনি বেগম সম্পর্কে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন, যিনি বাংলার মুর্শিদাবাদ নামে এক রাজ্যের কার্যত শাসক। তার মতে, 'তিনি বর্তমান শাসকের স্ত্রী নন, এমকি ভালো বংশেও তার জন্ম হয়নি। জাফর আলী খানের (বাংলার নবাব) গায়িকা রক্ষিতা তিনি এবং তার প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিলেন নবাব এবং পরম দাতা তার জন্যে সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছিলেন।'

মোগল ভারতের শেষ দিকে মহিলাদের ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠার ঘটনায় গুস্তারির বিস্ময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলাম কখনো স্থির ছিল না এবং সবসময় সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মহিলাদের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজে তাদের অবস্থান, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, তাদের যৌনজীবন সবকিছু মধ্যপ্রাচ্য উদ্ভূত ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু ভারতের শত শত বছর ধরে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের ফলে দুই বিপরীত আদর্শ ও সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় ঘটেছে। অতএব হিন্দুরা যেমন ইসলামের সামাজিক কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে, অনুরূপ উচ্চ শ্রেণির রাজপুত্র রমণীরা প্রকাশ্যে যে পর্দা পালন করত, হিন্দু পরিবেশে

BanglaBook.org

ভারতীয় মুসলমানরা তা গ্রহণ করেছে। ভারতে মুসলিম শাসকরা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করার ফলে এই প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।

এ পরিস্থিতি মোগল ভারতের দরবার সংস্কৃতি এবং সাফাভি ইরানের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক ব্যবধানের চাইতে ব্যাপক ছিল। ইরানে মহিলারা যতটা নিজেদের ঘরে আবদ্ধ রাখে এবং প্রকাশ্য তৎপরতায় অংশ নেয়, তার বিপরীত চিত্র দেখা যায় ভারতে। এজন্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব, পর্দা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মেয়েদের বিচ্ছিন্ন ও নিরাপত্তাধীনে থাকার বিষয়গুলো জড়িত। এর ফলে মুসলিম মহিলারা ভারতে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রাজনীতিতে, যা মধ্যপ্রাচের মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ভারতে হিন্দু ও মুসলিম উভৎয় সমাজ অত্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক এবং পদমর্যাদার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তা সত্ত্বেও ভারতে শক্তিশালী মুসলিম রানীর আবির্ভাব দেখা যায়! ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লির সুলতানা রাজিয়া অথবা ষোড়শ শতাব্দীর বিজাপুরে দুই মুসলিম যোদ্ধা রানী চাঁদ বিবি ও দিলশাদ আগার কথা, যাদের প্রথম জন অশ্ব চালনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয়জন গোলন্দাজ হিসেবে ছিলেন অতুলনীয়। তীরন্দাজীতেও তার জুড়ি ছিল না, বিশেষ করে দুর্গের চূড়া থেকে তার রাজ্য হামলাকারী সফদর খানের চোখে নিশানা করে তীর বিদ্ধ করে তার দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

তাছাড়া মোগল শাহজাদিরাও বহুগুণে সমৃদ্ধ ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সীমাহীন ক্ষমতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন, যা আবদুল লতিফ গুস্তারির পর্দায় বাস করা ইরানি অভিজাত মহিলার দেখাতে পারেননি। শাহজাহানের অধীনে মোগল দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ সৌধগুলোর অর্ধেক নির্মিত হয়েছে মহিলাদের দ্বারা, বিশেষ করে শাহজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারা এককভাবে নির্মাণ করান বেশ কিছু প্রাসাদ, একটি উদ্যান, হামাম খানা এবং প্রাসাদোপম সরাইখানা। চাঁদনি চকের প্রধান রাস্তাটির ধারণাও তারই।

অভিজাত রুচির মোগল রমণীরা তাদের ইরানি ভগ্নিদের চাইতে অধকতর শিক্ষিত ছিলেন বলে মনে হয়, তাদের প্রায় সবাই শিক্ষিত, প্রাসাদে বয়স্ক পুরুষ শিক্ষক অথবা শিক্ষিতা মহিলার তাদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, যার মধ্যে নীতিবিদ্যা, গণিত, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, যুক্তিশাস্ত্র, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, আইন কাব্য ও জ্যোতির্বিদ্যা অন্তর্ভূক্ত ছিল। ফলে বহু সংখ্যক ভারতীয় মুসলিম শাহজাদি বিখ্যাত লেখিকা ও কবি হিসেবে খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুনের বোন গুলবদন তার ভাইয়ের জীবনী 'হুমায়ুননামা' লিখেছেন এবং তার বহু পরের উত্তরাধিকারী জাহানারা বিখ্যাত ভারতীয় সুফি সাধক মুইন-উদ-দীন চিশতির জীবনী লিখেছেন। এছাড়া তার বেশ কয়েক খন্ড কাব্যগ্রন্থও আছে এবং নিজের কবরগাত্রের লেখাটিও তিনি স্বয়ং লিখে গিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব কন্যা

জেবুন্নিসার পাণ্ডিত্য ছিল আরও বেশি। 'মা'সির-ই আলমগিরি' অর্থাৎ আওরঙ্গজেরবের শাসনকালের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেবুন্নিসা কোরআন মুখস্থ করেছিলেন এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় তার দখল ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন ধাঁচের ক্যালিগ্রাফি তার আয়ত্তে ছিল। তার হৃদয় পড়ে থাকত গ্রন্থ সংগ্রহ, পাঠ ও লিখে রাখতে। তিনি তার সংগৃহীত গ্রন্থের একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন যা কোনো পুরুষ দেখেনি। বহু ধর্মতত্ত্ববিদ, বিদ্বান, ধার্মিক লোক, কবি ও ক্যালিগ্রাফার তার কাছে আসতেন তার সঙ্গে আলোচনা করতে।

এধরনের বিষয়গুলো বিপজ্জনক ছিল বলে শুস্তারি মনে করতেন। কিন্তু অতি শিক্ষিতা ও স্বাধীনচেতা মহিলাদের আচরণ তার কাছে আঘাতের মতো ছিল। সময়কালে তিনি বেশি শংকিত হয়েছেন ইংরেজদের সাথে মুসলিম-হিন্দু মহিলাদের প্রণয় ও আন্তঃবিবাহের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তিনি লিখেছেন—

> "অনৈতিক হিন্দু ও মুসলিম মহিলাদের তারা দুর্নীতিগ্রস্থ করেছে। মহিলারা স্বেচ্ছায় ইংরেজদের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ইংরেজরা তাদের কার্যে কোন হস্তক্ষেপ করে না অথবা তাদের অবগুণ্ঠন ত্যাগেও বাধ্য করে না। তাদের মিলনে যদি কোন পুত্রের জন্ম হয় তাহলে তাকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শিক্ষার জন্যে। কিছু কন্যাকে তাদের মায়ের সাথে রেখে দেওয়া হয় তাদের নিজেদের পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিতে এবং পরে কোন মুসলিম যুবকের সাথে সেসব কন্যার বিয়ে দিয়ে সেই যুবককে কোনো চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। পিতা ও কন্যার জন্যে তাদের উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু প্রাপ্য দেয়। সন্তানরা তাদের নিজেদের মর্জি অনুসারে চলার উপযুক্ত হলে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তারা কোন ধর্ম গ্রহণ করবে।"

এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে ঔপনিবেশিক কোনো দৃষ্টান্ত নয়, বরং ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অংশ। রাজকীয় ভারতে শাসকদের বিনোদনের দীর্ঘকাল ধরে পুষে রাখা একটি উপায় ছিল অধিক সংখ্যক স্ত্রী ও রক্ষিতা রাখা। ব্রিটিশরা উপমহাদেশে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্যে ভারতীয় রাজ পরিবারগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের তরুণীদেরকে ইংরেজদের সাথে বিয়ে দিতে থাকে। ব্রিটিশরাও, বিশেষ করে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আগে থেকেই অন্তর্ভূক্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্টরা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার বাড়তি সুবিধা হিসেবে আন্তঃবিবাহের এই সুযোগকে গ্রহণ করে। উইলিয়াম লিনেয়াস গার্ডনার এ ব্যাপারে অত্যন্ত খোলামেলা ছিলেন। তিনি তার পছন্দসই মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে নিবেদন করলে তা সেই মহিলার পরিবার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যেহেতু গার্ডনার প্রভাবশালী ব্যক্তি, অতএব তার অনুরোধ ফেলে দেওয়ার মতো নয় বিবেচনা করে তরুণী রাজকুমারীর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।'

BanglaBook.org

ব্রিটিশ পুরুষ ও ভারতীয় মহিলাদের এধরনের অব্যাহত বৈবাহিক সম্পর্কের ঘটনা এবং এ পরিস্থিতির কারণে গুস্তারির শংকিত দৃষ্টিভঙ্গি শুধু নারী পুরুষের ভিন্ন বংশগত ব্যাপার ছিল না, বরং রোমান্টিক প্রেম ও যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত ও ইরানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির গভীর পার্থক্যের কারণে ছিল। ভারতে যৌনতাকে সমসময় বিবেচনা করা হত বৈধ ও মুগ্ধ ঔৎসুক্য হিসেবে এবং নন্দনতত্ত্বের শিক্ষার অনিবার্য অংশ হিসেবে দেখা হত। শৃঙ্গার রস হিন্দু নন্দনতত্ত্বের নয়টি 'রস'-এর একটি। হিন্দু ও মুসলিম দরবারের অসংখ্য মিনিয়েচার চিত্রে সে কারণেই বিব্রতকর কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেখা যায় নি যখন সেসব চিত্রের এই 'রস'-এর সম্ভাব্য পূর্ণ আনন্দকে চিত্রে রূপ দেওয়া যায়। মধ্যপ্রাচ্যে আচরিত ইসলামের কঠোরতর ব্যাখ্যা অনুসারে কোনো ধরনের ছবি বা মুর্তি তৈরির নিষেধাজ্ঞা থেকে এসব সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মদ্যে প্রেম ও যৌনতা সম্পর্কিত বহু হিন্দু ক্লাসিকস ফারসিতে অনুবাদ করা হয়, ভারতীয় মুসলিম শাহজাদা ও শাহজাদিদের ব্যবহারের জন্যে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এসবের চর্চা হয়েছে দাক্ষিণাত্যের বহু সভ্যতার মিশ্রণে গড়ে ওঠা ও তুলনামূলকভাবে ইসলামের নমনীয় ব্যাখ্যার অনুসরণে পরিচালিত বিদর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মতো মুসলিম রাজ্যে। এসব স্থানে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনূদিত হয়ে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে যৌনসুখ লাভের উপায় সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ 'কামসূত্র' এবং 'শ্রীঙ্গার মঞ্জরি' যার শাব্দিক অর্থ 'যৌন পরিতৃপ্তির উপহার'। এসবের কোনো কোনোটির অনুবাদ হয়েছে ফারসি অথবা দাক্ষিণাত্যের উর্দুতে। তাছাড়া ভারতীয় মুসলিম লেখকরা প্রাসাদ গ্রন্থাগারের শেলফে যৌন বিষয়ক নতুন গবেষণাকর্ম সংযোজন করেছেন তাদের গ্রন্থ 'লাজাত-আল-নিসা' (নারীর পরিতৃপ্তি) এবং 'তাহকিরাত-আল-শাহাওয়াত' (কামোদ্দীপক গ্রন্থ)। দুটি গ্রন্থই বহুল পঠিত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত।

অন্যান্য গ্রন্থে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধির উপাদানে সমৃদ্ধ বৃক্ষ সমন্বয়ে একটি প্রমোদ উদ্যান গড়ে তোলা অথবা 'ইতর-ই নওরাস শাহী' অর্থাৎ কি করে প্রাসাদের একঘেঁয়েমি কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও পরম যৌন পরিতৃপ্তি লাভের উপযুক্ত সুগন্ধি দ্বারা প্রাসাদকে ভরে তোলা যায় তার উপায় প্রদর্শনমূলক নির্দেশিকা। সে জন্যে তীব্র সুগন্ধিযুক্ত গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের তোড়া কক্ষের বিভিন্ন উচ্চতায় স্থাপন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া লেখক অম্লগন্ধী ও বেলি ফুলের সুবাস সম্বলিত আগরবাতি জ্বালানো, বিছানার চাদর মাঝেমধ্যে তুলে রাখা যাতে সুগন্ধি মিশে যেতে পারে, যা উত্তেজনা বৃদ্ধি ও পূর্ণ পরিতৃপ্তি দানে সহায়ক হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

BanglaBook.org

শুধুমাত্র যৌন পরিতৃপ্তি লাভের তত্ত্বই নয়, সফর বিবরণী থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইরানের চাইতে ভারতের দৈনন্দিন জীবনে ও আলোচনায় যৌনতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনেক বেশি প্রকাশ্য ভূমিকা পালন করেছে। উপমহাদেশে বেড়াতে আসা পর্যটকেরা মোগল প্রাসাদে রোমান্টিক সম্পর্কের কাহিনি নিয়মিতই তাদের দেশে বয়ে নিয়ে গেছেন বিশেষ করে 'খানজাদা' ও 'সালাতিনদের সম্পর্কিত কাহিনি অর্থাৎ প্রাসাদে জন্মগ্রহণকারী শাহজাদাদের কথা, যারা হারেমে শিশুদের মতো অবাধে যাতায়াত করত এবং তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর হারেমে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। 'সালাতিন' অর্থাৎ রাজকন্যারা, যাদের বিয়ে কোনো রাজ পরিবারেই হবে তাদেরকে প্রস্তুত করা হয় তাদের মর্যাদার পুরো সুযোগ নিতে। সপ্তদশ শতাব্দীর ভেনেসীয় পর্যটক ও হাতুড়ে চিকিৎসক নিকোলাও মানুচির মতে, 'উপযুক্ত খেতাবের আড়ালে এসব শাহজাদি ও অন্যান্য রাজ মহিষীরা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে থাকেন।'

এটি যদি মোগল ভারত সম্পর্কে সাধারণভাবে সত্য হয়ে থাকে, তাহলে শেষ দিকের মোগল ভারত অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী অংশ পর্যন্ত আরও বেশি সত্য। আওরঙ্গজেবের চাপিয়ে দেওয়া ইসলামের পবিত্রতা বিধানের যুগের অবসান হওয়ার পর এবং নিজাম-উল-মুলকের যুগে দৃষ্টিভঙ্গি পুরো পালটে যায়। নিজাম আলী খান তার প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে একটি বিভাগ পর্যন্ত চালু করেন নৃত্য, সংগীত ও যৌনশাস্ত্র বিকাশের মতো বিষয়গুলো তত্ত্বাবধানের জন্যে। যে বিভাগের নাম ছিল 'দফতর আরবাব-ই-নিশাত' (প্রমোদের বিধাতার অফিস)। একই সময়ে যৌন বিষয়ক চিত্র ও সাহিত্য চর্চার বিস্ফোরণ ঘটে দিল্লি, লক্ষ্ণৌ ও হায়দারাবাদে। এ সময়ের কাবরা যৌন বিষয়ক ধৃষ্টতাপূর্ণ কিছু কাব্য সৃষ্টি করেন, যা সতেরো শত বছর পূর্বে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের সমাপ্তির পূর্বে সৃষ্ট কাজের অনুরূপ।

এই যুগ ছিল বিখ্যাত সব দরবারিদের : দিল্লিতে আদ বেগম বিশিষ্ট ওমরাহদের অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উপস্থিত হত, কিন্তু তার নগ্ন দেহ এমনভাবে রং দিয়ে সজ্জিত করা হত যে, কেউ তার নগ্নতাতে নগ্ন হিসেবে দেখার সুযোগ পেত না 'পাজামার মতো করে সে তার পা এত চমৎকারভাবে আঁকিয়ে নিত, আসলে কোনো পাজামাই পরত না। দুই উরুর সংযোগস্থলে সে ফুল ও পাতা অংকন করাত কালো রং দিয়ে, যা রুমের অতি সূক্ষ্ম কাপড়ে আঁকা ফুলের মতো মনে হত। তার প্রতিদ্বন্দ্বী নূর বাই এত জনপ্রিয় ছিল যে, প্রতি রাতে মোগল ওমরাহদের হাতিতে তার বাড়িমুখী প্রতিটি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যেত। এমনকি সবচেয়ে মর্যাদাবান অভিজাতকেও বিরাট অংকের অর্থ পাঠাতে হত তার বাড়িতে উপস্থিতির অনুমতি লাভ করতে...যেই তার কাছে

BanglaBook.org

যাওয়ার সুযোগ পেত তার দাবি পূরণ করতে তাকে সর্বস্বান্ত হতে হত এবং পরিণামে নিজ বাড়ির সর্বনাশ ডেকে আনত।...কিন্তু তার সঙ্গসুখ তারাই পেত যারা তার ওপর তাদের সম্পদ বর্ষণ করতে পারত।

হায়দারাবাদে নূর বাই-এর প্রতিপক্ষ ছিল মীর আলমের রক্ষিতা মাহ্‌লাকা বাই চান্দা। মাহ্‌লাকা বাই তখনকার সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। বুদ্ধিমত্তার জন্যে তার খ্যাতি ছাড়াও তার নাচ ছিল অতুলণীয়। শুস্তারির মতে, তাকে দেখামাত্রই মীর আলম তার প্রেমে পড়েন এবং সেই চন্দ্রমুখীর পদতলে নিক্ষেপ করেন তার পাণ্ডিত্যের ভার। তখন তার যৌবনের পূর্ণ বসন্তকাল চলছিল এবং তার মন মাহ্‌লাকার আচ্ছন্ন করা সৌন্দর্য ও মন ভুলানো চমৎকারিত্বে বিবশ হয়ে যায়। অতএব মীর আলমের পক্ষে শুধুমাত্র প্রেম ও কবিতা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করার সুযোগ ছিল না। অতএব শিগ্‌গির তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিন মাসের অধিক সময় লাগে তার সুস্থ হতে। আবার তিনি পড়াশুনা এবং ইসলামী বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

মাহলাকা বাই শুধু সুন্দরী ও মন ভুলানো রূপের অধিকারীই ছিলেন না, সমসাময়িক হায়দারাবাদে অন্যতম সেরা কবি হিসেবে বিবেচিত ছিলেন তিনি। তার কবিতা দিল্লি ও লক্ষ্মৌতে সমাদৃত ছিল এবং কাব্য প্রেমিক সংগ্রহ করত। তিনি বিখ্যাত একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন, যা কলা ও বিজ্ঞানের গ্রন্থে সমৃদ্ধ ছিল এবং তিনি 'মহানামা'র কাজ শুরু করেন, যা ছিল দাক্ষিণাতের বড় ধরনের নতুন ইতিহাস। পরবর্তীকালে তিনি কবিদের গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। তার বিজ্ঞাতর ওপর নিজামের এতটাই নির্ভরতা ছিল যে, হায়দারাবাদের মহিলাদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র তাকেই সিনিয়র ওমরাহ হিসেবে নিয়োগ দান করেন, যাতে তিনি দরবারে উপস্থিত হতে এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নিজামকে পরামর্শ দিতে পারেন। তিনি নিজামকে যুদ্ধের সময়েও সঙ্গ দিতেন পুরুষের বেশে এবং দক্ষ অশ্বচালনার মাধ্যমে, তীরন্দজী ও বর্শা নিক্ষেপে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। কার্কপ্যাট্রিকের সহকারী জন ম্যালকম যে তাকে 'ব্যতিক্রমী প্রতিভাধর মহিলা' বলে উল্লেখ করেছেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। হায়দারাবাদের এক সুফি কুদরত উল্লাহ্ কাসিম তার সম্পর্কে লিখেছেন, 'দেহ ও আত্মার অপূর্ব সমন্বয়।'

মাহ্‌লাকা বাই এর কবিতার মধ্যে সে যুগের কাব্য বৈশিষ্ট্যের মতোই প্রধান্য পেয়েছে প্রেমের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি। এই যুগে উর্দু ভাষাও দাক্ষিণাত্যের শব্দ ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ নতুন বিশেষায়িত শব্দ সংযোজিত হয়, যাতে কবিদের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে : 'প্রেমিকার বাহু যেন পদ্মের লতা, তার নাক চাঁপা ফুলের কুঁড়ির মতো, তার উরু যেন কচি কদলী কাণ্ড, তার বেণী যেন গঙ্গানদী এবং তার রুমাউলি'—যে শব্দটি দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে নাভি থেকে নিচের দিকে নেমে যাওয়া অস্পষ্ট একটি রেখাকে—সেটিকে তুলনা করা

BanglaBook.org

হয়েছে গোদাবরী নদীর সাথে।' এই চেতনায় সমৃদ্ধ অযোধ্যার কবি শওক (১৭৮৩-১৮৭১) এক সম্পূর্ণ ধারাবাহিক 'মসনভী' রচনা করেছেন 'ফারেব-ই-ইশক' (প্রেমের প্রবঞ্চনা) এবং 'বাহার-ই-ইশক' (প্রেমের ঝরনাধারা)। সমসাময়িক কবি নাসিক তার কবর গোত্রের লেখা দিয়ে তার জীবনের সকল কার্যের সমাপ্তি টেনেছেন—

'আমি বাতাবি লেবুর মতো স্তনের প্রেমিক
অতএব, এই গাছ ছাড়া আমার কবরের
ওপর আর কোন গাছ রোপণ করো না।'

এ ধরনের রুচি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দিল্লির বিখ্যাত কবি মীর তকি মীর তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, লক্ষ্মৌর অধিকাংশ কবি কবিতা লিখতে পারে না এবং তাদেরকে তিন উপদেশ দিয়েছেন 'চুম্বন ও দাসত্বে' নিয়োজিত থাকতে। কিন্তু সাহিত্যের এই শারীরিক অধঃপতন কবিদের 'মুশায়রা' থেকে অন্যান্য শিল্পীদের মহলে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন দর্জিদের কাছে, যারা অধিকতর মসৃণ ও স্বচ্ছ বস্ত্রের কাঁচুলি তৈরিতে মনোনিবেশ করে এবং ওড়নার আড়ালেও তা পরিদৃষ্ট হয়, যেগুলোর নাম প্রচলিত হয়ে যায়, 'বাফত্ হাওয়া' (বাতাসে তৈরি), 'আব-ই-রাওয়ান' (বহমান পানি) এবং 'শবনম' (সন্ধ্যায় শিশির)।

মিনিয়েচার শিল্পীরাও এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে। হায়দারাবাদে নিজাম আলী খানের যুগের শিল্পীরা প্রাচীন যৌন আবেদনমূলক মিনিয়েচার চিত্র আঁকতে শুরু করেন, যেগুলো ইসলামের আবির্ভাব পূর্বকালের ভারতীয় চিত্রের অনুরূপ এবং সর্বোপরি সেগুলো নান্দনিক দিক ছাড়াও হায়দারাবাদি প্রমোদ উদ্যানের সৌরভ সম্বলিত। এখানে দরবারি শিল্পীরা যৌবনবতী নগ্নিকা ও দক্ষিণ ভারতীয় পাথরের স্থাপত্যের পাশে অলংকার পরা শাহজাদাদের চিত্র, যারা প্রাচিন হিন্দু গুহা স্থাপত্যের দেয়াল ঘেঁষে হাঁটছে কাছাকাছি কোথাও। চিত্রের মহিলারা হুক্কায় ধমুপান করে, দীর্ঘ জলাধারে সাঁতার কাটে, মদপান করে এবং পায়রা উড়ায়। অথবা জোৎস্নালোকিত বর্ষার রাতে দোলনায় দোল খায়, সংগীত শোনে এবং মার্বেলের প্যাভিলিয়নে মদ্যপান করে। শিকার ও যুদ্ধের দৃশ্য সম্বলিত সমৃদ্ধ মোগল চিত্র এ যুগে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। ভারতীয় শিল্প বিষয়ক এক ইতিহাসবিদ বিস্ময়ের সাথে মন্তব্য করেছেন যে, 'শিকার বা যুদ্ধের দৃশ্য হঠাৎ করে চিত্রকরদের কাছে কেন হারিয়ে গেল তা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু চিত্রের দৃশ্য থেকে ধারণা করা যায় যে, তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে শিকার ও যুদ্ধের চাইতে রমণীরাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।'

শুস্তারির পারস্যের প্রমোদ প্রেমের চেতনার সাথে কোনো কিছুই তুলনীয় ছিল না। মোগল যুগের শেষ দিকের সাহিত্যের যৌন প্রবৃত্তির বিপরীতে পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্যে রোমান্টিক প্রেমের দৃষ্টভঙ্গি ছিল প্রাচ্যের খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির

BanglaBook.org

কাছাকাছি যাতে মানুষের শারীরিক পাপের ওপর, যৌনতার বিপদের ওপর গুরুত্ব আরোপ, অর্থাৎ যৌনতা পরিহার ও কৌমার্য রক্ষার আদর্শকে তুলে ধরা। ইরানের সাহিত্যে প্রেমের অনিবার্য পরিণতিকে দেখানো হয়েছে বিপর্যয়মূলক, বেদনাপূর্ণ ও বিপজ্জনক। বিখ্যাত ফারসি মহাকাব্য 'লায়লি-মজনু'তে লাইলিকে ভালোবাসার কারণে মাজনুর পাগল হয়ে যাওয়া এবং ক্ষুধার্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করার কাহিনি বিধৃত হয়েছে।

আবদুল লতিফ শুস্তারির রোমান্টিক প্রেম ছিল এরকমই এবং 'তুহফাত'-এর বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় তিনি প্রেমের ক্ষেত্রে ফারসি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন 'ইশক্'। চিকিৎসকরা এ অবস্থাকে বিষাদপূর্ণ আখ্যা দিয়ে বলতেন তার কাঙ্ক্ষিত নারীর সাথে যৌনমিলনের মাধ্যমেই নিরাময়যোগ্য।

শুস্তারি যখন ও বিষয়ের ওপর লিখেন, তখন নিঃসন্দেহে তার জ্ঞাতি ভাইয়ের কন্যা খায়রুন্নিসার ও জেমস কার্কপ্যাট্রিকের কুখ্যাত প্রণয়ের ঘটনা তার সামনে ছিল। যখন তিনি তার কাহিনি লিখছিলেন, তখন এই প্রণয় তার সকল আশা ভঙ্গ করে দেয় এবং তার পরিবারের আরও অনেকের, তাদের সম্পদ, সাফল্য ও ক্ষমতার কাছাকাছি অবস্থানে আসার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় রোমান্টিক প্রেম ও যৌন পরিপূর্ণতা । এ ঘটনা বিষের মতো তাদের সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই সম্পর্ক অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও কেলেংকারিপূর্ণ ছিল তাদের জন্যে এবং শুস্তারি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে উপযুক্ত নয়। কারণ, এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখও আতঙ্কের সৃষ্টি ও পাঠককে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে যে, যা কিছু ঘটেছিল সেজন্যে তিনি কার্কপ্যাট্রিকাকে দায়ী করেননি। বরং উষ্ণতার আমেজে তিনি তাকে বর্ণনা করেছেন, 'কোম্পানির প্রতিনিধি মেজর জেমস কার্কপ্যাট্রিক সৎ চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি এবং আমার ভালো একজন বন্ধু। হায়দারাবাদের উপকণ্ঠে তিনি এক উদ্যান তৈরি করেছেন, যেখানে তিনি বাস করেন। উদ্যানটি মনোরম এবং আমি মাঝে মধ্যে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে সেখানে যাই। আমি তাকে দেখেছি অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞানী লোক হিসেবে এবং আমার বড় ভাইয়ের পরই তাকে বিবেচনা করি।' শুস্তারির মতে, জেমস এই উদ্যোগ নেননি, অতএব, যা ঘটেছে, সেজন্যে তিনি দায়ী নন।

গ্রন্থটিতে শুস্তারি তার সাইয়িদ বংশের গৌরবের কথা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, তার বংশের পুরুষদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তাদের মহিলাদের দেখাশুনা ও তাদের মর্যাদা রাক্ষা করা। তবুও শুস্তারির সাইয়িদ বংশে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, তার জ্ঞাতি ভাই বকর আলী খানের পরিবারে এবং ভারতে আসার পর। তার ভাই ভারতে আসার পর ভাররতীয় মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করার মাধ্যমে অনৈতিক ভারতীয় পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন।

BanglaBook.org

তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বকর আলী খানের নাতনি যা করেছে তা শুধু নিজিকে সাইয়িদ বহির্ভূত একজনের কাছে সমর্থনই নয়, বরং অমুসলিম ফিরিঙ্গির কাছে।

তার মতে, উদ্যোগটা যেহেতু খায়রুন্নিসার পক্ষ থেকেই ছিল, সেখানেই তার লজ্জার কারণ।

১৭৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে, অর্থাৎ নাজিরুন্নিসার বিয়ের এক মাস পর বকর আলী খানের বাড়িতে গুরুতর মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো তার ছোট নাতনি খায়রুন্নিসার স্থিরীকৃত বিয়ের ব্যাপারে। বকর আলী খান এক যুবকের সাথে তার বিয়ে স্থির করেছিলেন। খায়রুন্নিসার বয়স তখন সম্ভবত চৌদ্দও হয়নি। সম্ভাব্য পাত্রটি কে ছিল তার নাম কখনো জানা যায়নি, কিন্তু হায়দারাবাদের অন্যতম শক্তিশালী ওমরাহ বাহরাম-উল মুলকের বংশধর ও মীর আমলের বন্ধু উল্লেখযোগ্য অভিজাত আহমদ আলী খানের পুত্র ছিল সে।

পরিবারের মহিলারা যুবকটির ব্যাপারে কী আপত্তি উত্থাপান করেছিল? হতে পারে, তাদের অভিযোগ ছিল, যুবকটি বেপরোয়া, মাতাল অথবা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথবা তারা তাকে পছন্দ করেনি অথবা খায়রুন্নিসার জন্যে উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করেনি। এটাও হতে পারে যে, বকর আলী খান মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা না করে বিয়ের জন্যে পাত্র স্থির করেছিলেন বলে সেটি তার মেনে নিতে পারিনি। কারণ, নানা হিসেবে পাত্র স্থির করার আইনগত অধিকার প্রশ্নের বাইরে ছিল না। খায়রুন্নিসার পিতা মেহদী ইয়ার খানের মৃত্যুর পর তার কন্যাদের বিয়ে দেয়ার আইনগত দায়দায়িত্ব বর্তায় স্বাভাবিকভাবে তাদের মা শরফ-ইন-নিসার ওপর। এরপর দায়িত্ব বর্তাতে পারে মেহদী ইয়ার খানের জীবিত ভাই মীর আসাদুল্লাহ খান ও তার পুরুষ আত্মীয়দের ওপর। অতএব এ ধরনের ব্যাপারে বকর আলী খানের জড়িত হওয়ার কথা নয়।

সম্ভবত মহিলাদের এই অসন্তোষ ছিল সব ঘটনাকে জড়িয়ে। কিন্তু কারণ যাই ঘটুক না কেন, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তারা পাত্রটির ব্যাপারে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেছিল এবং এটাও স্পষ্ট যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর হায়দারাবাদে কোনো অভিজাত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে এক ধরনের সমাঝোতা ছিল এবং বিশেষ করে কনের আসল অধিকার থাকে তার জন্যে আয়োজিত বিয়ের ওপর আপত্তি তোলায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো যায় যে, এক দশক পূর্বে নিজাম আলী খানের জেনানার মহিলারা নিজামের এক কন্যার সাথে টিপু সুলতানের পাঠানো তার শ্যালকের বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করার জন্য এ যোগে ভূমিকা পালন করেন। মহিলাদের যুক্তি ছিল যে, টিপু এবং তার বংশধরেরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাধারণ মানুষ, তাদের শিরায় অভিজাত রক্ত প্রবাহিত নয়।

BanglaBook.org

এমনকি স্বয়ং টিপু সুলতানও অশিক্ষিত এক সৈনিকের পুত্র, অতএব তার শ্যালকের সাথে হায়দারাবাদের আশফিয়া বংশের বিয়ে হলে ভারতীয় কৃষক বংশের মিশ্রণে আশফিয়া বংশের রক্তের প্রতি অমর্যাদা করা হবে। টিপুর পিতা নিজামের সেনাবাহিনীতে সামান্য সৈনিক ছিলেন। টিপুর প্রস্তাবিত বিয়ে সম্পন্ন হলে মহীশূর ও হায়দারাবাদের রাজনৈতিক মৈত্রীর যে সুবিধা ঘটত সেই সম্ভাবনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মহিলাদের দাবির সাথে নিজামকে আপস করতে হয় এবং টিপুর প্রেরিত দূতকে শূন্য হাতে শ্রীরঙ্গপতমে ফিরে যেতে হয়।

১৭৯৯ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে বকর আলী খানের বাড়ির মহিলারা বেপরোয়াভাবে বৃদ্ধের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তার স্থিরীকৃত পাত্রের সাথে বিয়ে ভেঙে দিতে। বিয়ের কথা পাকা করতে যেহেতু কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল, সেজন্যে বিয়ে হঠাৎ ভেঙে দেয়াও অসম্ভব হয়ে উঠে। কারণ তাতে দু'পক্ষেরই মর্যাদাহানির আশংকা। বকর আলী খান তার অবস্থানে স্থির থাকতে চেষ্টা করেন এই বলে যে, কথা ভেঙে তিনি তার পরিবারকে লজ্জার মুখে ফেলতে চান না। কিন্তু মহিলারা পরাস্ত হয়নি, মাঝ ফেব্রুয়ারিতে তারা বিষয়টিকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়, যখন বকর আলী খান ও মীর আলমকে একটি অভিযানে কয়েক মাসের জন্যে হায়দারাবাদ ত্যাগ করতে হয়।

তাদের হায়দারাবাদ ত্যাগের কারণ ছিল টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের সাথে নতুন যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য নিজামের সিদ্ধান্ত। এটি ছিল ভারতে ফরাসি প্রভাবের শেষ ঘাঁটি নির্মূল করে ভারতে ব্রিটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে লর্ড ওয়েলেসলির আগ্রাসী অভিযানের অংশ। ওয়েলেসলি যেসব চিঠিপত্র আটক করতে সক্ষম হয়েছেন তার প্রেক্ষিতে তার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছে যে, টিপু মরিশাসের গভর্নরের কাছ থেকে ফরাসি সৈন্য ও রসদ সরবরাহ পেতে চাইছেন। তাছাড়া তিনি ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়ন করতে নেপোলিয়নের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। লর্ড ওয়েলেসলি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি নেপোলিয়ন বা টিপুকে দ্বিতীয় সুযোগ দেবেন না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়া চিঠিগুলো তার প্রয়োজন ছিল যুদ্ধের অজুহাত সৃষ্টি এবং চল্লিশ বছর ধরে মহীশূরের সুলতানদের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্যে।

এখন হায়দারাবাদে জেনারেল রেমন্ডের ফরাসি বাহিনীকে নিরস্ত্র করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং মিশরের আবুকির উপসাগরে ফরাসি বাহিনীর পরাজয়ের খবর এসেছে। অতএব লর্ড ওয়েলেসলি টিপু সুলতানের সুরক্ষিত দ্বীপ দুর্গ শ্রীরঙ্গপতনের ওপর ব্যাপক হামলা পরিচালনার বিস্তারিত কৌশলগত প্রস্তুতি শুরু করলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে টিপু সুলতানকে অনেকটা ব্যঙ্গ করে এবং তাকে খোঁচা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নীল নদের যুদ্ধে এডমিরাল নেলসনের

BanglaBook.org

বিরাট বিজয়ের খবর দিয়ে লিখলেন 'আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজ করছে তার প্রেক্ষিতে এবং গোয়েন্দা তথ্য অনুসারে গভীর সন্তুষ্টি অর্জনের মতো খবর এসেছে, যা আপনাকে অবগত করানোর আনন্দ থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করতে পারি না। 'অন্যদিকে তিনি রাতের অন্ধকারে টিপুর ধ্বংসের জন্যে প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছিলেন।

১৭৯৯ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সবকিছু ঠিকঠাক এবং কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল হ্যারিসকে নির্দেশ প্রদান করা হলো, 'কালবিলম্ব না করে সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে মহীশূরের ভূখণ্ডে প্রবেশ ও শ্রীরঙ্গপতমে হামলার জন্যে অগ্রসর হতে হবে।' নিজামের কাছে একটি বার্তা প্রেরিত হলো ব্রিটিশদের সহায়তার জন্যে তার সৈন্যদের সমবেত করতে। কারণ নিজাম পাঁচ মাস পূর্বে স্বাক্ষরিত প্রাথমিক চুক্তিতে ব্রিটিশদের সহায়তা করতে সম্মতি দিয়েছেন।

বকর আলী খান হায়দারাবাদে ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্যে বকশি হিসেবে নিয়োজিত থাকায় তাকে ব্রিটিশ ও হায়দারাবাদি বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে সেখানে যেতে হয়। মীর আলমেরও সৈন্যদের সাথে যেতে হয় বিশাল হায়দারাবাদি বাহিনীর সার্বিক নেতৃত্ব নিয়ে। তার ছোট ভাই সাইয়িদ জয়নুল আবেদীন শুস্তারি টিপু সুলতানের একান্ত সচিব এবং মহীশূর দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ওমরাহ হওয়ার কারণে তিনি নিশ্চয়ই অভিযান সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে থাকবেন। আরও দ্বিধার মধ্যে ছিল হয়তো, হায়দারাবাদের সৈন্যরাও, বিশেষ করে চার হাজার পদাতিক যারা অল্প কিছুদিন পূর্বেও রেমন্ডের বাহিনীতে ছিল। ফরাসিদের বন্দি করে তাদেরকে ব্রিটিশ অফিসারদের নেতৃত্বাধীন রেজিমেন্টে যুক্ত করা হয়েছে। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস যে, তারা এখন জেমস কার্কপ্যাট্রিকের সহকারী ক্যাপ্টেন জন ম্যালকমের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়েছে। যিনি মাত্র চার মাস পূর্বে তাদের আত্মসমর্পণ করানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

টিপু সুলতান নিজেকে গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে দেখে বেপরোয়াভাবে নিজামের কাছে চিঠি লিখে নিবেদন করলেন, 'ইংরেজরা মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করে তাদের স্থলে সাহেবি টুপিধারীদের বসাতে চায়।' তিনি আরও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, মুসলমান হিসেবে তার ও নিজামের কর্তব্য হচ্ছে একযোগে কোম্পানিকে প্রতিহত করা। কিন্তু ততদিনে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

লে. কর্নেল জেমস ড্যালরিম্পেলের নেতৃত্বে হায়দারাবাদে অবস্থানরত ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির ছয়টি ব্যাটালিয়ন এবং জন ম্যাকলমের অধীনে হায়দারাবাদি সৈন্যদের চারটি ব্যাটলিয়ন এবং মীর আলমের নেতৃত্বে হায়দারাবাদি অশ্বরোহী বাহিনীর দশ হাজার সৈন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি জেনারেল হ্যারিসের বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। হ্যারিস যাত্রা করেছিলেন ভ্যালোর থেকে। ৫ মার্চ ত্রিশ হাজার ভেড়া, বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যবাহী এক লাখ

BanglaBook.org

গরুর গাড়ি সাথে নিয়ে দুই বাহিনী মহীশূরের সীমান্ত অতিক্রম করে। দুই বাহিনীতে সৈনিক এবং বেসামরিক লোকজন মিলিয়ে কমপক্ষে এক লাখ লোক ছিল। সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ যাত্রার জন্যে বিদায় জানাতে লর্ড ওয়েলেসলি মাদ্রাজ এসেছিলেন। কোম্পানির অধীনে ভারতে এটাই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ অভিযান ছিল বলে ওয়েলেসলির বিশ্বাস। কিন্তু বিশাল এই বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করার মতো ছিল না। অতএব, তারা অত্যন্ত মন্থর গতিতে শ্রীরঙ্গপতমের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দৈনিক মাত্র পাঁচ মাইল গতিতে। বিশাল পঙ্গপাল বাহিনী অগ্রসর হওয়ার সময় যেমন সবকিছু ধ্বংস করে যায়, এই বাহিনী যে এলাকার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে সে এলাকাকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে পুরোপুরি নিঃশেষ করে দিয়ে যায়।

হায়দারাবাদের জন্যে নতুন যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, শরফ-উন-নিসার কাছে তার পিতার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করার বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাজিরুন্নিসার বিয়ের অনুষ্ঠানে জেমস কার্কপ্যাট্রিক খায়রুন্নিসাকে দেখেছিলেন এবং দৃশ্যত উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেমের সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব বকর আলী খানের স্থিরীকৃত পাত্রের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট অন্তঃপুরবাসী মহিলারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কার্কপ্যাট্রিকই তাদের সমস্যার সম্ভাব্য উত্তর। তারা আরও স্থির করলেন, আহমদ আলী খানের অযোগ্য পুত্রের চাইতে তাদের কনের জন্যে কার্কপ্যাট্রিক অতি উপযুক্ত পাত্র।

জেমসের হাতে, 'মহিলারা তাদের এই মনোভাবে দৃঢ় হয়ে তাকে খায়রুন্নিসার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তাকে সকল উপায়ে প্রলুব্ধ করতে থাকেন। খায়রুন্নিসা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় তাকে কার্কপ্যাট্রিককে দেখার সুযোগ করে দেন। তার মা অথবা নানি তাকে তাঁকের ছবি প্রদান করে উৎসাহিত করেন যে, ছবির মানুষটিকে সে মুখোমুখি দেখতে চায় কিনা। আরও বলা হয় যে, তাকে দেখার জন্যে কার্কপ্যাট্রিক অত্যন্ত কাকুতিমিনতি করছে। অন্যদিকে কার্কপ্যাট্রিককে বলা হয় যে, খায়রুন্নিসা তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছে। এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত উভয়ের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয় এক রাতে।' বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলার জন্যে বকর আলী খানের পরিবারের মহিলারা দুদিন রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন বলে লে. কর্নেল বাউসার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

খায়রুন্নিসার মনোভাব সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ সামান্যই ছিল। জেমস কার্কপ্যাট্রিক নিশ্চিত বিশ্বাস করছেন যে, মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছে এবং তার বিশ্বাসের যথার্থতাও হয়তো ছিল। এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মেয়েটির আচরণে কোনো পার্থক্য দেখেননি তিনি। বড় ভাই উইলিয়ামকে পরে জেমস লিখেছেন

BanglaBook.org

যে, এখানে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বকর আলী খানের নাতনির আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে আমি ভালোভাবে অবগত।' জেমসের এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায় ক্লাইভের রিপোর্টে কর্নেল বাউসোরের বক্তব্যের মাঝে। তিনি শপথ করে বলেছেন, 'বলা হয়ে থাকে, মেয়েটি রেসিডেন্টের প্রেমে পড়েছিল।' জেমসও দাবি করেছিলেন, 'খায়রুন্নিসাকে একটি ঘৃণ্য বিষয় থেকে বাঁচাতে সহয়তা না করলে সে বিষ পান করে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল।'

শরফ-উন-নিসা ও তার মা দুরদানা বেগম কেন কার্কপ্যাট্রিকের সাথে খায়রুন্নিসার বিয়ের ব্যাপারে এতটা আগ্রহী ছিলেন তার উত্তর পাওয়া কঠিন। এটা প্রিয় কন্যার ব্যাপারে মায়ের সহানুভূতির কারণে হতে পারে এবং মেয়ের অসুখী ভবিষ্যৎ ও সম্ভাব্য আত্মহত্যা থেকে রক্ষার আগ্রহের কারণেও হতে পারে। কিন্তু খায়রুন্নিসা মহানবীর বংশধর একজন সৈয়দা, যারা তাদের অবিমিশ্র বংশমর্যাদা রক্ষায় কঠোর এবং যারা তাদের মেয়েদের কখনো সাইয়িদ বহির্ভূত কারো সাথে বিয়ে দেয় না এবং যারা মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গির এই রীতি রক্ষার ওপর কঠোর নজরদারি করে। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে প্রেমঘটিত বিয়ের কোনো রীতি প্রচলিত ছিল না। সেই যুগে প্রেম করে বিয়ে পাশ্চাত্যের অভিজাত পরিবারগুলোতেও বলতে গেলে অকল্পনীয় ছিল। তা সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে খায়রুন্নিসাকে তার মা শরফ-উন-নিসাই অনুমোদন দিয়েছিলেন জেমস কার্কপ্যাট্রিককে মুগ্ধ করতে। তিনি এবং দুরদানা বেগম খায়রুন্নিসাকে সকল উপায়ে সাহায্য করেছেন এই উদ্দেশ্য হাসিলে। জেমসের স্বীকৃতিকে যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে এই দুই মহিলাই খায়রুন্নিসাকে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের শয্যায় পাঠানোর জন্য কমবেশি দায়ী। তারা কেন এই কাজটি করছিলেন?

গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে যে, এই ধরনের সম্পর্কের ফলে তাদের পরিবারের জন্য বিরাট সুবিধানজক হবে। জেমস শুধু একজন শক্তিশালী ব্রিটিশ কূটনীতিকই নন, ১৭৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি হতে তিনি হায়দারাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ওমরাহদের মধ্যে গণ্য হয়েছেন বেশ কিছু উপাধিতে ভূষিত হয়ে— যেমন, 'মুতামিনুল মুলক', 'হাশমত জং,' 'নওয়াব ফকর-উদ-দৌলাহ বাহাদুর,' এবং নিজামের দরবারে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করেছেন।

এ সময়ে আরও যেসব ভারতীয় মহিলা ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের বিয়ে করেছিল দেখা গেছে, এই বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের সম্পদ ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। জেমসের প্রতিপক্ষ মারাঠা দরবারে নিয়োজিত জেনারেল উইলিয়াম পামার দিল্লির ফায়জি বখশ বেগমকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি পরবর্তী সময়ে খায়রুন্নিসার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীতে পরিণত হন। ফায়জির পিতা ইরান থেকে আগত এবং অশ্বরোহী বাহিনীর

অধিকারী ছিলেন। তিনি দিল্লি থেকে এক পর্যায়ে লক্ষ্মৌ চলে যান, যেখানে ফায়জির জন্ম হয়।

উইলিয়াম পামারের সাথে তার বিয়ে হওয়ার পর মোগল সম্রাট শাহ আলম তাকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন এবং খেতাবে ভূষিত করেন। খেতাবের সাথে প্রদত্ত একটি দর্শনীয় চকচকে সনদ এখনও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ব্রিটিশ রেসিডেন্টর সাথে বিয়ের কারণেই রাজকীয় বংশোদ্ভূত না হয়েও শুধু অভিজাত পরিবার থেকে মোগল সম্রাটের পক্ষ থেকে খেতাব লাভ বিরাট ব্যাপার ছিল।

এর চাইতেও নাটকীয় রূপান্তর ঘটেছিল জেনারেল স্যার ডেভিড অক্টোরলোনির জ্যেষ্ঠ বিবি মোবারক বেগমের ক্ষেত্রে। যদিও অক্টারলোনির তেরোজন বিবি ছিল বলে খ্যাতি আছে, তাদের একজন মোবারক বেগম ছিলেন পুনার সাবেক ব্রাহ্মণ দাসী। যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অক্টারলোনি তার উইলে তার এই স্ত্রীকে উল্লেখ করেছেন, 'বিবি মোহতারাম মোবারক উননিসা বেগম ওরফে বেগম অক্টারলোনি, আমার কনিষ্ঠ সন্তানদের মা' হিসেবে, যার দ্বারা অন্য বিবিদের চাইতে তার প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

তিনি জেনারেলি বেগম নামেও পরিচিত লাভ করেছিলেন এবং সমসমায়কি কিছু চিঠিপত্রেও তার উল্লেখ রয়েছে, যাতে অভিযোগ করা হয়েছে গুজবে তার কান দেয়া প্রসঙ্গে। নিজেকে 'লেডি অক্টারলোনি' বলে তিনি ব্রিটিশদের ক্ষোভ উদ্রেকের কারণ হয়েছে। একটি চিঠির বিবরণ অনুসারে, "লেডি অক্টারলোনি মক্কায় হজ পালন করতে যাওয়ার জন্যে আবেদন করেছেন।' মোগলদেরকেও তিনি ক্ষুব্ধ করেছেন নিজেকে 'কুদসিয়া বেগম' খেতাবে ভূষিত করে। এ উপাধি ছিল সম্রাটের মায়ের। অক্টারলোনির চাইতে বয়সে অনেক ছোট থাকায় নিশ্চিতভাবেই ধারণা করা যায় যে, বৃদ্ধ জেনারেলের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি বেশি প্রভাব খাটাতে সক্ষম ছিলেন। একজন পর্যবেক্ষকের মতে, 'অক্টারলোনির বিবি এখন প্রাচীরের অভ্যন্তরে সকলের কর্ত্রী।' মোবারক বেগম স্বভাবতই তার অধিক প্রভাব খাটাতে শুরু করেছিলেন, যা অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। অক্টারলোনির মৃত্যুর পর তিনি লাভ করেন মোবারক বাগ। অ্যাংলো-মোগল উদ্যান সমাধি অক্টারলোনি তৈরি করেছিলেন দিল্লির উত্তর দিকে। মোবারক বেগম পুরনো দিল্লির হাউজ কাজীতে একটি মসজিদ ও নিজের জন্যে 'হাভেলি' নির্মাণ করতে প্রাপ্ত সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেন। কিন্তু তাকে সাধারণভাবে কেউ পছন্দ না করায় এবং মন্দির নর্তকি হিসেবে তার পূর্ব পরিচিতির কারণে কোনো মোগল পুরুষকে কখনো তার নির্মিত মসজিদ ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। এখন পর্যন্ত পুরনো দিল্লিতে এটিকে 'রান্ডি-কি-মসজিদ অর্থাৎ' 'বেশ্যার মসজিদ' বলে উল্লেখ করা হয়।

BanglaBook.org

মোবারক বেগমের চরম সামাজিক ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষই তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার কাহিনি হতেই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো ব্রিটিশ রেসিডেন্টের স্ত্রী অথবা রক্ষিতা হলেও একজন মহিলা কতটা প্রতিপত্তির অধিকারী হতে পারে। শরফ-উন-নিসা ছিলেন একজন বিধবা, যার পিতা তাকে চাপ দিচ্ছিলেন তার কন্যাকে এমন এক পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে যাকে মা ও কন্যা কেউই উপযুক্ত বিবেচনা করেননি। কার্কপ্যাট্রিক স্পষ্টতই তাদের যোগ্য অজুহাত ছিল বকর আলী খানের পছন্দকে নাকচ করে দেয়ার জন্য।

খায়রুন্নিসার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সাড়া দিতে তার মা শরফ-উন-নিসার আরও একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ছিল। শরফ-উন-নিসার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন আরিস্তু জাহের পুত্রবধূ ফারজান্দ বেগম, প্রধান উজিরের প্রাসাদে যার প্রভাব ছিল ব্যাপক। বহু দলিলেই দেখা যায় যে, শরফ-ইন-নিসা ও ফারজান্দ বেগম প্রায়ই একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং শরফ-ইন-নিসা পরবর্তীতে বলেন যে, ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সাথে খায়রুন্নিসাকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে ফারজান্দ বেগমই তাকে উৎসাহিত করেছিলেন। পরিস্থিতিও প্রমাণ দেয় যে, শুরু থেকেই ফারজান্দ বেগম এই সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। কারণ পরে এটি যখন বিয়ের পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন আরিস্তু জাহ ব্যাপারটি তত্ত্বাবধান করেন। মোগল সমাজের রীতি হিসেবে এটা করার উপায় ছিল জেনানার মহিলাদের মাধ্যমে। কিন্তু একটি বিষয় অস্পষ্ট যে, আরিস্তু শাহ অথবা ফারজান্দ বেগন খায়রুন্নিসাকে কার্কপ্যাট্রিকের সাথে মিলিত করে দেওয়ার সুযোগ করে দিতে শরফ-উন-নিসাকে প্ররোচিত করেছিলেন কি না। কিন্তু এটি নিশ্চিতভাবেই জানা যায় যে, বিয়ের পর শরফ-উন-নিসা নিজাম কর্তৃক লোভনীয় ভূসম্পত্তির জায়গির পেয়েছিলেন, যার বার্ষিক আয় ছিল পঞ্চাশ হাজার রুপি। শরফ-উন-নিসার এই প্রাপ্তি যদি খায়রুন্নিসাকে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাছে বিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে হয়ে থাকে, তাহলে ধারণা করতেই হবে যে, কার্কপ্যাট্রিক ও খায়রুন্নিসার মধ্যে প্রেম একটি বড় পরিকল্পনা ছিল অথবা কমপক্ষে আরিস্তু জাহের সৃষ্ট ছিল। কারণ আরিস্তু জাহ একজন কুশলী প্রশাসকক হিসেবে উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলেন যে, এই সম্পর্ককে তিনি কতটা তার রাজনৈতিক সুবিধার জন্যে কাজে লাগাতে পারেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, আরিস্তু জাহ আশা করেছেন, তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে তার তাস চালতে পারলে এই সম্পর্কই খায়রুন্নিসার জ্ঞাতি ভাই এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী মীর আলমের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এটি সঠিক ব্যাখ্যা হয়ে থাকলে এবং মীর আলমেরও বিশ্বাস যে, প্রকৃত ঘটনাই হচ্ছে আরিস্তু জাহের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা।

BanglaBook.org

প্রকৃত ব্যাপার যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে শরফ-উন-নিসার ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা যাবে? তিনি কি তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তার কন্যাকে কার্যকরভাবে কার্কপ্যাট্রিকের শয্যায় পাঠাতে পেরেছেন? এখন আমরা বিষয়টিকে যেভাবেই গ্রহণ করি না কেন, পরিবারের মহিলারা নিশ্চয়ই বিষয়টিকে সেভাবে দেখেননি। মোগল ভারতে যৌন সম্পর্ক মহিলাদের জন্যে প্রধান সম্পদ ও অস্ত্র ছিল, যার মাধ্যমে কোনো পরিবারের মহিলারা শক্তিশালী শাসকের কাছে পথ করে নিয়েছেন এবং রাজ কর্মকর্তাদেরও স্বীকৃতি উপায় ও পদ্ধতি ছিল দরবার ও সমাজে প্রতিপত্তি অর্জন ও প্রাধান্য লাভের। শরফ-উন-নিসা যা করেছেন তা ছিল নব্য অর্ধ-উপনিবেশিক পরিবেশে প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণ, আর এখানেই ঘটে বিপত্তি।

এমনকি মোগল সংস্কৃতি দ্বারা অতি প্রভাবিত ব্রিটিশ অফিসারদের ক্ষেত্রেও একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ও প্রভাবশালী মোগল পরিবারের কন্যার মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনের যে বিপত্তি তা যথাসময়ে জানা যাবে। মোগল পরিবেশে স্বাভাবিক দরবারি সৌজন্য ইউরোপীয়রা অনেক ক্ষেত্রে ভুলভাবে গ্রহণ করে নারী সম্ভোগে প্রলুব্ধ হয়েছে। তদুপরি ব্রিটিশ রেসিডেন্টেরা আগে এক দরবার থেকে আরেক দরবারে দ্রুত বদলি হতেন এবং ব্রিটেনে ফিরে যেতেন। মোগল পরিবেশে একটি দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হতে গিয়েও প্রায়ই স্বল্পস্থায়ী হয়ে গেছে। শরফ-ইন-নিসার কৌশল ছিল কন্যাকে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সাথে বিয়ে দেয়ার মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টি, যা তার মনে হয়েছিল ভালোভাবে কাজ করছে। কিন্তু সময়ই প্রমাণ করবে যে, এ ধরনের স্পর্শকাতর সাংস্কৃতিক সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে।

সবকিছুর শেষে কোনো ঘটনার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করা সবসময়ই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। একটি ব্যাপারে শুধু নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বকর আলী খান সেনাবাহিনীর সাথে অভিযানে চলে যাওয়ার পর শরফ-উন-নিসা তার কন্যা ও ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সম্পর্কের বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা অনুসারে কাজ করতে আর কোনো বাধার সম্মুখীন হননি। এই সুযোগের পূর্ণ এবং দ্রুত সদ্ব্যবহার করতে তিনি আর দ্বিধা করেননি। পরবর্তীতে মীর আলমের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি এবং বকর আলী খান টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলে যাওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই কার্কপ্যাট্রিক মেয়েটিকে প্রলুব্ধ করে বোধশূন্য করে ফেলে।

কয়েক মাস আগে জেমস তার ভাইয়ের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি খায়রুন্নিসার সাথে শয্যায় যাচ্ছেন। ব্যাপারটি নিয়ে হায়দারাবাদে কেলেংকারি শুরু হওয়ার বহু পরে তিনি একথা স্বীকার করেন। উইলিয়াম তাকে বারবার তাগিদ দিচ্ছিলেন ঘটনার পেছনে আদৌ কোনো সত্যতা আছে কিনা তা জানার জন্যে। কারণ, কেলেংকারির ব্যাপকতা হায়দারাবাদের সীমানা ছড়িয়ে

BanglaBook.org

কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। দুই ভাই হায়দারাবাদে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন এবং উভয়েই জানতেন যে অন্যজন অন্তত একজন ভারতীয় মহিলার সাথে দীর্ঘদিন যাবত সম্পর্ক বজায় রাখছেন। উইলিয়ামের স্ত্রী মারিয়া ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পর তিনি দুলারি বিবির সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করেন। দুলারির গর্ভে আগেই তার দুটি সন্তান হয়েছে—রবার্ট এবং সিসিলা। উভয়েই এখন কিশোর বয়সী এবং কেন্টে সুদর্শন কর্নেলের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। উইলিয়াম যখন হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন, তার পরই দুলারির সাথে তার সম্পর্ক এবং উইলিয়াম স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে উত্তমাশা অন্তরীপে চলে যাওয়ার পর জেমস তাকে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তার রক্ষিতা ভালো ও সুখে আছে এবং তিনি তার দেখাশুনা করছেন। উইলিয়াম আবার ভারতে ফিরে এলে দুলারি তার সাথে কলকাতায় যায় এবং তখনো সেখানে অবস্থান করে পুত্র রবার্টকে নিয়ে। বারো বছর পর দুলারি উইলিয়ামের উইল অনুসারে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়। মনে হয়, দুলারি ও উইলিয়ামের প্রেমের সম্পর্কে ছিল গভীর। নিঃসন্দেহে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক। কারণ তাদের প্রথম পুত্র রবার্ট জন্মগ্রহণ করে ১৭৭৭ সালে। মনে হয় তারা দুজন একসাথে অন্তত ২৩ বছর কাটিয়েছে, শুধুমাত্র ১৭৮৫ সালের সংক্ষিপ্ত সময় ছাড়া, যখন উইলিয়াম বিয়ে করে মারিয়াকে। মারিয়া ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার পর তাদের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

জেমসও ইতোমধ্যে অন্তত একটি ভারতীয় মেয়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, যার গর্ভে তার একটি পুত্রসন্তানও জন্মলাভ করে। সেই মেয়েটির নাম অথবা তার সন্তান বেঁচে ছিল না কি তা জানা যায়নি, শুধু এটুকু জানা যায় যে মেয়েটির গায়ের রং খায়রুন্নিসার চাইতে কালো ছিল এবং সম্ভবত তামিল বা তেলেগু বংশোদ্ভূত ছিল। মনে হয়, জেমস এই সম্পর্ককে তাৎক্ষণিক যৌন পরিতৃপ্তি লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ক্লাইভের রিপোর্ট এবং কিছু কিছু ভারতীয় বিবরণীতেও জেমসের একাধিক নারী সংসর্গের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তার প্রণয় কাহিনি এমনকি তিনশো মাইল দূরবর্তী শ্রীরঙ্গপতমে আর্থার ওয়েলেসলির কাছে পৌঁছেছিল। একটি বর্ণনায় আছে, 'তিন বছর আগে তিনি এক মোগল তরুণীকে ভ্রষ্ট করেছেন নিজেকে ইরান থেকে আগত ভান করে।' ওয়েলিংটনের ভবিষ্যৎ ডিউক তার ভাই লর্ড ওয়েলেসলিকে জানান, 'বলা হচ্ছে যে, মেয়েটিকে এখন তিনি তার বাড়িতে তুলেছেন।' তিনি গভর্নর জেনারেলকে একথাও জানান যে, 'মীর আলম তাকে বলেছে।' কার্কপ্যাট্রিকের জন্যে এ ধরনের আচরণ মোটেও শোভনীয় নয় এবং ডিউক যদি হায়দারাবাদে যান তাহলে নিজেই লজ্জিত হওয়ার মতো প্রচুর ঘটনা শুনবেন, ইংরেজদের মধ্যে এমন লোকও আছে।' জেমসের যৌনকাতর পিতা সুদর্শন কর্নেল সম্পর্কেও এ ধরনের ব্যাপার প্রচুর বলা হয়েছে।

'কালো বালিকা' এবং রেসিডেন্টের জেনানায় বসবাসরত অন্য মহিলাদের স্থলে খায়রুন্নিসার আবির্ভাবের পর থেকে জেমসের চিঠি থেকে অন্য সকলের প্রসঙ্গ হারিয়ে যায়। কালো বালিকাটির কথা একবার মাত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমার পুরোনো সঙ্গী' হিসেবে। হতে পারে যে তার মৃত্যু ঘটেছিল। সে নিঃসন্দেহে জেমসের কাছ থেকে কিছুই পায়নি এবং জেমসের উইলেও তার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। জেমসের দৃশ্যত নৈর্ব্যক্তিক ভাব শুধু মেয়েটির ওপর নয়, মেয়েটির সন্তানের ব্যাপারেও ছিল বলে মনে হয়। এমনকি সুদর্শন কর্নেল, যিনি কখনো সন্তান জন্মদান ও পিতৃত্বের ব্যাপারকে গুরুতরভাবে নেওয়ার মতো, ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু 'হিন্দুস্থানি শিশু' সম্পর্কে জেমসের নিস্পৃহতার কারণে মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি জেমসকে ভর্ৎসনা করেন চিঠিতে এবং লিখেন, 'আমার মতে, বৈধ ও অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে পিতার কর্তব্যে কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়।' শিশুটি যখন আকস্মিকভাবে জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং ১৮০৪ সালের গ্রীষ্মে সুদর্শন কর্নেলের হাতের ওপর মারা যায়, তখন সঠিকভাবে এবং সামান্য দূরাগতভাবে তার পিতাকে লিখেন, 'পুত্রের মৃত্যুতে আমার যে অনুশোচনা হয়েছে, যারা তার (সুদর্শন কর্নেল) পরিচিত তারা তা জানে। যিনি তার বয়সের মর্যাদা এবং সুযোগ সুবিধার কারণে, অত্যন্ত যোগ্যতার অধিকারী, তার পক্ষেই এ ব্যাপারে যৌক্তিক মতামত দেয়া সম্ভব।'

খায়রুন্নিসা ও তার সন্তানদের ব্যাপারে জেমসের আবেগময় ভাষা ও গভীর অনুভূতির প্রকাশ এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা থেকেই বুঝা সহজ হবে যে, ব্রিটিশরা ভারতে একটি নৈতিক মনোভাব নিয়ে এসেছিল যার ভিত্তিতে তারা শ্রেণি ও গোত্রের মানুষকে বিচার করেছে। সমাজের নিম্ন শ্রেণি থেকে বেছে নেয়া রক্ষিতার ক্ষেত্রে তাদের আচরণ ছিল এক রকম, আর উচ্চতর শ্রেণির শিক্ষিত মেয়েদের গ্রহণের ক্ষেত্রে তারাই ভিন্নতর নিয়ম মেনে চলত এবং সেক্ষেত্রে গায়ের রং, ধর্ম বা গোত্র কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করত না।

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, খায়রুন্নিসার অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ এবং তার সাথে সম্পর্কের কারণেই বিষয়টি জেমস তার ভাই উইলিয়ামের কাছ থেকে চেপে রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ মীর আলমের সম্পর্কিত বোনের সাথে প্রেমের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক পরিণতি ছিল এবং প্রথম দিকে এ বিষয়ে উইলিয়ামের প্রশ্ন জেমস কৌশলে এড়াতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র একথা বলে যে, খায়রুন্নিসাকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। তিনি বলতেন, 'এটি অসম্ভব ব্যাপার।' উইলিয়ামও একথা শুনেছেন। কিন্তু উইলিয়াম দেখতে পাচ্ছিলেন যে, জেমসকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে সোজা উত্তর পাচ্ছেন না। একের পর এক পাঠানো চিঠিতে তিনি জেমসের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছিলেন যে, সে মেয়েটির প্রেমে পড়েছে কী না? জেমসকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হতে হলো উইলিয়ামকে বিস্তারিত ঘটনা জানাতে যে, কীভাবে এবং কোথায় তিনি 'বকর-

BanglaBook.org

এর নাতনির' সাথে প্রথম শয্যায় যান। উইলিয়ামকে লেখা চিঠিতে জেমস খায়রুন্নিসাকে 'বকর-এর নাতনি' বলেই উল্লেখ করেছেন। এই চিঠিতে তিনি মেয়েটিকে ছলনা করার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে যে অভিযোগ তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। বরং তিনি জোরের সাথে উল্লেখ করেন, খায়রুন্নিসাই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল—তাকে তার জেনানায় এনেছিলেন তার মা ও নানি। দৃশ্যত তার জেনানার মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। জেমস ভাইকে লিখেন—

> "আমার প্রিয় উইল,
> আমার আগের চিঠিতে আমি কোনো কিছু গোপন না করে 'বকর-এর নাতনি' ও আমার মধ্যে কি ঘটেছে তা জানিয়েছি। এর কারণ, তোমার কাছে আমার গোপনীয়তা বলে আমি কিছু জানি না, যদিও এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন স্বীকার করার ব্যাপার যে, তোমার কাছে নিজেকে কতোটা উন্মুক্ত করার অধিকার রাখি, বিশেষ করে বর্তমান বিষয়টি সম্পর্কে। এটি যেহেতু অনেক বিলম্বিত একটি ব্যাপার, সেজন্যে কি ঘটেছে স্মরণ করার জন্যেও বিলম্বিত। যেহেতু তোমার ওপর আমার অব্যক্ত নির্ভরতা এবং ভালোবাসাও আছে, সেজন্যে কোনো কিছু গোপন না করে তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দেব, যা তোমার উৎকণ্ঠাকে সন্তুষ্ট করবে।
> ভূমিকা হিসেবে এটি বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না, যে, এই চিঠির আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এক দীর্ঘ রাতের সাক্ষাৎ, যা আমি নিরাপদে অতিক্রম করে এসেছি। এ ছিল সেই সাক্ষাৎ, যা আমাকে পরিপূর্ণ ও অতি ঘনিষ্ঠভাবে তার সুন্দর কোমল দেহকে জরিপ করার সুযোগ দিয়েছিল—রাতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ পর্যন্ত যা স্থায়ী ছিল এবং এই সাক্ষাতের সাথে জড়িত ছিল তার নানি ও মা, যাদের সার্বক্ষণিক পীড়াপীড়ি তাকে তার অদম্য আকাঙ্ক্ষা পূরণে উদ্যোগী করে তুলেছিল। সাক্ষাৎ ঘটেছিল আমারই কক্ষে, আমি সংকল্প করেছিলাম উত্তেজনাকর ভোগ্য থেকে নিজেকে বিরত রাখার, যে আমন্ত্রণ আমাকে করা হয়েছিল এবং ঈশ্বর জানেন, সে এই কর্মে যোগ্য হয়ে উঠেনি, কিন্তু আবেগে উদ্বেল সেই রোমান্টিক তরুণীকে যুক্তি দেখিয়েছিলাম যে আমি তা করতে পারি না। স্বীকার করছি, আমার মধ্যে তার জন্যে করুণার উদ্রেক হয়েছিল। সে বারবার আমাকে পীড়াপীড়ি করছিল যে, তার ভালোবাসা শুধু আমারই জন্যে, তার ভাগ্য আমার সাথে জড়িত হয়ে গেছে এবং আমার সাথে সে যদি বাঁদী হয়েও থাকতে পারে তাহলেও পরিতৃপ্ত হবে। এই আবেগকে তোমার কাছে হয়তো উদভ্রান্ত মনের ব্যাকুল প্রকাশ বলে মনে হবে, কিন্তু যখন তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তোমাকে প্রেমের পুরো কাহিনি বর্ণনা করতে পারবো এবং তুমিও তার কাজ ও কথার ব্যাপারে আমার সাথে একমত হতে পারবে।

BanglaBook.org

এর পূর্ব পর্যন্ত (আমার আগের চিঠির এক পক্ষ বা তিন সপ্তাহ আগে মেয়েটির শরীর সম্পূর্ণ পবিত্র অলংঘিত ছিল)। কিন্তু এ ধরনের আরেকটি পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলে নিজেকে সংযত রাখা কি মানুষের সহজতা বলে মনে হবে? সম্ভবত, তোমার উত্তর হবে,'না', কিন্তু এরপর হয়তো তুমি প্রশ্ন করবে, তুমি এতে সাড়া দাও। উত্তরে আমি মানবিক অনুভূতির কথা ছাড়া আর কিছুই বলব না, আর তুমি যদি মানবিক দুর্বলতার কথা স্বীকার করো তাহলে এই তরুণীর হৃদয়গ্রাহী বেপরোয়া পরিস্থিতি এবং তার নানির আকুতিপূণ বার্তার বিপরীতে নিজেকে দৃঢ় রাখার পরিবর্তে মেয়েটির স্বস্তি বিধানের জন্যে সাড়া দিতে হবে।

আবারও বলছি, যদিও আমি অসংখ্য খবর ও প্রকৃত ঘটনা যাচই করে ও আমার পূর্বের দৃঢ়তার কারণেই সাড়া দেইনি। তবু এর পিছনে মেয়েটির নানি ও মা জড়িত (যদিও এ ব্যাপারে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখেছেন) আমি সে খোঁজও নিয়েছি। আমি তোমায় নিশ্চিত করতে চাই এবং শপথ করে বলতে পারি যে, মেয়েটির নানি স্বয়ং পরিকল্পনা তৈরি করেছিল আমাদের সাক্ষাতের এবং নাতনি মূর্চ্ছা যাওয়ার মতো এবং ভাঙা উচ্চারণে ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, সে আমার কাছে যা উৎসর্গ করতে চায়, (এবং সে আন্তরিকভাবে তাতে সাড়া দেবে) কেবলমাত্র তার মাধ্যমেই সে একটি ঘৃণ্য বিয়ে এড়াতে পারে। আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, আমার মধ্যে সকল পুরুষের মতোই কমবেশি কিছু আছে, যা আর ঠেকিয়ে রাখার উপায় ছিল না। ইচ্ছাকৃতভাবে মেয়েদের প্রেমে পড়া আমি ঘৃণা করি এবং নিজেকে তা থেকে দূরে রাখতেও সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার আচরণকে যে হঠকারিতার জন্যে অভিযুক্ত করা হোক না কেন (আর কার পক্ষেই বা সবসময় বিজ্ঞ থাকা সম্ভব) বা নৈতিকতার কঠোর বিধি দ্বারা বিচার করা হোক না কেন, আমি অসম্মানিত হওয়ার কথা ঘুনাক্ষরেও উচ্চারণ করব না...।

আমি এ ব্যাপারে আরও লিখতে পারি। কিন্তু তোমাকে অনুরোধ করছি যে, এ নিয়ে আরও আলোচনার ঝামেলা থেকে সম্ভব হলে আমাকে মুক্তি দাও।

তোমার বিশ্বস্ত ভাই
জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক।"

জেমসের ব্যক্তিগত জীবনে খায়রুন্নিসার সাথে প্রেম যখন পরিপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে, ঠিক একই সময়ে তার অফিসের সময় দখল করে রেখেছিল টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে লর্ড ওয়েলেসলির যুদ্ধে হায়দারাবাদের দিকটি সমন্বয় করার দায়িত্ব।

জেমসের দায়িত্ব ছিল কোম্পানির বিশাল বাহিনীর জন্যে ভেড়া, খাদ্যশস্য, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি সরবরাহ করা। বিশেষ করে যখন টিপু সুলতান এই

আশায় পোড়া মাটি নীতি গ্রহণ করেছেন যে তিনি অগ্রসরমান ব্রিটিশ বাহিনীকে ক্ষুধার্ত রেখে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করবেন, সে পরিস্থিতিতে জেমসের দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জেমস পাশাপাশি আরিস্তু জাহকেও উৎসাহিত করছিলেন তার সৈন্যদের বেতন হিসেবে আরও নগদ অর্থ প্রেরণ ও আরও সৈন্য সীমান্তে প্রেরণ করতে। এর আগে কৌশলগত দায়িত্ব পালনে তার কিছুটা সাফল্য ছিল। কিন্তু নগদ ও বর্ধিত সৈন্য প্রেরণের উপায় ছিল না জেমসের। এ ব্যাপারে তিনি নিজামের প্রধান উজিরকে যত চাপাচাপি করছিলেন, আরিস্তু জাহ তত কৌশলে তাকে ঠেকিয়ে রাখছিলেন আলোচনার প্রসঙ্গ দ্রুত পালটে ফেলে। এপ্রিল মাসের মেধ্যে জেমস সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, প্রধান উজিরের কাছ থেকে কোনো কিছু আদায় করার মোক্ষম উপায় হচ্ছে তার প্রিয় প্রসঙ্গ মোরগের লড়াই-এর অবতারণা করা এবং জেমস তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পায়গাহ অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণের বিনিময়ে সেরা ইংলিশ লড়াকু মোরগ উপহারের প্রস্তাব দিলেন। তিনি উইলিয়ামকে এ ব্যাপারে লিখেন, 'উজির এই খেলার প্রতি অতি মাত্রায় আসক্ত এবং লড়াকু জাতের খাঁটি কিছু ইংলিশ মোরগ লাভে ব্যগ্র।' অবশ্য এই চিঠির এক মাস আগেই হায়দারাবাদের বাহিনী মহীশূরের পথে রওয়ানা হয়ে গেছে। উইলিয়ামের কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'মাদ্রাজে কি এ ধরনের মোরগ আছে?'

যুদ্ধেক্ষেত্র থেকে খবর আসছিল যে, যুদ্ধ চরম পর্যায়ে পৌঁছতে যাচ্ছে। এপ্রিলের প্রথম দিকেই জেনারেল হ্যারিস বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করে নিয়েছেন এবং টিপু পশ্চাদপসরণ করে শ্রীরঙ্গাপতমের বিখ্যাত দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তার অধীনে মাত্র সাঁইত্রিশ হাজার সৈন্য, দুশমন বাহিনীর তুলনায় অনেক কম! তবু তিনি কোম্পানির শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবেই টিকে ছিলেন। পূর্ববর্তী তিনটি অ্যাংলো-মহীশূর যুদ্ধে প্রতিবারই কোম্পানির সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে। প্রথম দুটি যুদ্ধে কোম্পানি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন স্যার ডেভিড বেয়ার্ড এবং তার সম্পর্কিত ভাই জেমস ড্যালরিম্পেল। দুজনকেই টিপুর সৈন্যরা বন্দি করতে সক্ষম হয়েছিল ১৭৮০ সালে পাল্লিউরে ব্রিটিশদের শোচনীয় পরাজয়ের পর। সমসাময়িক একজন ইতিহাসবিদ লিখেছেন, 'ভারতে ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর আপতিত সবচেয়ে শোচনীয় বিপর্যয়।'

কৌশলগতভাবে মহীশূরের বাহিনী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর সাথে খাপ খাওয়ানোর মতো যোগ্য ও দক্ষ ছিল। টিপু সুলতানের সৈন্যরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ফরাসি প্রশিক্ষকদের কাছে সেই প্রশিক্ষণই লাভ করেছে, যা কোম্পানি সৈন্যদের দেওয়া হয়েছে। বরং মহীশূরের পদাতিক বাহিনীর ইস্পাত কঠিন শৃঙ্খলা ছিল অবিশ্বাস্য এবং বহু ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকের কাছে তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তদুপরি সৈন্যদের রাইফেল ও কামান ছিল

Banglabook.org

আধুনিকতম ফরাসি ডিজাইনের এবং তাদের কামান অধিক পরিমাণে গোলা অধিকতর দূরত্বে নিক্ষেপে সক্ষম ছিল, যার তুলনীয় কামান কোম্পানির সৈন্যদের ছিল না। বাস্তবিক পক্ষেই বহু ক্ষেত্রে মহীশূরের বাহিনী বেশি উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ও কোম্পানির বাহিনীর তুলনায় প্রযুক্তিগভাবেও সেরা ছিল। যেমন, ব্রিটিশ বাহিনীতে উইলিয়াম কংগ্রীভের গৃহীত রকেট ব্যবস্থা চালু করার বহু আগেই মহীশূরের উষ্ট্র বাহিনী থেকে রকেট নিক্ষেপের কৌশল চালু করা হয়েছিল অশ্বরোহী বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার জন্যে। লর্ড ওয়েলেসলির জন্যে উদ্বেগের ব্যাপার হলো শ্রীরঙ্গপতমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ফরাসি প্রকৌশলীদের ডিজাইনে তৈরি এবং তারা তখনকার বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে তা করেছেন। কামানের গোলায় যাতে দুর্গপ্রাচীরে কোনো ফাটল সৃষ্টি না হয় সেজন্যে ব্যবহার করা হয়েছে সেবাস্টিয়ান ডি ভাউবনের গবেষণার ফলাফল। এ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে মার্ক ডি মন্টালেম্বার্টের গ্রন্থ 'লা ফের্টিফিকেশন পারপেন্ডিকুলার'-এ। এর ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সেরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল শ্রীরঙ্গপতম দুর্গে। তদুপরি তার সাথে যোগ হয়েছে গোলা বর্ষণের উন্নততর কামান, বোমা ও মাইন।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীরঙ্গপতমে অবরোধ শুরু হয়। টিপু সুলতান প্রতিটি উদ্যোগে হামলা ঠেকানোর ক্ষেত্রে তার চারিত্রিক অখণ্ডতা ও ধৈর্যের প্রমাণ রেখে যাচ্ছিলেন। একজন ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক লিখেন—তিনি আমাদের বন্দুকের জওয়াব দিয়েছেন বন্দুক দিয়ে। রাতের অন্ধকারে সংঘর্ষের সময় আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে হামলা। শিগ্‌গির দৃশ্যপট হয়ে উঠে অদ্ভুত : দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে অসাধারণ ওজনের গোলা ও রকেট নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। উত্তর দিক থেকে বর্সিত হতে থাকে চৌদ্দ পাউন্ডের গোলা। পরিখা থেকে তাদের হামলা অব্যাহত ছিল। আমাদের কামানের সারিতে প্রায়ই আগুন ধরে যাচ্ছিল...যা ছি টিপুর সেরা ব্যাঘ্র বাহিনীর (এ বাহিনীর সৈন্যদের ইউনিফর্মে বাঘের ডোরাকাটা ছিল) অগ্রসর হওয়ার সংকেত। বন্দুকের গুলি আসছিল ঝাঁকে ঝাঁকে। তাদের প্রতিরক্ষা ছিল সাহসিকতাপূর্ণ ও দক্ষ। ৩ মে যখন নিজামের বাহিনীর কামানগুলো দুর্গের পশ্চিম দিকের দুর্বল অংশের সাড়ে তিনশো গজের আওতার মধ্যে আনা ছিল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং হ্যারিস পরদিন বিপুল বিক্রমে হামলার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

দুপুর একটায় দিনের উত্তপ্ত সময়ে টিপুর অধিকাংশ সিপাহী বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে চলে গেছে। কোম্পানির পরিখায় ডেভিড বায়ার্ড সৈন্যদের চাঙ্গা করে তুলে তাদের মাঝে বিস্কুট বিতরণ করলেন। ডেভিড বায়ার্ড টিপুর কারাগারে চুয়াল্লিশ মাস অন্তরীণ ছিলেন। তিনি তরবারী হাতে পরিখা থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে একটি ঝটিকা বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন—যার মধ্যে মীর আলমের দুশো হায়দারাবাদি সৈনিকও ছিল। তারা কাবেরী নদীর ওপর দিয়ে দুর্গ

BanglaBook.org

অভিমুখে যাচ্ছে, যেদিকে দুর্গের দুর্বলতম অংশ। দুটি দল অগ্রসর হলো দুর্গের ঢালু দিয়ে এবং শহরের ভেতরে। ডান ও বাম দিক দিয়ে যাচ্ছিল তারা এবং টিপুর সৈন্যদের সাথে বিভিন্ন স্থানে হাতাহাতি যুদ্ধ হচ্ছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শহরটি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে এলে। বায়ার্ডকে টিপুর মৃতদেহের কাছে নিয়ে যায় তার এক ওমরাহ। মৃত ও আহতদের স্তুপের মাঝে পড়ে ছিলেন তিনি। তার দেহে বেয়নেটের তিনটি আঘাত এবং মাথায় একটি গুলি লেগেছিল। টিপুর চোখ ছিল খোলা এবং শরীর তখনো উষ্ণ ছিল। বায়ার্ড বিস্মিতভাবে ভাছিলেন যে, টিপু এখন জীবিত কিনা, কিন্তু তার নাড়ি অনুভব করে তিনি তাকে মৃত ঘোষণা করলেন।

মহীশূরের সৈন্যদের মাঝে মৃতের সংখ্যা ছিল বিপুল। সে তুলনায় কোম্পানির অধীনস্থ মিত্র বাহিনীর হতাহত কম। টিপু সুলতানের পক্ষে নিহত হয়েছিল প্রায় নয় হাজার, আর কোম্পানি হায়দারাবাদি পক্ষে মাত্র সাড়ে তিনশো। কিন্তু সে রাতে এক লাখ অধিবাসীর শহর শ্রীরঙ্গপতমের ওপর নেমে এসেছিল হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন। আর্থার ওয়েলেসলি তার মাকে এ সম্পর্কে জানান—

> "একটি বাড়িও লুণ্ঠনের বাইরে ছিল না এবং আমার মনে হয় দুর্গের অভ্যন্তরে মূল্যবান রত্নাদি, সোনার পিণ্ড ইত্যাদি বাজারে আনা হয়েছিল আমাদের সৈন্য ও অনুসারীদের কাছে বিক্রির জন্যে। ৫ তারিখে আমি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে কঠোর হাতে শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে অনেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, বেত্রাঘাত করে পরিস্থিতি শান্ত করতে সক্ষম হই.... ।"

একটি দল, যাদের ওপর লুটের মাল বণ্টনের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল, তারা টিপুর ভাণ্ডারের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা সংগ্রহে লিপ্ত হয় এবং তার খাজাঞ্চিতে প্রায় ১১ লাখ পাউন্ড মূল্যের সোনার থালাবাসন, অলংকার, পালকি, ঢালাই সোনার ব্যাঘ্র আসন, অস্ত্রশস্ত্র, রেশমি বস্ত্র ও শাল অর্থা'ৎ ক্ষমতা দিয়ে যা সংগ্রহ করা যায় অথবা অর্থ দিয়ে ক্রয় করা সম্ভব সবই ছিল। প্রায় এক পক্ষ পর অর্থাৎ ১৭ মে জেমসের দূতদের একজন মহাবিজয়ের এই খবর হায়দারাবাদে নিয়ে আসে। জেমসের মুন্‌শি বা একান্ত সচিব আজিজ উল্লাহ ইতোমধ্যেই দরবারের পথে রওয়ানা দিয়েছেন উজির ও নিজামকে ঈদুল আজহা উপলক্ষে তার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে। তিনি সাথে নিয়েছেন বিজয়ের খবর। নিজামকে খবরটি দেয়ার সাথে সাথে তিনি তার গলা থেকে মুক্তার একটি মালা খুলে মুনশির গলায় পরিয়ে দিলেন এবং আসন থেকে উঠে তাকে আলিঙ্গন করলেন। নিজাম অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। তিনি গোলকুণ্ডা দুর্গ প্রাচীন থেকে এক ঘণ্টা ধরে কামানের গোলা বর্ষণের নির্দেশ দিলেন আনন্দ উদযাপনের জন্যে।

কোম্পানি ও হায়দারাবাদের মধ্যে মৈত্রীর সাফল্যের ক্ষেত্রে এ ছিল বিরাট এক মুহূর্ত, যে লক্ষ্যে জেমসকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিন্তু বিজয়ের

BanglaBook.org

বিশালতা এবং বিজয়ী বাহিনী কর্তৃক বিপুল সম্পদ দখলের বিষয়টি দু'পক্ষের মধ্যে ভবিষ্যৎ মতানৈক্যের বীজ বপন করে। এ মতানৈক্য শুধু ব্রিটিশ ও নিজামের মধ্যে অথবা আরিস্তু জাহ ও মীর আলমের মধ্যে নয়, বরং লর্ড ওয়েলেসলি ও ইংল্যান্ডে তার প্রভুদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরোক্ষ ভাবে জেমস কার্কপ্যাট্রিক ও উল্লেখিত সকলের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

উইলকি কলিন্স-এর বিস্ময়কর ভিক্টোরীয় যুগের গোয়েন্দা কাহিনি 'দি মুনস্টোন'-এ শ্রীরঙ্গপতমের কাহিনিতে দেখানো হয়েছে যে, কাহিনি বর্ণনাকারীর সম্পর্কিত ভাই জন হেরেনক্যাসেল 'হলুদ হীরক' কব্জা করেছেন—এই ঘটনাটি ভারতের দেশিয় বিবরণীতে বিখ্যাত, যা বসানো ছিল চার হস্তধারী ভারতীয় চন্দ্র দেবতার কপালে। হীরক সংগ্রহ করতে হেরেনক্যাসেলকে এক হাতে একটি মশাল ও আরেক হাতে রক্তে ভেজা একটি ছুরি নিয়ে মুনস্টোনের তিনজন অভিভাবককে হত্যা করতে হয়েছে, যাদের মধ্যে সর্বশেষ জনকে হত্যার সময় সে বলেছে যে, হীরকটির অভিশাপ তাকে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করবে। অর্থাৎ মুনষ্টোন তার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। রহস্যোপন্যাসের কাহিনির গতিধারায় হীরকটি যার হাতেই পড়েছে তারা হয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে অথবা দুর্ভাগ্যের শিকার পরিণত হয়েছে, হীরকটি পুনরায় তার রহস্যজনক হিন্দু অভিভাবকদের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত।

কাহিনিটি কলিন্সের নিজের কল্পিত এবং সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে রচিত নয়। তবু অবাক ব্যাপার যে, শ্রীরঙ্গপতমে লুটপাটের ঘটনা লুণ্ঠনে নেতৃত্বদানকারী অনেকের জীবনে অভিশাপ হিসেবে আসে এবং আরও উল্লেখযোগ্য যে, টিপু সুলতানের ভাণ্ডার থেকে লুণ্ঠিত হীরক সেই মুহূর্ত থেকেই মীর আলমের জীবনে বাস্তবিকপক্ষেই সর্বনাশা প্রভাব ফেলে।

বিজয়ী হায়দারাবাদি সেনাবাহিনী গোলকুণ্ডায় ফিরে আসার পূর্বে পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। গোলকুণ্ডায় তাদেরকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানানো হয়। আবদুল লতিফ শুস্তারির মতে, ১১ অক্টোবর তিনিও অভ্যর্থনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন। তিনি লিখেন, 'মীর আলম হায়দারাবাদে ফিরে আসেন এবং নিজাম তার ব্যক্তিগত হাতি পাঠান তাকে বিজয়ী বেশে আনার জন্যে। এমনকি তিনি ওমরাহদের নির্দেশ দেন তাকে শহরের বাইরে অপেক্ষা করে স্বাগত জানানোর জন্যে।' অন্যান্য হায়দারাবাদি বিবরণীতেও এই দৃশ্যেরই উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। গোলাম হোসেন খান লিখেছেন, 'মীর আলম যখন শ্রীরঙ্গপতম থেকে ফিরে আসেন, তখন তার খ্যাতি ছিল আকাশচুম্বি।' কিন্তু উপরিকাঠামোর নিচেই উত্তেজনা সূচিত হয়েছিল মীর

BanglaBook.org

আলমকে কেন্দ্র করে। কারণ, টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর মীর আলমের আচরণেও পরিবর্তন এসেছিল। গুস্তারি এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বিজয়ের মুহূর্তটি তার পতনেরও সূচনা ঘটিয়েছিল। কারণ ওমরাহ্‌রা ঈর্ষায় জ্বলছিলেন এবং তার পতন ত্বরান্বিত করতে চক্রান্ত শুরু করেছিলেন।'

নয় মাস আগে হায়দারাবাদ ত্যাগ করার পূর্বে মীর আলম যা ছিলেন শ্রীরঙ্গপতম থেকে ফিরে আসার পর তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হন। শারীরিকভাবে তিনি দুর্বল ছিলেন এবং মাদ্রাজে তিনি এতই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, লর্ড ওয়েলেসলির সঙ্গে তার আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ বিলম্বিত হয়েছিল এবং তার পরিস্থিতি এত শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, অনেকের ধারণা হয়েছিল, তিনি মারা যাচ্ছেন। গুরুতর, অসুস্থতার মধ্যেই তার শরীরে প্রথম কুষ্ঠরোগের লক্ষণ ধরা পড়ে, যা পরবর্তী দশ বছর তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিন্তু স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা সত্ত্বেও মীর আলমের মধ্যে নতুন এক আস্থার জন্ম হয়েছিল—এমনকি এক ধরনের ঔদ্ধত্যের। টিপুর ওপর দর্শনীয় বিজয়, ঊর্ধ্বতন ব্রিটিশ সেনাপতিদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব এবং লর্ড ওয়েলেসলি সাথে তার বৈঠক—সবকিছু মিলে তার মধ্যে নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, ক্ষমতার সিঁড়িতে তার দ্রুত আরোহণের পেছনে আছে ব্রিটিশদের সমর্থন এবং শিগ্‌গিরই গুজব ছড়াতে শুরু করল যে, তিনি তার পুরনো মনিব আরিস্তু জাহকে উৎখাত করার ইচ্ছা পোষণ করছেন, যিনি কলকাতায় কোম্পানির অফিসারদের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন মহীশূরের যুদ্ধে আরও সৈন্য ও তহবিল প্রেরণে কোনো তাগিদ অনুভব না করায়। জেমস কার্কপ্যাট্রিকও নিশ্চিতভাবেই মীর আলমের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন এবং পরপরই তিনি উইলিয়ামকে লিখেন, 'হায়দারাবাদে ফিরে আসার পর থেকে মীর আলমের পুরো আচার আচরণের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আমার বিশ্বাস হচ্ছে নিজাম যে তার ফিরে আসার সময় অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন তা তাঁর মাথা সম্পূর্ণ বিগড়ে দিয়েছে।

শুধু যে জেমসের কাছেই মীর আলমের আচরণ আপত্তিকর মনে হয়েছে তা নয়, আরও অনেকেই তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ১৪ সেপ্টেম্বর বিজয়ীর বেশে তার ফিরে আসার আগেই জেমস উল্লেখ করেছেন যে, মীর আলমের দ্বারা নিজাম খুব বিরক্ত অনুভব না করলেও তেমন ঘনিষ্ঠতা অনুভব করছেন না। আমার বিশ্বাস, জেনানায় তার বন্ধুর চাইতে শত্রু সংখ্যা অধিক। এ ছিল এক অশুভ লক্ষণ। কারণ জেমস স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, নিজামের স্ত্রীরা—বিশেষ করে দুই জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বকশি বেগম ও তিনাত-উন-নিসা বেগমের বিশাল প্রভাব ছিল নিজামের উপদেষ্টা ও উজিরদের ওপর। অনেক ক্ষেত্রে এই দুজনের মর্জির ওপর নির্ভর করত তাদের দায়িত্বের মেয়াদ। তারা যদি মীর আলমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে থাকে, তাহলে মীর আলমের উদ্বিগ্ন

BanglaBook.org

হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, তার সাফল্যের চমকের মধ্যে তিনি নিজে কি আচরণ করতে শুরু করেছেন তা লক্ষ করেননি।

নিজাম এবং আরিস্তু জাহ দুজনেরই আসলে যথেষ্ট কারণ ছিল মীর আলমের ওপর ক্রুদ্ধ হওয়ার। প্রথমত, মে মাসে বিজয়ের পর যা ঘটেছে তাতে তারা গভীরভাবে অসন্তুষ্ট হন, কারণ টিপুর ভূখণ্ডকে ব্রিটিশরা খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছিল। ব্রিটিশরা আশঙ্কা করছিল ব্রিটিশ এবং নিজামের মধ্যে যদি টিপুর বিশাল ভুখন্ড ভাগ হয়ে যায় তাহলে মারাঠারা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। ফলে তারা বিপুলভাবে তাদের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করবে। মারাঠারা এই অভিযানে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অতএব তারা বিজয়ের ফসলের কোনো ভাগ পাওয়ার দাবিদার হতে পারে না। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকসহ একটি কমিটি মারাঠাদের বিক্ষুব্ধ না করে মহীশূর রাজ্যকে অসম্মনজনকভাবে বিভক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনার মধ্যে নিজামকে আরও ভূখণ্ড ও ক্ষমতার অধিকারী না করার চিন্তাও ছিল ব্রিটিশদের।

মহীশূরকে দুই ভাগে বিভক্ত করার সহজ উপায় অবলম্বনের পরিবর্তে ব্রিটিশ বিভাগ কমিটি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় তুলনামূলকভাবে ভূখণ্ডের অল্প অংশ নিজেদের ও নিজামের জন্যে রেখে সিংহভাগ অর্পণ করে মহীশূরের প্রাচীন ওয়াদায়ার বংশকে, যাদের ভূখণ্ড জয় করে নিয়েছিলেন টিপু সুলতানের পিতা এবং রাজাকে তিনি উৎখাত করেছিলেন। ব্রিটিশরা একটি বিষয় নিশ্চিত করে যে, মহীশূরের পুরঃপ্রতিষ্ঠিত রাজা ব্রিটিশ দাতাদের অনুগত থাকবে। ফলে ভূখণ্ডের ওপর তাদের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। কারণ, তারা রাজ্যের সাবেক মালিকের কাছে শর্তহীনভাবে রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। লর্ড ওয়েলেসলি এটিকে সর্বোত্তম সমাধান বলে বিবেচনা করেন, কিন্তু নিজাম এতে শঙ্কিত হন এবং বোধগম্য করণেই ভাবেন যে, যেহেতু তিনি টিপুকে পরাজিত করার জন্যে অর্ধেক সৈন্য সরবরাহ করেছেন, অতএব অধিকারের বলেই বিজয়ের অর্ধেক অংশীদার হওয়া উচিত তারই। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, যখন তিনি জানতে পারেন, মীর আলম এ ধরনের বিভক্তিতে দুর্বলতার সাথে সম্মতি দিয়েছেন এবং বিভক্তি চুক্তিতে নিজের সিলমোহর প্রদান করেছেন, বিষয়টির আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্যে নিজামের কাছে না পাঠিয়ে। মীর আলমের ব্যাপারে নিজামের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায় যখন প্রকাশ পায় যে, মীর আলম লর্ড ওয়েলেসলির কাছ থেকে একই সাথে দানসুলভ ভাতা গ্রহণ করেছেন—মাসিক ভাতা, যা নিজাম ও আরিস্তু জাহ সন্দেহ করেন বিভক্তিতে তার দুর্বল ও সন্দেহজনক ভূমিকার পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন, অভিযানে সহযোগিতা করার বিনিময়ে নয়।

টিপুর লুণ্ঠিত সম্পদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তার প্রতি নিজামের অসন্তুষ্টি মীর আলমের জন্যে আরও শোচনীয় ছিল। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে লুণ্ঠিত

BanglaBook.org

সম্পদ শুধুমাত্র সেনাপতিদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়ার পরিবর্তে ইউরোপীয়রা সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেও বণ্টন করে দেয়। জেমস যখন জানতে পারলেন যে, হ্যারিস একটি কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে সৈনিকদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের জন্যে, তখনই তিনি উপলব্ধি করলেন এর ফলে দরবারে সমস্যার সৃষ্টি হবে।

'নিজাম ও তার উজির যখন জানতে পারবেন যে, টিপু সুলতানের পুরো সম্পদ...সেনাবাহিনী ভাগ করে নিয়েছে, আমি নিশ্চিত যে, তাদের হৃদয় ভেঙে যাবে দুঃখে ও হতাশায়। আমি ধীরে ধীরে এ তথ্য উজিরের কাছে প্রকাশ করে তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পারি। কিন্তু খবরটি তাকে যে মর্মাহত ও বিচলিত করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মীর আলমের জন্যে আরও বিপর্যয়কর যে, হায়দারাবাদে গুজব প্রচারিত হয়েছিল যে, শ্রীরঙ্গপতম লুণ্ঠন চলাকালে মীর আলমের হাতেই কোনোভাবে পড়েছে টিপুর সেরা রত্নভাণ্ডার, যার মধ্যে আছে ডিমের আকৃতির মতো মুক্তা সম্বলিত অপূর্ব এক নেকলেস। একথা সত্য যে, ফিরে আসার পর তিনি এগারো লাখ রুপি মূল্যের সমতুল্য সুন্দর বাছাই করা লুণ্ঠিত রত্নাদি নিজামকে উপহার দিয়েছেন, কিন্তু অব্যাহত গুজবে এই পরিমাণ ছিল নিজের কাছে গোপনে রেখে দেওয়া রত্নরাজির তুলনায় বুদবুদ তুল্য। এছাড়াও কাহিনি ছড়িয়েছিল যে, মীর আলম যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাজ্যের সম্পদের বিশাল অংশ সাথে নিয়ে গেছেন। আরিস্তু জাহকে ব্যক্তিগতভাবে এসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। এ কারণে তিনি নিজেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন মীর আলমের সাথে যুদ্ধ চলাকালে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সেনাপতিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল বলে এবং মীর আলম এসব সম্পর্কের বিষয় তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে গোপন রাখার চেষ্টাও করেননি।

শুস্তারি বংশের সদস্যদের মধ্যে শুধু যে মীর আলমই নিজামের অসন্তুষ্টির শিকার হবেন তা নয়। মীর আলমের ফিরে আসার সপ্তাহ দু'য়েক পূর্বে একটি চক্রান্তমূলক ঘটনা ঘটে। শ্রীরঙ্গপতমের পতনের পর বকর আলী খান মাদ্রাজে মীর আলম ও জন ম্যালকমের সাথে সাক্ষাৎ করেন, যখন তাদেরকে লর্ড ওয়েলেসলির সমীপে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো কারণে হঠাৎ করে বকর আলী খান তার অজুহাত সৃষ্টি করে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে দুই সপ্তাহ আগে হায়দারাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তার পক্ষ ত্যাগের খবর যখন নিজামের দরবারে পৌঁছে তখন আরিস্তু জাহ কঠোরভাবে তার সমালোচনা করেন বিনা অনুমতিতে নিজের অবস্থান ছেড়ে আসার জন্যে এবং প্রথমে তাকে শহরে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হয়। ক্ষমা চেয়ে তিনি যে দরখাস্ত পাঠান সেটিও আরিস্তু জাহ না খুলে ফেরত পাঠান। কিছু সময় ধরে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করে। জেমস কার্কপ্যাট্রিকের মতে, 'এহেন আচরণে মর্মাহত বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাগের প্রথম আবেগে উজিরের

BanglaBook.org

কাছে হজ্বে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেন। দরখাস্তের কোনো উত্তর পাননি তিনি, যার ফলে তার মধ্যে এত ক্ষোভের সৃষ্টি হয় যে তিনি তার স্ত্রী ও পরিবারকে উজিরের মহলে যাওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন এবং উজিরের অন্যতম স্ত্রী বু বেগমের পুনঃপুনঃ প্রেরিত খবরের পরেই শুধু এ পরিস্থিতির অবসান ঘটে, কারণ আরিস্তু জাহের পরিবার ও বকর আলী খানের পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। উজির শেষপর্যন্ত তাকে হায়দারাবাদ প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। বকর আলী খানের সিদ্ধান্ত ছিল অবিজ্ঞচিত, বেখাপ্পা ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব তথ্য জানার জন্য জেমসের চিঠিপত্রই একমাত্র উৎস এবং চিঠিগুলোতে বকর আলী খানের আচরণের ব্যাখ্যা কী হতে পারে তার উল্লেখ না থাকাই স্বাভাবিক। কোনোভাবে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে জেনানায় কিছু আলোড়ন হচ্ছে এবং পরিবারের মহিলাদের মধ্যে তার তত্ত্বাবধান আবশ্যক।

ক্রমবর্ধমান এসব উত্তেজনার মধ্যেও একটি উৎসবের আমেজ ছিল সর্বত্র। টিপু সুলতানের পতন উদযাপনের জন্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিল। প্রথম অনুষ্ঠান ছিল ১৮ অক্টোবর, সেনাবাহিনী ফিরে আসার এক সপ্তাহ পর। মীর আলমের বাসভবনে বাইজি নাচের বিশাল আয়োজন করা হয়, যেখানে মীরের রক্ষিতা মাহলাকা বাই চান্দা দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে নৃত্য পরিবেশন করেন এবং তার লেখা কবিতার একটি বই জন ম্যালকমকে উপহার দেন। শ্রীরঙ্গপতম অভিযানের সময় জন ম্যালকম শুস্তারি বংশের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান এবং বকর আলী খানের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রিত হন, যেখানে পরিবারের মহিলাদের সাথে তাকে পরিচায় করিয়ে দেওয়া হয়—যা ছিল কাউকে দেওয়া নজিরবিহীন এক সম্মান। সৌজন্যের আরও চূড়ান্ত দেখানো হয় তাকে বকর আলী খানের সম্মানসূচক ভাই হিসেবে মর্যাদা দিয়ে। এটি ছিল পরিবারটির উদার নীতির দৃষ্টান্ত। একজন পর্যবেক্ষক এভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন যে, 'তাদের সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক সংকীর্ণ কুসংস্কার থেকে মুক্ত।'

তখনকার দিনে হায়দারাবাদে বাইজি নাচ, মাহফিল ইত্যাদি দিল্লি ও লক্ষ্মৌর মতোই প্রাসাদের বাইরের উদ্যানে রাতের বেলায় অনুষ্ঠিত হত। এ ধরনের অনুষ্ঠানের চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন ফারজান্দ বেগমের দাদা দরগাহ কুলি খান। তিনি লিখেছেন—

> "সন্ধ্যায় আঙ্গিনা ঝাড় দিয়ে পানি ছিটিয়ে রঙ্গিন গালিচা বিছানা হত ভূমি থেকে উঁচু একটি প্ল্যাটফর্মে। এরপর প্রতিষ্ঠিত কবিরা সেখানে আসন নিয়ে তাদের গজল আবৃত্তি করতেন...কখনো কখনো শামিয়ানা টানানো হত....নর্তকিরা দর্শদের মনোরঞ্জন করত এবং এসব অনুষ্ঠানে এত অধিক সংখ্যক সুন্দরী রমনীয় উপস্থিতি ঘটত যে, তাদের দেখলেই ক্ষুধা নিবারিত

BanglaBook.org

> হত, যদিও লম্পট কামুকদের জন্যে এটুকু যথেষ্ট ছিল না। প্রদীপ ও মোমবাতির আলোতে পুরো এলাকাকে মনে হত যেন 'তুর' উপত্যকার উজ্জ্বলতা বিরাজ করছে। ওমরাহরা বসতেন সবচেয়ে সুন্দর গালিচা বিছানো এক পাশে। তাদেরকে বিনয়ের সাথে পরিবেশন করা হয় ফল ও অন্যান্য খাবার, ছিটানো হয় সুগন্ধি। যারা মদ পানে আগ্রহী তাদেরকে মদও পরিবেশন করা হয়—সারেঙ্গির তারে উত্থিত শব্দ যেন তীর দিয়ে হৃদয় বিদ্ধ করার মতো—সুর মানুষকে উত্তাল উচ্ছ্বসিত করে তোলে এবং প্রশংসার ধ্বনি আকাশকে কম্পিত করে।"

এধরনের অনুষ্ঠান জেমস অনেক উপভোগ করেছেন এবং সাধারণত তিনি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকতেন। এটা ঠিক যে, নভেম্বর মাসে কলকতায় প্রেরিত তার চিঠিতে বার বার ক্ষমা প্রার্থনার উল্লেখ আছে কাজে পিছিয়ে থাকার জন্যে এবং বিশেষ করে এক রাতে তিনি অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিতে না পারার জন্যে আরিস্তু জাহের উপস্থিত থাকার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন—'উজিরের প্রতি সৌজন্যের কারণেই রাতের গভীরেও বিদায় নিতে পারিনি...।' যদিও আমি রাতের অনুষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত উপস্থিত থাকি, সে কারণে ক্লান্তিও পেয়ে বসে, আশা করি সেজন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে এবং গভর্নর জেনারেলের কাছেও আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে।'

বিজয়ের উৎসবগুলো যখন শেষ হয়ে এল, তখন নিজামের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সিকান্দার জাহ্‌'র আসন্ন বিয়ের কথা ঘোষণা করা হলো। বিয়ে হবে আরিস্তু জাহের নাতনি জাহান পাওয়ার বেগমের সাথে। এ উপলক্ষে আবার নতুন করে উৎসব শুরু হলো। জেমসও উপলক্ষটিকে কূটনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করলেন। কারণ দরবার ও রেসিডেন্সির মধ্যে লক্ষণীয় শিথিল সম্পর্ক তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল, যার সূচনা হয়েছিল হায়দারাবাদের কাছে ঘৃণিত ও অগ্রহণযোগ্য মহীশূর বিভক্তি চুক্তি। জেমস নিজামের পক্ষ থেকে ইংরেজদের প্রতি আচরণে বিরাসক্তি লক্ষ করে আসছিলেন, যা কোনো না কোনোভাবে কাটিয়ে উঠে সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

এতদিন পর্যন্ত জেমস কার্কপ্যাট্রিক লর্ড ওয়েলেসলির একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। ভাইয়ের কাছে লিখিত চিঠিতে গভর্নর জেনারেলের প্রতি তার শ্রদ্ধা অনেক সময় বীর পূজার মতো মনে হত : 'আমি কীভাবে যে নিজেকে মহামহিমের পদতলে নিক্ষেপ করার এবং তার কাছে একথা প্রকাশ করার জন্যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি, আমি তার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ, আমার প্রতি তার সহৃদয়তার জন্যে।' ১৭৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি উইলিয়ামকে লিখিত এ চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন, 'আমি বিশ্বাস করি গভর্নর জেনারেল কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগেই আমার তা করা উচিত। আমি আসলেই মনে

BanglaBook.org

করি যে, এই মহান ব্যক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আমার প্রিয় বাবা মা এবং তোমার প্রতি যে ভালোবাসা অনুভব করি, ঠিক সেরকম।'

এখন জেমসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। বিভক্তি চুক্তিতে ভারতীয় রাজাদের প্রতি লর্ড ওয়েলেসলির আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রভুত্বের মনোভাব দেখার পর তার প্রতি জেমসের দৃষ্টিভঙ্গিও যাচাই করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। ১৭৯৮ সালের প্রাথমিক চুক্তিতে নিজাম তার প্রতিশ্রুতির প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠ ছিলেন এবং স্বল্প সময়ের নোটিশে ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে শ্রীরঙ্গাপতমে যুদ্ধের জন্যে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু বিজয়ের হিস্‌সা প্রদানের ক্ষেত্রে হায়দারাবাদিদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। এর ফলে জেমসও স্বয়ং বিরক্ত এবং সতর্কতার সাথে তিনি হায়দারাবাদ দরবারের সাথে যে সম্পর্কে গড়ে তুলেছিলেন বিভক্তি চুক্তির কারণে তা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জেমস পুনার রেসিডেন্ট তার বন্ধু জেনারেল উইলিয়াম পামারকে লেখা চিঠিতে গভর্নর জেনারেলের নীতির খোলামেলা সমালোচনা করেন—'আমি তোমার ন্যায়সঙ্গত মনোভাবের প্রতিফলন সংক্রান্ত একনায়কত্ব সুলভ চেতনার বিরুদ্ধে একমত। বাস্তবিক পক্ষেই আমাদের অর্জিত সাফল্য যেন আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে।' পরবর্তী মাসগুলোতে জেমসের এই দৃষ্টিভঙ্গি কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে।

মহীশূর বিভক্তি চুক্তির ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার কিছুটা হলেও সংশোধনের লক্ষ্যে জেমস এখন কলকাতায় লিখতে থাকেন বড় ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি চেয়ে। এক্ষেত্রে অনুষ্ঠান বলতে তিনি নিজাম ও আরিস্তু জাহের পুত্র ও কন্যার মধ্যে বিবাহ-পরবর্তী ভোজের আয়োজন বুঝাতে চেয়েছেন। যে অনুষ্ঠানে নিজাম ও উজিরের পরিবারের সকল সদস্যকে উদারভাবে উপঢৌকন প্রদান করা যেতে পারে, এমনকি জেনানার সদস্যদেরসহ। এভাবেই ঘোলা পানিতে তেল ঢালার চেষ্টায় নিয়োজিত হন জেমস কার্কপ্যাট্রিক।

জেমসের ভালোভাবেই জানা ছিল যে, এ ধরনের একটি ব্যয়বহুল ব্যাপারে সন্দেহ প্রবণ লর্ড ওয়েলেসলিকে মানিয়ে নেয়া সহজ হবে না, যিনি দেশীয়দের ব্যাপারে এত অর্থ ব্যয়ের ধারণার সাথে কখনো একমত হবেন না। বিশেষ করে বিভিন্ন অভিজাতের হারেমে মহিলাদের, বাইজি নর্তকিদের এবং হায়দারাবাদের বিভিন্ন সুফির দরগাহতে দান করার বিষয়টি তাকে মানিয়ে নেয়া যথার্থই কষ্টকর। সেজন্যেই জেমস তার চিঠিতে স্বীকার করেছেন যে, কলকাতার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এই রাজ্যের সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা আমাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে কিছু একটা ব্যবস্থা করে অনিবার্য পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়া আমাদের জন্যে জরুরি। আমি আশা করি যে, তুমি আমার সাথে একমত হবে যে, সামঞ্জস্য ও

BanglaBook.org

সমঝোতা সবসময়ই কোনো মৈত্রী স্থাপনের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত এবং যদি সম্ভব হয়ে তাহলে আমাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে আপসরফামূলক কোনো ব্যবস্থা যে কোনো উপায়ে করাই বাঞ্ছনীয়।

লর্ড ওয়েলেসলি জেমসের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী তিন লাখ রুপির অধিক ব্যয়সম্পন্ন 'জশ্‌ন' আয়োজনের প্রস্তাবে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু পরিস্থিতি অনুধাবন করে শেষ পর্যন্ত তাকে এক লাখ রুপির মধ্যে ব্যয়ের কর্তৃত্ব প্রদান করেন। ১৮০০ সালের এপ্রিলে একটি দিন ধার্য করা হয়। যা ছিল সিকান্দার জাহ্'র বিয়ের পাঁচ মাস পর।

রাজকীয় বিয়ের দিন যত ঘনিয়ে আসছিল দরবারে আরিস্তু জাহ ও মীর আলমের মধ্যে বিবাদ নিয়ে দরবার তত জড়িত হয়ে পড়ছিল। জেমস ১ নভেম্বর লিখেন, 'মীর আলম ও আরিস্তু জাহ-এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিবাদ জট পাকিয়ে উঠছিল। ব্যাপারটি এত জটিল ছিল যে, মীর আলম তার পুত্র মীর দৌরানকে দুবার আমার কাছে পাঠান আমার পরামর্শ চেয়ে অথবা এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে। একই সময়ে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, আমি যদি তার পক্ষাবলম্বন করি তাহলে তার পক্ষে বিষয়গুলো নিয়ে আরিস্তু জাহের সাথে বুঝাপড়া করা সহজ হয়।' কিন্তু জেমস বিনয়ের সাথে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানান তখন মীর আলম তাকে জানার সুযোগ দেন যে তিনি বিষয়টিকে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে গণ্য করেছেন। জেমস এতে কিছুটা বিস্মিত ও বিচলিত হন।

প্রকৃত সংকট দেখা দেয় ৩ নভেম্বর, বিবাহ অনুষ্ঠানের মাঝখানে। আরিস্তু জাহ বিবাহ ভোজের আয়োজন করেছিলেন 'পুরানী হাভেলি'তে। এই বাড়িটি তিনি তার সদ্য বিবাহিতা নাতনিকে যৌতুক হিসেবে প্রদান করেছেন। জেমস রেসিডেন্সির ঊর্ধ্বতন অফিসারদের নিয়ে এবং জেমস ড্যালরিম্পেল আরও কিছু পদস্থ সেনা অফিসারসহ ভোজ অনুষ্ঠানে হাজির হন। তাদের সাথে এনেছেন কনের ঘনিষ্ঠ পুরুষ ও মহিলা আত্মীয়দের জন্যে বস্ত্র ও অলংকারাদি। মহিলাদের মধ্যে বিতরণের জন্যে তারা তাদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবারও এনেছেন। তারা এ ধরনের অনুষ্ঠানের রীতি মাফিক শরবত পান করেছেন। তাছাড়া প্রত্যেক ব্রিটিশ অফিসারকে রত্নখচিত পাগড়ি উপহার দেয়া হয়েছে। বিশালদেহী আরিস্তু জাহ অধিকাংশ সময় ধরে অশ্রুসজল চোখে ছিলেন, নাতনির বিদায়ের বেদনায়, যা তার আদরের একটি বিশাল অংশ ছিল।

পরে, সেই রাতেই, হায়দারাবাদের সমবেত ওমরাহ্‌দের সামনে আরিস্তু জাহ অশ্রুপূর্ণ চোখে মীর আলমকে টিপুর খাজাঞ্চির রত্নরাজির ব্যাপারে জানতে চেয়ে তাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন। মীর আলম সেসবের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করে মুহূর্ত খানেক নীরব থাকেন এবং উপস্থিত সকলে

BanglaBook.org

চরম বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন। কিন্তু সকলেই একটি বিষয় উপলব্ধি করেন যে, হায়দারাবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুই ওমরাহের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে থেকে আর পিছু হটার উপায় নেই।

এমনকি মীর আলম কয়েকদিন পর হায়দারাবাদ ছেড়ে মহীশূর বিজয়ের পর রায়দ্রুগ-এর গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে চলে গেলেও খুব কম লোকের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব ছিল যে, আরিস্তু জাহের প্রতিশোধ স্পৃহা কতটা দ্রুত ও পরিপূর্ণ হতে পারে।

মীর আলম ছিলেন কোম্পানিতে নিয়োজিত নিজামের সরকারি উকিল, অর্থাৎ ব্রিটিশ বিষয়ক মন্ত্রী। ১৭৮৭ সালে থেকে বকর আলী খানের সাথে তার কলকতায় অবস্থানের সময় থেকেই মীর কলকাতায় কোম্পানির ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সাথে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। আরিস্তু জাহ্ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতেন যে, তিনি যদি মীর আলমকে অপমান বা অবদমিত করতে চান তাহলে প্রথমেই তাকে ব্রিটিশ সমর্থকদের কাছ থেকে বিছিন্ন করে ফেলতে হবে। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তিনি জেমস ও খায়রুন্নিসার সম্পর্ককে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার পরিকল্পনা যেমন বিচক্ষণতার পরিচায়ক ছিল, তেমনি অতি সহজ ছিল।

মীর আলম ইতোমধ্যেই তার জ্ঞাতি বোনের সাথে জেমসের প্রণয়ের কথা জানতে পেরেছিলেন এবং জেমসও তাকে এ সম্পর্কে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ডিসেম্বরের শেষ দিকে তিনি হায়দারাবাদ ছেড়ে যাওয়ার আগে। কিন্তু মীর আলমের স্পষ্ট ধারণা ছিল না যে, এই সম্পর্ক কতদূর গড়িয়েছে। তিনি তার নতুন কর্মস্থলে পৌঁছার অল্পদিন পরই অর্থাৎ ১৮০০ সালের জানুয়ারিতে আরিস্তু জাহ একজন হায়দারাবাদি বার্তা লেখকের কাছে এই সাধারণ, কিন্তু উদ্ভাবিত খবর ফাঁস করেন ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরঞ্জিত করে।

দুটি পত্রিকা অথবা তখনকার দিনের 'আখবার' জেমসকে যে খায়রুন্নিসার সাথে শুধু শয্যায় গমনের কথাই প্রচার করে তা নয়, তাকে ধর্ষণের জন্যে অভিযুক্ত করে। একথাও বলা হয় যে, জেমস তার পদের প্রভাব খাটিয়ে খায়রুন্নিসার মা ও নানিকে বাধ্য করে মেয়েটিকে তার হাতে তুলে দিয়ে তার ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করার জন্যে। তাছাড়াও খবরটি হায়দারাবাদে জেমসের পূর্বেকার কেলেংকারির গুজব প্রকাশ করে, যার মধ্যে ছিল কীভাবে জেমস এক কারিগরের স্ত্রীর সাথে প্রতারণা করেছে। এ সম্পর্কিত দীর্ঘ এক কাহিনিতে বলা হয় যে, আসলে সেই মহিলাটি তার উগ্র স্বামীর কবল থেকে বাঁচার জন্যে রেসিডেন্সিতে কর্মরত তার মায়ের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল। কিন্তু জেমস কখনো এই মেয়েটিকে দেখেনি। মহিলাকে যখন হায়দারাবাদ

দরবারে তলব করা হয়, তার অনাকর্ষণীয় দৈহিক রূপই প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট ছিল যে, তার সম্পর্কে জেমসের কিছু না জানারই কথা।

এর চাইতেও গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছিল 'আখবার'-এ। শরফ-উন-নিসার ভাই ও খায়রুন্নিসার মামা মাহমুদ আলী খান মারা যান মীর আলম রায়দ্রুগে চলে যাবার কিছুদিন পরই। একটি বন্দুক দিয়ে তিনি খেলছিলেন—যা ছিল শ্রীরঙ্গপতম থেকে লুণ্ঠিত সামগ্রীর অংশ। গুলি তার মুখে বিস্ফোরিত হয়। বকর আলী খান পরীক্ষা করে দেখেছেন, 'মাহমুদ বন্দুকটি নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় দুর্ঘটনাবশত গুলি বেরিয়ে যায়—রাত ৯টা পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল এবং তিনি নিজে বলে যান যে, শৈশব থেকে আতশবাজির প্রতি তার দুর্বলতা ছিল, এই দুর্বলতারই পরিণতি ছিল এ দুর্ঘটনা।' কিন্তু উদ্ভাবনী প্রিয় খবর লেখকের দৃষ্টিতে কাহিনির অন্ধকার একটি দিক আছে। খায়রুন্নিসার এই মামাকে জেমসের নির্দেশে হত্যা করা হয়েছে, যাতে তার দুরভিসন্ধি অর্জনের পথে কোনো বাধা না থাকে। জেমস উইলিয়ামের কাছে লিখেন, 'আখবার যা উল্লেখ করেছে তা ছিল, তার ভাগ্নির প্রতি আমার আকর্ষণের পথে বাধা অপসারণের জন্যেই আমি ভাড়াটে লোক পাঠিয়েছিলাম, এবং এ নিয়ে গুজবের অবসান ঘটাতেও। আমি তাকে মারাত্মক একটি অস্ত্র উপহার দেই এবং যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল।'

জেমস কার্কপ্যাট্রিক খায়রুন্নিসার সাথে শয্যায় গমন করেছেন এই একটি সত্য ছাড়া আর কোনো অভিযোগেরই বাস্তব ভিত্তি ছিল না। কিন্তু মীর আলমের জেমসের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার জন্যে এসব অভিযোগই যথেষ্ট ছিল। কারণ জেমস আরিস্তু জাহের পক্ষ নেয়ায় মীর আলম ক্ষুব্ধ ছিলেন। অভিযোগুলো প্রকাশিত হওয়ার পরই 'গুলজার-ই-আসাফিয়া'য় আরিস্তু জাহ অজ্ঞাতনামে সবকিছু বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করে ক্রাপায় মীর আলমের কাছে প্রেরণ করলেন, যেন মীর আলমই কলকাতায় লর্ড ওয়েলেসরি কাছে হাশমত জং জেমস কার্কপ্যাট্রিকের কেলেঙ্কারির বিষয় উল্লেখ করে জানালেন যে, এহেন আচরণের জন্যে জেমস শাস্তিলাভের যোগ্য এবং এতে অন্যদের প্রতিও হুঁশিয়ারিমূলক ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হবে। মীর আলম এই চিঠি পেয়ে উৎসাহিত হলেন এবং জেমস কার্কপ্যাট্রিকের মৃত্যুদণ্ড দাবি করে লর্ড ওয়েলেসলিকে লিখলেন।

মীর আলম সোজা আরিস্তু জাহের ফাঁদে পাড় গেছেন। আরিস্তু জাহও তাই ভেবেছিলেন। ওয়েলেসলি মীর আলমের চিঠি পেয়ে অবিলম্বে নিজাম ও আরিস্তু জাহের কাছে লিখে জানতে চাইলেন যে, তার অভিযোগের সত্যতা কতটুকু।

ওয়েলেসলি চিঠি পাঠিয়েছিলেন জেমসের মাধ্যমে। ১৮০০ সালের ৭ মার্চ জেমস সাপ্তাহিক ডাকে ওয়েলেসলি কর্তৃক পাঠানো সবচেয়ে ভয়াবহ একটি খবর পেলেন। চিঠিতে সৌজন্যমূলক কোনো সম্বোধনই নেই। বরং চিঠির

BanglaBook.org

কথাগুলো তার কাছে আঘাতস্বরূপ ও অপমানজনক। চিঠিতে জেমসকে শুধু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে—

> "তুমি যে মুহূর্তে এই চিঠি ('আখবার'-এ প্রকাশিত খবরসহ) পাঠ করবে, তখনই তুমি নিজাম ও আজিম-উল-ওমরাহ'র (আরিস্তু জাহ) কাছে পেশ করবে। আমার পক্ষে থেকে তুমি মহামান্য নিজাম ও উজিরকে অনুরোধ করবে কাগজে লিপিবদ্ধ অভিযোগগুলো যদি তারাও পেয়ে থাকেন তাহলে শুন্য মার্জিনে তা উল্লেখ করে দিতে। আমি মহামান্য নিজাম ও তার উজিরকে অনুরোধ করেছি তাদের অভিমতের স্বীকৃতি দিতে। তোমার বিরুদ্ধে যে গুরুতর চরিত্রহীনতার অভিযোগ আনা হয়েছে সে সম্পর্কে তোমার ব্যাখ্যা যোগ করতে পারো। তার পূর্ব পর্যন্ত অভিযোগুগো সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকবে এবং বিষয়গুলো সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।"

এ পরিস্থিতিতে আরিস্তু জাহ জেমসকে আমন্ত্রণ জানান। কিছুক্ষণ মোরগের লড়াই দেখার পর তিনি অভিযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে ধারণা দেন এবং এ ইঙ্গিতও দেন যে, জেমসের ভাগ্য নির্ভর করছে তারই হাতে। তিনি যদি মীর আলমের অভিযোগের সাথে নিজেকে জড়িত করেন তাহলে জেমসের ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। এরপর তিনি অত্যন্ত কার্যকরভাবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। জেমস যদি মীর আলমকে কোম্পানির উকিলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় এবং আরিস্তু জাহের সাথে হায়দারাবাদের কল্যাণের স্বার্থে কাজ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে তিনি নিশ্চিত করেন জেমসকে অভিযোগ থেকে পুরোপুরি মুক্ত করে দেয়া হবে। তিনি নিজামকে ব্যক্তিগতভাবে বলবেন লর্ড ওয়েলেসলিকে একথা জানাতে যে, অভিযোগগুলো মীর আলমের দুরভিসন্ধিমূলক উদ্ভাবন। তাদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছিল অথবা জেমসের সাথে সংলাপ 'গুলজার-ই-আনাফিয়া' যা প্রকাশ করেছে তা সম্ভবত কল্পিত, কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। বিবরণীতে দেখা যায়—

> "আরিস্তু জাহের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে যান জেমস কার্কপ্যাট্রিক এবং নিজের মর্যাদা ও জীবন ভিক্ষা করে বলেন, 'মেয়েটিই আমাকে প্রলুব্ধ করেছে, আমি কিছু করিনি। সেই এসে নিজেকে আমার কাছে সম্পূর্ণ করেছে। আমি কোনরকম জবরদস্তি করিনি। আপনি যদি একথাটুকু লর্ড বাহাদুরকে লিখে জানান, তাহলে আমার প্রাণরক্ষা পায়। এই মহান সাহায্যের বিনিময়ে, আমি যতদিন এখানে রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবো, কোনোদিন আপনার কাছে এই ঋণ ভুলবো না। আমি হায়দারাবাদ সরকারের স্বার্থে কাজ করব এবং আপনার সকল নির্দেশ প্রতিপালন করব।' আরিস্তু জাহ উত্তর দেন, 'আমি যদি তোমার জীবন রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করি, তাহলে বিনিময়ে আমার যা প্রয়োজন তা করার অবস্থায় থাকতে

বা সে ইচ্ছা পোষণ করতে তুমি সক্ষম হবে কিনা, তা নিয়েই আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

হাশমত জং (কার্কপ্যাট্রিক) জানতে চান, ' সেটি কী?' আরিস্তু জাহ হাশমত জংকে শপথ করান এবং গোপনীয়তা রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করে বলেন, 'মীর আলমকে ইংরেজ রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে বরখাস্ত এবং আমাকে সেই দায়িত্বে ন্যস্ত করতে হবে, তাহলে নিজামের প্রধান উজির এবং ইংরেজদের রাজনৈতিক এজেন্ট একই ব্যক্তি থাকবে—তুমি এ ব্যাপারে নিজামকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্যে কলকাতায় প্রবলভাবে লিখতে পারবে কিনা?' হাশমত জং আন্তরিকভাবে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন দরকষাকষিতে তার অংশের ভূমিকা পালনের জন্যে।

এরপর আরিস্তু জাহ নিজামের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাশমত জং-এর ব্যাখ্যা পেশ করলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ...(মীর আলম চক্রান্তমূলকভাবে ব্রিটিশের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে সচেষ্ট নির্দোষ রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রমাণের অযোগ্য অভিযোগ তুলে)। তারা কলকাতায় বিষয়টি লিখলেন এবং সেখানকার ঊর্ধ্বতন অফিসাররা সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করে নিজামের কাছে উত্তর পাঠান যে, 'যদি হাশমত জং দোষী না হয়ে থাকে এবং নিজামের সরকার যদি তাকে রেসিডেন হিসেবে রেখে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তাকে তার অবস্থানে বহাল থাকতে পারে। আমরা শুধু নিজামের সরকারের সন্তুষ্টির বিষয়কেই বিবেচনায় রাখতে চাই।' মীর আলমের বরখাস্তের ব্যাপারে কলকাতা থেকে প্রেরিত চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, 'নিজামই তার কর্মচারীদের মনিব এবং যাকে খুশি তিনি তাকে নির্বাচন ও নিয়োগ করতে পারেন। তার পছন্দের ওপর নির্ভর করেই আমরা আনন্দিত। অবশ্য এক্ষেত্রে যদি আরিস্তু জাহকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে এর চাইতে ভালো আর কি হতে পারে। তবে শর্ত থাকে যে, মীর আলমের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি নিরাপদে থাকবে!'

এই চিঠি যখন হায়দারাবাদে পৌঁছে তখন হাশমত জং কার্কপ্যাট্রিক দরবারে উপস্থিত হন। মীর আলমকে ইংরেজদের উকিল পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। নতুন অর্জিত ভূখণ্ড তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থেকেও তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। রায়দ্রুগ দুর্গের নির্জনতায় তাকে কারারুদ্ধ করে কারো সাথে সাক্ষাতের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়।"

এই প্রমাণকে কতটা সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়? খায়রুন্নিসাকে ব্যবহার করে ক্রমবর্ধমান বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ মীর আলমকে শুধু তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে আরিস্তু জাহ্ কি সত্যিই সফল হয়েছিলেন? তার ফাঁদে পড়ে

কার্কপ্যাট্রিককেও তার অবস্থান থেকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন? এছাড়া 'হায়দারাবাদ সরকারের স্বার্থে কাজ করব এবং আপনার সকল নির্দেশ প্রতিপালন করব' মর্মে কার্কপ্যাট্রিকের প্রতিশ্রুতি কি যথার্থই অনুসৃত হয়েছিল কিনা? কার্কপ্যাট্রিক আসলেই তার দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ফিলবি, বার্জেস অফ ম্যাকলিন-এর মতো এক ধরনের 'ডাবল-এজেন্টে'র ভূমিকা পালন করেছিলেন কিনা। অথবা হায়দারাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বা ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন কিনা। তাছাড়া আরও গুজব ছিল যে, আরিস্তু জাহ্ হস্তক্ষেপ করায় তিনি উজিরকে যখন তার পক্ষে সম্ভব সাহায্য করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

ঘটনার দীর্ঘকাল পর যে সামান্য প্রমাণাদি আছে তার ভিত্তিতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এতে সন্দেহ নেই যে, হায়দারাবাদের প্রতি জেমসের সবসময় সহনুভূতি ছিল এবং যত দীর্ঘদিন শহরে তার অবস্থান ছিল শহরটির প্রতি তার ভালোবাসা আরও বেড়েছে। কিন্তু অগ্রহণযোগ্য হুমকি ও ওয়েলেসলির আক্রমণাত্মক ভাষার ব্যবহার তাকে ক্রকবর্ধমানভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ওয়েলেসলি তাকে শুধু হায়দারাবাদের মিত্রদের পরই চাপ প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে ব্রিটিশদের সাথে অসম চুক্তিতে প্রবেশ করার জন্যে। ইতোমধ্যে তিনি যেসব চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন সেগুলো মানার ব্যাপারে ওয়েলসির ব্যর্থতাও জেমসকে বিস্মিত করেছিল। অবশ্য এটা জানা কঠিন যে, তার এই দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক মনোভাবের কারণে এবং কতটা হায়দারাবাদের প্রতি তার দীর্ঘ লালিত দূর্বলতার কারণে ঘটেছিল। অথবা আরিস্তু জাহ জেমসকে কাবুতে রাখার যে অস্ত্র শানিত রেখেছেন তার প্রভাব কতটা ছিল। কারণ খায়রুন্নিসাকে ধর্ষণ ও তার মামাকে হত্যা করা সম্পর্কিত মীর আলমের অভিযোগগুলো গভর্নর জেনারেলের কাছে অস্বীকার করে জেমস কেলেংকারির প্রকৃত ভিত্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও অভিযোগের সত্যতা খবরগুলোতে ছিল এবং তিনি সত্যিসত্যিই মীর আলমের কিশোরী জ্ঞাতি বোনের সাথে শয্যায় যাপন করছিলেন। তিনি গভর্নর জেনারেলকে নির্জলা মিথ্যা বলেননি বটে, কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি স্বচ্ছও প্রমাণ করতে পারেননি। এক্ষেত্রে জেমসের মধ্যে চরম দুর্বলতা ছিল এবং তার ওপর অবাঞ্ছিত প্রভাব খাটানোর ব্যাপারে উজিরের জন্যে পথ খোলা ছিল।

প্রাপ্ত প্রমাণের প্রেক্ষিতে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজতর। প্রশ্ন হিসেবে এগুলোর যথার্থ কোনো গুরুত্ব ছিল না, যদিও তখনকার যুগের সাধারণভাবে স্বীকৃত সঠিক ও সুবিদিত ঘটনা ছিল। কিন্তু একই ঘটনা দুটি স্বাধীন হায়দারাবাদি ইতিহাসে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, 'তারিখ-ই-আসফ জাহি' এবং দ্বিতীয়টি 'তারিখ-ই-নিজাম'। এছাড়া জেমসের মৃত্যুর পর

রেসিডেন্সিতে পরিচালিত তদন্তেও এর উল্লেখ রয়েছে—সব ক'টি স্থানেই বলা হয়েছে যে, জেমস আরিস্তু জাহের কৌশলের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন এবং তার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তার ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।'

আরও গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার যে, মীর আলম নিজে বিশ্বাস করতেন আরিস্তু জাহ্ জেমসকে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তারা দুজন ষড়যন্ত্র করে তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ছ'মাস পর ১৮০০ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি একথা বলেন আর্থার ওয়েলেসলিকে। মীর আলম তখন সবেমাত্র কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেছেন, কিন্তু অপমানজনক পরিস্থিতির অবসান তখনো হয়নি। হায়দারাবাদে তার ফিরে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। আর্থার ওয়েলেসলি অবিলম্বে তাকে বলা মীর আলমের কাহিনি তার ভাই গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দেন। তার এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এটি প্রত্যক্ষ ও সর্বশেষ ব্যাখ্যা। পরে আরও বিস্তারিত বিবরণসহ এ কাহিনি 'আখবার'-এ প্রকাশিত হয়।

এটা স্পষ্ট নয় যে, জেমসের সাথে কখনো আর্থার ওয়েলেসলি সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা। কিন্তু আর্থারের লেখা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিককে খুবই অপছন্দ করতেন, যাকে তিনি জানতেন এবং জেমস সম্পর্কে কিছু শোনেননি। কিন্তু কার্কপ্যাট্রিক ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যাপারে তার বদ্ধমূল ধারণা কোনো কিছুতেই পরিবর্তিত হয়নি। উপরন্তু তিনি দক্ষ, বিচক্ষণ ও কর্মোদ্যম মীর আলমের প্রশংসা করতেন, যার সাথে তিনি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। অতএব, মীর আলম ও তার অনুসারীরা কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেই স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নিলেন ভবিষ্যৎ ডিউক অফ ওয়েলিংটনের কাছে এবং ১৮০০ সালের সেপ্টেম্বরে তার রেজিমেন্টর সাথে কর্নাটকের পল্লি এলাকায় চলে গেলেন। আর্থার মীর আলমের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে সন্দেহবশত শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেন।

তাদের সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিবসে মীর আলম আর্থার ওয়েলেসলি ও তার রেজিমেন্টের অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্যে প্রাচীন হিন্দু রাজধানী বিজয়নগরের (আধুনিক হাম্পি) ধ্বংসাবশেষের উত্তর-পশ্চিম দিকে কোপাল দুর্গের কাছাকাছি এক উদ্যানে বাইজ নাচের আয়োজন করেন। বাইজিদের শোরগোলের মধ্যেই আর্থার একটি প্রস্তাব লিখেন, যা তিনি কয়েকদিন পর লর্ড ওয়েলেসলির কাছে পাঠান। তাতে তিনি লিখেন, 'মীর কর্নেল ডব্লিউ (আর্থার স্বয়ং)-এর সাথে দীর্ঘ আলোচনায় তার কারাবাস ও অবমাননার কথা বলেছেন। তিনি একথা দিয়ে শুরু করেছেন যে, ন্যায় বিচারের ঝরনা তার দিকে আর প্রবাহিত হচ্ছে না। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক এ ঝরনাকে বাংলার রুদ্ধ করে

BanglaBook.org

দিয়েছেন এবং হায়দারাবাদে রুদ্ধ করেছেন তার ভাই। এখন তিনি পুরোপুরি নির্ভর করে আছেন তা বিষয়টি গভর্নর জেনারেলের কাছে উত্থাপনের জন্যে কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলির ওপর।'

মীর আলম অতঃপর আর্থারের কাছে পুরো ঘটনা তুলে ধরেন: কীভাবে আরিস্তু জাহ দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা করে আসছিলেন তাকে অপমান করার জন্যে। শেষপর্যন্ত তিনি যে সফল হয়েছেন তা শুধ কার্কপ্যাট্রিককে ব্যবহার করে। কীভাবে কার্কপ্যাট্রিক খায়রুন্নিসার প্রেমে পড়েন, আরিস্তু জাহগ কী করে ঘটনাটির সূচনা থেকে জানতে পারেন এবং কীভাবে আহমদ আলী কানের পরিবারকে খায়রুন্নিসার সাথে তাদের পুত্রের বিয়ের সম্পর্কে স্থাপন থেকে সুরিয়ে দেন, কী কারণে কেউ মীর আলমকে এসব বিষয় সম্পর্কে জানাতে সাহসী হয়নি এবং তিনি কার্কপ্র্যাট্রিকের তার প্রডিত অবজ্ঞাসূচক আচরণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তখনই গভর্নর জেনারেলকে বিস্তরিত ঘটনা জানিয়েছেন, কিন্তু গভর্নর জেনারেল পুরো ঘটনায় আরিস্তু জাহের জড়িত থাকা সম্পর্কে না জেনেই সিদ্ধান্ত নেন যে, এই তদন্ত করার দায়িত্ব নিজামের সরকারের এবং বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্যে নিজামের কাছে পাঠিয়ে দেন।...সেখানে আরিস্তু জাহ নিজামকে প্রভাবিত করে যে, অভিযোগ যাই হোক, তার কোনো ভিত্তি নেই এবং পুরো ঘটনা বানোয়াট। মীর আলমের তখন সন্দেহ হয়েছিল যে এর পেছনে আজিজ-উল-ওমরাহ'র (আরিস্তু জাহ) হাত আছে, যিনি মীর আলমের ধ্বংস চান। কারণ, তিনি জানতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কার্কপ্যাট্রিক মীর আলমকে সমর্থন করবে, ততক্ষণ তাকে অপমান করা অসম্ভব। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি তার সমর্থন থেকে মীর আলমকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হন, তখনই তাকে তাকে বঞ্চিত করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি হশমত জং (কার্কপ্যাট্রিক)-এর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মীর আলমকে রাজনীতির সাথে সম্পর্ক থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হন।

অন্য সকল হায়দারাবাদি বিবরণীতে কার্কপ্যাট্রিকের হায়দারাবাদি পোশাক ও রীতিনীতি পালনের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার এই পদ্ধতি অবলম্বনে শহরবাসী তার ওপর কতটা প্রীত সে সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মীর কার্কপ্যাট্রিককে তীর্যকভাবে দেখেছেন। কারণ তিনি ইংরেজদের ভদ্রতা, সৌজন্য এবং নিজস্ব রীতি পালনে ও ব্যক্তিগত জীবনে সেসব প্রথা অনুসরণের কারণে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং ভারতীয়রা যে আচার প্রথা অনুসরণ করে সেসবের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু কার্কপ্যাট্রিক দেশীয় ঢং-এ পোশাক পরে নিজেকে হাসির পাত্রে পরিণত করেছেন এবং তাদের মহিলাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতায় বিরূপ ভাব প্রকাশ করছেন। তিনি বলেছেন যে, কর্নেল ওয়েলেসলি যদি কথায় বিশ্বাস না করনে তাহলে তিনি অনুনয় করেছেন একজন গুপ্তচরকে

BanglaBook.org

হায়দারাবাদে পাঠাতে যাতে সে শুধু হাশমত জং সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে আনে... ।

বরখাস্ত ও অবমাননা করা সম্পর্কে মীর আলমের বক্তব্য হচ্ছে, জেমসের সংস্কৃতি পরিবর্তন করার বিষয়টিকে তিনি হাস্যকর বিবেচনা করায় জেমস এটিকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো বিবেচনা করে থাকবেন। একটি মিনিয়েচার ছবিতে জেমসকে হায়দারাবাদি পোশাকে দেখা যায়, যে পোশাকটি মীর আলমই তাকে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি এই পোশাক পরে ১৭৯৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মীর আলমের পুত্র মীর দৌরানের বিয়ের অনুষ্ঠানে আসতে পারেন। তবুও মীর আলমের বক্তব্য ইতিহাসবিদ গোলাম ইমাম খানের ‘তারিখ-ই-খুরশিদ জাহি’তে জেমসের হায়দারাবাবাদি পোশাক পরিধানের কারণে শহরে তার জনপ্রিয়তার দাবির পুরো বিপরীত চিত্রই ফুটিয়ে তোলে। তবে মীর আলমের মন্তব্য হায়দারাবাদে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিনা তা জানা অথবা মীর আলম তার ক্রোধ ও চাকরি হারানোর তিক্ততার কারণেই তার মন্তব্য করেছেন কিনা তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কিন্তু তার মন্তব্য জেমসের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতার প্রমাণ : তিনি ভারতীয় পোশাক পরে থাকতে পারেন, তার ভারতীয় প্রেমিকা থাকতে পারে এবং ভারতীয় রীতিপ্রথাকে আপন করে নিতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছে তিনি একজন ফিরিঙ্গি এবং বিদেশি শক্তির নিয়োজিত প্রতিনিধিই ছিলেন।

মীর আলম আর্থার ওয়েলেসলি মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা চালান কার্কপ্যাট্রিককে তার পদ থেকে অপসারণ করার উদ্যোগে ও তাকে নিজ বাড়িতে পরিবারে কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে। তিনি একটি হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেন যে, কার্কপ্যাট্রিক এখন পুরোপুরি উজিরের প্রভাবের আওতায় রয়েছেন এবং এটাই আশা করা সঙ্গত যে, তিনি তার নিজস্ব সরকারের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে নিজামের দরবারের কাজে নিজেকে অধিক নিয়োজিত রাখেন। আর্থার তার ভাইকে জানান, যদি একথা সত্য হয়ে থাকে যে, উজির কার্কপ্যাট্রিককে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন, তাহলে তিনি নিজাম সরকারের কাছে ভালো রেসিডেন্ট হিসেবে প্রমাণিত হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

বাইজি নৃত্যানুষ্ঠানের পরদিন আর্থার তার বন্ধু কর্নেল ব্যারি ক্লোজকে জানান ‘আমার দৃষ্টিতে মীর আলমের জন্যে কিছু করা অসম্ভব ব্যাপার। আরিস্তু জাহ খুব কঠোরভাবে চেয়েছেন মীর আলমের হাত থেকে রক্ষা পেতে, সে কারণেই তিনি পদচ্যুত...এবং হাশমত জং-এর দূর্বলতা তাকে আরিস্তু জাহের পুতুলে পরিণত করেছে এবং তার কিছুই করণীয় নেই।’ সব মিলিয়ে এ এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনি।

পরবর্তী মাসগুলোতে তিনি মীর আলমকে কোনো ধরনের নিরাপত্তা বা সহায়তা প্রদান করেননি। এর ফলে তার দুর্ভাগ্য আরও বৃদ্ধি পায়। আরিস্তু জাহের গুপ্তচরেরা এই গজবের সত্যতা নিশ্চিত করে যে, শ্রীরঙ্গপতম লুণ্ঠনের সময় মীর আলম বেশ কিছুসংখ্যাক মুল্যাবান ও দর্শনীয় হীরক আহরণ করেছেন। তাকে গ্রেফতারের পর উজির উঠেপড়ে লাগেন এই হীরকগুলো তার লুকানো স্থান থেকে উদ্ধার করতে। মীর আলমের পুত্র মীর দৌরানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তিনি। তার শ্যালক মুস্তাকিম-উদ-দৌলাকেও জেরা করেন। উভয়েই কোনো হীরকের ব্যাপারে তাদের অবহিত থাকার বিষয় অস্বীকার করে। এরপর আরিস্তু জাহ তার অনুগত বাহনীকে প্রেরণ করেন মীর আলমের প্রাসাদে। তারা প্রাসাদ তল্লাশি করে তছনছ করে ফেলে। প্রাসাদের খানসামার ওপরও নিপীড়ন চালায়। এসব ব্যবস্থাতেও কোনো ফল না পাওয়ায় তারা খানসামার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

ইতোমধ্যে খায়রুন্নিসার নানা বকর আলী খান তার বংশের অন্যান্য সকলের সাথে হায়দারাবাদে অপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন, যারা মীর আলমের দুর্ভাগ্যের জন্যে পরোক্ষভাবে তাকেই দায়ী করে। খায়রুন্নিসার সাথে জেমসের প্রণয়ঘটিত কেলেংকারির ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে বকর আলী খানকে রাস্তায় বিদ্রুপ করা হত তিনি তার নাতনিকে রেসিডেন্টের কাছে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করেছেন বলে। এক পর্যায়ে চারমিনারের দেয়ালে তাকে জঘন্য ভাষায় গালি দিয়ে প্রচারপত্র সাঁটানো হয়েছিল।

লে. কর্নেল জেমস ড্যালরিম্পেল হায়দারাবাদের সবচেয়ে উর্ধ্বতন ব্রিটিশ অফিসার। জুন মাসের কোনো এক সময়ে তিনি লে. কর্নেল বাউসারের সঙ্গে শহর থেকে এক দিনের দূরত্বে শিকার করতে যান। বকর আলী খানের এক ভৃত্য তাকে একটি বার্তা দেয় যাতে তিনি ড্যালরিম্পেলকে তার পুরনো ও সর্বোত্তম বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন। পরদিন সকালে তার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে। ড্যালরিম্পেল শিকার করতে পছন্দ করতেন এবং তার আরবীয় ঘোড়া 'মামুলা' ও কুকুরগুলো সেভাবেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু বকর আলী খানের প্রেরিত বার্তার গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি বিলম্ব না করে শহরে ফিরে আসেন।

জেমস ড্যালরিম্পেল বকর আলী খানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে কাটিয়েছেন কমপক্ষে পাঁচটি বছর। ১৭৯৬ সালে নিজামের জামাতা দারা জাহ্-এর বিদ্রোহের সময় রায়চূড় দখলের যুদ্ধে তারা পাশাপাশি যুদ্ধ করেছেন। ড্যালরিম্পেলের মনে হলো বকর আলী খান বন্ধুহীন হয়ে পড়েছেন এবং তার আতিথেয়তাকেও কেউ আর মনে রাখেনি। ফলে তার পুরনো বন্ধু নিজ বংশের মধ্যেই অচ্ছুৎ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। ড্যালরিম্পেল পরদিন সকালে বকর

BanglaBook.org

আলী খানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, বৃদ্ধ লোকটি বেশ উত্তেজিত।

চার মাস আগে বকর আলী কার্কপ্যাট্রিককে সাহায্য করেছিলেন তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে ওয়েলেসলির কাছে তার স্বাক্ষরিত একটি বক্তব্য পাঠিয়ে যাতে তিনি 'আখবার'-এ প্রচারিত খবরগুলো 'বাজে ও মিথ্যা' বলে দাবি করেছেন এবং বলেছেন যে, জেমস তার নাতনিকে ধর্ষণ অথবা তার পুত্রকে হত্যা করেনি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সবৈব মিথ্যা এবং জেমসের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু অনুভব করেন না। তখন থেকে বৃদ্ধ তার নাতনির সাথে কার্কপ্যাট্রিককে জাড়িয়ে নানা গুজব শুনে আসছেন এবং এসব গুজব বন্ধ করতে তিনি ড্যালরিম্পেলের সাহায্য কামানা করেন। তাছাড়া খায়রুন্নিসা এখনও আহমদ আলী খানের পুত্রকে বিয়ে করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। যার প্রতি সে তার বিতৃষ্ণা শুরু থেকেই দেখিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, বকর আলী খান অবশেষে কার্কপ্যাট্রিকের প্রতি তার নাতনির পক্ষপাতিত্ব আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু দৃশ্যত তিনি এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি যে, এই সম্পর্ক কোন পর্যায়ে গড়িয়েছে। বিলম্বে হলেও তিনি এই দুজনকে জড়িয়ে শহরে ছড়িয়ে পড়া গুজব, তার অপমানের ভিত্তি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। আহমদ আলী খানের সাথে খায়রুন্নিসার বিয়ের কথা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে যায়নি। কিন্তু বকর আলী উপলব্ধি করছেন যে, তার নাতনিকে জড়িয়ে এহেন কেলেংকারি ছড়ালে এ বিয়ে ভেঙেই যাবে। বকর আলী বললেন, তিনি চান, ড্যালরিম্পেল কার্কপ্যাট্রিকের সাথে কথা বলে তাকে খায়রুন্নিসা থেকে দূরে থাকতে বলুক। তিনি ড্যালরিম্পেলকে বলেন—

> "তার নাতনি অভিজাত একজন মুসলমানের সাথে তার বিয়ে হোক, তাই চায় এবং তিনিও এই সমর্থক যথাশীঘ্র সম্পর্ক করতে চান। কিন্তু রেসিডেন্ট তার ক্ষমতার সকল উপায় কাজে লাগাচ্ছে এ বিয়েকে ব্যাহত করতে। তিনি তার পরিবারের মহিলাদের কাছে বারবার খবর পাঠাচ্ছেন ও যোগাযোগ করছেন এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে।—এহেন কার্যক্রমের দ্বারা জেমস তার পরিবারের সম্মানহানির কারণ ঘটিয়েছেন। অতএব, তিনি মক্কা মসজিদে (শহরের প্রধান মসজিদ) গিয়ে সেখানে সমবেত মুসলমানদের কাছে ব্যাপারটি জানানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এরপর তাদের নেতৃত্ব দিয়ে রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে অগ্রসর হবেন এবং পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্রোধের পরিণতি কি হতে পারে তা তিনি প্রত্যক্ষ করবেন।"

এ ধরনের পরিস্থিতির অবতারণা বাস্তবিক পক্ষেই অনাকাঙ্ক্ষিত। হায়দারাবাদে ব্রিটিশের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ। এখন ফরাসি বাহিনী মিশরে অবস্থান করছে এবং সীমান্তে মারাঠারা যে কোনো সময় হায়দারাবাদের

BanglaBook.org

সাথে যোগ দিয়ে একত্র ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে সমূলে এবং চিরতরে উৎখাত করে দিতে পারে। এখন মনে হচ্ছে, কার্কপ্যাট্রিকের যৌন তাড়না সবকিছুকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং দাক্ষিণাত্যে বড় ধরনের ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের কারণ ঘটিয়েছে। পরিস্থিতির এই বিপজ্জনক মোড়ে উপস্থিত হয়ে ড্যালরিম্পেল জেমস কার্কপ্যাট্রিককে সতর্ক করে লিখলেন, 'কর্নেল ড্যালরিম্পেল জেমস কার্কপ্যাট্রিককে সতর্ক করে লিখলেন, 'কর্নেল ড্যালরিম্পেল রেসিডেন্টকে বিপর্যয়কর পরিণতির কথা জানাতে চায়, যা শুধু তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে নয়, জনস্বার্থের জন্যেও ক্ষতিকর।' সংক্ষেপে তিনি খায়রুন্নিসার সাথে সাক্ষাৎ থেকে জেমসকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। (জেমস ড্যালরিম্পেল স্বয়ং মসলিপতমের নওয়াবের কন্যাকে বিয়ে করেন এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া তার পাঁচটি সন্তান ছিল। অতএব, এ ধরনের আন্তঃসম্প্রদায়গত সমস্যা যৌক্তিকভাবে নিরসন তার জন্যেও মুশকিল ছিল)।

মেয়েটির সাথে দূরত্ব বজায় রাখার জন্যে জেমসকে বাধ্য করা হলো অন্তত কিছুদিনের জন্যে, কেলেংকারির পরিস্থিতি না কেটে যাওয়া পর্যন্ত। কেননা, তার নিজের অবস্থানই নিরাপদ নয়। ব্যাপারটি নিয়ে ইতোমধ্যে তার চাকরি যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বকর আলী খান ও ড্যালরিম্পেল যা চাইছেন তা অবজ্ঞা করার মতো অবস্থা তার নেই। খায়রুন্নিসার ব্যাপারে তিনি লর্ড ওয়েলেসলির কাছে পুরোপুরি স্বচ্ছ করতে না পারায় সৃষ্ট গুজবে তার অবস্থা কর্তৃপক্ষের কাছে শোচনীয় পর্যায়ে আছে, বিশেষ করে হায়দারাবাদে। ব্রিটিশ সৈনিকরাও বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, যাদের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ একেবারেই সীমিত। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, একবার তিনি ক্ষমতা লাভ করলেও জেমসের বিরুদ্ধে যৌন অভিযোগ আবার যদি ওঠে তাহলে ওয়েলেসলি আর কোনো কৃপা প্রদর্শন করবেন না। তাছাড়া জেমসের ব্যাপারটি নিয়ে যদি ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয় তাহলে ওয়েলেসলি নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। অতএব ড্যালরিম্পেলের কাছে প্রতিজ্ঞা করা ছাড়া জেমসের আর কোনো উপায় ছিল না যে, বকরের পরিবারের সাথে সকল সম্পর্ক রাখা থেকে তিনি বিরত থাকেবেন।

১৮০০ সালের মধ্য গ্রীষ্মে জেমস ও খায়রুন্নিসার মধ্যে সংক্ষিপ্ত সম্পর্কই বিশাল বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, তা আপাতত শান্ত হল—অন্তত কার্কপ্যাট্রিক, ড্যালরিম্পেল ও বকর আলী খানের কাছে তাই মনে হল।

কিন্তু কেউ অনুমান করতে পারেনি যে, আসল সমস্যার সূচনা ঘটল সবেমাত্র। কারণ, এই তিনি ব্যক্তির একজনও জানতেন না, বকর আলী খানের জেনানার সকল মহিলা কোনো বিষয়টি নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল। তা ছিল, খায়রুন্নিসার গর্ভে কার্কপ্যাট্রিকের তিন মাসের সন্তান।

BanglaBook.org

# ৫

১৮০০ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে জেমস কলকাতায় পাঠানো তার রিপোর্টে উল্লেখ করলেন, 'মাওলা আলীর বার্ষিক 'ওরস' আসন্ন এবং আমি সেখানে গিয়ে নির্মল হাওয়া ও বিনোদনের জন্যে কয়েকদিন নিজের তাঁবুতে কাটাতে চাই।'

ওরস উপলক্ষে যে শুধু জেমস কার্কপ্যাট্রিকই শহর ছেড়ে যেতে পরিকল্পনা করেন তা নয়, হায়দারাবাদের বিপুল সংখ্যক লোক তাদের নিয়মিত কর্মসূচি থেকে দশ দিন পৃথক করে শহরের উত্তর দিকে ২০ মাইল দূরবর্তী স্থানে সুফির দরগায় গমন করে। যার আকর্ষণ সুফির করুণা লাভের দিক ছাড়াও নতুনত্বের আনন্দ ও বায়ু পরিবর্তনের সাথে জড়িত। এটি এক সাথে পবিত্র স্থানে যাত্রা, জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী ও পবিত্র উৎসব এবং জেমসের বর্ণনা অনুসারে 'তাঁবুতে অবকাশ যাপন'। এই উৎসব আয়োজিত হয় মহানবীর জামাতা হযরত আলীকে স্বপ্নে দেখার স্মৃতিতে, যে স্বপ্নটি দেখেছিলেন দুশো বছর আগে কুতুব শাহী বংশের শাসনামলে দরবারের প্রবীণ খোজা ইয়াকুত। এক রাতে ইয়াকুত যখন গভীর নিদ্রায় তখন তার স্বপ্নে আবির্ভূত হয় সবুজ পোশাক পরা এক ব্যক্তি, যিনি নিজের পরিচয় দেন 'মাওলা আলী' বলে। মহানবীর কন্যা ফাতিমার স্বামী, শিয়া মতাবলম্বীদের কাছে যায় মর্যাদা অসামান্য। ইয়াকুত সবুজ পোশাক পরিহিত লোকটিকে অনুসরণ করেন, যিনি এক পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করে আসন গ্রহণ করেন। তার ডান হাত স্থাপিত ছিল একটি পাথরের ওপর, ইয়াকুত সেই ব্যক্তির সামনে নত হলেন, কিন্তু কিছু বলার আগেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরদিন সকালে ইয়াকুত তার পালকিযোগে গোলকুণ্ডা থেকে রওয়ানা হলেন এবং পর্বতে আরোহণ করলেন, যেখানে তিনি মাওলা আলী যে পাথরে তার হাত স্থাপন করেছিলেন অনুরূপ পাথরে হাতের ছাপ দেখতে পেলেন। তিনি পাথরের হাতের ছাপের অংশটি তুলে নিয়ে সেখানে নির্মিত বিরাট এক খিলানের ওপর স্থাপনের নির্দেশ দেন।

শিগ্‌গিরই হস্তছাপযুক্ত পাথরটি সুফি, দরবেশ ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা নিবেদনের এক মহান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং গোলকুণ্ডার শাহজাদিদের একজন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পাহাড়ে এসে সন্ন্যাস অবলম্বন করার পর

BanglaBook.org

থেকে শিয়া মতাবলম্বী কুতুব শাহী সুলতানরা সেখানে প্রতিবছর গমন শুরু করেন ইয়াকুতের স্বপ্ন দর্শনের বার্ষিকী পালন উপলক্ষে। ১৬৮৭ সালে সুন্নি মতাবলম্বী মোগলরা হায়দারাবাদ দখল করার পর এই বার্ষিক 'ওরস' উৎসবে সাময়িক ভাটা পড়ে। ১৭৮০-এর দশক থেকে নিজাম পরিবারে পুনরায় মাওলা আলীর ওরসকে পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করার পর থেকে আসফ জাহি হায়দারাবাদের দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ উৎসবের একটিতে পরিণত হয় এই ওরস। নিজামের জেনানার মহিলারা বিশেষভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকেন এই উৎসবের, যখন তারা কয়েকদিনের জন্য শহরের বাইরে কাটানোর সুযোগ লাভ করেন। নিজামের দুই প্রবীণা স্ত্রীর একজন তিনাত-উন-নিসা বেগম 'ওরস' উপলক্ষে তার দান হিসেবে হস্তছাপ শোভিত খিলানের অদূরে একটি উদ্যান নির্মাণ করে দিয়েছেন, যার নাম তিনাত নগর। এখানে তিনি এবং নিজাম অবস্থান করেন ওরসের সময় এবং শীতকালীন শিকার অভিযানে এসেও এখানেই ওঠেন। শহরের লোকদের কাছে প্রচলিত আছে যে, মাওলা আলীর জন্মদিনে তাকে খিলানকে কেন্দ্র করে নির্মিত সৌধের আশপাশে দেখা যায়। অতএব 'ওরসের' গুরুত্ব ক্রমে এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, কুতুব শাহী আমলে যেখানে মাত্র একদিন 'ওরস' পালিত হত তা ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। ভক্ত ও দর্শনার্থীদের আনাগোনা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওরসের সুযোগে শহরের বিশিষ্ট অভিজাতরাও সপরিবারে এখানে আসে অবকাশ, বিনোদন ও দীর্ঘ রাতের পানভোজনের উৎসবে যোগ দিতে। চারমিনার থেকে 'কোহে শরিফ' অর্থাৎ মাওলা আলী সৌধ পর্যন্ত রাস্তায় দুপাশে প্রদীপ জ্বালানো হয়। হায়দারাবাদের অধিকাংশ মানুষ এবং চারদিকের শহর ও গ্রামের মানুষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, পালকিতে চড়ে, হাতির পিঠে উঠে রাস্তায় ধূলি উড়িয়ে মুসি নদীর একটি বাঁকে সবুজ শ্যামল বৃক্ষশোভিত স্থানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। জায়গাটি তিন মসৃণ আগ্নেয় পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। একটি বড়, দুটি তুলনামূলকভাবে ছোট। ১৮০০ সালের মধ্যে উৎসব হযরত আলীর জন্মদিন ১৩ রজব থেকে শুরু করে স্বপ্ন দর্শনের বার্ষিকী অর্থাৎ ১৭ রজব পর্যন্ত স্থায়ী রূপলাভ করে। এ সময়ে দোকান মালিক থেকে শুরু করে বিরাট মর্যাদাধারী ওমরাহ্ পর্যন্ত বহু লোক এই এলাকায় দশদিন পর্যন্ত অবস্থান করে। মিষ্টি ও মসলার গন্ধ, হাতির বিষ্ঠা ও রাস্তার পাশে স্থাপন করা দোকানের ঝাল খাবার রান্নার ঝাঁঝ, দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ ওমরাহদের গহনা বিক্রেতা, সহিস, সিপাহী, হীরক ব্যবসায়িদের দরকষাকষি—অদ্ভূত এক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

ভারতের সর্বত্র ধর্মানুরাগ ও বেশ্যাবৃত্তির মধ্যে অভাবিত এক যোগসূত্র ও যুগে যুগে তা সমগ্র ভারতে বিরাজ করেছে—বিখ্যাত মন্দিরগুলোতে দেবদাসীদের মধ্যে এবং সুফি দরগাহ'র মুসলিম দরবার সুন্দরীদের

BanglaBook.org

মধ্যে—যারা এসব স্থান থেকে তাদের পছন্দের প্রেমিক বা খদ্দের খুঁজে নেয়। এই উৎসব বিশেষভাবে সংস্কৃতিমনা, শহুরে নর্তকিদের সাথে জড়িত, যারা মোগল শাসনের শেষ অধ্যায়ে মুসলিম অভিজাত মহলের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশের ইতিহাস অত্যন্ত স্বাধীন জীবনযাপন ও মত প্রকাশের মুহূর্তে সারা ভারত জুড়ে এ ধরনের উৎসব। তার সাথে সংগীত, উচ্ছ্বাস ও পুরুষ ও নারীর মধ্যে বাধাহীন মেলামেশার সুযোগ সব মিলিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাদের সাক্ষাতের জন্যে মোক্ষম উৎসব হিসেবেও বিবেচিত হত। সে যুগের এক তরুণ হায়দারাবাদি একটি ওরসের দৃশ্যকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

> "সৌধের অভ্যন্তরে সব ধরনের ঝাড়বাতি ঝুলানো থাকে এবং শিল্পীরা বাতিগুলোতে বৃক্ষের আকৃতি দেয়, যখন আলো জ্বালানো হয় তখন মনে হয় যে, সাইপ্রেস গাছও লজ্জা পাবে। পুরো স্থানটি যখন আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তখন চারদিকে সূর্যের আলোর মতো দীপ্তি ছড়ায় এবং চাঁদের আলোকে ম্লান করে দেয়। ...প্রেমিক প্রেমিকারা হাত ধরাধরি করে সৌধের আশেপাশের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, অন্যদিকে ভ্রষ্টা ও মাতালরা কোতোয়ালের উপস্থিতি বিস্মৃত হয়ে সবরকম অপকর্মে লিপ্ত হয়। যতদূর দেখা যায় শুধু সুন্দর মুখই চোখে পড়বে। বেশ্যা ও আকর্ষণীয় চেহারার বালকেরা কামনা চরিতার্থ করার এ পরিবেশে অধিক সংখ্যক লোককে প্রলুব্ধ করে। অভিজাতদেরকে সৌধের প্রত্যেক কোনায় দেখা যায়। সংগীতশিল্পী, কাওয়াল ও ভিক্ষুকের সংখ্যা মনে হবে মশা ও মাছির সংখ্যার চাইতেও বেশি। সংক্ষেপে বলা যায় অভিজাত ও সাধারণ মানুষ সেখানে তাদের যৌনলালসার তৃষ্ণা নিবারণ করে।"

সংস্কৃতিবান মানুষ ও মাওলা আলীর উৎসবের মধ্যে যোগসূত্র ছিল বেশ শক্তিশালী। কারণ দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত শিল্পী ও কবি মাহলাকা বাই চান্দা এই উৎসবের সাথে জড়িত থাকতেন। তার মা রাজ কানওয়ার বাইও খ্যাতিমান নর্তকি ছিলেন। তার গর্ভের ছয় মাসের সময় ১৭৬৪ সালের বসন্তকালে তিনি জেমসের বন্ধু নিজামের দরবারের শিল্পী ও ইতিহাসবিদ তাজাল্লি আলী শাহের সাথে পবিত্র উদ্দেশে মাওলা আলীর সৌধে যান। তারা যখন কোহে শরিফের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে রাজ কানওয়ার বাই-এর রক্তপাত শুরু হয় এবং মনে হচ্ছিল যে তার গর্ভপাত হয়ে যাবে। তাজাল্লি শাহ তাকে সোজা দরগাহ'য় নিয়ে কিছু পবিত্র সুতা ক্রয় করেন রাজ কানওয়ারের কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধার জন্যে এবং দরগাহের পীরজাদার দেয়া শিরনি খান। রাজ কানওয়ার অলৌকিকভাবে আরোগ্য লাভ করেন এবং তিন মাস পর সুন্দরী কন্যা মাহলাকা জন্মগ্রহণ করে।

কৃতজ্ঞতা হিসেবে তার পরিবার দরগাহর অন্যতম তহবিলদাতায় পরিণত হয় এবং তাদের প্রভাব ও মর্যাদার কারণে নিজাম ও তার পরবার মাওলা

BanglaBook.org

আলীর ওরসে উপস্থিত হতে থাকেন। ঘাতকের হাতে নিহত মাহলাকার চাচা নিজামের উজির রুকন-উদ-দৌলাকে দরগাহর নিচেই কবরস্থ করা হয়েছে। ১৮০০ সালে জেমস যখন প্রথমবারের মতো ওরসে যোগ দেন, তখন মাহলাকা স্বয়ং দরগাহর নিচের দিকে একটি মনোরম উদ্যান সৃষ্টির কাজ তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন, যেখানে তার মাকে দাফন করা হয়েছে এবং মৃত্যুর পর তার দাফনও সেখানে হবে বলে স্থির করেছেন। তার কবরে উৎকীর্ণ থাকবে একটি ফারসি কাব্য, যাতে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে, ' সৌন্দর্যের উদ্যানে সাইপ্রেস বৃক্ষ ও প্রণয়ের ঝাড়ে গোলাপের গাছ' হিসেবে।

অন্যান্য সংস্কৃতিসেবী ও শিল্পী যারা তাদের সাথে কাজ করেছেন তারাও পুণ্যার্থীদের জন্যে নির্মিত সরাইখানা, মসজিদ, খিলান, নকরখানা নির্মাণ, জলাধার, ফোয়ারা ও আশপাশের গ্রামগুলোতে উদ্যান তৈরির জন্যে দান করেছেন। গোলাম হোসেন খানের মতে, 'কোহে শরিফ থেকে পাহাড়ের ঢালুতে অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন রাজ নর্তকিরা। ওরসের সময় এখানে তারা জড়ো হন। সেখানে তারা উপাদেয় খাদ্য বিতরণ করেন, আতশবাজি ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেন সংগীতের 'রাগ' পরিবেশনের পাশাপাশি। ওরস চলাকালে আলোকোজ্জ্বল উদ্যানগুলোতে শিল্পীরা রাতের গভীর পর্যন্ত নৃত্য পরিবেশন ছাড়ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে, যে কারণে তারা হায়দারাবাদি অভিজাতদের কাছে এতটা কাঙ্ক্ষিত।'

অবকাশ কাটানোর প্রিয় স্থান ছাড়াও ওরস উৎসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করে। হায়দারাবাদের ওমরাহদের মধ্যে সম্প্রদায়গত যে বিভক্তি ওরসে তাদের সাথে নিজামের উপস্থিতি বিভক্তি নিরসনে খানিকটা হলেও অবদান রাখে। পুরনো কুতুব শাহী অভিজাতরাসহ আওরঙ্গবাদ ও বিদরের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরের অভিজাতদের প্রায় সকলেই শয়া মতাবলম্বী। পারস্য থেকে বিপুল সংখ্যক শিয়া অভিবাসীর আগমনে তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ আরিস্তু জাহ ও মীর আলম তাদেরকে হায়দারাবাদে স্বাগত জানিয়েছিলেন। নিজাম পরিবার কট্টরভাবে সুন্নি, অভিজাত পায়গাহ বংশের ওমরাহবৃন্দ এবং দিল্লি থেকে দক্ষিণাত্যে যোগ দিতে আসা মোগল সৈন্য ও দরবারিদের প্রায় সবাই সুন্নি। উভয় সম্প্রদায় একে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং জেমসের সহকারী হেনরি রাসেল পরবর্তী সময়ে লিখেছেন, 'দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ পরিমাণে বিদ্বেষ কাজ করে এবং তাদের মধ্যে সচরাচর বিয়ে হয় না।' কিন্তু শিয়া চেতনাসম্পন্ন মাওলা আলীর ওরস শিয়া-সুন্নি উভয় সম্প্রদায় সমান উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে পালন করে। তাছাড়া পবিত্র যে স্মৃতিচিহ্নকে কেন্দ্র করে উৎসবের আয়োজন সেখানে প্রবেশ হায়দারাবাদের উঁচু নিচু সকল শ্রেণির হিন্দুর জন্যে উন্মুক্ত। এখন পর্যন্ত সে রীতি বহাল আছে। যদিও এখন হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের চাইতে অধিক,

তবুও অন্য কোনো দেশে হলে এটি শুধুমাত্র শিয়াদের তীর্থস্থান হিসেবেই রয়ে যেত।

হায়দারাবাদের জনগোষ্ঠী ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে তাদের উৎসবের ব্যাপারে গর্বিত। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসবিদ মুনশি কাদের খানে বিদরি তার লেখা 'তারিখ-ই-আসফ জাহি'তে উচ্ছ্বসিতভাবে উল্লেখ করেছেন, 'ওরসের সময় স্থানটিতে এত জনসমাগম হয় যে, বিজ্ঞ ও বয়োবৃদ্ধ লোকজন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এমন স্থান দিল্লিতে অথবা ভারতের আর কোথাও নেই, যেখানে এত বিপুল লোকের সমাবেশ ঘটে।' তারা নিশ্চয়ই এটা পছন্দ করতে পারেনি, যখন মধ্যপ্রাচ্যের শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত এসেছে যে, নজফ, কারবালা এবং হযরত আলীর স্মৃতির সাথে জড়িত ইরাকের অন্য সৌধসমূহ হায়দারাবাদিদের নিজস্ব চিন্তায় তৈরি শিয়াদের পবিত্র স্থানের চাইতে যে কোনো দৃষ্টিতে যথার্থ ও শক্তিশালী। এ প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মোঙ্গল বংশোদ্ভূত হাজারাদের একটি কাহিনি বলতেন মীর আলম, 'যিনি সম্প্রতি ইরান থেকে এসেছেন এবং আমি যখন কোহে শরিফে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন আমার বাড়িতে এসে পৌঁছেন। সেখানে আমি রীতি অনুযায়ী ভোজের আয়োজন করব। আমি মোঙ্গলকে আমার সাথে পবিত্র সফরে যাওয়ার আমন্ত্রন জানাই। তিনি উত্তর দেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি ইতোমধ্যে অনেকবার নজফ (ইরাকে শিয়াদের অন্যতম প্রধান পবিত্র স্থান) সফর করেছি। অতএব এখানে আপনাদের ছোট্ট সৌধ সফরের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না।'

শেষ পর্যন্ত আমি পীড়াপীড়ি করেই তাকে গরুর গাড়িতে তুললাম আমার পরিবারের মাঝে এবং তাকে কোহে শরিফে নিয়ে গেলাম। আমরা যখন থামলাম এবং তিনি গরুর গাড়ি থেকে নেমে আসছিলেন, যেহেতু তিনি গরুর গাড়িতে চড়তে অভ্যস্ত নন, অতএব পা পিছলে জোয়াল ও কাঠামোর মাঝখানে ফেঁসে গেল। এরই মধ্যে বলদ দুটির নড়াচড়ায় গাড়ির চাকা ঘুরতে শুরু করল এবং হাঁটুর নিচে পায়ের হাড় ভেঙে গেল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন এবং আর্তনাদের মধ্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। আমি কোনোমতে তার পা আলগা করে আবার গাড়ির ওপর শুইয়ে দিলাম এবং পর্বত বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। ইতোমধ্যে বেশ ক'জন ভৃত্যকে পাঠিয়েছিলাম একজন চিকিৎসক খুঁজে আনতে। মোঙ্গলের সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আমি আমার পা কখনো কোনো চিকিৎসককে দেখতে দেব না, কখনো না। তিনি (সকল প্রশংসা তাঁরই)—আমার পা ভেঙেছেন, অতএব তিনিই আমার পা সারিয়ে দেবেন।'

অতএব সারা রাত মোঙ্গল কাটালেন বিনা চিকিৎসায় এবং কোনো রকম ব্যবস্থা ছাড়াই তিনি কাঁদলেন, মাথা আছড়ালেন বিছানায়, চিৎকার করলেন,

BanglaBook.org

'ইয়া মাওলা! ইয়া মাওলা! ইয়া আলী! বলে।' এভাবে রাতের শেষ প্রহরে সকালের ঠিক আগে তার চোখে ঘুম নেমে এল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন মহান হযরত আলী আবির্ভূত হয়েছেন এবং তার দিকে এগিয়ে আসছেন। যেই মাত্র তিনি মোঙ্গলের ভাঙা পায়ের ওপর তার হাত রাখলেন, তিনি চিৎকার করে জেগে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

মোঙ্গল তার পায়ে আর কোনো যন্ত্রণা অনুভব করছেন না। তিনি পা ছড়িয়ে দিলেন, আবার গুটিয়ে আনলেন, পুনরায় পা ছড়ালেন, বসলেন, উঠলেন, হাঁটলেন, ফিরে এসে আবার বসলেন এবং দেখলেন যে পায়ে ভাঙার আর কোনো নিশানামাত্র নেই। তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যে প্রার্থনায় মগ্ন হলেন এবং তার ওপর নির্ভরশীল প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করে আলৌকিকভাবে ভালো হয়ে যাওয়া তার পা দেখালেন। এরপর তিনি দরগায় প্রবেশ করে ফাতিহা উচ্চারণ এবং হস্তছাপযুক্ত পবিত্র প্রস্তর সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন।

তিনি যতদিন হায়দারাবাদে ছিলেন প্রতি বৃহস্পতিবার মাওলা আলীর দরগাহ জিয়ারত করতে কখনো ভুল করেননি। তার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মাওলা আলীর কাছেও এই পবিত্র স্থানটি বিশেষভাবে গৃহীত।'

জেমসের জন্যে 'ওরস' এ আগমন খুব ভালো সময়ে হয়নি। কিন্তু তিনি একটু অবসর চাচ্ছিলেন। কারণ রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর গত কয়েকটি মাস ছিল তার জন্যে ভয়াবহ। তার স্নায়ু ক্লান্ত এবং স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। তার এমনও মনে হচ্ছিল যে, তিনি পুরোপুরি স্বাস্থ্যগত দিক থেকে বিকল হয়ে পড়তে যাচ্ছেন।

কয়েকটি সপ্তাহ তিনি কাজ করেছেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। অন্য সময়ে তিনি চিঠি লিখতেন উষ্ণ পানিতে বসে, যেটি তিনি তৈরি করান রেসিডেন্সির হাঁতুড়ে ডাক্তার জর্জ ওরের পরামর্শে, যিনি জেমসের সার্বক্ষণিক মাথাব্যথার নিরাময়ে সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। যখন তার আমাশয়ের কাছাকাছি কোনো পেটের পীড়া হয়েছিল এবং একবার বিশেষভাবে বিব্রতকর মুহূর্তে তিনি নিজামের প্রাসাদে তার তাঁবুর পায়খানা নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথবা মানুষের শরীরে যত সমস্যা হতে পারে সব ধরনের জটিলতার শিকার হয়েছিলেন তিনি। এক চিঠিতে তিনি লিখেন, 'উজিরের সাথে সাক্ষাতের জন্যে যখন যাই তখন আমি বেশ ভালো ছিলাম, কিন্তু পাতলা পায়খানা হচ্ছিল বলে আমাকে দরবারের একটি প্রয়োজনীয় তাঁবু নিয়ে যেতে হয়েছিল।

জেমসের সরকারি জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন এখন অত্যন্ত চাপের মধ্যে। সিকান্দার জাহ-এর সাথে আরিস্তু জাহের নাতনির বিয়ে উপলক্ষে জেমসের

BanglaBook.org

আয়োজিত 'জশন' উৎসব ভালোভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মহীশূর বিভক্ত নিয়ে অসন্তোষের যে হাওয়া বিরাজ করছিল তা কেটে গেছে। তিনি কলকাতায় রিপোর্ট পাঠাতে পেরেছেন যে, আমি উজিরের প্রিয়পাত্রে পরিণত হতে পেরেছি। কিন্তু কলকাতা থেকে তার ওপর ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছিল নিজামের ওপর আরও একটি মৈত্রী চুক্তি চাপিয়ে দিতে, যে চুক্তির বলে হায়দারাবাদে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির আকার আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব, যা কোনো হামলার আশঙ্কার বিরুদ্ধে নিজামকে আরও শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেবে। কিন্তু এর বিনিময়ে নিজামকে কোম্পানির জন্যে বিশাল এক খণ্ড ভূমি প্রদান করতে হবে।

এর ফলে কোম্পানির সুবিধা হবে নিঃসন্দেহে, কারণ কোম্পানিই মূলত নিজামের রাজ্যের জন্যে দেওয়া ব্রিটিশ বাহিনীর অধিকারী এবং নিজাম কখনো তার স্বাভাবিক নমনীয়তার চাইতে ভিন্নরকম প্রমাণিত হলে প্রয়োজনে ভদ্রভাবে হায়দারাবাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাছাড়া নিজেদের বাহিনীকে অন্যের অর্থে লাভজনকভাবে পরিচালনার দিকটি তো ছিলই। হায়দারাবাদ দরবারের কাছে নতুন চুক্তির তেমন প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ করে মারাঠাদের পক্ষ থেকে হামলার আশঙ্কা যখন কমে গেছে। আলোচনার এক পর্যায়ে জেমস তার ভাইকে এই দিকটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, 'যদিও আরিস্তু জাহ আমাদের সাথে কোনো চুক্তি করতে আগ্রহী, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমরা যা চাচ্ছি তার সব তিনি মেনে নেবেন কিনা, যদি পুনা থেকে আসলে তাদের ওপর কোনো হুমকি না থাকে।' কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি যে শর্তাবলি স্থির করে দিয়েছেন তার কোনো রকম ছাড় দিতে তিনি সম্মত নন, যার সবই কোম্পানির অনুকূলে। তিনি জেমসকে নির্দেশ দিলেন যেকোনোভাবে হায়দারাবাদের স্বাক্ষর গ্রহণের জন্যে।

ওই সময়ে ওয়েলেসলি বিশেষ করে অত্যন্ত বাজে ও আপসহীন মনোবৃত্তি পোষণ করছিলেন। সেরিঙ্গাপত্তম বিজয় এবং 'ব্যাঘ্র দমনের' (টিপুর হত্যাকাণ্ডকে এভাবে উল্লেখ করতেন) পর তিনি ধারণা করছিলেন যে লন্ডনে তার প্রভুরা তাকে বিপুলভাবে পুরুস্কৃত করবেন। তিনি তার ফরাসি স্ত্রী হায়াসিন্থেকে লিখেন, 'এ ধরনের সাফল্যের পরও যদি কেউ সম্মান আশা না করে তাহলে কোন ক্ষেত্রে করতে পারে, ইংল্যান্ডে ন্যায়বিচার বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে বিশেষ কুরিয়ার মারফত সম্মানসূচক পদক আমাকে পাঠানো উচিত...। কোনো সম্মনসূচক নির্দশন ছাড়া অন্য সম্মানের আমি থোড়াই তোয়াক্কা করি।' যখন তাকে সামান্য একটি আইরিশ খেতাব প্রদান করা হয়, যা তাকে লন্ডনে হাউজ অফ লর্ডসে বসার অধিকারও দেবে না, তখন ওয়েলেসলির মধ্যে যেন স্নায়বিক বৈকল্যের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। দশদিন পর্যন্ত তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইলেন। খাবার খেতে অথবা

BanglaBook.org

ঘুমাতেও সক্ষম ছিলেন না তিনি। অবস্থা সহ্যই করতে পারছিলেন না এবং কাজকর্মে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন যেন বড় বড় যন্ত্রণাদায়ক ফোড়ায় তার শরীর ফুটছিল। কিংবা কলকাতায় এমন কিছু ছিল না যা নিজের শয্যার বাইরে তার চিত্তকে উৎফুল্ল অথবা আকর্ষণ করতে পারে। ওয়েলেসলির দৃষ্টিতে কলকাতার সমাজ ছিল একঘেয়ে, বিরক্তিকর ও অশ্লীল, 'পুরুষরা অসভ্য, ফুলবাবু ও অশিক্ষিত, মহিলারা কুকুরীতুল্য, বাজে পোশাক পরিহিতা এবং নীরস। এছাড়া তিনি তার স্ত্রীর কাছে কোম্পানির বণিকদের 'বদমায়েশি ও নিম্ন বংশজাতদের মধ্যে সম্পর্কিত, বলে ক্রোধ প্রকাশ করেন অর্থাৎ যারা তাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিল তাদের প্রতিও তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। তার মতে, 'তারা অশ্লীল বাক্যালাপে পটু, অজ্ঞ, অমার্জিত, বিরক্তি উৎপাদক ও অসহনীয় পর্যায়ের বাজে, বিশেষ করে তাদের মহিলাদের একজনও সুদর্শনা নয় এবং বিরক্তি উৎপাদক।'

শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পতিত হয়ে আহত ওয়েলেসলি স্ত্রী হায়াসিন্থেকে লিখেন, 'আমি কংকালসার হয়ে গেছি, আমার শরীরের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে, এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, কক্ষের মধ্যে হেঁটে বেড়াতেও অক্ষম...। মানসিক দিক হতে আমি সম্পূর্ণ মরে গেছি...এখানে আমি ধ্বংস হয়ে গেছি, আমার বিপর্যস্ত অবস্থা সকলেই অনুভব করছে।' কলকাতার ওয়েলেসলির কর্মচারীদের মতো তার স্ত্রী হায়াসিন্থেও স্বামীর মানসিক অস্থিরতায়, বিশেষত ব্রিটিশ মর্যাদা ব্যবস্থার বিভাজনে স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করে বিচলিত বোধ করছিলেন। তার আচরণে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ভদ্রভাবে স্বামীকে লিখলেন যে, 'এশিয়ার শাসকরা তার ভয়ে কম্পমান (মিথ্যা) হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। উত্তেজনার শিকার হয়ে, সম্মান ও পদক্ষেপ আশা যুক্তি ও সাহস হারিয়েছে....তা কিছুতেই আশা করা যায় না....প্রিয়, আমার প্রিয় জীবন, তুমি তো শিশু নও....তোমার দুর্ভাগা মাথা তোমার শরীরকে ধ্বংস করে ফেলবে।'

এসবের কোনোকিছুই ওয়েলেসলিকে নমনীয় করতে পারল না এবং এ পরিস্থিতি তার কোনো কর্মচারীর পক্ষে নির্দেশ প্রতিপালন করতে গিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন অথবা গভর্নর জেনারেল যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনে ব্যর্থতা প্রদর্শনের সময় ছিল না। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক জরুরি ভিত্তিতে জেমসকে লিখলেন নিজামের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের বিষয় সফলভাবে আলোচনা করতে এবং তার নিজের অবস্থান রক্ষার স্বার্থেই এ উদ্যোগে জেমসকে সফল হতে হবে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন। তিনি জেমসকে একথাও জানান যে, ইতোমধ্যে ওয়েলেসলি তার ভাই আর্থারকে জেমসের স্থলাভিষিক্ত করার কথা বলতে শুরু করেছে।

জেমসের সমস্যার মধ্যে নতুন করে যোগ হয়েছিল ১৭৯৯-এর গ্রীষ্মে তার পরিশ্রমী সহকারী জন ম্যালকমের হায়দারাবাদ ছেড়ে একটি মিশন নিয়ে

BanglaBook.org

পারস্যের শাহের কাছে গমন। তার স্থান পূরণ করেছে ম্যালকমেরই আশ্রিত বয়োবৃদ্ধ এক স্কটিশ সৈনিক ক্যাপ্টেন লিথ। শুরু থকেই জেমসের সন্দেহ ছিল ক্যাপ্টেন লিথের সামর্থ্যের ব্যাপারে এবং উইলিয়ামকে অতি সংক্ষেপে এ ব্যাপারে লিখেন, 'ম্যালকম একজন সত্যিকার স্কটিশ হিসেবে টুইড অঞ্চলের উত্তরে জন্মগ্রহণকারীদের মতোই বিশেষ কাজের প্রতি অধিক আকৃষ্ট।' হায়দারাবাদে লিথের উপস্থিতি বিলম্বিত হয়েছিল এবং তা তার দুর্বল স্বাস্থ্য ও আমাশয়ে আক্রান্ত হওয়ার কারণে। ফলে নিয়োগ লাভের তিন মাস পরও তার পক্ষে মাদ্রাজ থেকে হায়দারাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া সম্ভব হয়নি। জেমস খানিকটা বিরক্ত হয়েই লিখেন, 'ক্যাপ্টেন লিথ যদি বছরের এই অংশেও শিগ্‌গির যাত্রা শুরু না করেন তাহলে আমাকে ভাবতে শুরু করতে হবে যে, তার পেটে আর আন্ত্রিক নাড়িভুঁড়িও নেই।' শেষ পর্যন্ত লিথ যখন হায়দারাবাদে পৌঁছলেন, তখন প্রমাণিত হলো, সে সাহায্য করার চাইতে বরাং একটি বাধা। ১৮০০ সালের জানুয়ারিতে জেমস কলকাতায় উইলিয়ামকে লিখেন, 'নতুন সহকারী রীতিমতো এক যন্ত্রণা। সে হিন্দুস্থানি বলতে বা লিখতে জানে না—যতটুকুও জানে তা আলোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সাথে উপস্থাপনে ব্যর্থ অথবা ফরাসিও বলতে পারে না। আমান উল্লাহ (জেমসের যোগ্য মুনশির ছোট ভাই) সারাক্ষণ তার সাথে থাকার পর একটি চিঠি অনুবাদ করতে লিথের তিনদিন লেগেছে।'

পরবর্তী মাসে সিকান্দার জাহ-এর বিয়ের সময়ে জেমসের স্বাস্থ্যেরই অবনতি ঘটে এবং এমন এক চরম মুহূর্তে লিথ কোনোভাবে তাকে সাহায্য করার যোগ্য হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেনি। জেমস লিখেন : 'গত একটি সপ্তাহ আমি পেটের পীড়ায় বিপর্যস্ত ছিলাম, যার সাথে ছিল জ্বর ও ম্যালেরিয়া এবং এখনও আমি সেরে উঠিনি। ডাক্তার ওরে এখন আমাকে যে ওষুধ দিয়েছেন, ঈশ্বরের কৃপায় তা কিছুটা হলেও আমাকে স্বস্তি দিয়েছে। আমি সহজভাবে বুঝতে পারছি যে, আমার বর্তমান সহকারী আমার কোনো কাজেই আসছে না। ধারণা করার চাইতেও তার কাজের গতি মন্থর...। সে প্রায় বধির ও অন্ধ এবং মোমবাতি ব্যবহার করার জন্য তাগিদ দেওয়ার পর সে চোখ পুড়িয়ে ফেলেছে এবং আমাকে অনুরোধ করেছে দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে তাকে মার্জনা করতে।

পুরো বছরের কার্যসূচির অংশ হিসেবে চুক্তির আলোচনা অব্যাহত ছিল একের পর এক খসড়া প্রণয়ন, প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব তৈরি ও বিনিময়ের মধ্য দিয়ে লিথ সপ্তাহের পর সপ্তাহ অফিসে অনুপস্থিত ছিল কোনো না কোনো অজুহাতে : ম্যালমকের সুপারিশে নেওয়া এই অদ্ভুত সহকারীর আচরণ আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।' জেমস ফেব্রুয়ারি মাসে লিখেন—'গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি তাকে দেখছি না। পায়ে কৃমির সংক্রমণ ঘটেছে বলে সে বিছানা

BanglaBook.org

নিয়েছে এবং পারদ দিয়ে সেগুলো মারার চেষ্টা করার কারণে এখন তার মুখ দিয়ে শুধু লালা নিঃসৃত হচ্ছে। তার আঙুলে যদি একটু চুলকানি হয় তাহলে নিজেকে কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবে এই বলে যে তার শারীরিক অবস্থা কাজের উপযোগী নয় এবং ছুটি নিয়ে নেয়। যদিও তার কাজের নমুনা দেখার পর তার অনুপস্থিতিতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আমি রেসিডেন্সির প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ করছি, যা একজন সহকারী করে দিলে কাজে আরও সুবিধা হত। ডাক্তার ওরের মতে 'লিথ খামখেয়ালি এবং স্নায়বিক রোগগ্রস্ত।' শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন লিথ হায়দারাবাদকে তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে বিপজ্জনক বিবেচনা করে পরের বছরই মাদ্রাজে তার রেজিমেন্টে ফিরে যায়।

ফলে চুক্তির আলোচনা এককভাবে চালিয়ে যেতে হয় জেমসকে। অবশ্য এ সময় তার পাশে থাকত দিল্লিতে জন্মগ্রহণকারী অতি বিচক্ষণ মুনশি আজিজ উল্লাহ। হায়দারাবাদিদের কোম্পানির ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে প্রলুব্ধ করতে জেমস ও আজিজ উল্লাহকে সম্ভাব্য সকল কৌশল ভাবতে হয়েছে। আজিজ উল্লাহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরিস্তু জাহের প্রাসাদে কাটিয়েছেন তাকে অধিকতর নমনীয় করার সাধনায়। দিনের পর দিন তিন উজিরের গ্রীষ্মাবাসে তার সাথে হুক্কা টেনেছেন, পায়রা উড়িয়েছেন অথবা মোরগের লড়াই দেখেছেন। কিন্তু কোনো একটি উপলক্ষেও মুনশি তার সরকারি রিপোর্টের কোথাও উল্লেখ করেননি যে আরিস্তু জাহ তাদের আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তার ব্যক্তিগত হাম্মামেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যেখানে তারা কারো কানে কিছু প্রবেশ করা ছাড়াই আলোচনা করতে পারতেন।

আজিজ উল্লাহর পরামর্শে জেমস আরিস্তু জাহকে মাদ্রাজ থেকে একটি বা দুটি ঘড়ি আনিয়ে উপহার হিসেবে প্রদান করেন, যাতে ঘড়ির সময় অনুযায়ী কাজ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নিজামও। যা চুক্তিতে পরিপূর্ণ রূপ দিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে তার বিশ্বাস। নিজামও উপহার পেয়ে আনন্দিত। তাকে দেয়া উপহারের মধ্যে ডিসেম্বরের কনকনে শীত থেকে শরীর উষ্ণ রাখার জন্যে নতুন পশমি কম্বলও ছিল। জেমস আরিস্তু জাহ ও নিজামের জেনানার মহিলাদের উপহার বা ঘুষ দিতে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করেন। জেমস সাংকেতিক ভাষায় উইলিয়ামকে লিখেন যে, তিনি আরিস্তু জাহকে মাসে এক হাজার রুপি করে ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন, যদি তিনি নিজামকে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সম্মত করাতে পারেন এবং মন্তব্য করেন 'আলোচনার দুর্গ ভাঙতে লক্ষ্যভেদী সোনার গুলি ছুড়তে হবে।'

পরে উইলিয়াম যখন আরও বিস্তারিত জানতে চান তখন জেমস আবার তাকে সাংকেতিক লিখে জানান যে, প্রধান উজিরকে ঘুষ দেওয়ার মতো কঠিন কাজটি তিনি কীভাবে প্রস্তাব করেছেন—

BanglaBook.org

> "ঘুষের ব্যাপারটি তখনই ভাবতে হয়েছে...যখন সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি ধারণা করছি। কিন্তু আমি হয়তো এ উদ্যোগও গ্রহণ করতাম না, যদি তুমি বারবার বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্যে আমাকে তাগিদ না দিতে। করলেও অন্তত এতোদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবতাম না, যা আমি করেছি... ঘুষে লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং কিছু কিছু শর্তে আরিস্তু জাহ ও নিজামের আপত্তিও এর ফলে দূর হয়ে গেছে। যে সংখ্যক লোককে ঘুষ দেওয়া হয়েছে তা যদি এই দরবারের পরিবর্তে অন্য দরবারে হত তাহলে ক্ষতি ঘটে যাওয়ার সমূহ আশংকা ছিল এমনকি তা যদি দরবার প্রধানের কানেও পৌঁছতো। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্র অন্যগুলোর চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নিজামের জেনানায় আমার ঘুষ প্রদানের প্রধান মাধ্যমে ছিল ফাহিম বাই নামে অর্থলিপ্সু এক মহিলা।"

১৮০০ সালের সহায়ক চুক্তি শেষ পর্যন্ত 'স্থায়ী মৈত্রী চুক্তি' হিসেবে স্বাক্ষরিত হয় ১২ অক্টোবর। এর মাঝে আলোচনায় কেটে গেছে দীর্ঘ একটি বছর। কোম্পানি হায়দারাবাদে অতিরিক্ত দুই হাজার ব্রিটিশ পদাতিক, এক হাজার অশ্বারোহী মোতায়েন করতে সম্মতি দেয়, যার বিনিময়ে নিজামকে আঠারো মাস পূর্বে শ্রীরঙ্গপতমের পতনের পর নিজামের নিয়ন্ত্রণে থাকা মহীশূর প্রদেশ হস্তান্তর করতে হয় কোম্পানির হাতে। কয়েক হাজার সৈনিকের রক্ষণাবেক্ষণের খরচের চাইতে মহীশূর প্রদেশের প্রকৃত আয় অনেকগুলো বেশি।

কূটনৈতিকভাবে আরেকটি বিজয় সাধিত হলো কোম্পানির এবং ওয়েলেসলি অভিনন্দন জানিয়ে লিখেন জেমসকে। পরের বছর শিল্পী রবার্ট হোম যখন তার একটি চিত্র আঁকেন তখন তিনি চান যে নিজামের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ওপর হাত রাখা অবস্থায় আঁকতে হবে চিত্রটি। কারণ তখন পর্যন্ত ভারতে অর্জিত কোম্পানির সাফল্যগুলোর মধ্যে এটি ছিল তার সেরা সাফল্য। নিজামকেও মনে হচ্ছিল সন্তুষ্ট এবং তিনি জেমসকে খেতাব দেন 'প্রিয় পুত্র'। তাছাড়া তাকে সোনার আংটিতে যুক্ত বড় আকৃতির একটি হীরকও উপহার প্রদান করেন। আরিস্তু জাহ, কিছুদিন আগে মুনশি আজিজ উল্লাহকে অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আমার জন্যে কিছু পাওনা আছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার দিনে তিনি উইলিয়ামকে লিখেন—'আরিস্তু জাহ যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি ভেবেছেন, আমার কাছে সাদরে গৃহীত হবে। কিন্তু তাকে বলতে পারিনি যে, বস্তুটি কী। ...গতকালের আগের দিন আমি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছি যে, কী হতে পারে। মহামান্য নিজাম আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন তার কাছে আমার একটি আংটি পাঠাতে, যাতে তিনি আমার আঙুলের মাপ নিতে পারেন। আজ সকালে আমি দরবারে হাজির হওয়ার পর আরিস্তু জাহ আমাকে জানান যে, নিজাম আমাকে তার পুত্র হিসেবে বিবেচনা করে সম্মান দিতে চান। এই দুর্লভ

BanglaBook.org

সম্মান তিনি শুধুমাত্র আরিস্তু জাহ্ ছাড়া আর কাউকে দেননি। আমার যোগ্যতা, ভান অথবা অতি আশাবাদী হওয়ার পরও এ ধরনের সম্মান গ্রহণের প্রতিবাদ করা আমার জন্যে বৃথা। আংটিটি অত্যন্ত দর্শনীয় এবং আংটিতে বসানো হীরকটিও উজ্জ্বল ও বড় আকৃতির। রেসিডেন্সির একজন জুনিয়র কর্মচারী তরুণ সিডনিহ্যাম-এর ধারণা, হীরকটির মূল্য দেড় হাজার থেকে দুই হাজার প্যাগোডা (স্থানীয় মুদ্রা) পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু আমি অনুমান করছি, এর মূল্য এক হাজার পাউন্ড।'

তবুও পুরো ব্যাপারটি কার্কপ্যাট্রিকের মুখে বিস্বাদ এনে দেয়। তিনি বিশেষভাবে বিরক্তি অনুভব করছিলেন তাকে সামনে যে বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং কীভাবে দরবারে ঘুষ পৌঁছাবেন। তাছাড়া তার মনে শুরু থেকেই সন্দেহ ছিল যে, চুক্তিটি কোনোক্রমেই হায়দারাবাদের স্বার্থের অনুকূলে হবে না। পুনায় তার বন্ধু জেনারেল উইলিয়াম পামারকে তিনি লিখে পামারের মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন যে, কোম্পানি ক্রমবর্ধমানভাবে বিপজ্জনক আগ্রাসী ও অতি আস্থাশীল হতে চেষ্টা করছে। অবশেষে তিনি যখন তার ভাইকে লিখলেন অত্যাসন্ন সাফল্যের ফলাফল সম্পর্কে, সে চিঠিতে বিজয়ের কোনো ইঙ্গিত ছিল না। বরং তিনি তার ক্রমবর্ধমান অস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে জানান, 'লক্ষ অর্জনের জন্যে ওয়েলেসলি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।' আরিস্তু জাহ ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পর্কে তার মুনশি আজিজ উল্লাহকে বলেছেন যে, ইংরেজদের লোভের কোনো সীমা পরিসীমা নেই, তাদের সবকিছু প্রয়োজন, অথচ কোনোকিছুরই দায়দায়িত্ব নেবে না তারা অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায়, ইংরেজরা সবকিছু তাদের মতো করে কব্জা করতে চায়। জেমস উইলিয়ামকে আরিস্তু জাহর এই কথাগুলোও জানিয়ে লিখেছেন, 'আমার মন এখন এতটাই অস্থির যে, তোমার চিঠিতে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যা জানতে চেয়েছো তা জানানোর মতো অবস্থায় নেই আমি, যদিও লেখার মতো সময় হাতে ছিল।' তিনি ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চান, 'আমি নিজের প্রতিও সুবিচার করতে পারছি না এবং এখানকার জনগোষ্ঠীর প্রতিও নয়। এ অবস্থায় আমার কি এখানে থেকে পদত্যাগের অনুমতি চাওয়া উচিত?

যে 'ব্যক্তিগত ব্যাপারে' অস্থিরতার কারণে তিনি পদত্যাগ করার কথা ভাবছিলেন তা নিঃসন্দেহে খায়রুন্নিসার সাথে জড়িত।

ব্যাপারটি এখন জেমসের জন্যে সার্বক্ষণিক যাতনা ও উৎকণ্ঠার উৎস। একজন সাইয়িদাকে বিপথে নেয়াকে কেন্দ্র করে বিগত মে মাসে হায়দারাবাদে যে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল তা পুনরায় নাটকীয়ভাবে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। একদিন তিনি তার স্বাভাবিক নিয়মে খুব সকালে মুসি নদীর তীর ধরে

BanglaBook.org

অশ্ব চালনা করছিলেন। জেমসকে হামলা করার জন্যে ওঁৎ পেতে ছিল কে বা কারা। ঘটনার পরদিন জেমস উইলিয়ামকে লিখেন, 'গুলির হাত থেকে অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছি আমি। বিশ গজ দূরত্ব থেকে সাবেক ফরাসি বাহিনীর দুজন সৈনিক দু'বার গুলি ছুড়েছিল আমাকে লক্ষ্য করে। গুলি আমার মাথার খুব কাছ দিয়ে যায়। আমার সাথে যে সৈন্যরা ছিল তাদের প্রতি ঘৃণা চেপে রাখা আমার জন্যে খুব কষ্টকর ছিল। কিন্তু অপরাধীদের পাকড়াও করে বেঁধে আমার কাছে পাঠিয়ে আরিস্তু জাহ বলেও দিয়েছিলেন যে, আমি তাদেরকে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারি। যাহোক, আমি নিজেকে দমন করি, যদিও তাদেরকে জেরা করেছি যে, তারা কারো দ্বারা প্রেরিত হয়েছিল কিনা, যা তারা অস্বীকার করে। রাজ্যের শত্রু ছাড়া আর কারো দ্বারা প্রতি ভবিষ্যতে তারা যাতে গুলি না ছুড়ে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদের ছেড়ে দেই।' হায়দারাবাদের গুজবের কারখানা গুলির ঘটনার সাথে জেমসের প্রণয়ের ঘটনাকে জড়িত করে তারই পরিণতি বলে প্রচার করা।

কিন্তু পুরনো শহরের গুজব ও ক্রোধের লক্ষণ কোনোটাই জেমসকে উদ্বিগ্ন করেনি। তিনি জানতেন, খায়রুন্নিসা এখন গর্ভবতী। একথাও তিনি জানতেন যে, তার পরিবার এখন তাকে তাদের সন্তানের গর্ভপাত ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

তখনকার সময়ে ভারতে এবং ইসলামী বিশ্বে গর্ভপাত সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। কিন্তু গর্ভপাতের ঘটনা যে ব্যাপক ছিল তা স্পষ্ট। গর্ভপাত সম্পর্কে প্রথম যুগের ইসলামী আইনবিদরা মতামত দিয়েছেন, গর্ভের প্রথম পর্যায়ে গর্ভপাত ঘটানো নিষিদ্ধ নয়, অবশ্য তারা একথাও বলেছেন যে মায়ের স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতি বিবেচনা করেই কেবল গর্ভপাত ঘটানো অনুমোদনযোগ্য এবং তা করতে হবে গর্ভ সঞ্চারের চতুর্থ মাসের মধ্যে, যে সময়ের পর ভ্রূণ পরিপূর্ণ আত্মা লাভ করে, ঠিক মানুষের মতোই। নিকোলাও মানুচি, যিনি আওরঙ্গজেবের সময়ে চিকিৎসক হিসেবে মোগল হারেমে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন; তার মতে, সেখানে গর্ভপাত সাধারণ ব্যাপার ছিল এবং মধ্যযুগীয় ইসলামী চিকিৎসা শাস্ত্রে গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকা এবং দুর্ঘটনাবশত গর্ভ সঞ্চার হলে গর্ভপাত ঘটানোর জন্যে বিভিন্ন গাছগাছড়া ও ওষুধ সেবনের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বে ধারণা ও প্রয়োগের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে এবং বীর্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে প্রত্যাহার থেকে শুরু করে খরগোসের দুধ, প্রাচীরে জন্মায় এমন ফুলের নির্যাস ও মধুর মিশ্রণ, উইলো পাতা পশমের সাথে জড়িয়ে স্ত্রী অঙ্গে ব্যবহার পর্যন্ত অদ্ভুত সব সমাধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র মহিলাদের একার ব্যাপার নয়, পুরুষদের জন্মনিরোধ হিসেবে কিছু অতি অদ্ভুত প্রয়োগ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যার মধ্যে

BanglaBook.org

যৌনমিলনের পূর্বে প্রচুর তরল পান, পিঁয়াজের রস অথবা পাথুরে লবণের মিশ্রণে লিঙ্গের অগ্রভাগে প্রলেপ অথবা আরও মারাত্মক হচ্ছে পুরো লিঙ্গে আলকাতারা মেখে যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়া। এ সমস্যার ইসলামী সমাধানের মধ্যে হাতির বিষ্টায় আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ এবং আজব এক পদ্ধতি পেছনের দিকে লাফ দেয়ার মতো রহস্যজনক বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে।

সব সময়ের স্পর্শকাতর বিষয় গর্ভপাত সম্পর্কে সামান্য জানা গেলেও, চিকিৎসা শাস্ত্রে মহান অবদানের দাবিদার ইবনে সিনা একাদশ শতাব্দীতে বোখারায় লিখিত তার গ্রন্থে যেসব পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো প্রীতিকর বিবেচিত না হলেও মায়ের স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। তার মতে—

> "ঝাঁকুনির মাধ্যমে অথবা ওষুধ প্রয়োগ করে গর্ভপাত করানো যেতে পারে। ওষুধ ভ্রূণ হত্যায় কার্যকর এবং রজঃস্রাবের সূচনা করে। ঝাঁকুনির মধ্যে রক্ত ঝরানো, ক্ষুধার্ত থাকা, ব্যায়াম, লাফালাফি করা, ভারি বোঝা বহন করা, জোরে হাঁচি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।
>
> একটি উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, যোনিতে কাগজ গোলাকৃতি করে পাকিয়ে প্রবিষ্ট করানো, কাগজ ছাড়া পালক বা অনুরূপ অন্য কিছুও হতে পারে। এতে অবশ্যই কাজ হবে, বিশেষ করে এর সাথে যদি গর্ভপাত করানোর ওষুধ যেমন—আলকাতরা, শসার রস অথবা অন্য কোনো কার্যকর ওষুধ মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।"

মধ্যযুগীর ইসলামী বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অন্যান্য গর্ভনিরোধকের মধ্যে বিবেচিত ছিল মরিচ, দারুচিনি, এলাচ, সোমলতার রস, গাজরসহ আরও অনেক লতাগুল্মের রস ব্যবহার। এগুলোর কোনো কোনোটি গরুর পিত্তের সাথে মিশিয়ে নাভির চারপাশে মালিশ করতে হত, কোনো কোনোটি আগুনে জ্বালিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করতে হত।

মোগল যুগের শেষ দিকের ধাত্রীরা গর্ভপাতের জন্যে কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করত তা জানা না গেলেও কমবেশি উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোই হায়দারাবাদেও প্রয়োগ হত। কিন্তু ধাত্রী সম্পর্কে খায়রুন্নিসার পরিবার ও কার্কপ্যাট্রিকের ধারণা স্পষ্ট ছিল যে তারা এ কাজে সিদ্ধহস্ত। ঠিক যেভাবে গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ভারতীয় রমণীদের প্রেমের কলাকৌশল সম্পর্কে আস্থা ছিল, অনুরূপ গর্ভনিরোধেও যে তারা সমান দক্ষ সে ব্যাপারেও তাদের বিশ্বাস ছিল। সবকিছু যদি ব্যর্থও হয় তাহলে প্রসবে তাদের সহায়তার ব্যাপার কারো সন্দেহ ছিল না।

তবুও গর্ভপাতের বিষয়টি বিপজ্জনক এবং গর্ভের সন্তানটি রাখার ইচ্ছা সত্ত্বেও খায়রুন্নিসা গর্ভপাতের সাথে জড়িত ঝুঁকিতে শঙ্কিত ছিলেন। বিশেষ করে ১৮০০ সালের মার্চে অর্থাৎ' মাত্র কয়েক মাস আগেই তার এক সৎ- বোন গর্ভধারণের জন্যে কম ঝুঁকিপূর্ণ একটি ব্যবস্থার প্রয়োগ করাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

BanglaBook.org

বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো জেমসের পক্ষে তার ভাইকে জানানো সম্ভব হয়নি। আসলে তিনি সবসময় চেষ্টা করেছেন তার হায়দারাবাদি প্রেমিকা সম্পর্কে তাকে যথাসম্ভব কম জানাতে। এমনকি খায়রুন্নিসা যে গর্ভবতী তাও তিনি উইলিয়ামের কাছে প্রকাশ করেননি—কিন্তু গর্ভপাতের উদ্যোগ সম্পর্কে ক্লাইভের রিপোর্টে সামান্য উল্লেখ আছে, যখন কর্নেল বাউসার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, কার্কপ্যাট্রিক স্বয়ং তাকে বলেছেন, 'তাদের দেহবিনিময়ের এক পর্যায়ে বালিকাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং এই অসম্মানজনক পরিস্থিতি গোপন করতে তার পরিবার তাকে আগে যার সাথে কথা হয়েছিল সেই মুসলিম যুবকের সাথে বিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটি প্রবলভাবে তার আপত্তি জানান ও আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে ঘোষণা করেন যে, হাশমত জং (জেমস কার্কপ্যাট্রিক) ছাড়া তিনি আর কোনো পুরুষকে বিয়ে করবেন না। যখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদের চেষ্টায় কোনো লাভ হবে না, তখন তারা তাকে ওষুধ প্রয়োগ করাতে চায় গর্ভপাতের জন্য। কিন্তু তিনি (রেসিডেন্ট) শহরের নামকরা ধাত্রীকে পাঠিয়ে গর্ভপাতের উদ্যোগ থেকে তাদের বিরত রাখেন। তিনি জানান যে, তার বিরুদ্ধে তদন্তের ফলাফল যাই হোক না কেন, তিনি মেয়েটি ও তার সন্তানকে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করবেন না।'

যদিও জেমস সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে তিনি দীর্ঘসময় ধরে খায়রুন্নিসাকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারবেন না, কিন্তু আপাতত তার পক্ষে খায়রুন্নিসার সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি তিনি তার চিঠির নিয়মিত উত্তরও দিতে পারছিলেন না। কারণ, তার নানা জেমস ড্যালরিম্পেলের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে নিজের নিরাপত্তার স্বার্থেই কড়া খবরদারি করছিলেন। এর ফলে জেমস কার্কপ্যাট্রিককে রেসিডেন্সিতে নিষ্ক্রিয়ভাবে মুসি নদীর ওপর দিয়ে শহরের পুরনো অংশের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকতে হত, যেখানে খায়রুন্নিসা বাস করতেন। তার সাথে সাক্ষাৎ ও তার চিঠির উত্তর দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল জেমসের জন্যে। তিনি উইলিয়ামের কাছে সাংকেতিক চিঠি লিখেন, 'দীর্ঘদিন থেকে বকর আলী খানের পরিবারের সাথে আমার যোগযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ—কিন্তু আমার কাছে খবর আসছে যে, মেয়েটিকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে এবং তার অভিভাবকরা তার মনের যাতনা লাঘবের জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাকে আর কারো সঙ্গে বিয়ে দেবে না।'

এরপর জেমস প্রথমবারের মতো ইঙ্গিত দেন যে, তার প্রেমের ব্যাপারে আগে যতটা উদ্যোগী ছিলেন, এখন তার চাইতেও গুরুতর উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন তিনি। তখন পর্যন্ত তিনি অনিচ্ছার সাথে বড় ভাইয়ের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তিনি খায়রুন্নিসাকে শয্যায় নিয়েছেন, কিন্তু তাকে বিয়ে করার পরিকল্পনার কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন অথবা তার সাথে সম্পর্ককে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার মতো 'অনুশোচনাযোগ্য ভুল' করেছেন

BanglaBook.org

বলে মনে করেন। এখন তিনি আরও স্পষ্টভাবে ভাইকে জানান যে, তিনি আসলে ব্যাপারটির সাথে গভীরভাবে জড়িত। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার কথার মর্যাদা রক্ষা এবং সে অনুযায়ী তার কর্তব্য পালন করতে, যদিও তা তার ভাইয়ের কাছে আপত্তিকর বিবেচিত হতে পারে। পুরো ঘটনা প্রকাশে বরং তিনি স্বচ্ছ হবেন এবং এতদিন পর্যন্ত বলে এসেছেন যে, সম্পর্কটি তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ভান করার ফলে মর্মপীড়া থেকেও মুক্তি পাবেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে তাকে একই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—তাকে তার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হবে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও পরিত্যাগ করতে হবে মেয়েটির জন্যে। ১৭ আগস্ট তিনি উইলিয়ামকে লিখেন—

> "আমি বিস্মিত হবো না, যদি তারা আগে বা পরে খায়রুন্নিসার সাথে আমার সম্পর্কে পুনরায় স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। আমি তোমাকে আগের মতোই বলছি যে, আমি জানি, এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমি কী করব। প্রথমে আমার ক্ষমতার বলে আমি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করব। কিন্তু যদি মনে হয়, কোনরকম বিপদের মোকাবেলা করা ছাড়া এটা করা যাবে না, তাহলে আমি নিজাম ও আরিস্তু জাহের মনোভাব বুঝার চেষ্টা করব। তারা যদি এ ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ না করেন তাহলে আমি কর্তব্যের টানেই বিষয়টি লর্ড ওয়েলেসলি কাছে পেশ করব, যিনি এ ব্যাপারে আমার প্রকাশ্য বক্তব্য থেকেই আমার প্রতি মেয়েটির মনোভাব সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। কিন্তু ওয়েলেসলি যদি রাজনৈতিক জটিলতার কারণে অথবা অন্য কোনো বিবেচনায় এ সম্পর্কে প্রতিকূল কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে অনুভূতির তাগিদই আমাকে বাধ্য করবে আমার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতে। তাহলে আমি তাদের (খায়রুন্নিসার পরিবার) সাথে আরও স্বাধীনভাবে মেয়েটির প্রতি আমার দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করতে পারবো। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। বিভিন্ন বিষয় বিবেচনার পর এই বিকল্প চিন্তা করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এছাড়া আমার জন্যে আর কোনো পথ খোলা নেই। নিষ্ঠুর এক দ্বিধাদ্বন্দ্বের হাত থেকে সম্মানজনকভাবে নিষ্কৃতি পাওয়ার এটিই উপায়...।"

মাওলা আলীর দরগাহ'য় যাওয়ার পেছনে জেমসের যদি ঘটনার ছায়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা রীতিমতো ভুল ছিল।

তিনি উত্তর দিকে যাত্রা করেন ১ ডিসেম্বর এবং সাথে লিথের স্থলে তার নতুন সহকারী মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্তি তরুণ প্রাচ্য বিষয়ক পণ্ডিত হেনরি রাসেল। অনর্গল হিন্দুস্থানি বলতে অভ্যস্ত রাসেল, তার ফারসি ততটা ভালো হয়ে উঠেনি। সম্ভবত সে চাকরি পেয়েছিল তার যোগাযোগ এবং দক্ষতার কারণে। তার পিতা স্যার হেনরি রাসেল, সিনিয়র বাংলার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ, বুদ্ধিমান, কিন্তু রুক্ষ মেজাজি, যার আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার চামচা স্বভাবের হীন মর্যাদার লর্ড ওয়েলেসলির কাছে আতঙ্কের মতো ছিল।

ওয়েলেসলি স্যার হেনরি রাসেলের নিয়োগের খবর পেয়ে লন্ডন কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট হেনরি ডুন্ডাসকে লিখেছিলেন : 'আমি জানি না, আপনারা কোথা থেকে স্যার হেনরি রাসেলকে তুলে এনেছেন। তিনি কর্কশ, উচ্চ বংশে তার জন্ম হয়নি, তিনি অত্যন্ত উগ্র ও উদ্ধত স্বভাবের। সার্বজনীন বিরক্তির কারণ ঘটাবেন তিনি। আমি আশা করি, আপনি তার প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ অনুমোদন করবেন না—কোনোভাবেই সেই উদ্ধত লোককে এমন এক স্থানে পাঠাবেন না, যে স্থান তার আচরণে গৌরব হারাবে।'

লর্ড ওয়েলেসলি প্রধান বিচারপতি হেনরি রাসেল সিনিয়রকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখলেও তার পুত্র হেনরি রাসেলের প্রশংসা করতেন তাকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় যুবক হিসেবে। জেমসও তাকে পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে উইলিয়ামকে লিখেন, 'আমার মনে হয়, যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে তার নির্বাচন উপযুক্ত হয়েছে। ফরাসি ভাষায় সে যথেষ্ট অগ্রগতি করছে। কিন্তু হিন্দুস্থানি ভাষায় তার যথেষ্ট দখল থাকায় অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার জন্যে অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। এ ভাষায় সে ক্রমে আরও দক্ষ হয়ে উঠবে।' জেমস ব্যক্তিগতভাবে হেনরিকে পছন্দ করতেন। কারণ হেনরি প্রাণবন্ত, বুদ্ধিমান এবং মিশুক। লিথের করুণ দর্শন উপস্থিতির পরিবর্তে তার আগমন ছিল জেমসের কাছে আশীর্বাদতুল্য।

রাসেল, কার্কপ্যাট্রিক ও রেসিডেন্সির অন্যান্যরা যখন কোহে শরিফে পৌঁছে ততক্ষণে সেখানে বিপুল সমাগত হয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে পাম গাছের সারির মাঝখানে টানানো বিশাল বিশাল রেশমি শামিয়ানা। ভক্তরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা বাজারে কেনাকাটা করছে, মাহলাকা বাই চান্দার ব্যক্তিগত ব্যয়ে গড়ে তোলা বিশাল রন্ধনশালা থেকে সকলে বিনে পয়সায় খাবার খাচ্ছে ও শরবত পান করছে। হিন্দুরা দরগায় নিবেদন করার জন্যে নারিকেল এনেছে, মুসলমানরা ভেড়া এনেছে কোরবানি দেওয়ার জন্যে। ভিক্ষুকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে ভিক্ষার আশায়। গোলাম হোসেন খান লিখেছেন—

> "আল্লাহর সকল বান্দা সেখানে যায়। নিজাম থেকে শুরু করে তার মন্ত্রীরা দরিদ্র মানুষ, সৈনিক ও চিত্তবিনোদনের কাজে নিয়োজিতরাও যায়। এমনকি ৯০ থেকে ১০০ বছর বয়সী বৃদ্ধা, যাদের হাঁটার শক্তি পর্যন্ত নেই, তারাও দেহকে কোনমতে টেনে নিয়ে যায় উৎসবে অংশ নিতে। প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ জড়ো হয়—মুসলিম, হিন্দু, বিষ্ণু ও শিবের অনুসারী, ব্রাহ্মণ ও সাধু, মাড়ওয়ারি, এমনকি ইরান, মধ্য এশিয়া, তুর্কিস্থান, অটোম্যান তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, অনারব বিদেশি এবং ইংরেজরাও আসে ওরসে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ অংশগ্রহণ থেকে বাদ থাকে না। তারা অসংখ্য তাঁবু খাটায় এবং যারা সেখানে অট্টালিকা তৈরি করে রেখেছে তারা সেগুলোকে

BanglaBook.org

> গালিচা ও মোমবাতি দিয়ে সজ্জিত করে। প্রত্যেক বিশিষ্ট ওমরাহের প্রাসাদ আছে এখানে, যেগুলো তাদের নামে। প্রায় ৩ হাজার হাতি, ৫০ হাজার ঘোড়া এবং মালবাহি উট, তাজা ও শুকনো ফলের দোকান, কাপড় ও খাঁটি মোলায়েম পশমি শালের দোকান—যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় চোখে পড়ে। জনতার যেন শেষ নেই, চরদিকে শুধু ক্রেতা ও বিক্রেতা, অশ্বারোহী, নর্তকি, চকচাকে তাঁবু, পর্বতসম হাতি এবং মুসি নদীর তীর থেকে কোহে শরিফের পাদদেশ পর্যন্ত অসংখ্য দালানের সারি রেশমি কাপড় ও ঝাড়বাতি দিয়ে সাজানো।
>
> সুন্দরী নর্তকিরা নানাভাবে সেজে উজ্জ্বল রঙের পোশাক ও মণিমুক্তার অলংকার পরে উচ্ছ্বসিত জনতাকের বিনোদন দিতে নাচছে, সুর ও নৃত্যের তালে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে দর্শকরা। এছাড়া আতশবাজি চলছে। সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয়ের কোনো শেষ নেই। মহামান্য নিজাম যখন অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করেন তখনই শুরু হয় আসল অনুষ্ঠান... ।"

উৎসবের মূল আকর্ষণ, ১৬ রজব মধ্যরাতে পাত্রভর্তি চন্দনকাঠ উঠিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তাকিয়া রং আলী শাহের মাজার থেকে আনার মুহূর্তটি। শিয়া মুসলমানদের এ অনুষ্ঠানে কিছুটা হিন্দু রীতি অনুসরণের স্পর্শ আছে। এরপর দ্বিতীয় একট চন্দন কাঠ পাঠানো হয় পাঞ্জা শাহ থেকে কোহে শরিফে এবং তৃতীয়টি পাঠানো হয় মালাজগিরি থেকে। ভক্তরা এ সময় পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে এবং গোলাম হোসেন খানের মতে, 'ভিড় এত প্রচণ্ড যে, দরগাহ'য় পৌঁছা রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পেছন দিকে থেকে শক্তিশালী যুবকেরা ঠেলা দিলেই কেবল এগুনো সম্ভব। সকলে ঘেমে ভিজে যায় এবং শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত দরগাহর কাছে পৌঁছা যায়।' এখানে তারা মাথা নিচু করে অথবা অন্যভাবে আভূমি প্রণত হয়ে পবিত্র হস্তছাপের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, যে হস্তছাপ দুই শতাধিক বছর আগে স্বপ্নে দেখেছিলেন খাজা ইয়াকুত।

উৎসবের বিশাল জনসমুদ্রের মাঝেও জেমস উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, তাকে ঘিরে যে কেলেংকারি ছড়িয়ে পড়েছিল এখনও তিনি তা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। যেখানেই তিনি গেলেন—হস্তছাপের সৌধে, শিকারে অথবা বাইজি নাচের মজলিশে, সেখানেই ছায়ার মতো অনুসরণকারী মীর আবদুল লতিফ শুস্তারি ও মীর আলমের মোটা, বখাটে, আকর্ষণহীন কিশোর পুত্র মীর দৌরানকে দেখতে পেলেন। মনে হচ্ছিল, দুজনই মীর আলমকে তার দুর্দশায় ও নির্বাসিত অবস্থা থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে জেমসকে মধ্যস্থতা করার জন্যে বলতে চায়। মীর আলম রায়দ্রুগ থেকে হায়দারাবাদের পথে আসছেন তার স্বেচ্ছা নির্বাসনের জন্যে বাছাই করা স্থান হায়দারাবাদ থেকে একশো মাইল উত্তর—পূর্বদিকে বেরার-এ তার নিজস্ব স্থানে। দুজনই জেমসের আপত্তি বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানান যে, মীর আলমের জন্যে সুপারিশ করার মতো অবস্থা

BanglaBook.org

তার নেই। দুজন যখন তাকে প্রস্তাব দিল যে, তারা যদি তাকে খায়রুন্নিসার ব্যাপারে একটি রফা করে দেয়, তাহলে তিনি মীর আলমকে তার বাড়িতে ফেরার অনুমতির ব্যবস্থা করে দেবেন কিনা, তখন জেমস যথার্থই বিরক্তি অনুভব করলেন। এ সম্পর্কে পরে জেমস উইলিয়ামকে লিখেছেন—

> "আবদুল লতিফ আমার পূর্ব পরিচিত এবং আলাপ অলোচনায় খোলামেলা। মীর দৌরানোর মধ্যে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও তার কথার কোনো সীমা ছিল না। সে আমাকে বিনা দ্বিধায় প্রস্তাবই করে বসলো যে, আমি তার কাজ করে দিলে আমার নিজের ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে কোনো বাধারই সৃষ্টি হবে না। তুমি সহজেই অনুমান করতে পারো যে, আমি এ ধরনের প্রস্তাব কিভাবে গ্রহণ করেছি এবং কি উত্তর দিয়েছি—আমার সন্দেহ, মীর দৌরান বৃদ্ধ বকর আলী খানের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছে।"

জেমস ভালোভাবে জানতেন যে, খায়রুন্নিসার গর্ভের সাত মাস চলছে এবং আহমদ আলী খানের পুত্রকে বিয়ে করার অবস্থায় নেই। বকর আলী খান ও গুস্তারি পরিবার লে. কর্নেল ড্যালরিম্পেলের চাইতে কম সমস্যায় আছে। কারণ ড্যালরিম্পেল এখনও জেমসের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারেন, যদি তিনি সাক্ষাৎ শুরু করেন। যদিও তিনি জানেন যে, এর ফলে হায়দারাবাদের ব্রিটিশ অবস্থানের ওপর মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে।

অতএব ৯ ডিসেম্বর অর্থাৎ মাওলা আলীর ওরস অনুষ্ঠান সমাপ্তির মাত্র তিনদিন পর রেসিডেন্সিতে যখন খবর এল যে, লে. কর্নেল ড্যালরিম্পেল হঠাৎ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তার তাঁবুতেই মৃত্যুবরণ করেছেন। জেমসের মধ্যে মিশ্র আবগের সৃষ্টি হলো। ড্যালরিম্পেলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল এবং জেমস তার 'মৃদু সমঝোতামূলক ব্যবহার সম্পর্কে লিখেছেন এবং বলেছেন, 'আমার গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের নিদারুণ ক্ষতি হলো।' প্যারেড গ্রাউন্ড গোরস্থানে জেমস ব্যক্তিগতভাবে তার শেষকৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। জায়গাটি নতুন ব্রিটিশ সেনানিবাসের পাশেই। জেমসের শোকবাণী উচ্চারণে বেদনার ছাপ প্রতিভাত ছিল। কিন্তু তার হৃদয়ের কিছুটা অংশ নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছিল। কারণ, বকর আলী খান পরবর্তীতে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে, ড্যালরিম্পেলের মৃত্যুর দুদিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই জেমস আবার গোপনে আগের চাইতেও বেশি আগ্রহে খায়রুন্নিসার সাথে সাক্ষাৎ করতে শুরু করেছিলেন।

দুই সপ্তাহের কিছু সময় পর রহস্যজনক এক গুপ্তচর উপস্থিত হলো আরিস্তু জাহের আঙ্গিনার প্রাসাদোপম ভবনে। লোকটি উজিরের দরবারে প্রবেশ করে উপস্থিত সকলের সামনে উচ্চকণ্ঠে দাবি করল হাশমত জং-এর উচিত খায়রুন্নিসাকে অবিলম্বে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাছে তুলে দেয়া। তাকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ হওয়ার আগেই লোকটি সামনের জনবহুল রাস্তায় মিশে গেল।

BanglaBook.org

সেই একই সন্ধ্যায় শরফ-উন-নিসা তার মা দুরদানা বেগমের সাথে বকর আলী খানের বাড়িতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বৃদ্ধ বকর আলী একা বসে ছিলেন এবং কান্নার শব্দে উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইলেন যে, কী ঘটেছে। শরফ-উন-নিসা দাবি করলেন যে সপ্তাহ দুয়েক যাবৎ প্রধান উজিরের বাড়ি থেকে একের পর এক হুমকি লাভ করছেন। প্রথম দুটি হুমকি এসেছে আরিস্তু জাহের পুত্রবধূ ফারজান্দ বেগমের পক্ষ থেকে। ক্রিসমাস উৎসবের পরের দিন ফারজান্দ বেগমের পরচালিকা মামা সালাহা'র কাছ থেকে। মামা সালাহা তার হুমকিতে উল্লেখ করেছে যে, রেসিডেন্ট যেহেতু ছয় মাস আগে থেকেই খাঁটি মুসলমানে পরিণত হয়েছে, অতএব এখন তাকে তার কন্যাকে রেসিডেন্টের সাথে বিয়ে দিতে হবে। সে যদি এতে সম্মত না হয় তাহলে তার পিতা ও পরিবারের ওপর সর্বনাশ নেমে আসবে।

শরফ-উন-নিসা বললেন যে, তিনি এসব হুমকির কোনোটারই তোয়াক্কা করেননি, কিন্তু মাত্র তিন ঘণ্টা আগে উজিরের আরেকজন পরিচারিকা ফারাজান্দ বেগমের পক্ষ থেকে আরেকটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, আমি যদি অবিলম্বে আমার কন্যাকে রেসিডেন্টের কাছে তুলে না দেই, তাহলে তাকে লাভের জন্য রেসিডেন্টের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যগ্রতা এত উন্মত্ত হয়ে উঠবে যে, তিনি নিজের চুল কেটে ফেলবেন এবং বকর আলী খানের দরজায় বসে থাকবেন।

বকর আলী খান সঙ্গত কারণেই এসব হুমকিতে অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কারণ দুরদানা বেগম, নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে কাঁধের ওপর থেকে কাফন ছড়িয়ে বিলাপ করছিলেন, 'আমি এখন ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছি এবং দুনিয়াও ছাড়তে হবে আমাকে।' এরপর তিনি বকর আলী খানের হাতে একপ্রস্থ কাফন দিয়ে বললেন, 'এটি নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছে যান এবং কাঁধে রেখে সকল ব্রিটিশ লোকদের সামনে ঘোষণা করুন যে, আপনি জগৎ সংসার ছেড়ে ভিক্ষুকে পরিণত হতে যাচ্ছেন—' তার দৃষ্টিতে পরিবারকে রক্ষা এবং এ ধরনের অপূরণীয় মর্যদাহানির হাত থেকে মুক্তি লাভের উপায় পাগলের ভান করা।

পরদিন ২৮ ডিসেম্বর সকালে বকর আলী খান ব্রিটিশ শিবিরে গেলেন বটে, কিন্তু ভিক্ষুকে পরিণত হওয়ার জন্য নয়। তিনি কর্নেল বাউসারের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, যিনি কর্নেল ড্যালরিম্পেলের স্থলে অতিরিক্ত ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব লাভ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। তিনি তার কাছে বিনীত নিবেদন করলেন তাকে জেমস কার্কপ্যাট্রিক ও আরিস্তু জাহের হাত থেকে রক্ষা করতে। বকর আলী খান যখন বাউসারের কাছে যান তখন তিনি নাশতা করছিলেন। তিনি যেহেতু ফারসি বা হিন্দুস্থানি জানেন না, কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে বকর আলীকে সান্ত্বনা দিলেন যে, পুরো বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার জন্যে তার শিবিরে অনর্গল ফারসি বলতে অভ্যস্ত ডাক্তারের

BanglaBook.org

কাছে যাওয়াই উত্তম। ডাক্তার কেনেডি তার বাড়িতেই ছিলেন। তিনজন একটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে আলোচনায় বসলেন। বকর আলী খান তার সামনে উপস্থিত জটিল পরস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন যে, রেসিডেন্ট কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে উজিরের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তার নাতনিতে লাভের জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি তাদের সকল উদ্যোগ প্রতিহত করেছেন এবং তার উদ্যাগে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছেন পরলোকগত লে. কর্নেল ড্যালরিম্পেল, যিনি রেসিডেন্টের কাছ থেকে শপথ আদায় করেছিলেন যে, রেসিডেন্টের এ ধরনের ভবিষ্যৎ কোনো চেষ্টা তিনি ঠেকাবেন। কিন্তু কর্নেল ড্যালরিম্পেলের মৃত্যুর মাত্র দুদিন পরই তার আগের উদ্যোগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে...এবং এখন উজিরের কাছ থেকে তার পক্ষে হুমকি আসতে শুরু করেছে যে, রেসিডেন্টের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করা হলে তাকে ও তার পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। বকর আলী খানের মতে, 'প্রতিটি অনুরোধ ও প্রতিটি হুমকির মধ্যেও তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থাকার চেষ্টা করছেন। এজন্য তাকে তার জায়গির থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে, তার ভাতা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এমনকি জীবন যেতে পারে, তবু তিনি কিছুতেই তার পরিবারের অমর্যাদার জন্যে সম্মতি দেবেন না।'

বকর আলী আরও বলেন, 'এখন তার ওপর এমন চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করেছে যে, মর্যাদা রক্ষার জন্য বাউসারের কাছে আসা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। তাছাড়া পরিস্থিতি যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে তিনি যে কোনো মুহূর্তে পদত্যাগ করবেন এবং এ ব্যাপারে কর্নেল বাউসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করবেন।' খান বাইরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরই একটি চিঠি হাতে ফিরে এলেন, চিঠিটি বাউসারের হাতে অপর্ণ করলেন। চিঠিতে স্বাভাবিক সৌজন্যের পর লেখা ছিল: কর্নেল ড্যালরিম্পেলের মৃত্যুর পর আমার ওপর এক ধরনের নিপীড়ন শুরু হয়েছে, যার পরিণতি আমার চরিত্র ও খ্যাতির ওপর কলংক লেপন করবে এবং হায়দারাবাদে অবস্থান করার আর কোনো উপায় থাকবে না আমার জন্যে। সেজন্য আমি আপনার খেদমতে নিবেদন করতে চাই যে, ইংরেজ শিবিরে আমার জন্যে একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন, যাতে আমি আমার ওপর নির্ভরশীলদের নিয়ে সেখানে থাকতে পারি। এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে আমাকে কিছু সৈনিক দিন যারা আমাকে ও আমার পরিবারকে কোম্পানির ভূখণ্ডে প্রহরা দিয়ে পৌঁছে দেবে।

বকর আলী খানের এই আনুষ্ঠানিক অভিযোগের পর বিষয়টি প্রকাশ্য হয়ে পড়ে এবং এই পর্যায় থেকেই শুরু হয় উপযুক্ত তদন্ত, যা এর পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল এবং গুজবেরও উৎস ছিল।

সেই সন্ধ্যায় কর্নেল বাউসার জেমসের কাছে একটি নোট পাঠালেন তার বিরুদ্ধে বকর আলী খানের আনীত গুরুতর অভিযোগের উল্লেখ করে। তিনি এ

BanglaBook.org

প্রস্তাবও দিলেন এই বিবাদে জড়িত সকল পক্ষ দুদিন পর অর্থাৎ ত্রিশ তারিখ সকালে রেসিডেন্সিতে মুখোমুখি বৈঠকে মিলিত হবে, যাতে তারা অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে পারে।

জেমস বৈঠকে উপস্থিত হতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে পরদিন, অর্থাৎ ২৯ তারিখে মুনশি আজিজ উল্লাহকে সরাসরি আরিস্তু জাহের বাসভবনে প্রেরণ করলেন যা ঘটেছে তা জানাতে এবং আরিস্তু জাহের বাসভবনে প্রেরণ করলেন যা ঘটেছে তা জানাতে এবং বাউসারের চিঠি দেখাতে। তিনি আজিজ উল্লাহকে বিশেষভাবে খোঁজ নিতে পাঠান যে, উজিরের নাতনি ফারজান্দ বেগম বকর আলীর পরিবারের মহিলাদের কাছে হুমকিপত্র পাঠিয়েছিল কিনা।

ঘটনাচক্রে মুনশি আজিজ উল্লাহ পৌঁছার পাঁচ মিনিট আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন মীর আবদুল লতিফ শুস্তারি, যিনি তার নির্বাসিত জ্ঞাতি ভাই মীর আলমের পক্ষে উজিরের কাছে দরখাস্ত করতে এসেছেন। দুজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—শুস্তারি আন্তরিকতার সাথে আজিজ উল্লাহকে তার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, মুনশি কী চমৎকার উর্দু কবি ও তার সহানুভূতিশীল সঙ্গী ছিলেন। এ সম্পর্কে শুস্তারি নিজেই লিখেছেন : আজ ১৩ শাবান (২৯ ডিসেম্বর) আমি উজিরের কাছে অপেক্ষা করছিলাম, ঠিক তখনই মুনশি আজিজ উল্লাহ উপস্থিত হলেন এবং সরাসরি উজিরের হাতে একটি চিঠি দিলেন। এটি পাঠ করার সময়ই তার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল এবং দু-তিনবার তিনি বিস্ময় প্রকাশের মতো করে বললেন, 'আল্লাহর নামে বলতে চাই, এটা মিথ্যা।'

চিঠি পড়া শেষ হলে তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আল্লাহ আমার সাক্ষি যে, এটি একটি জঘন্য কুৎসা।'

এরপর আরিস্তু জাহ বকর আলী খানের অভিযোগ সম্বলিত কাগজটি শুস্তারিকে দিলেন পাঠ করার জন্যে এবং বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন যে, এহেন মিথ্যাচারের জন্যে বকর আলীর নাক কাটা যাওয়াই উচিত। শুস্তারি অভিযোগগুলো পাঠ করার পর আরিস্তু জাহ তার পুত্রবধু ফারজান্দ বেগম এবং দুই পরিচারিকাকে তলব করলেন, যারা শরফ-উন-নিসাকে হুমকি দিয়েছে বলে বকর আলী অভিযোগ করেছেন। একে একে তারা এল এবং শুস্তারি ও মুনশির সামনেই উজির তাদেরকে জেরা করলেন। শুস্তারির মতে 'তারা শতবার কসম কেটে প্রবলভাবে দাবি করল যে, এ ব্যাপারে তারা পুরোপুরি অজ্ঞ এবং শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতেই এটা করা হয়েছে।'

এর ফলে দ্বন্দ্ব আরও জটিল হলো—তারা শরফ-উন-নিসাকে হুমকি দিয়েছে কি দেয়নি—জেমস বিষয়টি গ্রহণ করলেন, তার সরলতার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে। তিনি জানেন যে, তিনি কাউকে হুমকি প্রদান করেননি এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, খায়রুন্নিসা ও তাকে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বকর আলী খান তার স্ত্রী ও কন্যার মিলিত প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি আদৌ

BanglaBook.org

অজ্ঞ নন। অতএব তার ধারণা হলো, বকর আলীর মনে অন্য কিছু আছে এবং সন্দেহ করলেন, শুস্তারি বংশের লোকদের ক্ষমতার কাছাকাছি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এবং মীর আলমের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যেও পরিচালিত হয়ে থাকতে পারে।

মীর আলম হায়দারাবাদ থেকে ত্রিশ মাইল উত্তর দিকে অবস্থান করছিলেন এবং নির্বাসিত হওয়া ও বেরারে প্রেরিত হওয়ার পূর্ববর্তী আনুকূল্য ফিরে পাওয়ার শেষ বেপরোয়া চেষ্টা করছিলেন। এমনকি তিনি জেমসকেও লিখেছেন তার আগের অভিযোগ পুষিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে যে, 'বকর আলী খানের পরিবারকে জড়িয়ে যেসব কথা ছিল সেগুলো আমার মন থেকে পুরোপুরি মুছে গেছে সেসব যে মিথ্যা তা প্রমাণিত হওয়ার পর। পানির ওপরিভাগে বৃষ্টির ফোঁটার অস্তিত্বে যতক্ষণ থাকে দুই বন্ধুর মধ্যে বিদ্বেষ তার চাইতে অধিক স্থায়ী হতে পারে না।' মীর আলম নিজামকে লিখলেন যে, তিনি গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছেন এবং নিজামের করুণা প্রার্থনা করেছেন। যদিও আবুদল লতিফ শুস্তারি ব্যক্তিগতভাবে জেমসকে বলেছেন, এগুলো আসলে অন্যকিছুর চাইতে একটি ভান ছিল মাত্র। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মীর আলমের মতো একজন লোক, যিনি পঞ্চান্ন জন উপ-পত্নী নিয়ে সফর করেন এবং প্রতিদিন বা প্রতি রাতে কোনো একজনের সাথে মিলিত হন, তিনি কিছুতেই মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে পারেন না। যদিও জেমস আবদুল লতিফকে শুরু থেকেই পছন্দ করতে শরু করেছিলেন, এমনকি বিশ্বাসও করছিলেন: তিনি বকর আলী খানের উদ্দেশে সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠলেন।

অতএব, পরদিন ৩০ ডিসেম্বর সকালে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্নেল বাউসার, ডাক্তার কেনেডি এবং বাউসারের ফারসি দোভাষী ক্যাপ্টেন ওর রেসিডেন্সির উদ্যানে পৌঁছার পর জেমস কার্কপ্যাট্রিককে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তাদের সন্দেহ হলো যে, জেমস কোনো রকম সমঝোতয় উপনীত হওয়ার মেজাজে নেই। যেসব সৈনিক বকর আলী খানের কাছে গিয়েছিলেন তারা জানাল, তারা সেনা শিবির থেকে সাত মাইল এলাকা পর্যন্ত গিয়েছিল বকর আলীর খোঁজে এবং তাদের নিশ্চিত ধারণা, দুই পক্ষের মধ্যে গুরুত্বর কোনো ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তু জেমসের দৃঢ় বিশ্বাস বকর আলী কাহিনির পেছনে আরও কোনো বিষয় কাজ করছে। তিনি বাউসারকে বললেন যে, 'তিনি বিশ্বাস করেন, বকর আলী খান ঘটনার ছলনাপূর্ণ ব্যাখ্যার আরও কিছু অশুভ উদ্দেশ্য আছে। উজিরের পরিবারের পক্ষ থেকে হুমকি আসছে বলে বকর আলীর খানের অভিযোগ কখনোই পাঠানো হয়নি বলে তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করেন (কারণ উজির এ বিষয়ে জানার পর অত্যন্ত বিস্ময় ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।) এবং তিনি আরও নিশ্চিত যে, খানের পরিবার কোনো কারলেই মানসিক যাতনার মধ্যে নেই।

BanglaBook.org

জেমসের এই অভিমতের কারণ তিনি ইতোমধ্যে খানের পরিবারের মহিলাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন, যারা তাকে অহরহ জ্বালাতন করেছে। এদিক থেকে তাকে ভালোভাবে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, এ ধরনের কোনো যাতনা বা ক্লেশ তাদের মাঝে নেই এবং এসব প্রমাণের প্রেক্ষিতে তিনি মনে করেন, মহিলাদের কাহিনি, বিলাপ, কাফন পরিধান ইত্যাদি নিছক তাদের ভান ছাড়া কিছু নয়। রেসিডেন্টের কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি তার ধারণাকে আমাদের কাছে প্রমাণও করতে সক্ষম। উত্থাপিত অভিযোগ বানোয়াট, বিকৃত ও অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সবকিছুর জন্যে বকর আলী খানই দায়ী।

এর কিছুক্ষণ পরই বকর আলী খান রেসিডেন্সির বাগানে পৌঁছেন। তিনি তার ঘোড়া থেকে নেমে রেসিডেন্সিতে প্রবেশের পূর্বেই জেমস অত্যন্ত রেগে তার মুখোমুখি হলেন এবং জানতে চাইলেন যে, তিনি কীভাবে তার নাম এসবের মধ্যে জড়ালেন এবং তার উত্থাপিত অভিযোগের প্রমাণ পেশ করতে বললেন। খান নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন যে, তিনি যেসব হুমকিপত্রের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন সেগুলো বাস্তবিক পক্ষেই উজিরের পরিবার থেকে প্রেরিত এবং সঙ্গে আরও যোগ করলেন, 'আপনি যদি এসবের মধ্যে জড়িত নাই থাকবেন তাহলে তারা কী করে এসব পাঠাল?' অতঃপর মুনশি আজিজ উল্লাহকে তলব করা হলো এবং আরিস্তু জাহের বাড়িতে আগের দিন যা ঘটেছিল তিনি তা বর্ণনা করলেন। ফারন্দাজ বেগম ও তার পরিচারিকাদ্বয় বকর আলী খানের বাড়িতে কোনো হুমকি পাঠানোর বিষয় কীভাবে অস্বীকার করেছে তাও পেশ করলেন আজিজ উল্লাহ। এতে বিভ্রান্তি আরও বাড়ল। রাউসার পরবর্তীতে এই বৈঠকের ব্যাপারে তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন—

> "খান তার বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, তার পরিবারের দুর্দশার জন্য তারাই দায়ী...কিন্তু এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভের মতো কিছুই পাওয়া যায়নি এবং প্রতিটি পক্ষ ধরে নিয়েছিল যে, অপরের পক্ষই দায়ী। অতএব আমরা বের করতে চেষ্টা করেছি যে, খানের পরিবারে দুর্দশা নেমে আসার কারণ কি, খানের ভাষ্য অনুসারে তার পরিবার আসলেই শোকবস্ত্র ধারণ করেছিল কিনা, তারা তাদের পারিবারিক সমস্যার প্রকাশ্য রূপ দিতে চেয়েছিল কিনা?"

তারা একটি বিষয়ের ওপর তাদের যুক্তি প্রদর্শনের সময় দরজায় টোকা পড়ার পর একজন লোককে দেখা গেল। তাকে দেখে রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, শরফ-উন-নিসার কাছ থেকে নিশ্চয়ই কোনো খবর এসেছে। তিনি তখনই বের হয়ে যান এবং ফিরে আসার পর বলেন যে, তিনি এইমাত্র একটি খবর পেয়েছেন, যা বকর আলী খানের কাহিনির চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ অবস্থায় তিন ব্রিটিশ সেনা অফিসার মতৈক্যে পৌঁছেন যে, এই রহস্যের একটি মাত্র সমাধান আছে : শরফ-উন-নিসার অন্তঃপুরে তাদের পক্ষ থেকে কাউকে পাঠাতে হবে তাকে প্রশ্ন করে এ ব্যাপারে তার বক্তব্য জানার জন্যে।

প্রশ্ন উঠল কে যাবে বা কাকে পাঠানো হবে? বকর আলী খান প্রস্তাব করলেন, ডাক্তারের উপযুক্ত স্ত্রী মিসেস ওরে যেতে পারেন, যেহেতু তিনি হিন্দুস্থানি জানেন, অতএব মহিলাদের বক্তব্য কী তা তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে আপত্তি করলেন কর্নেল বাউসার। তিনি বললেন, একজন ইউরোপীয় মহিলার পক্ষে সামলানোর চাইতেও জটিল বিষয় এটি। বকর আলীর সাথে তিনজন সৈনিককে পাঠানোর প্রস্তাব উঠলে তাতেও আপত্তি উঠল, বিষয়টি মানুষের চোখে পড়বে এবং জেমসও যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, খানের উপস্থিতিতে মহিলারা সব কথা খুলে নাও বলতে পারেন অথবা তারা তাই বলবেন, যা খান তাদের দ্বারা বলাতে চাইবেন। কিন্তু খান আপত্তি করলেন যে, তিনি সঙ্গে না থাকা অবস্থায় ক্যাপ্টেন ওর বা ডাক্তার কেনেডি অন্তঃপুরে যেতে পারবেন না। কেনেডিও আপত্তি করলেন খান তার সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি যেতে পারেন না বলে।

এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে তারা সকলে সদ্য আগত বার্তা আনয়ণকারীকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করলেন। কিন্তু সে বার্তা দিয়েই চলে গেছে। একটি ছেলেকে পাঠানো হলো তাকে ডেকে আনার জন্যে। অপেক্ষার সময়ে তারা রেসিডেন্সির ডাইনিং হলে খেতে গেলেন। সেখানে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া জরুরি সেগুলোর ব্যাপারে তাগিদ অনুভব করলেন। প্রস্তাব করা হলো যে, ডাক্তার কেনেডি একজন চিকিৎসক হিসেবে এ বিষয়গুলো নিয়ে খুব উত্তেজিত হবেন না অথবা তিনি ততটা আগ্রহীও নন। তিনি একা শরফ-উন-নিসার সাথে সাক্ষাৎ করে হুমকি ও শোকবস্ত্রের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করবেন।

এটাই গ্রহণযোগ্য সমাধান বলে বিবেচিত হলো। অন্য কোনো বিবেচনার চাইতে শরফ-উন-নিসার বাড়িতে কেনেডি আগেও গেছেন তা গরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হলো। এক বছর আগে খায়রুন্নিসা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তার আতঙ্কিত মা বকর আলী খানকে পীড়াপীড়ি করেন একজন ইংরেজ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করতে। কেনেডি খানের অন্তঃপুরে গিয়ে খায়রুন্নিসাকে দেখেন এবং তার চিকিৎসার তিনি আরোগ্য লাভ করেন। বকর আলী খান অবশেষে ডাক্তার কেনেডিকে তার বাড়ির মহিলাদের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সম্মতি দেন। আরিস্তু জাহের কাছে অনুমতি চাওয়া হয় শহুরে ডাক্তারের প্রবেশের জন্যে। তারা যখন আরিস্তু জাহকে লিখছিলেন, তখন রেসিডেন্ট বারান্দায় যান। ডাক্তার কেনেডি বকর আলী খানকে একান্তে প্রশ্ন করেন যে, তার পরিবার যে তাকে সত্য কথা বলতে দ্বিধা করবে না এ ব্যাপারে তিনি কী পদক্ষেপ নিয়েছেন। খান বলেন যে, তিনি তার স্ত্রী ও কন্যাকে ব্যাপারটি বলেছেন এবং তাদের সব কথা খুলে বলতে বলেছেন। একই সাথে তাদেরকে বলেছেন যে, তারা যদি রেসিডেন্টের প্রতি দুর্বলও থাকে তারপরও তিনি তার নাতনিকে জেমসের সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হবেন না।

তারা সে কথাই বলবে। বাদবাকি ব্যাপার তিনি তাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে পারিবারিক অমর্যাদার দায়দায়িত্ব তাদের এবং তিনি যে পরিস্থিতিতে তাদের ত্যাগ করে নিজ দেশে চলে যাবেন অথবা ভিক্ষুকে পরিণত হবেন। মহিলারা ঘোষণা করেছে যে, তাদের এ ধরনের কোনো দুর্বলতা নেই, তারা তার সাথে ভাগ্য বরণ করে ভিক্ষুকে পরিণত হতে রাজি। এরপর তিনি আমাদের জানান, তার এই প্রস্তাব কঠিন এবং সাধারণভাবে কোনো পুরুষ এ ধরনের পরস্থিতিতে এত কঠোর সিদ্ধান্ত নেয় না।

এই পর্যায়ে আমাদের জানানো হলো যে, বেগমের দূত ফিরে এসেছে এবং পেছনের বাংলোতে অপেক্ষা করছে। আমরা সেখানে গেলাম। কেনেডি তাকে চিনতে পারলেন, বৃদ্ধ খানের পুরনো ভৃত্য। তার আনা খবরের বিষয়বস্তু ছিল, 'শরফ-উন-নিসা রেসিডেন্টকে জানাতে চেয়েছেন যে খান পরিবারে একটি গোলযোগ সৃষ্টির মতলব করছেন এবং সন্দেহ নেই যে, তিনি রেসিডেন্সিতে গেছেন আরও একটি অলস কাহিনি ফাঁদার জন্যে এবং তিনি আশা করছেন, রেসিডেন্ট তাকে শান্ত করতে সক্ষম হবেন।'

বকর আলী খান এ কথা শুনে রাগান্বিত এবং বিস্মিত হয়েও তার অভিমত ব্যক্ত করলেন যে ,উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান একটাই, তা হলো কেনেডি তার বাড়ি গিয়ে শরফ-উন-নিসাকে প্রশ্ন করবে। আরিস্তু জাহের পক্ষ থেকে পুরনো শহরে কেনেডির প্রবেশের অনুমতিপত্র আসার পর তিনি সেখানে গেলেন একটি পালকিতে চড়ে। সিদ্ধান্ত অনুসারে যাতে তার যাওয়ায় বিষয় গোপন থাকে সেজন্যে পালকিতে চারদিক থেকে ঢাকা ছিল। বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না ভেতর থেকেও কেনেডি বাইরের কিছু দেখতে পাবেন না। তিনি একা থাকলেও তাকে যে অনুসরণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি ধারনা করতে পারেননি। একজন দ্বারা নয়, দুজন তাকে অনুসরণ করছিল ছায়ার মতো। কিন্তু এই দুজনও একে অন্যের সম্পর্কে জানত না।

ডিসেম্বরে হাতির পিঠে বা ঘোড়ায় উঠে মুন্সি নদীর যে স্থান দিয়ে অতিক্রম করা যেত তা রেসিডেন্সির ঠিক নিচেই। কিন্তু একদল পালকি বাহক সম্ভবত তাদের পা না ভিজিয়ে নদী অতিক্রমে অধিক আগ্রহী ছিল, যারা নদী অতিক্রম করত আরও একই মাইল উজানে একটি পুরনো, নিচু কুতুব শাহী সেতু দিয়ে। এদিক দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তাদেরকে নদী তীর দিয়ে স্থাপিত মোগল জলাধার, শহরের ভিড়পূর্ণ ঘাট-যেখানে সারাক্ষণ অসংখ্য লোকজন গোসল করছে, কাপড় কাচছে অথবা বালিতে গর্ত খুঁড়ে পানি সংগ্রহ করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মাহুতরা বালি দিয়ে ঘষে হাতি পরিষ্কার করছে এবং দৃশ্যত সকলেই বেশ আনন্দ উপভোগ করছে। সেদিক দিয়ে কেনেডি এবং তার পালকি বাহকরা বিখ্যাত বানজারা গেট দিয়ে শহরে প্রবেশ করল।

BanglaBook.org

যদিও রেসিডেন্সির কর্মচারীরা নিয়মিতই পুরনো শহরে বেড়াতে যায়, তারা সাধারণত প্রধান সড়ক ছেড়ে ভেতরে প্রবেশ করে না। তারা স্বল্প সময়ের জন্য দরবারে যায়, মণি রত্নের বাজারে যায় অথবা নতুন আগত দর্শনার্থীদের নিয়ে যায় চারমিনার ও মক্কা মসজিদে। ফলে পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষক, যারা শহরের অতি ভেতরে প্রবেশ করেছেন, তারা দূর থেকে শহরের সমৃদ্ধি দেখে এবং সরু গলিগুলোর দুপাশে নোংরা জঞ্জাল প্রত্যক্ষ করে হতবাক হয়েছেন। হায়দারাবাদের একজন রেসিডেন্ট বর্ণনা করেছেন, বানজারা পাহাড়ের ওপর থেকে রেসিডেন্সির উত্তর দিক দিয়ে শহরের ওপর কারো দৃষ্টি পড়লে তা অপূর্ব এবং বিস্মৃত হওয়ার মতো নয়। কারণ এটি "দাক্ষিণাত্যের প্রথম শহর...আমার সামনে উপত্যকার ওপর সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা রঙের বারান্দা শোভিত বাড়িগুলো সূর্যের আলোতে চকচক করছে, যা দূর থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে বৃক্ষে পূর্ণ বনের মতো। চারমিনার ও মক্কা মসজিদ অট্টালিকা সারির মধ্য থেকে গর্বিত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সেখানে শ্বেত গম্বুজ ও তার ওপর উজ্জ্বল রঙের স্ট্রাইপ, যেগুলো কোনো পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের সৌধের প্রতীক। আবার ছোট ছোট কিছু মসজিদ; আমাকে বলতেই হবে যে সেগুলো সংখ্যায় শত শত, ওপর দিকে উঠে যাওয়া সরু মিনার দেখেই সহজে বুঝা যায়।

...শহরটি মনে হয় বিশাল। কিন্তু গাছের সংখ্যা দেখে মনে হয় যে শহরে অসংখ্য উদ্যান এবং পরে শহরে প্রবেশ করে বিস্মিত হয়েছি, রাস্তার দুপাশ বাড়িঘরে পরিপূর্ণ এবং শহর ঘনবসতিপূর্ণ...কিন্তু সব মিলিয়ে শহরটি মনোরম—সকালের সতেজ পরিবেশ, নির্মল বায়ু এবং শহর ও অট্টালিকা সারির ওপর সকালের সূর্যের প্রতিফলন এত অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে যা স্মৃতি থেকে কখনো মুছে যাওয়ার মতো নয়।"

কোনো পর্যটক ফটক অতিক্রমের পর প্রধান রাস্তা ধর যাওয়ার সময় তার মধ্যে এক ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয়, যা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "বর্ষার পর বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে, রাস্তাগুলো সরু ও নোংরা এবং শহরের অভ্যন্তরভাগ নিঃসন্দেহে দূর দেখে শহরটি দেখে কারো মধ্যে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখনও হাতির সংখ্যা দেখে শহরের সমৃদ্ধি আঁচ করা যেতে পারে, তাছাড় ওমরাহদের ছাউনি, যেখানে তারা উপস্থিত হয় তাদের সশস্ত্র প্রহরীসহ। সুবেশী লোকজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে—আমরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদের প্রহরীরা প্রথম পরিষ্কার করে দিচ্ছিল... ।"

বকর আলী খানের বাড়ি ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল তা জানা যায় না। কিন্তু সব বিবরণ থেকে মনে হয়, সম্ভবত ইরানি গলিতে তার জ্ঞাতি ভাই মীর আলম ও অন্যান্য পারস্যবাসীর বাড়ির পাশেই ছিল। ইরানি গলি চারমিনার থেকে আধ মাইল দূরে বোরখা বাজারের পেছনের গলিতে, যেখানে

হায়দারাবাদের মহিলারা কাপড় ও চুড়ি কিনতে আসে। তখনকার দিনের অভিজাতদের বাড়িগুলো ছিল বিশাল আকৃতির। সে সব বাড়িতে প্রবেশ করতে হলে দুটি বিরাট গেট অতিক্রম করতে হবে, যা নকরখানা হিসেবে পরিচিত, যার দোতলা থেকে সুরশিল্পীরা তাদের ঢাক এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রে আওয়াজ তোলে বিশিষ্ট কোনো অতিথির আগমনে। এটি অতিক্রমের পর এক একটি ফোয়ারা শোভিত চত্বর এবং চত্বর ঘিরে ছোট 'চারবাগ' বা উদ্যান। উদ্যান পেরিয়ে যাওয়ার পর নিচু ও উন্মুক্ত বরাদরি বা প্যাভিলিয়ন, যার প্রতিটি অলংকৃত খিলানওয়ালা এবং এর সাথেই যুক্ত কয়েকটি মোগল ধাঁচের দ্বিতল ভবন, যেগুলোর জানালা ও ব্যালকনি কাঠের সুন্দর কারুকার্যখচিত।

মহিলাদের চত্বর সাধারণত পৃথক বেষ্টনীর মধ্যে, সম্পূর্ণ মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত। বকর আলী খানের জেনানা মহল বা অন্তঃপুর দুটি পৃথক ভবন সমৃদ্ধ। একটি ভবন শরফ-উন-নিসা ও তার কন্যার জন্যে, আরেকটি দুরদানা বেগমের জন্যে। সেখানে প্রবেশের ফটক পৃথক এবং সে যুগে হায়দারাবাদে মহিলাদের অংশের প্রবেশদ্বারে সশস্ত্র মহিলা প্রহরী নিয়োজিত থাকত। একজন ঊর্ধ্বতন ব্রিটিশ অফিসারের বর্ণনা অনুসারে 'নিম্নবর্ণের মহিলাদের প্রহরার কাজে নিয়োগ করা হত, যারা আমাদের সিপাহীদের মতো সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল। কিন্তু তাদেরকে দেখতে হাস্যকর লাগত।'

উল্লিখিত চত্বর ও প্রহরীদের পেরিয়ে ডাক্তার কেনেডি পাল্কি থেকে নেমে শরফ-উন-নিসার সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করেন: এ ধরনের সাক্ষাতের নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত। একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যের উপস্থিতিতে দর্শনার্থী চিকের আড়াল থেকে কথা বলবেন। এমনকি চিকিৎসার জন্য রোগিনীকে দেখার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম পালিত হত, মুখোমুখি সাক্ষাৎ অনুমোদনযোগ্য নয়, যদিও ব্যতিক্রমী ধরনের জরুরি ক্ষেত্রে ডাক্তার রোগিনীর নাড়ি অনুভব করতে পারে চিকের আড়ালে বসে প্রসারিত হাত ধরে।

এক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। শরফ-উন-নিসা যখন উপস্থিত হলেন, তার সাথে ছিল এক পরিচারিকা। তিনি আলোচনার জন্য বাঁশের চিকের আড়ালে বসেন। ডাক্তার কেনেডির বর্ণনা অনুসারে, তিনি তার বক্তব্য শুরু করেন। নিজেকে তার পিতার একজন বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়ে এবং সন্দেহপূর্ণ কিছু বিষয়ের সত্যতা যাচাই করতে তার কাছে এসেছেন, যা অত্যন্ত জরুরি। তিনি তখন জানতে চান যে, বিষয়গুলো কী এবং তাকে যাতে সত্য বলা হয়।

শরফ-উন-নিসার মহলের বারান্দায় বসে ডাক্তার কেনেডি সকালে রেসিডেন্সিতে তারা যে সব অভিযোগ ও সন্দেহের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন তা তাকে বললেন। কীভাবে তার পিতা দাবি করেছেন যে, ফারজান্দ বেগম ও তার পরিবার কার্কপ্যাট্রিকের সাথে খায়রুন্নিসাকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে চাপ প্রয়োগ করছে এবং তার পিতা সন্দেহ করছেন যে, রেসিডেন্ট স্বয়ং

BanglaBook.org

এসব খবর ও হুমকি দেয়ার সঙ্গে জড়িত। কেনেডি তার বক্তব্য শেষ করে চিকের আড়ালে ছায়ার মতো অবয়বের কাছে জানতে চান এ সম্পর্কে তার বক্তব্য কী। কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। এরপর অন্য সব বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি যা বলছিলেন তাতে সবকিছু বদলে যাচ্ছিল। কারণ শরফ-উন-নিসা নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে এনেছিলেন বিষয়টি খোলাসা করার জন্যে এবং খোলামেলা স্বীকার করলেন যে, 'এ ধরনের কোনো হুমকিই তার কাছে আসেনি। সফর মাসের (দু'মাস আগে) পর থেকে উজিরের পরিবারের সাথে এ প্রসঙ্গে কোনো যোগাযোগই হয়নি তাদের, যে সময়ে অথবা তার আগে ফারজান্দ বেগম তাকে ডেকে পাঠান এবং এ বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু শরফ-উন-নিসা তার সম্মতি দানে অস্বীকৃতি জানান এবং তার কন্যাকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে বলবেন না বলে জানিয়ে দেন।'

ডাক্তার কেনেডি অতঃপর তাকে বলেন যে, বকর আলী খান বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, অতি সম্প্রতি একটির পর একটি হুমকি এসেছে এবং বিষয়টি বিস্মিত হওয়ার মতো মনে হচ্ছে যে, কোনো ধরনের হুমকি না দেয়া সত্ত্বেও কী পরিমাণে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু শরফ-উন-নিসা তার বক্তব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দৃঢ়তার সাতে জানান যে, তিনি স্বয়ং আকিল-উদ-দৌলাহর (বকর আলী খান) কাছে এই হুমকির কথা বলেছেন এবং তার এ কাজ করার পিছনে সুনির্দিষ্ট একটি কারণ আছে।' তার উদ্দেশ কী ছিল আমি জানতে চাই, কারণ তার পিতা বিষয়টি নিয়ে খুবই বিচলিত এবং একথাও বলেছেন, 'তার স্ত্রী ও কন্যা দুজনও একইভাবে বিপর্যস্ত।' এরপর শরফ-উন-নিসা বলতে থাকেন যে, 'হাশমত জং (কার্কপ্যাট্রিক) ও তার কন্যার মধ্যে কী ঘটেছে। বিশ্বের দৃষ্টিতে তার কন্যার চরিত্র কলংকিত হয়ে গেছে। কিন্তু কী ঘটছে তা যেহেতু প্রকাশযোগ্য নয়, এবং একটি পাপকর্ম ঘটেছে, সেজন্যে তিনি অন্য কারো সাথে তার বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন না। অতএব তিনি তার কন্যাকে হাশমত জং-এর হাতেই দিতে চান এবং এই উদ্দেশেই হুমকির কথা সাজানো হয়েছে।'

কেনেডি এরপর পরিবারের মহিলাদের ভিক্ষুকের বস্ত্র পরিধানের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চান, এটা সত্য কিনা, আর সত্য হলে কারণ কী? শরফ-উন-নিসা উত্তর দেন, হুমকিপত্র নিয়ে ব্যাপক ও উচ্চকণ্ঠে আলোচনা হয়েছিল, কারণ তার পিতা বিরক্ত ছিলেন এবং তার প্রতি এ মনোভাব ব্যক্ত করতেন যে, তিনি কখনো তরবারি বের করবেন তাকে হত্যা করার জন্যে। শুধুমাত্র তার মা এ পরিস্থিতি থেকে তাকে রক্ষা করেছে তার ক্রোধ দমন করে। এমনকি নিজামের সানে উপস্থিত হয়ে তিনি তাকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে তিনি ও তার মা তার পরিচারিকাকে নির্দেশ দেন কাফনের কাপড় আনার জন্যে। কাফন আসার পর মহিলারা পরিস্থিতির

ভয়াবহতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এগুলো পরিধান করেন এবং বিলাপ করতে থাকেন যে, তিনি জগৎ সংসার ছেড়ে ভিক্ষুকে পরিণত হতে চান। তার পিতা তাকে হত্যা করতে পারে আশঙ্কা করেই তিনি কাফন পরিধান করেছিলেন, যাতে তার পিতা তাকে হত্যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তার উত্তেজনা প্রশমন করেন। এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না বলে শরফ-উন-নিসা তার অভিমত জানান। তিনি কেনেডিকে একথাও জানান যে, তিনি এখন আর ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করে নেই। কেনেডি লিখেছেন, "শরফ-উন-নিসা দৃঢ়তার সাথে হাশামত জং-এর পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ ও নিপীড়নের কথা অথবা কোনো চাপ সৃষ্টির কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। এমন কোনো চাপ ছিল না অথবা তিনি তা বলেনও নি। তিনি জানেন যে, এক বছরের মধ্যে তিনি তার কন্যাকে হাশমত জং-এর কাছে যেতে দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু গত পাঁচ-ছয় দিনে তার মতামত পরিবর্তন করেছেন এবং হাশমত জংকে পেতে চাইছেন এবং 'আমিও চাই, হাশমত জং তার হোক।' তিনি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেন। 'হযরত মুসা, হযরত ইসা ও হযরত মুহাম্মদ যেভাবে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছেন, সেভাবে হাশমত জং তাকে পেতে পারেন' শরফ-উন-নিসা বলেন।

আমার উপলব্ধি হলো যে, ব্যাপারটি যেহেতু এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং প্রকাশ্যে জানাজানি হয়ে গেছে, তার মধ্যে বকর আলী খান এসবের কিছু জানেন না, এটাই অদ্ভুত মনে হয়। যদি তিনি জানেন, তাহলে বুঝতে পারা আরও কঠিন যে, তিনি বিষয়টি নিয়ে এখন এতটা বিপর্যস্ত কেন। এ প্রশ্নে শরফ-উন-নিসা উত্তর দেন যে, এটা তার ও তার মায়ের ভুলের কারণে ঘটেছে এবং তারা মনে করছেন সবকিছু তাদের মধ্যেই থাকা উচিত। আমি জানতে চাই, তাকে পুরো অন্ধকারে রেখে আরও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এবং অবিলম্বে তাকে প্রকৃত ঘটনা জানানো উচিত। তিনি বলেন, তার বিশ্বাস এতে ভালো ফল হত, কিন্তু তার পিতা পরিবারের মর্যাদার ব্যাপারে এত অন্ধ যে, প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছে তা তাকে জানাতে তারা ভীত। তিনি চান যে, তার কোনো ইংরেজ বন্ধুই ব্যাপারটি তার কাছে প্রকাশ করুক। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের পক্ষ থেকে তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তার ও তার মায়ের পক্ষ থেকে যে ভুলই হয়েছে তাতে তার সুনামের কোনো হানি হবে না। কারণ তিনি সবসময় এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নির্দোষ ছিলেন। তিনি আরও মনে করেন কন্যার বিয়ের ব্যাপারে তার বক্তব্যই অধিক প্রাধান পাবে, কারণ সে বকর আলী খানের নাতনি মাত্র।"

ডাক্তার কেনেডি চিকের ওপারের অবয়বকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সালাম জানিয়ে পেছনের দিকে পা ফেলতেই সেখানে বকর আলী খানের বালক ভৃত্যকে দেখতে পান, যাকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। সে ভেতরে এসে আমাদের সব কথা শুনেছে, কেনেডি স্মরণ করেন। তাদের মধ্যেকার কথা

BanglaBook.org

বকর আলী খানের কানে পৌঁছামাত্র মহলে বেগমের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়বে—এই উদ্বেগ নিয়ে কেনেডি সোজা পালকিতে গিয়ে বসেন এবং পালকি রাস্তায় চলে আসে। তিনি লিখেছেন, "যখন অনাকাঙ্ক্ষিত ধরনের আলোচনা হয়েছে আমাদের মধ্যে, আমি ভাবতে শুরু করেছি, আমার হয়তো এগুলো অবশ্বাস করা উচিত এবং সবচেয়ে উত্তম হত যদি চিকের আড়ালে আমার সাথে যিনি কথা বলেছেন তার সম্পর্কে সকল অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব হত। আমি ফিরে এসে একই স্থানে প্রবেশ করলাম এবং মহিলাকে অবহিত করলাম, যেহেতু বকর আলী খান এতটা অন্ধকারে আছেন, অতএব তিনি নিশ্চয়ই আমি যা জেনেছি তা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমি অত্যন্ত নিশ্চিত যে, আমি বকর আলী খানের কন্যার সাথেই কথা বলছি, তাহলে আমি তাকে বলতে পারি যে আমি যার সাথে কথা বলেছি তিনি তার কন্যা, সেজন্যে আমি চাই, তিনি তার একট আংটি অথবা অন্য কোনো নিদর্শন আমাকে প্রদান করুন যা বকর আলী খান তার কন্যার বলে শনাক্ত করতে পারবেন। তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন। তখন আমি প্রস্তাব করলাম, তাহলে তার কাছে আমার কিছু রেখে যাওয়ার অনুমতি দিতে যাতে তিনি তার পিতাকে দেখাতে পারেন, যাতে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, তার কন্যা এটি আমার কাছ থেকেই পেয়েছে...।

এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন এবং আমি আমার ঘড়ির চেন থেকে একটি চিহ্ন খুলে দিলাম ,যাতে ফারসি অক্ষর উৎকীর্ণ ছিল, যা তিনি তার পিতাকে প্রদর্শন করতে পারবেন।"

এবারও পেছনে ঘুরতেই কেনেডি বকর খানের নাছোড়বান্দা বালক ভৃত্যকে ছাড়াও দেখতে পেলেন যে, রেসিডেন্টের এক ভৃত্য তার আলোচনা শুনতে পেয়েছে, যে তার পালকি প্রবেশের সময়েই কৌশলে বকর আলী খানের অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছিল। কেনেডি লিখেছেন, 'এই আড়িপাতা দুজনই তাদের মধ্যেকার আলোচনার সবকিছু শুনে ফেলেছিল।'

বকর আলী খানের জন্যে দিক থেকে এটি ভয়াবহ আবিষ্কার, সম্পূর্ণ বিপর্যয়কর, অপমানের চূড়ান্ত। পরিবারের মহিলাদের দ্বারা তিনি পুরোপুরি পরাজিত ও বিপর্যস্ত। তারা বিষয়টি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে এবং তারা যে শুধু তার চাপিয়ে দেওয়া বিয়ের একটি সম্পর্কের বিরোধিতা করতে সফল হয়েছে তাই নয়, তার নাতনি সুস্পষ্টভাবে তার অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছে, তারা ভিক্ষুকে পরিণত হতে যাচ্ছে বলে তাকে বোকা বানিয়েছে এবং তার ক্ষোভ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সফল হয়েছে। নিজেদের পক্ষ থেকেই হুমকি পাঠিয়ে সেগুলো জেমসের কাছ থেকে প্রেরিত এবং প্রধান উজিরের জেনানার পরিচারিকাদের তার বাড়িতে কল্পিত হুমকিপত্র নিয়ে আসার কাহিনি তৈরি করে মহিলারা ধারণা করেছে যে, বকর আলী চুপসে যাবে এবং খায়রুন্নিসাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে জেমসের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু সে পরিকল্পনা ভ্রান্ত প্রমাণিত

BanglaBook.org

হয়েছে। বরং বকর আলী ব্রিটিশ অতিরিক্ত বাহিনীতে তার বন্ধুদের কাছে নিয়ে গেছেন অভিযোগ। যদিও মহিলাদের বিভিন্ন কৌশল প্রকাশ পেয়ে গেছে। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত একটি পথের সন্ধান পেয়েছে।

দু'দিন পর ১৮০১ সালের ১ জানুয়ারি সকালে শরফ-উন-নিসা এবং তার মা দুরদানা বেগমকে আরিস্তু জাহের প্রাসাদে তলব করা হলো। তারা ডাক্তার কেনেডিকে যা বলেছেন তার সত্যতা জানতে চাওয়া হলো। তারা স্বীকার করলেন এবং তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হলো যে, বকর আলী যদি তাদের ওপর তরবারির আঘাতও হানতে চেয়ে থাকে এবং তারা যদি জীবন রক্ষার্থে এসব কাহিনি তৈরি করে থাকে, তবু তারা যে কাজ করেছে তা অত্যন্ত অমর্যাদাকর। কিন্তু উজিরের প্রকৃত রোষ ছিল বকর আলীর জন্যে সংরক্ষিত । তিনি জেমসের মুনশি আজিজ উল্লাহকে বলেন যে, বকর আলী খানকে ভুল খেতাব প্রদান করা হয়েছে—আকিল-উদ-দৌলাহর পরিবর্তে তার খেতাব দেওয়া উচিত আহমক-উদ-দৌলাহ'। এই বৃদ্ধকে নিঃশেষ করে দেওয়া উচিত অথবা কারারুদ্ধ করা উচিত। আজিজ উল্লাহ উত্তর দেন যে, বকর খানের প্রকাশ্য অপমান সম্ভবত কোনো শাস্তির চাইতেও অধিকতর হয়েছে।

সেদিনই বিকেল তিনটায় করুণ দর্শন বিব্রত বকর আলী রেসিডেন্সিতে এসে জেমসের সাথে সাক্ষাৎ করে হুমকি দেয়া সম্পর্কিত ভ্রান্ত অভিযোগের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন যে, তিনি আর কখনো জেমসের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। খায়রুন্নিসার চাচা মীর আসাদুল্লাহও তার সম্মতি দিলেন। আইনগত বাধা দূর করার লক্ষে বকর আলী খান তার নাতনিকে জেমসের সাথে বিয়ে দেওয়ার পথে সকল আপত্তি প্রত্যাহার করে নেবেন, যদি জেমস তখনো বিয়েতে রাজি থাকেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না। এ অনুষ্ঠানে সাক্ষী হিসেবে থাকার পরিবর্তে তিনি শহর থেকে দশ থেকে বারো মাইল দূরে গিয়ে অবস্থান করবেন, কিন্তু বাড়িতে তার সিলমোহর রেখে যাবেন, যাতে তারা তার নামে তাদের ইচ্ছা কার্যকর করতে পারে। এরপর তিনি একটি আচ্ছাদিত ডুলিতে বসে উত্তর দিকে চলে যান, যেখানে তার জ্ঞাতি ভাই মীর আলম তখনো অস্থায়ী শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন। জেমস পরে লিখেন, বৃদ্ধ লোকটিকে দোষারোপ করার চাইতে তিনি বরং করুণার পাত্র ছিলেন। কারণ তিনি বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। উপরন্তু তার দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষীণ এবং কানেও কম শুনতেন। অতএব মহিলারা খুব সহজে তার ওপর তাদের ছলনা খাটাতে সক্ষম হয়েছে।

খায়রুন্নিসা ও জেমস কার্কপ্যাট্রিকের মাঝখানে বাধা হিসেবে ছিলেন দুই ব্যক্তি—একজন কর্নেল ড্যালরিম্পেল, যিনি এখন মৃত এবং অন্যজন বকর আলী খান, যিনি তার সকল আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্তু তখনো

BanglaBook.org

জেমসের বিয়ের পথে আরও প্রতিবন্ধকতা ছিল। যদিও তিনি হায়দারাবাদি পোশাক পরিধান করতেন এবং হায়দারাবাদের সকল রীতি প্রথা অনুসরণ করতেন এবং সে কারণে সকলের মাঝে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মুসলিম হয়েছেন। কিন্তু তিনি বাস্তবে একজন খ্রিস্টানই ছিলেন। অতএব, ইসলামী শরিয়ত অনুসারে তিনি কোনো মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে পারেন না। এজন্যে তাকে খৎনা করাতে হবে এবং এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে।

পরবর্তী সময়ে রেসিডেন্সির মুনশি খায়রুন্নিসার পরিবারের সাথে আলোচনাক্রমে তৈরি রিপোর্ট উল্লেখ করেছেন, 'যেহেতু ইসলাম গ্রহণ না করে বিয়ে করা অসম্ভব ব্যাপার, অতএব তিনি বিয়ের সময়ে ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেন... হাশমত জং অতঃপর একজন শিয়া মুজতাহিদের সামনে উপস্থিত হয়ে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার পক্ষ থেকে খায়রুন্নিসার কাছে একটি সার্টিফিকেট পাঠান হলো এবং তিনি সেটি দিলেন তার মাকে।'

কার্কপ্যাট্রিক তার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার প্রসঙ্গে কখনোই স্বীকার করেননি তার লেখায়, অতএব আন্দাজ করা যথার্থই কঠিন যে এই গুরুতর একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার অনুভূতি কিরূপ ছিল। এটি কি শুধু সাধারণ ধর্মান্তর ছিল, শুধুমাত্র তার গর্ভবতী প্রেমিকার কাছে গমনের সুযোগ সৃষ্টির কারণে ছিল? অথবা মুসলিম সংস্কৃতিক ব্যাপারে তার পক্ষপাতিত্বের কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন? সময়ের এত ব্যবধানে এবং প্রয়োজনীয় সূত্রের অভাবে একথা বলা অসম্ভব ব্যাপার। যা নিশ্চিত বলা যায়, তা হচ্ছে, তার ইসলাম গ্রহণ যদি যথার্থই হয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, খায়রুন্নিসাই তাকে ইসলামে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, অন্য কিছুর অবদান ছিল সামান্য।

জেমস তার ধর্মান্তরের সার্টিফিকেট পেশ করার পর স্বীকৃত হলো যে, বিয়ের আয়োজন হতে পারে এবং বিয়ে অনুষ্ঠিত হলো একই শিয়া মুজতাহিদের মাধ্যমে। বিয়ের সকল রীতিপ্রথা পালিত হলো মুসলিম নিয়মে। শরফ-উন-নিসা অনেকদিন পর তার এক চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে অতি গোপনীয়তার মধ্যে এবং প্রকাশ্য বিয়ে হয়নি। কারণ, খায়রুন্নিসার গর্ভের শেষ দিক চলছিল তখন। শরফ-উন-নিসার মতে, 'কর্নেল জেমস কার্কপ্যাট্রিক নিজাম আলী খান ও আরিস্তু জাহ এর মাধ্যমে আমার কন্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। নিজাম ও আরিস্তু জাহ তাদের অনুরোধ পাঠান আমার পিতাকে, যিনি অনেক বিরক্তির পর শেষ পর্যন্ত সম্মতি দেন এবং বলেন যে, বিয়ে হতে পারবে। তিনি একথাও বলেন যে, আমাদের সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে বিয়ে হতে হবে।

এতে নিজামও সম্মতি প্রদান করেন এবং একই সাথে কর্নেল জেমস কার্কপ্যাট্রিককে নিজের পুত্রের মর্যাদা দিয়ে সম্মানে ভূষিত করেন। নিজাম এই ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন যে, বিয়েতে তিনি জেমসের পিতা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এবং আরিস্তু জাহ আমার কন্যার পিতার স্থান নেবেন...। কিন্তু গোলযোগপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাওয়ায় (বকর আলী খানের অভিযোগ ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ) বিয়ের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক পর্যায়ে হতে পারবে না, যদিও বিয়ে হবে মুসলিম রীতিতে। প্রমাণ হিসেবে মীর আহমদ আলী খান নামে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আরিস্তু জাহের পক্ষে থাকবেন এবং তার দুজন বিশ্বস্ত কর্মচারীও সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সাইয়িদ-উদ-দৌলাহ আমার প্রতিনিধি হিসেবে বিয়েতে থাকবেন সকলে আমার বাড়িতে উপস্থিত হলে এবং শুধুমাত্র বিয়ের অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হবে।'

ইসলামী আইনে বিয়ের অনুষ্ঠানে কনের জন্য মোহরানা নির্ধারণ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে সেই মোহরানা তাকে ফেরত দিতে হয়। খায়রুন্নিসার ক্ষেত্রে মোহরানার পরিমাণ স্পষ্টতই বিপুল অংকের ছিল। জেমস তার উইলেও তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পদের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, তার জন্য অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গির এবং অন্যান্য সম্পত্তি দেওয়া হয়েছে। এগুলো সবই তার ব্যক্তিগত অলংকারের অতিরিক্ত, যার পরিমাণ অর্ধ লক্ষ রুপির কম নয়, যা বর্তমান মূল্যে তিন লক্ষ পাউন্ডের সমপরিমাণ। খায়রুন্নিসার জায়গির সম্ভবত আরিস্তু জাহের পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপহার, কারণ তিনি তার মৃত পিতার স্থলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতএব সব মিলিয়ে জেমস যে শুধু সুখী মানুষ হলেন তাই নয়, একজন ধনবান ব্যক্তিতেও পরিণত হলেন।

শরফ-উন-নিসার বিবরণ অনুসারেও যদি এই বিয়েকে বিবেচনা করা হয় তাহলে অন্তত নিজাম ও আরিস্তু জাহের দৃষ্টিতে এটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিয়ে এবং বিয়ে সম্পন্ন করার ঐতিহ্যগত রাজকীয় পদ্ধতির একটি ব্যতিক্রম : প্রথমে একটি চুক্তি স্বাক্ষর, অতঃপর দুই পক্ষের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করে বৈবাহিক সম্পর্কের অনুমোদন প্রদান। খায়রুন্নিসা অবশ্যই আসফিয়া বংশের শাহজাদি ছিলেন না, কিন্তু বিয়ের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে তিনি উজিরের দত্তক কন্যায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন, আর জেমস হলেন নিজামের দত্তক পুত্র। এভাবে বিয়ের সম্পর্কে স্থাপনের মাধ্যমে ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে নিজামের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে আরিস্তু জাহ বিশ্বাস করতেন। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এ ধরনের কার্যকর একটি বিয়ের সম্পর্ক নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে বকর আলীর উদ্যোগের কারণে নিজাম ও আরিস্তু জাহ দুজনেই তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

এই বিয়ের ফলে দুজন লোকের পক্ষে রেসিডেন্টের ওপর প্রভাব ঘটানো ও ব্রিটিশের তৎপরতার ওপর নজর রাখার একটি সুযোগ সৃষ্টি হলো।

আঠারো মাসব্যাপী বেপরোয়া আশাহীনতার আনন্দময় পরিসমাপ্তির প্রেক্ষিতে জেমসের মনে যে অনুভূতি তা সুখের অনুভূতিই হয়ে থাকলেও তিনি তার বিয়ের মুহূর্তের আবেগের কোনো প্রমাণ রেখে যাননি। কারণ, হায়দারাবাদে এই বিয়েতে যারা সম্মতি দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তারা তা দিয়েছেন এবং বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু জেমস তার ভাইয়ের কাছে তখনো ভান করে যাচ্ছিলেন যে, তার প্রেম আর নেই। কলকাতায় অন্যান্যের মধ্যেও একই ধারণা বিরাজ করছিল। ১৮০১ সালের ১৬ জানুয়ারি তিনি উইলিয়ামকে লিখেন, যা তার পূর্বের অন্যান্য চিঠির চাইতেও সত্য থেকে অনেক দূরে। তাকে তিনি লিখেন, 'খায়রুন্নিসার পরিবার থেকে কোনো ধরনের খবর প্রেরণ তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, যদিও তখন তাদের পক্ষ থেকে বিয়ের জন্যে অব্যাহত চাপ আসছিল।' জেমস এখন পুরোপুরি বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি উইলিয়ামের কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করার অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। অতএব, সত্য বলার পরিবর্তে তিনি এখন মিথ্যা ও অর্ধসত্য মিশ্রিত প্যান্ডোরার বাক্স খুলতে শুরু করলেন। যা একবার উন্মুক্ত করার পর পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত তাকেই তাড়া করে ফিরেছে। জেমস হয়তো তার নিরাপত্তার খাতিরেই ধরে নিয়েছিলেন যে, কিছুদিনের জন্যে খায়রুন্নিসার পক্ষে পুরনো শহরের বাড়িতে তার মায়ের কাছে অবস্থান করাই উত্তম, অন্ততপক্ষে মানুষের মন থেকে কেলেংকারির গুজব কেটে যাওয়ার সময় পর্যন্ত। অতএব, বিয়ের দু'মাসের কম সময়ের মধ্যে হায়দারাবাদের প্রধান প্রতীক চারমিনারের ছায়ায় পারিবারিক দেউড়িতে খারুন্নিসার গর্ভে তাদের প্রথম পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল।

জেমস সন্তান প্রসবের সময় সে বাড়িতেই ছিলেন এবং একটি ছোট্ট কাগজে সে রাতে যা লিখেছিলেন এখনও সেটি তাদের উত্তরাধিকারীদের পারিবারিক মহাফেজখানায় (আর্কাইভে) রক্ষিত আছে—

> "১৮০১ সালে ৪ মার্চ অর্থাৎ ১২১৫ হিজরির ১০ শাওয়াল বুধবার ভোর রাত চারটার দিকে হায়দারাবাদ শহরে আমার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তার মায়ের যে স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন অনুসারে তাকে মীর গোলাম আলী নাম দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে (স্বপ্নে মাওলা আলীকে দেখেছিলেন খায়রুন্নিসা), যার সাথে আমি যোগ করতে চাই 'সাহিব আলম' (বিশ্বের প্রভু)।"

৬

১৮০০ সালের গ্রীষ্মে যে সময়ে খায়রুন্নিসা গর্ভ ধারণ করেন, তখন জেমসের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মিত্র পুনায় মারাঠা দরবারে উদার ও সহানুভূতিশীল ব্রিটিশ রেসিডেন্ট জেনারেল উইলিয়াম পামার দেখতে পান যে, তিনি লর্ড ওয়েলেসলির নতুন কঠোর রাজনৈতিক নির্দেশের শিকার পরিণত হয়েছেন।

জুন মাসের শেষদিকে পামার গভর্নর জেনারেলের নিকট থেকে একটি চিঠি পান, যাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতিশীল অবস্থা ও বয়সের শেষ দিকে উপনীত হওয়ায় তাকে যথাসময়ে তার গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য অবস্থান থেকে অপসারণ করা হবে। পামার শিগ্‌গিরই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, তাকে অপসারণ করার পেছনে কারণ হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত সহনশীল, ভারত প্রেমিক 'শ্বেতাঙ্গ মোগল' হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন, যার প্রতি ওয়েলেসলির চরম ঘৃণা এবং কোম্পানির চাকরি থেকে তিনি এ ধরনের লোকদের আগাছা উপড়ানোর মতো অপসারণ করবেন।

জেনারেল পামার দিল্লির সুন্দরী মোগল বেগম ফায়জি বখশকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি সজ্জন, চিন্তাশীল এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি, যিনি ভারতীয়দের আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। আবদুল লতিফ শুস্তারি পুনরায় জেনারেল পামারের সাথে রেসিডেন্সিতে অবস্থান করছেন, যিনি পামারকে তার সদাচরণে তাকে 'ফেরেশতাতুল্য মানুষ' বলে বর্ণনা করেছেন। জেনারেল পামার অত্যন্ত সুদৃঢ় নীতির ব্যক্তিত্ব, যিনি কলকাতায় প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিশ্বাস ভঙ্গের মতো কোনো আচরণ তিনি পেশোয়া'র (মারাঠা নেতা) সাথে করতে পারবেন না। অথবা এমন কোনো উদ্যোগও নেবেন না, যা জনসাধারণের আস্থা ও ঐক্য বিনষ্টের কারণ হয়। অন্য কথায় বলা যায়, কলকাতার ভ্রান্ত নির্দেশ প্রতিপালনে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলেন—যার মধ্যে ছিল মারাঠা নেতাদের ওপর চাপ প্রয়োগ, ঘুষ ও হুমকি প্রদানের মাধ্যমে মারাঠাদেরকে একটি চুক্তিতে উপনীত করানো যায় আওতায় মারাঠারা ব্রিটিশের অধীন থাকবে এবং মারাঠারা নিজেদের ইচ্ছার কোনো প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। ওয়েলেসলির কল্পিত ভারতে এহেন বৈশিষ্ট্যের লোকদের জন্যে কোনো সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট ছিল না।

পামারের স্থলাভিষিক্ত হবেন উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক, তাও ঘোষণা করা হলো, ওয়েলেসলি জানতেন, যিনি পুনার সাথে ব্রিটিশ সম্পর্কে আরও কঠোর ও অনমণীয়ভাবে কার্যকর করতে সক্ষম হবেন। বিখ্যাত মারাঠা উজির ও

BanglaBook.org

আরিস্তু জাহের সাবেক প্রতিপক্ষ নানা ফাদনাভি মাত্র তিনমাস আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার অনুপস্থিতিতে মারাঠা ভূখণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ রাখা কঠিন কাজ এবং ইতোমধ্যেই মারাঠা প্রধানরা ক্ষমতার জন্যে কাড়াকাড়ি শুরু করেছিলেন। ওয়েলেসলি জানতেন পামারের পরিবর্তে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক পরিস্থিতির পুরো সুযোগকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন। গভর্নর জেনারেল এ পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছেন 'মারাঠা সাম্রাজ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি, যা আমাদের স্বার্থের জন্যে অত্যন্ত সময়োপযোগী' বলে। মারাঠাদের কাছেও অনিবার্য ছিল যে, ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের সুযোগ অবারিত...।

পামারের চাইতে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের স্বাস্থ্যের অবস্থা কোনোভাবে উত্তম এ ধারণা হাস্যকর-পামার ষাট বছর বয়সেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সক্রিয় লোক, আর কার্কপ্যাট্রিক তার চাইতে চৌদ্দ বছরের ছোট হয়েও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে প্রায় অক্ষম। উত্তমাশা অন্তরীপে অবস্থান করে স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হয়েছিল, তা ছিল স্বল্পস্থায়ী। কলকাতায় তাকে অধিক সময় কাটাতে হয়েছে—তিনি প্রায়ই বাতজ্বরে আক্রান্ত থাকতেন এবং মূত্রাশয়ের জটিলতা ছিল গুরুতর। কখনো তার ব্যথা এত তীব্র হত যে, তিনি অধিক পরিমাণে আফিম সেবন করে যন্ত্রণামুক্তির উপায় খুঁজতেন। তথাপি পামার তার বাধ্যতামূলক প্রকাশ্য অবসর গ্রহণ ভালোভাবেই মেনে নিলেন এবং ওয়েলেসলিকে লিখলেন, 'মহামান্য লর্ড, আমি অত্যন্ত বোধসম্পন্ন অবস্থায় আছি, শ্রমসাধ্য কোনো কাজে যে মানসিক শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা যে এখনও আমার মধ্যে আছে তা আশা করা সঠিক হবে না।'

কিন্তু একান্তে পামার তাকে অপসারণ করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ, দীর্ঘদিন কোম্পানির চাকরিতে তাকে কোনো অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তিনি যদি স্বেচ্ছায় অবসর নিতে না চান তাহলে আরও বহু বছর পর্যন্ত তাকে রেসিডেন্সির দায়িত্ব থেকে অবসর দেয়া হবে না। দিল্লির রেসিডেন্ট স্যার ডেভিড অক্টারলোনি সাতষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিশ বছর কাল রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার পুরনো বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ওয়ারেন হেস্টিংস, যিনি গ্লুচেস্টারশায়ারে অবসর জীবন অতিবাহিত করছিলেন, পামার তাকে লিখেন, 'রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আমি মারাঠাদের সঙ্গে অত্যন্ত সমঝোতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখেছি এবং পেশোয়া ও তার অন্যতম প্রধান দরবারিদের সাথে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক অর্জন করেছি, যা আমার পরবর্তী আর কোনো রেসিডেন্টের সময়ে ছিল না।... সম্ভবত আমার ভূমিকা আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়নি এবং এখন যুক্তি ও সমঝোতার পরিবর্তে হীন উদ্দেশ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে আমার চাইতে যোগ্য লোক যে পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

BanglaBook.org

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিকের বিজ্ঞ ও সুযোগ্য অফিসারদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন জেনারেল পামার। তার পেশা জীবনের বিকাশ সূচিত হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে। হেস্টিংস স্বয়ং পামারের ভারত প্রীতি এবং ভারতীয় সবকিছুর প্রতি আগ্রহে সাড়া দিয়েছেন। ১৭৭৬-১৭৮৫ সালের মধ্যে পামার কলকাতায় চার বছরের জন্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের সামরিক সচিব ছিলেন। এরপর তিনি তাকে লক্ষ্ণৌর দরবারে ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেন।

কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনকালে পামার তার অবসর সময় কাটাতেন সংস্কৃত ভাষা ও মোগল আমলের পাণ্ডুলিপির মধ্যে তার আগ্রহের বিষয় অনুসন্ধান করে এবং তা তিনি প্রায়ই হেস্টিংসের জন্যেও করতেন। তার কাছে তিনি তার অনুসন্ধান সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিঠি লিখতেন। পামার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পাডুলিপির নিজস্ব বিপুল সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সামরিক অভিযানগুলোর ঐতিহ্য সম্পর্কেও গবেষণা করেন। এই আগ্রহ ও উৎসাহের কারণে জেনারেল পামার খুব শিগ্‌গিরই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শহর লক্ষ্ণৌকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মোগল দিল্লি যখন দ্রুত অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন লক্ষ্ণৌ ছিল সোনালি যুগের শীর্ষে এবং নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক আমলের পূর্বেকার উত্তর ভারতে সর্ববৃহৎ, সবচাইতে সমৃদ্ধ ও উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন শহর ছিল। অতি মার্জিত দরবারি উর্দু এবং সৌজন্য ও বিনয় প্রকাশের ব্যাপক রীতি গোটা ভারতে সবচেয়ে চৌকস বলে খ্যাত ছিল। লক্ষ্ণৌর নর্তকিরা সেরা নর্তকি বলে সর্বত্র প্রশংসিত ছিল, রসনা পরিতৃপ্তির জন্যে বিবিধ উন্নত খাবারের জন্যও খ্যাতি ছিল লক্ষ্ণৌর। একজন ইতিহাসবিদের মতে, আনন্দের উপকরণে পরিপূর্ণ এই নগরীকে বিপ্লব-পূর্ব তেহরান, মন্টিকার্লো এবং লাসভেগাসের ভারতীয় সংস্করণ ছিল বলা যায়। বরং সংস্কৃতি দিক থেকে সেই শহরগুলোর চাইতেও অধিক উন্নত ছিল। লক্ষ্ণৌর ভোগ সুখের এই পরিবেশেই পরিচয় ঘটে তার জীবনসঙ্গিনী বেগম ফায়জি বখশের সঙ্গে, যিনি এক পযায়ে খায়রুন্নিসার ঘনিষ্ঠতম বান্ধবীতে পরিণত হয়েছিলেন।

পামারের সঙ্গে যখন ফায়জি বখশের সাক্ষাৎ ঘটে তখন আসলে তিনি বিবাহিত ছিলেন। তার প্রথম যৌবনে একজন সৈনিক হিসেবে অবস্থানকালে ক্রেওলের এক সুন্দরী সারাহ হ্যাজেলকে তিনি বিয়ে করেন, যান গর্ভে জন্মলাভ করে তার তিনটি পুত্র ও দুটি কন্যা। ছয় বছর পর পামারকে যখন ভারতে বদলি করা হয়, তখন সারাহ তার দুই কন্যাকে নিয়ে সেন্ট কীটসেই রয়ে যান এবং তার স্বামী তিন পুত্রকে নিয়ে ভারত অভিমুখী জাহাজে ওঠেন। তিন পুত্র তাদের মাকে চিঠি লিখত এবং সারাহ্ ক্যারিবিয়ান ত্যাগ করে গ্রিনউইচে চলে যাওয়ার পর স্থায়ীভাবে অভাবে নিপতিত হন। পামার ব্রিটেনে অবস্থিত তার

BanglaBook.org

বন্ধুদের পীড়াপীড়ি করে চিঠি লিখেন তার স্ত্রীকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্যে। কিন্তু সারাহ কখনো লক্ষ্ণৌতে স্বামীর সাথে যোগ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেননি এবং পামারও কখনো ব্রিটেনে ফিরে তার দুই কন্যাকে দেখার পরিকল্পনা করেননি, যারা তার মায়ের সাথে রয়ে গিয়েছিল। কারো ধারণা হতে পারে যে, এই বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল অথবা অন্তত পারস্পরিক বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজে থাকাকালে এবং দুজন বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছিলেন, যদিও তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি এবং পামার সারাহকে সবসময় তার স্ত্রী হিসেবেই উল্লেখ করতেন। ১৭৭৯ সালের মধ্যে ফায়জির সাথে পামারের সাক্ষাৎ হয় এবং মুসলিম আইন অনুসারে তিনি ফায়জিকে বিয়ে করেন। পরের বছরই তাদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয় এবং পিতার নামানুসারেই তার নাম রাখা হয় উইলিয়াম পামার। এক পর্যায়ে এই পুত্রের ভাগ্য দুঃখজনকভাবে জড়িয়ে যায় জেমস কার্কপ্যাট্রিক, খায়রুন্নিসা ও তার মায়ের সাথে।

পামারের তরুণী বধূর জন্ম মোগল রাজধানী দিল্লিতে। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলে অশ্বারোহী বাহিনীর পারসিক অধিনায়কের কন্যা ছিলেন তিনি, যিনি দিল্লি থেকে লক্ষ্ণৌতে আসেন এবং নওয়াবের অধীনে যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী হন। সেখানে তিনি বিয়ে করেন ফায়জির লক্ষ্ণৌবাসী মাকে। নূর বেগম নামে ফায়জি'র এক বোন ছিল, যাকে শৈশবেই পুন্ড্রির নওয়াবের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। পুন্ড্রির অবস্থান দিল্লির পশ্চিম দিকে। কিন্তু মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাকে বৈধব্য বরণ করতে হয় বিয়ে বাস্তব রূপ লাভের পূর্বেই। এর ফলে তিনি অধিকাংশ সময় লক্ষ্ণৌতে ফায়জির বাসভবনেই অবস্থান করতেন। পরবর্তী কয়েক বছর নূর বেগমকে ফায়জির সন্তানদের প্রধান খালার ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ, ফায়জি প্রায় প্রতিবছর একটি করে সন্তানের জন্ম দিচ্ছিলেন এবং আট বছরে তাদের সন্তান সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টিতে—চারটি পুত্র, দুটি কন্যা।

পামারের লেখা চিঠিতে ফায়জি ও তার সন্তানদের উল্লেখই প্রধান থাকত। ১৭৮১ সালে তিনি তার বন্ধু ডেভিড অ্যান্ডারসনকে লিখেন, ' তোমার ছোট্ট বান্ধবী তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছে ও শান্তি কামনা করছে।' অথবা 'তুমি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে যাওয়ার পরই সে আমাকে একটি ছোট্ট পুত্র উপহার দিয়েছে এবং গত বছর আরেকটি, কিন্তু, সেটি মৃত অবস্থায় জন্মেছে। আমি আগামী চার মাসের মধ্যে আরেকটি আশা করছি।' ১৭৮৩ সালের এপ্রিলে উইলিয়াম লক্ষ্ণৌর বাইরে ছিলেন এবং তার সন্তানদের মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ফিরতে পারেননি। তিনি লিখেন, 'আমি যথাশীঘ্র রেসিডেন্সিতে ফিরে আসতে চাই, আমার ছোট্ট পরিবারটি সেরে উঠার সাথে সাথে। ছেলেটি গুটি বসন্ত থেকে সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করেছে এবং ফায়জি মাত্র ছয় মাস আগে

BanglaBook.org

যে ছেলেটি আমাকে দিয়েছে সে এখনও অসুস্থ।' এক বছর পর পামার লিখেন, 'বেচারি ফায়জি আবার গর্ভধারণ করেছে এবং এ মাস এমন পরিস্থিতিতে কেটেছে যে, সে দোতলায় উঠতে পারেনি, তাকে ঘুমাতে হয়েছে নিচতলায়।'

১৭৮৫ সালে এপ্রিল ও জুলাই মাসের মধ্যবর্তী সময়ে শিল্পী জোহান জোফানি পামার পরিবারের একট চিত্র অংকন করেন যা এখনও লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। ইন্দো-ব্রিটিশ ঝঞ্ঝার পুরো সময়ে টিকে থাকা চিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম সুন্দর চিত্র এটি। চিত্রের মাঝখানে ফায়জি, তার খালি পা এবং লক্ষ্মৌর দরবারি পোশাকে সজ্জিতা—একটি চমৎকার গেরুয়া পেশোয়াজ ও সংক্ষিপ্ত অন্তর্বাসের ওপর দোপাট্টা বা ওড়না। তিনি মাটিতে উপবিষ্টা এবং তাকে ঘিরে আছে তার সন্তান, আয়া ও সেবিকরা। ফায়জিকে দেখে মনে হয় বিশ বছরের কম বয়সী শান্ত, পবিত্র চোহরার সুন্দরী তরুণী। মাধুর্যমণ্ডিত ও মাতৃত্বের ছাপ চেহারায়। পরনে অনুপম মোগল আমলের অলংকার। ইয়ারিং-এর হীরক জ্বলজ্বল করছে, মুক্তার কয়েক ছড়া হার ঝুলছে গলা থেকে এবং পায়ের গোড়ালিতে রুপার পায়েল। তার কোলে আদরের সাথে ধরে রাখা সদ্যজাত শিশু। এটি তার তৃতীয় পুত্র, যার নাম রাখা হয়েছিল হেস্টিংস পামার। কিন্তু চিত্রে তাকে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় দেখা যায়, মাথায় সূচিকর্ম করা মুসলিম টুপি। হেস্টিংসের বড় দুই ভাই উইলিয়াম ও মেরির বয়স তখন যথাক্রমে পাঁচ ও তিন বছর। তারা দীর্ঘ ঢিলেঢালা লক্ষ্মৌর ঐতিহ্যগত পোশাক পরা এবং কৌতূহলীভাবে তাকিয়ে আছে। ফায়জির বামদিকে ইউরোপীয় চেয়ারে ব্রিটিশ সামরিক ইউনিফর্মের লাল কোট পরিহিত তার স্বামী বসে আছেন। শ্যাম বর্ণের হালকা পাতলা লোকটির বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে মনে হয়। ফায়জির দিকে তিনি প্রেম ও বন্ধনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বামে তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ফায়জির বোন নূর বেগম, তার দৃষ্টি বোনের পানে। নূরের তখন ষোলো'র ঘরে এবং সুন্দরী। তার মুখের ওপর সাদা হালকা ওড়না। চিত্রের ডানদিকে তার আরেক বোন তাকিয়ে আছে।

১৭৮০-র দশকের শেষদিকে কোনো সময়ে উইলিয়ামের এক বন্ধু সেভয়ে জন্মগ্রহণকারী মারাঠা জেনারেল বেনোট ডি বোনের সাথে নূর বেগমের বিয়ে হয় এবং তিনি তার সাথে আগ্রার কাছে আলীগড়ে বাস করতে চলে যান। দুই ভায়রা—ভাইয়ের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হত তা চেম্বারিতে বোনের পারিবারিক আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। যেসব চিঠিতে দুই বোনের মধ্যে ভালোবাসা ও আবেগের অনেক প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, 'ফায়জি তার বোনকে ভালোবাসাপূর্ণ সালাম জানিয়েছে, যার সাথে আমি আমার সালাম জানাচ্ছি,' পামার এক পর্যায়ে লিখেছেন, ' বেগমকে আমার ভালোবাসা জানিও এবং আমার পক্ষ থেকে ছোট্ট ব্যারনকে চুম্বন দিও।' এ চিঠি ১৭৯২ সালের

BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারিতে লেখা। এর আরও দুমাস পর লিখেছেন, 'আমার আন্তরিক সালাম আমার বোন বেগমের কাছে। তিনি কী করে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমারীকে সহ্য করবেন?'

এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে ডি বোনের আরও দুটি রক্ষিতাকে লক্ষ্য করে—মেহেরুন্নিসা ও জিনাত, যাদেরকে ডি বোনের কাছে দেয়া হয়েছে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের অংশ হিসেবে, যদিও অন্তত মেহেরুন্নিসার ব্যাপারে তিনি শপথ করে বলেছেন যে, সে প্রভাশালী মোগল সেনাপতি নজফ খান ও তার স্ত্রীর দত্তক কন্যা ছিল। ১৭৯৬ সালে ডি বোনে যখন ইউরোপে ফেরত যান তখন নূর বেগমকে তার সঙ্গে নেন এবং অপর দুটিকে ফায়জির হেফাজতে রেখে যান তাদের জন্যে ভাতাসহ। চেম্বারির আর্কাইভে একটি চমকপ্রদ 'আর্জি' আছে ফারসিতে লিখিত, যেটি ফায়জির হাতে লেখা। তিনি তার বোনের স্বামীকে অনুরোধ জানিয়েছেন তার রেখে যাওয়া দুই মহিলার জন্যে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে। জেনানা মহলে মহিলাদের ঐক্য প্রমাণিত হয় এই দরখাস্ত থেকে যে, মেহেরুন্নিসা ও জিনাত তার বোনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রতি উদার ছিলেন, দরখাস্তে তিনি লিখেছেন—

> "ফায়জি-উন-নিসার পক্ষ থেকে সাহেব কালান এম বেনোট ডি বোনের কাছে আর্জি।
> যেদিন থেকে আপনি আমাদের ছেড়ে গেছেন, আল্লাহ এবং লোকজন সাক্ষী, আমি সারক্ষণ আপনার কথা ভাবি এবং আমি আশা করি আপনি আমাকে ভুলে যাবেন না। যে অর্থ আপনি আমাকে দিয়ে গেছেন মোতিকে (মেহেরুন্নিসার মা) দেয়ার জন্যে, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এই বলে যে, এ অর্থ খুবই সামান্য। আমাদেরকে অবশ্যই এ ব্যাপারে ভাবতে হবে। মোতি অত্যন্ত প্রভাবশালী মহিলা, অর্থের পরিমাণ যদি তার মর্যাদার উপযুক্ত হত তাহলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি তা নেননি। অর্থ ফেরত পাঠাচ্ছি। প্রার্থনা করি, আমার এই অর্থ ফেরত দানে আপনি বিব্রত হবেন না। আপনি এক মহান ব্যক্তি এবং তিনি অনুরূপ শ্রদ্ধাভাজন। সম্ভবত আমরা আলোচনা করতে পারি যে তাকে কী পরিমাণ অর্থ দেয়া যায়। ফেরত পাঠাচ্ছি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে। আমাকে ভুলবেন না।"

যে লক্ষ্মৌতে ফায়জি ও পামার বাস করতেন তা সকল বিচারে তাদের নিজেদের বিবাহ সম্পর্কের মতোই সম্ভ্রান্ত ছিল। বাস্তবিকপক্ষেই লক্ষ্মৌ বহু দিক থেকেই শ্বেতাঙ্গ মোগল রেসিডেন্সি সংস্কৃতির বিকাশের তীর্থ ছিল যা পরবর্তীতে জেমস কার্কপ্যাট্রিক হায়দারাবাদে চর্চা করেছেন। নওয়াব যদি কখনো তার বিদেশি অতিথিদের সামনে একজন ব্রিটিশ নৌ সেনাপতির পোশাকে অথবা চার্চ অফ ইংল্যান্ডের যাজকের পোশাকে আবির্ভূত হয়ে তাদের চমকে দিতেন,

BanglaBook.org

তাহলে লক্ষ্মৌতে বসবসারত ইউরোপীয় পদস্থ অফিসাররাও অনুরূপ পালটা সৌজন্যের বিনিময় করতেন মোগল পোশাক পরিধান করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অসংখ্য মিনিয়েচার চিত্রে সে সময়ের ইউরোপীয়দের অযোধ্যায় দীর্ঘ ঢিলেঢালা সাদা গাউন পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, যারা গালিচার ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে, যেন মুখে হুক্কার নল এবং তারা উপভোগ করছে বাইজি নাচ। অনেক ইউরোপীয় নওয়াব পরিবারে বিয়েও করেছিলেন। উইলিয়াম লিনেয়াম গার্ডনারের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুত্র জেমস বিয়ে করেন নওয়াবের শ্যালিকা মালেকা বেগমকে।

এই যৌন কৌতূহল একমুখী ছিল না। অন্তত দুজন ব্রিটিশ মেমসাহিবাকে (অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান) অযোধ্যার হারেমের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছিল এবং নওয়াব তাদের একজন মিস ওয়াল্টারের জন্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা এখনও টিকে আছে। আরেকজন ইংরেজ মহিলা লক্ষ্মৌর এক বিশিষ্ট মুসলিম ওমরাহকে বিয়ে করেন, যিনি উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যদিও গ্রন্থটির নাম একটু জটিল 'অবজারভেশনস অব দি মুসলমানস অফ ইন্ডিয়া ডেসক্রিপটিভ অফ দেওয়ার ম্যানার্স, কাস্টমস, হ্যাবিটস এন্ড রিলিজিয়াস ওপিনিয়নস মেড ডিউরিং টুয়েলভ ইয়ার্স রেসিডেন্স ইন দেওয়ার ইমিডিয়েট সোসাইটি'। এ গ্রন্থটি তিনি লিখেন মিসেস মীর হাসান আলীর পরিচয়ে। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর মিসেস মীর হাসান আলী তার জীবন সমাপ্ত করেন অদ্ভুতভাবে তৃতীয় জর্জের বোন প্রিন্সেস অগাস্টার পরিবারের সাথে কোনোভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করে।

একইভাবে লক্ষ্মৌর জীবনের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিলেন পামারের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুইস-ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, গুপ্তচর ও পণ্ডিত কর্নেল এন্টোনি পলিয়ার। আগ্রার কাছে তার জায়গিরে অথবা অক্ষ্মৌর হাভেলিতে পলিয়ার পুরোপরি একজন মোগল ওমরাহের মতোই বসবাস করতেন। তার প্রেরিত দর্ঘি চিঠি ও বিবরণী এখন প্যারিসরে 'বিবলিওথেক ন্যাশনাল' এ সংরক্ষিত আছে। একদিন তিনি হয়তো তার ভৃত্যকে নির্দেশ দিয়েছেন কোনো পানওয়ালাকে খুঁজে আনতে, হুক্কা সাজিয়ে দিতে অথবা বিলাসবহুল পালকি আনতে, পরদিনই খবর পাঠিয়েছেন লক্ষ্মৌর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মীর চান্দকে এবং তার বিবি ও বাইজিদের চিত্র আঁকতে বলেছেন, তৃতীয় দিবসে তিনি হয়তো তার প্রিয় কাঁচা আমের আচার অথবা বিশেষ ধরনের সুগন্ধি তামাক আনতে পাঠিয়েছেন। তার দুজন ভারতীয় বিবি ছিল (একজন প্রবীণা, একজন নবীনা, যারা একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন এবং দুজনের মধ্যে কলহ লেগেই থাকত), এছাড়া ছিল বেশ কিছুসংখ্যক আধা-ভারতীয় সন্তান (যাদের একজন জর্জ পরবর্তী সময়ে পামারের শ্যালিকা

BanglaBook.org

নূর বেগমের সাথে সাসেক্সে থাকত)। তার সংগ্রহে ছিল দুর্লভ মোগল পাণ্ডুলিপি, যার অধিকাংশই প্যারিসে চলে আসে।

এই সহনশীল ও ভোগসুখের মরুদ্যান থেকে পামার পেস্টিংসকে যে চিঠিগুলো লিখতেন তাতে লক্ষ্মৌতে তার আনন্দময় জীবনের প্রকাশের পাশাপাশি ১৭৯০'র দশকের শেষ দিক থেকে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য ও নগ্ন বর্ণবাদের প্রকাশে তার মাঝে যে উদ্বেগের সৃষ্টি হচ্ছিল তার প্রমাণও রেখে গেছেন। ১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলির দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ থেকে শোচনীয় পরিণতির দিকে যেতে শুরু করে এবং পামারের চিঠিপত্রে দেখা যায় যে, নতুন গভর্নর জেনারেলকে তিনি শুরু থেকেই অপছন্দ করতে শুরু করেছিলেন। তিনি হেস্টিংসের কাছে লর্ড ওয়েলেসলির 'অহেতুক জাঁকজমকের প্রতি ঝোঁক এবং অসার দম্ভের' কথা লিখেন যা তার ধারণার বাইরে ছিল। একই চিঠিতে তিনি তার উপলব্ধি বর্ণনা করেন 'এটি নিষ্ঠার সাথেই বলা যায় যে, এ ধরনের দুর্বলতা প্রথম শ্রেণির মেধার প্রভাবকে পরাস্ত করবে।' কয়েক বছর পর পামার দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, 'ওয়েলেসলির নীতি ভারতে বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতীয়দের চিরস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। কলকাতা থেকে একবার ফিরে এসে তিনি হেস্টিংসকে লিখেন—

> "গভর্নর জেনারেলের দেশপ্রেমকে আমি প্রথম শ্রেণির বলে গ্রহণ করতে পারি না। তার শাসনে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত, যা বাস্তবিক পক্ষেই হাস্যকর। তার রাষ্ট্রীয় নীতি ধৃষ্ট মি. পিট'-এর মতো যার লক্ষ্যে দ্বারাই বিবেচিত হয় উপায় পদ্ধতি এবং সুবিধাবাদ লক্ষ্যকে যৌক্তিক করতে চায়...। ওয়েলেসলি দেশীয় রাজ্যের উকিলদের (দূত) প্রতি সামান্য মনোযোগী, অথবা তাদেরকে আদৌ গুরুত্ব দেন না। বছরে দুই বা তিনবারের বেশি তাদেরকে তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় না, যা আমার কাছে সুবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে হয় না এবং অমর্যাদাকরও বটে...। আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে তাদেরকে নিপীড়নের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা লক্ষ করছি এবং প্রায় প্রত্যেক ইউরোপীয়ের আচরণে ও তার প্রকাশ ঘটছে। সকল দায়িত্বশীল পদ থেকে তাদের বাদ ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সাথে আচরণে ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে। আসলে তাদের সাথে আমাদের সামাজিক কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করছে ইউরোপীয়রা, যারা এ দেশের আইন ও ভাষা কোনোটাই জানে না এবং এর ফলে কোম্পানির ব্যয়ও হচ্ছে বিপুল। প্রতিটি আদালতে নিয়োজিত হেড মৌলভি, যার তথ্য ও ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে বিচারকের সিদ্ধান্ত, তার মাসিক বেতন ৫০ রুপি এবং আমার বিশ্বাস এটি অত্যন্ত

BanglaBook.org

> বিশ্বাসভাজন ও লোভানীয় চাকরি, যা একজন দেশীয়কে করতে দেয় কোম্পানি। এই লোকগুলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদের নিজ দেশেই ক্ষুধায় দিন কাটাবে।”

এর কয়েক মাস পরের চিঠির ভাষায় পামারকে আরও বিষণ্ন মনে হয়; ‘আমাদের দুর্বলতা, ঔদ্ধত্য এবং অন্যায়ের কারণে যে সমগ্র ভারতের প্রতিশোধ আমাদের ওপর অবশ্যই পড়বে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।’ তার বক্তব্য ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর মতো, ‘ইতোমধ্যে এখানে বিক্ষোভ হচ্ছে...।’ ব্রিটিশদের ক্রমবর্ধমানভাবে অহংকারী হয়ে ওঠার পটভূমিতে পামার নিজেকে অধিকতর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পান নতুন প্রজন্মের ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে, যারা তার ভারতীয় বন্ধুদের সাথে আরও বেশি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শুরু করেছে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, হায়দারাবাদে জেমস কার্কপ্যাট্রিকও তার মতো মনোভাবই পোষণ করেন। ১৭৯৮ সালে পুনায় পৌঁছার পর হায়দারাবাদে তার প্রতিপক্ষের বন্ধুত্ব লাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন।

আন্তরিকতাপূর্ণ বেশকিছু চিঠির মাধ্যমে জেনারেল পামার জেমসের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা করেন, যদিও তাদের মধ্যে তখনো মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি। তাদের অনেক বিষয়ে অভিন্ন আগ্রহের মধ্যে পত্র বিনিময়ের এক পর্যায়ে উভয়েরই আমের প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ ছিল লক্ষণীয়। জেমস তার প্রথম দিকের একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন, ‘আমের মৌসুম এসেছে বিলম্বে, কিন্তু প্রচুর আম পাওয়া যাচ্ছে এবং কোনো আমের স্বাদই মন্দ নয়।’ এর উত্তরে পামার উদ্যানের জন্যে বাছাই করা আম গাছের কলম প্রেরণের প্রস্তাব করেন। এরপর দুজনেই তাদের পছন্দকৃত জাতের আম সম্পর্কে নিজ নিজ মতামত বিনিময় করতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে দুজন একমত হন যে, আলফনসো জাতের আমের তুলনা হয় না। মীর আলম যখন জেমসের বিরুদ্ধে কলকাতায় অভিযোগ করেন তখন পামার তার সমর্থনে এগিয়ে আসেন। অবশেষে মীর আলম আরিস্তু জাহের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত, পদচ্যুত ও গ্রেফতার হওয়ার পর পামার স্বস্তি প্রকাশ করে জেমসকে লিখেন : ‘আমি স্বীকার করি, মীর আলমের প্রতি আমি কোনো আবেগ অনুভব করি না। তোমার প্রতি তার বিদ্বেষ ও অকৃতজ্ঞতার কারণে সে এখন যে পরিস্থিতিতে পড়েছে তার চাইতেও অধিক শাসিত তার প্রাপ্য ছিল। তার মন এত নোংরা যে তাকে আস্থায় আনা বা মর্যাদা দেয়া যায় না। খ্যাতি ও সম্পদ লাভের কাছাকাছি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, কিন্তু আমাদের স্বার্থের বিরোধিতা করে এবং প্রয়োজনে আমাদের নির্মূল করে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে দ্বিধা করত না। তার দৃঢ়তা এবং সামর্থ্য তাকে নিঃসন্দেহে ধারণা দিয়েছিল যে, সে তার কাঙ্ক্ষিত সবকিছু অর্জন করতে সক্ষম হবে। ধনলিপ্সার কারণে তার এই

BanglaBook.org

পরিণতি হয়েছে।...আরিস্তু জাহের কারাবাসের সময় তার প্রতি মীর আলমের আচরণ ছিল সে কারণে তিনি কখনো তাকে ক্ষমা করবেন না। তা সে জানত এবং সে নিজেই তার পরিণতি ডেকে এনেছে। তোমারও ক্ষোভ আছে তার ওপর, কারণ সে তোমাকে নিয়ে হাস্যকর সব গল্প ফেঁদেছিল তোমার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে। সে নিজের আচরণেরই শিকার হয়েছে।'

অন্যান্য চিঠিতে ওয়েলেসলির প্রতি দুজনের বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে পামার ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়। অহংকারী ও আগ্রাসী গভর্নর জেনারেল সম্পর্কে তিনি যা ভাবতেন তা তার তরুণ সহকর্মীর কাছে খোলামেলা প্রকাশ করেছেন। চিঠির পর চিঠিতে পামার জেমসকে ওয়েলেসলির বিরুদ্ধ যেসব কথা রাখঢাক না করে লিখতেন, তা জেমস এখন পর্যন্ত শুধু তার ভাইকে নৈমিত্তিকভাবে লিখেছেন : যার মধ্যে ওয়েলেসলির ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্য, তার নিজস্ব সহকর্মী, ভারতীয় রাাজন্য ও তাদের দূতদের প্রতি বিরূপ আচরণ, তার অতিমাত্রায় ব্যয় করার মানসিকতা এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কাউন্সিল তলব না করে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিকতা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকত।

১৮০১ সালের জুন মাসের প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে ভারতীয় রাজন্যদের প্রতি ওয়েলেসলির জবরদস্তি খাটানোর প্রবণতা জেমসকে আরও বেশি বিরূপ করে তুলল, বিশেষ করে কলকাতা থেকে একটি নির্দেশ আসার পর, যাতে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাত্র এক বছর আগে ওয়েলেসলি ও নিজামের মধ্যে স্বাক্ষরিত অতিরিক্ত চুক্তি পুনরায় আলোচনা করার জন্যে। চুক্তিতে শ্রীরঙ্গপতমের পতনের পর নিজামের সেনাবাহিনী টিপুর যেসব ভূখণ্ড দখল করেছিল সেগুলো কোম্পানির কাছে সমর্পণ করতে হয়েছিল, কোম্পানি হায়দারাবাদে অতিরিক্ত ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করতে সম্মত হওয়ার বিনিময়ে। অতিরিক্ত ব্রিটিশ সৈন্য তখনো হায়দারাবাদে পৌছেনি। তারা হায়দারাবাদের উদ্দেশে মাদ্রাজও ত্যাগ করেনি। কিন্তু ওয়েলেসলি যখন আবিষ্কারে সক্ষম হলেন যে, নিজাম কোম্পানির কাছে যে ভুখণ্ড সমর্পণ করেছেন তা তার কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব যোগান দিতে পারছে না, তখন তিনি জেমসকে লিখতে শুরু করেন ঘাটতি রাজস্ব প্রদানের জন্যে নিজামের কাছে দাবি তুলতে। যদিও চুক্তিতে এটির ওপর বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ছিল। ওয়েলেসলির দাঁড়িয়ে থাকার মতো পা ছিল না, অথচ তিনি গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুসুলভ এক মিত্রকে কোনো রকম আইনগত সমর্থন ছাড়াই মোটা অংকের অর্থ প্রদানে বাধ্য করতে চাচ্ছেন, যা মাত্র আট মাস আগে তারই স্বাক্ষরিত চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন। অথচ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, চুক্তি অনুসারে কোনো অতিরিক্ত সৈন্য আসেনি। সামান্য সংখ্যক কামান আসার কথা তাও পৌঁছেনি। এমন প্রকাশ্য অন্যায় ওয়েলেসলির অবস্থানকে আগ্রাসী হিসেবে আরও মূর্ত করে তুলেছিল।

BanglaBook.org

পামারের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে এই উদ্যোগ নেওয়ার ফলে হায়দারাবাদের সাথে ব্রিটিশ সম্পর্ক কী হতে পারে। তিনি লিখেন: 'এই কঠোর অন্যায় দাবির কারণে হায়দারাবাদ দরবারের সাথে আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হবে বলে আমার ভয় হচ্ছে।' জেমস লর্ড ওয়েলেসলির 'নিষ্ঠুর' নির্দেশে হতভম্ব হয়ে বড় ভাই উইলিয়ামকে একান্তে লিখেন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে : 'প্রিয় উইল, এই গোপন নির্দেশগুলো নিয়ে আমি যত ভাবছি, তত আমার মধ্যে অনুশোচনা হচ্ছে, আমি বিস্মিত ও শঙ্কিত হচ্ছি।...এগুলো সম্প্রতি সম্পাদিত একটি সুবিধাজনক চুক্তি, যা করা হয়েছে অত্যন্ত পুরনো এবং উপকারী মিত্রের সাথে, সেই চুক্তি প্রকাশ্যে লঙ্ঘনের উদ্যোগ নিলে গভর্নর জেনারেলকে ব্রিটেনে ফিরে যাওয়ার পর কোনো শক্তিই তাকে ইমপিচমেন্টের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।'

জেমসের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মুহূর্ত ছিল এটি। তিনি উইলিয়ামকে লিখেন, 'আমার পক্ষে আর তার (ওয়েলেসলির) রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সচেতনতার প্রশংসা করা সম্ভব নয়, যা আমি ইতোপূর্বে করেছি।' ওয়েলেসলির সম্পদ লোলুপতা সম্পর্কে জেমস তার অভিমত ব্যক্ত করেন ১৮০১ সালের নভেম্বরে, যখন গভর্নর জেনারেল তার ছোট ভাই হেনরিকে লক্ষ্মৌ পাঠান হতভাগ্য নওয়াবের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ডগত সুবিধা আদায় করতে। জরবদস্তি করে ও হুমকি দিয়ে তিনি নওয়াব সাদাত আলী খানকে বাধ্য করেন কোম্পানির কাছে তার ভূখণ্ডের অর্ধেকের বেশি সমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে, যার মধ্যে দোয়াব অঞ্চলের সবচেয়ে আবাদি ও উর্বর জমিগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল এক কোটি ত্রিশ লাখ রুপির অধিক। নতুন দখলিকৃত ভূখণ্ডের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় হেনরি ওয়েলেসলির ওপর। যা ঘটছিল জেমস তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কোনোটারই আইনগত কোনো ভিত্তি ছিল না। তিনি পামারকে লিখেন যে, আবার তিনি পদত্যাগ করার বিষয়ে চিন্তা করছেন, এ ধরনের উর্ধ্বতনের অধীনে চাকরি করার চাইতে: 'প্রিয় মহোদয়, আমি ভেতরে ভেতরে এতটাই অসুস্থ, যা প্রত্যক্ষ করছি তার জন্যে। এত অমর্যাদামূলক কার্যকলাপ ঘটছে, আমি কল্পনাও করতে পারি না যে এগুলো সম্ভব হতে পারে। তবুও আমি আপনার সঙ্গ তখনো দেব (যখন পামারের উত্তরাধিকারী পুনায় পৌঁছবে), যতটা বুঝি আমাদের দুজনের পথই একসাথে এগুবে, আপনার পথ কলকাতার দিকে, আর আমারটা মাদ্রাজমুখী (যেখান থেকে জেমস ইংল্যান্ডগামী জাহাজ ধরতে পারবেন)। হেনরি নওয়াবেব প্রতি যে অদ্ভুত হুমকি নিয়ে আসছেন তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না, যিনি যারা দেশটির প্রকৃত মালিক তাদেরকে বঞ্চিত করে কোনো বিরাট নিয়ন্ত্রণকারী দফতরে তার শ্রম দিয়ে উত্তম সুবিধা ভোগ করবেন।'

এরই মাঝে জেমসকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে, অতিরিক্ত চুক্তি পুনরায় আলোচনা করার ব্যাপারে ওয়েলেসলির নির্দেশের প্রেক্ষিতে তিনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন। হতাশার সুরে তিনি পামারকে লিখেন, 'গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ আমাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। আগের আলোচনাকালে আমি আরিস্তু জাহকে যেসব আশ্বাস দিয়েছি, কীভাবে আমার পক্ষে তার সামনে এ ধরনের নতুন দাবি নিয়ে মুখোমুখি হওয়া সম্ভব, যা আমাকে তুলতে বলা হয়েছে। আর বেচারি আরিস্তু জাহই বা কী করে তার মনিবকে মুখ দেখাবেন? শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে জেমস কার্কপ্যাট্রিক ওয়েলেসলিকে লিখলেন যে, তিনি যে নির্দেশগুলো পেয়েছেন সেগুলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে তার ধারণা এবং এক বছরের কম সময় আগে তিনি (ওয়েলেসলি) যে চুক্তি করেছেন এসব নির্দেশ তার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এটি জেমসের প্রধান ভুল ছিল, অন্তত জেমসের চাকরি জীবনের ভবিষ্যতের জন্যে। ওয়েলেসলি তার অথবা তার সিদ্ধান্তের কোনো সমালোচনা হালকাভাবে নেওয়ার লোক ছিলেন না এবং জেমসের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ও তার চিঠির ভাষা ওয়েলেসলিকে জেমসের প্রতি আরও বিরূপ করে তোলে।

পামারের কাছে জেমসের চিঠি খাপছাড়া হয়ে যায়, তাদের অভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্বাস, আশা ও আশঙ্কার বাইরে চলে যায় তাদের চিঠির প্রসঙ্গ। তারা স্বল্প গুরুত্বের এবং পামারের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সন্তানদের নিয়ে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করেন, যাদের প্রত্যেকে ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করেছে এবং ভারতে তাদের কর্মজীবনে শুরু করতে চেষ্টা করছে। ১৭৯৯ সালে জেমস কার্কপ্যাট্রিক ফায়জির বড় পুত্র উইলিয়ামের জন্যে একটি চাকরি ঠিক করেন নিজামের অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীতে। পামারের পক্ষ থেকে জেমসকে দায়িত্ব দেয়া হয় তার কন্যা মেরী ইংল্যান্ড থেকে মাদ্রাজে পৌছলে তাকে পুনায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জেমসকে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়নি। কারণ মেরী তার সৎ ভাই জন পামারের সাথে যোগ দিয়ে এই পথটুকু আসে। কলকাতায় সফল ব্যাংকার জন পামার 'দি প্রিন্স অফ মার্চেন্টস' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। অতএব মেরীকে আর জেমসের রেসিডেন্সি হয়ে যেতে হয়নি। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিরূপতার কারণেই ফায়জি ও পামার জেমসকে তাদের কন্যার নিরাপদ পথ পরিক্রমার জন্যই প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন।

শিগ্‌গির পামার জেমসকে লিখলেন যে, তিনি হায়দারাবাদ সফরের পরিকল্পনা করছেন এবং চাকরি থেকে অব্যাহতি লাভ করা মাত্রই তিনি হাজির হবেন। তিনি হায়দারাবাদ ও মসলিপতম হয়ে কলকাতায় ফিরে যাবেন এবং জেমসের কাছে জানতে চান যে, তার পক্ষে রেসিডেন্সিতে অবস্থান করা সম্ভব হবে কিনা? জেমস উত্তর দেন যে, তিনি এতে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।

BanglaBook.org

'আমার একটি বিরাট বাংলো প্রস্তুত, যা আপনার এবং আপনার পুরো পরিবারের স্থান সংকুলানের জন্য যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। একটি ছোট্ট পৃথক জেনানাও আছে এর সাথে।' কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, বাংলোটি কোনোভাবেই তাদের জন্য পর্যাপ্ত হবে না। সেজন্যে ক'দিন পরই তিনি পামারকে লিখেন, 'বাংলোর চাইতে বরং স্যুট বিশাল এবং সেখানে অন্তত এক ডজন মহিলা বাস করতে পারবেন।

পামার পরিবার, বিশেষ করে ফায়জি মোগল সম্রাটের 'দত্তক কন্যা' হিসেবে সম্মানিত এবং সাহিব বেগম খেতাবে পরিচিত। তিনি জাঁকজমকের সাথেই সফর করবেন, তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

১৮০১ সালের দীর্ঘ, তাপদগ্ধ গ্রীষ্মে জেমসের মনে হয় যে, তার নিজস্ব জেনানাও প্রয়োজনের তুলনায় ছোট। আগস্টের শেষ দিকে তিনি সকল সতর্কতা ঝেড়ে ফেলে সিদ্ধান্ত নেন আনুষ্ঠানিকভাবে খায়রুন্নিসা ও তাদের ছোট্ট শিশু সাহিব আলমকে রেসিডেন্সিতে আনতে (মনে হয়, জেমস তার শাশুড়ি শরফ-উন-নিসাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন)। এর ফলে দৃশ্যত জেমসের জেনানার রক্ষিতাদের বিদায় করতে হবে।

এই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পেছনে পরবর্তীতে তিনি কারণ হিসেবে বলেন, 'তিনি প্রকৃতির তাগিদ শুনতে পাচ্ছিলেন, একটি অসহায় নিষ্পাপ শিশুর অবয়ব তাকে ডাকছিল।' এটা আংশিক সত্য হতে পারে। শিশুটিকে যারা দেখেছে তারা 'অপূর্ব সুন্দর শিশু' বলে মনে করে এবং তার মেয়েসুলভ চেহারা সবদিক থেকে তাকে মুগ্ধতার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। জেমসের নিজেরও মন্তব্য ছিল, 'অন্যান্য পরিস্থিতির মধ্যে শিশুটির প্রতি আমার আবেগ প্রবল হয়ে উঠে, তার চেহারায় আমার পিতার চেহারার অদ্ভুত মিল আছে এবং তার পরিচারিকা, যারা আমার কক্ষে রক্ষিত আমার পিতার ছবি দেখেছে, তাদেরও একই মন্তব্য।' এছাড়া ডাক্তার ওরে এবং তার স্ত্রীও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন (ইয়োরোপীয়দের মধ্যে এই দুজনই শিশুটিকে দেখেছে)। বাস্তবিক পক্ষেই শিশুটি অপূর্ব এবং ওরে ও তার স্ত্রীর কথায় যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে তারা জীবনে এত সুন্দর শিশু দেখেননি।

পরে উইলিয়ামের সঙ্গে পত্রালাপে পামারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পুত্রকে পড়াশুনা করানোর জন্যে ইংল্যান্ডে পাঠানোর সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করেন জেমস এবং স্বীকার করেন, 'ওকে ছাড়া আমার হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে কিছু না বলে আমি এ বিষয়ে অন্য সময় কথা বলতে পারি।' কিন্তু এটা যে শুধু তার শিশুপুত্রের প্রতি প্রবল ভালোবাসার আকর্ষণ ছিল তাই নয়, বরং গর্বিত পিতা হিসেবে তার পরিবারকে ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে শেষপর্যন্ত আমন্ত্র জানাতে পারছেন এই অহংকারও ছিল। তাছাড়া খায়রুন্নিসাকে তিনি অনুক্ষণ

BanglaBook.org

অনুভব করছিলেন। তিনি জানতেন, তার অভিজাত মুসলিম স্ত্রীকে রেসিডেন্সিতে এনে তিনি সবকিছুর ঝুঁকি নিচ্ছেন, বিশেষ করে তিনি যখন তাদের সম্পর্কের সত্যতা সম্পর্কে কলকাতায় এখনও কিছুই স্বীকার করেননি, অথচ সেই সম্পর্ক ইতোমধ্যে তার উর্ধ্বতনদের সাথে তার সম্পর্কের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। স্বেচ্ছায় ঝুঁকি গ্রহণ করেন জেমস—কারণ ইতোমধ্যেই তিনি অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন আর এক্ষেত্রে ঝুঁকিটা ছিল তার তরুণী স্ত্রীর প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা। এবার জেমস তার সকল মনোযোগ ও শক্তি নিয়োগ করলেন খায়রুন্নিসার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন পূরণের উপযোগী একটি জেনানা-প্রাসাদ নির্মাণের লক্ষ্যে। সেই মাসেই তিনি শুরু করেন তার মোগল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত 'রং মহল' নির্মাণের কাজ। যা পরবর্তী সময়ে বর্ণিত হয়েছে ভারতের অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ ও অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে। জেমস কখনো তার চিঠিতে এই প্রাসাদের বর্ণনা দেননি, কিন্তু ১৮০৯ সালে প্রাসাদটি পরিদর্শনের সুযোগ লাভের পর একজন দর্শনার্থী অভিভূত হয়ে বর্ণনা করেছেন, 'প্রাসাদটি দেশীয় ধাঁচে তৈরি করা হয়েছে এবং সন্দেহ নেই যে, কোনো ভারতীয় রাজন্যেরও এত চমৎকার জেনানা নেই। ইউরোপের সুন্দর অট্টালিকাগুলোর সাথেই কেবল এর তুলনা করা চলে। এটি নির্মিত হয়েছিল এক উদ্যানে। চত্বরের মধ্যে ছিল একটি ফুলের বাগান। প্রাসাদের মূল অংশের চারদিকে বারান্দা, যার প্রাচীর এবং ছাদ-এর কারুকাজ করা, যা ঔজ্জ্বল্য ও রুচির পরিচায়ক। এশীয়রা যে ধরনের শয়নকক্ষ তৈরিতে অভ্যস্ত এটির প্রধান শয়নকক্ষ তার চাইতে অনেক বড়। ড্রেসিং রুম ও বাথরুম ও উপযুক্ত আকৃতির। প্রধান চত্বরের কেন্দ্রস্থলে মার্বেলে তৈরি বিরাট এক জলাধার, যাতে অনেকগুলো ফোয়ারা ও দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে রোপিত সাইপ্রেস গাছ। খিলান এবং চত্বর ঘিরে যে বেষ্টনী সবই চমৎকারভাবে অলংকৃত এবং পাথরের জালিকাটা গ্রিল বসানো। স্থানে স্থানে কোথাও পাখি, ফুল ও জীবজন্তুর রঙিন চিত্র। এখানে খায়রুন্নিসা মহিলাদের আপ্যায়ন করতেন, অন্যদিকে তাদের স্বামীদের মূল রেসিডেন্সি ভবনে সঙ্গ দিতেন জেমস কার্কপ্যাট্রিক।'

সত্তর বছর পর পুরো প্রাসাদাটি ধ্বংস করে চত্বর সমান করে ফেলেন জেমসের আচরণে মর্মাহত এক ভিক্টোরীয় রেসিডেন্ট, যিনি বিশ্বাস করতেন যে, এর মধ্যে 'দেশীয় অনৈতিকতার' দুর্গন্ধ আছে। টিকে থাকার মধ্যে ছিল শুধু চমৎকারভাবে নির্মিত অলংকৃত গেট হাউজটি এবং খায়রুন্নিসার 'কবুতরখানা'র অভ্যন্তরভাগের কিছু অংশ। ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পিছনের দিকে যে অংশে অযত্নে বেড়ে উঠেছে নানা গাছ, সেটি এখনও 'বেগের উদ্যান' হিসেবে পরিচিত। পুরনো প্রাচীরের অংশের ধ্বংসাবশেষ থেকেও সহজে অনুমান করা সম্ভব যে, জেমস তার প্রিয় খায়রুন্নিসার জন্যে কী অনুপম এক প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন এবং অবশ্যই তাদের পুত্র 'সাহিব আলম' বা বিশ্বের অধিপতির জন্যেও।

ওয়েলেসলি পুনায় পামারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ১৮০০ সালের জুন মাসে তার স্থলাভিষিক্ত হবেন উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক। কিন্তু উইলিয়ামের অসুস্থতা জটিল মোড় নেয়ার ফলে এক বছর পরও পামারই দায়িত্বে ছিলেন।

১৮০১ সালের মার্চের পূর্ব পর্যন্ত উইলিয়ামের পক্ষে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করাই সম্ভব হয়নি। নৌ যাত্রায় তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার পরিবর্তে দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। তিনি মাদ্রাজে উপস্থিত হন স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা নিয়ে। তার মুত্রথলির যন্ত্রণা আরও বেড়ে গিয়েছিল। জেমস দ্রুত ডাক্তার ওরেকে মাদ্রাজে প্রেরণ করেন তার বড় ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য। উইলিয়াম যতদিন হায়দারাবাদে রেসিডেন্ট ছিলেন তখনো ওরেই তার চিকিৎসা করতেন, বিশেষ করে খার্দলা অভিযানের পর তা স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার পর এবং তখন ওরের চিকিৎসায় কাজ হয়েছিল বলে মনে হয়।

১৮০১ সালের ৫ এপ্রিল জেমস এটুকু লিখতে পারেন যে, তিনি সবেমাত্র শুনেছেন, তার ভাইয়ের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তিনি লিখেন, 'অবশেষে হায়দারাবাদে তোমাকে আলিঙ্গন করার সুখের অনুভূতি আসছে আমার মনে।' কিন্তু তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করতে থাকেন, যদি পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। 'ওরে স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে, তোমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করে আমাকে জানাও, অর্থনৈতিক কোনো কারণও যাতে মাদ্রাজ থেকে প্রথম সুযোগে তোমার যাত্রা যাতে বিরত না করে।'

বারো দিন পর, তিনি যখন মাদ্রাজে উইলিয়াম থ্যাকারের সাথে অবস্থান করছিলেন, তখন উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের স্বাস্থ্যের আরেক দফা অবনতি হয়। তার মূত্রবদ্ধতা দূর করতে মাদ্রাজের চিকিৎসকরা তাকে কস্টিক পান করানোর পরিণতিতে তাৎক্ষণিকভাবে ইতিবাচক হয়েছিল। জেমস, লিখেন, 'আমি আনন্দিত যে, তোমার যে দুর্ভোগ হয়েছে তার কোনো ধারণা দেয়ার চেষ্টা তুমি করোনি। কারণ ইতোমধ্যে তোমার অসুস্থতাগত যন্ত্রণার কারণে আমার যে কষ্ট হচ্ছে তা আমি যেভাবে বিবরণ দিতে পারবো তার চাইতেও বেশি ঈশ্বরের দোহাই, আমার ভাইকে যাতে আবারো এমন যন্ত্রণার শিকার না হতে হয়...। কস্টিক ব্যবহারে শরীরের যে ক্ষতি হতে পারে সে ব্যাপারে তোমার সাথে একমত পোষণ করে আমি এই বিশ্বাস করতে চাই যে, তোমার শরীর সহনীয় পর্যায়ে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত এ ধরনের ওষুধ প্রয়োগের আর কোনো উদ্যোগ তুমি নেবে না।' জেমস তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি উইলিয়াম থ্যাকারের পুত্র ও ভাগ্নেদের জন্য হায়দারাবাদে উপযুক্ত উপহারের সন্ধান করছেন, যা উইলিয়ামকে যত্ন করার বিনিময় হতে পারে। সতেরো তারিখে তিনি লিখেন, 'থ্যাকারের সন্তানদের জন্যে খেলনা সংগ্রহ করে আমি শিগ্‌গির পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আমার সামর্থের মধ্যে আমি তাকে আমার প্রিয় ভাইয়ের আরোগ্যের বিনিময়ে সবকিছু দিতে পারি। আশা করি তার চিকিৎসা তোমাকে সুস্থ করবে।'

BanglaBook.org

কিন্তু উইলিয়ামের স্বাস্থ্য কখনো ভালো হয়, পুনরায় অবনতি ঘটে। পুনার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার মতো অবস্থা তখনো হয়নি। অশুভ লক্ষণ যত বাড়তে থাকে জেমস তাকে তত ইংল্যান্ডে যাওয়ার ব্যাপারে ভাবতে উৎসাহিত করতে থাকেন। যদিও তার বয়স তখন মাত্র ছেচল্লিশ বছর। তিনি লিখেন, 'এখন তোমাকে শুধু নিজেকে রক্ষার করার বিষয় ভাবতে হবে এবং সবকিছুর ওপরে তোমার পরিবারের কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এসব কারণে আমার দৃষ্টিতে যত শিগ্‌গির সম্ভব তোমার নিজ দেশে ফিরে যাওয়াই উত্তম।' জেমস স্পষ্টভাবে উইলিয়ামকে একথাও জানান যে, বড় ভাইয়ের অবসর জীবনে তাকে সহায়তা করাকে তিনি তার কর্তব্য বলে মনে করেন,' আমার সম্পদ, তুমি ভালোভাবে জানো এবং প্রায়ই তোমাকে বলে থাকি পুরোপুরিই তোমার সেবায় এবং তোমার নিজের বলেই ভাবতে পারো।'

মে মাসের প্রথম দিকে উইলিয়ামের স্বাস্থ্য হঠাৎ করেই যখন আবার অবনতি ঘটল, ডাক্তার ওরে তার জন্যে কিছু নতুন ওষুধ পাঠালেন, আর জেমস ভাইকে পাঠানোর জন্যে তাজা ডুমুর ও খেজুর খুঁজছিলেন দাক্ষিণাত্যে, যাতে জেমস তার ওষুধের সাথে এসব ফলের স্বাদ যোগ করতে পারেন। তিনি লিখেন, 'ওরে এখনও বিশ্বাস করেন যে, তোমার ওপর কোনো অবস্থাতেই জটিল কোনো ওষুধ প্রয়োগের আর কোনো প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি শরীরে পূর্ণ শক্তি ফিরে না পাচ্ছ।'

কিন্তু তা আর ঘটে না। উইলিয়ামের স্বাস্থ্যগত জটিলতা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে এবং যন্ত্রণা হয়ে ওঠে অসহনীয়। জুন মাসের গুরুত্ব দিকে তাকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয় যে, অন্তত সাময়িক সময়ের জন্যে হলেও ভারতে তার পেশাজীবনের অবসান ঘটেছে। তিনি কলকাতায় লিখলেন, 'স্বাস্থ্যগত কারণে ভারত ত্যাগের অনুমতি কামনা করে এবং মাসের শেষ দিকে তিনি ওয়েলেসলির চিরকুট লাভ করলেন যে, তাকে কেপ অফ গুড হোপের উদ্দেশ্যে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে সেখান থেকে ইংল্যান্ডে যাত্রার।'

এরপর উইলিয়ামের জন্যে শুধু কাজ ছিল ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্যে একটি জাহাজের অপেক্ষায় থাকা। জেমস এ সময়ে লিখেন, 'এখনও আমি তোমাকে অনুরোধ করছি যে, জাহাজে একজন ভালো ভারতীয় চিকিৎসক ছাড়া আর কারো ওপর তোমার নির্ভর করা ঠিক হবে না। তুমি জানো, আমি কেন এ পরামর্শ দিচ্ছি। মাদ্রাজ থেকে যদি এভাবে যাওয়ার সুবিধা না হয়, তাহলে তোমার বাংলায় যাওয়া উচিত।'

উইলিয়ামকে যখন স্বাস্থ্যগত কারণে মাদ্রাজে থ্যাকারের বাড়িতে দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করতে হচ্ছিল, তখন কলকাতা থেকে তার সঙ্গে আগত দুই সহকারীকে মহীশূর ও হায়দারাবাদ হয়ে পুনায় যাওয়ার জন্যে বলা হয়,

BanglaBook.org

যেখানে তাদের সাথে যোগ দেবেন একজন রেসিডেন্ট, যাকে উইলিয়ামের পরিবর্তে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

এই দুই তরুণ সহকারী এডওয়ার্ড স্ট্রাচে এবং মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন সম্পর্কে জেমসের ধারণা হলো, দুজনই অত্যন্ত পদমর্যাদাসম্পন্ন তরুণ এবং অতি বিচক্ষণ। স্ট্রাচের বয়স ছাব্বিশ বছর, এলফিনস্টোনের বয়স বড়জোর একুশ। দুজন বুদ্ধিদীপ্ত এবং যোগ্য। কিন্তু তারা যা জানতেন তা গোপন করার সামান্য চেষ্টাই করেছিলেন। অথবা তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তাদেরকে বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্যেই পাঠানো হচ্ছে।

পুনায় খুব তাড়াহুড়ো করে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না তাদের। তারা প্রায় সমগ্র ভারত জুড়ে ঘুরে বেড়াতে প্রচুর সময় ব্যয় করলেন এবং এভাবে প্রায় এক বছর অতিবাহিত করলেন। তাদের সাথে ছিল আটটি হাতি, এগারোটি উট, চারটি ঘোড়া ও দশটি গরুর গাড়ি। এর মধ্যে তাদের ভৃত্যদের ঘোড়া ও টাট্টুর হিসেব নেই। ভৃত্যদের উট ঘোড়া ছিল দেড়শো থেকে দুশো। তাছাড়া বিশজন সিপাহী। এলফিনস্টোন বর্ণনা করেছেন, 'ত্রিশ থেকে চল্লিশ জনের এক মারাঠা প্রহরী দল। একটি হাতি শুধু বহন করছিল তাদের বইপত্র, যার মধ্যে এডওয়ার্ড স্ট্রাচের পিতা হেনরি স্ট্রাচের 'বেঙ্গল মিউটিনি'র ওপর লেখা ইতিহাস, ফারসি কবিদের কবিতার বই এবং হোমার, হোরাস, হেসিয়ড, হেরোডোটাস, থিওসাইট্রাস, সাপহো, প্লেটো, বেওউলফ, মেকিয়াভেলি, ভলতেয়ার, ওয়ালপোল, ড্রাইডেন, বসওয়েল ও টমাস জেফারসনের গ্রন্থাদি। কোম্পানির খরচে ভারত প্রদক্ষিণের সময় তারা বইগুলো থেকে একে অন্যকে জোরে জোরে পাঠ করে শোনাতেন, ছবি আঁকতেন, ফারসি ও মারাঠি ব্যাকরণ চর্চা করতেন, শিকার করতেন এবং জ্যোৎস্না রাতে বাঁশি বাজাতেন। তারা ডায়েরিও লিখতেন।

তাদের ডায়েরি—বিশেষ করে ভ্রমণ সংক্রান্ত বিবরণী স্থান ও পাত্র সম্পর্কে। হায়দারাবাদে সফরকালে ফরাসি জুয়েলার টাভারনিয়ার প্রধানত স্বর্ণ ও হীরার বাজার সম্পর্কে লিখেছেন। ভোজনবিলাসী এক অজ্ঞাত ফরাসি সৈনিক ১৭৫০ সালে তার হায়দারাবাদ সফরের সময় শহরের বিখ্যাত খাদ্য সামগ্রীর ওপর বর্ণনা দিয়েছেন, বিশেষ করে হায়দারাবাদের বিখ্যাত বিরিয়ানি সম্পর্কে। এডওয়ার্ড স্ট্রাচে আশা করেছেন সুদৃশ্য স্থানের, কিন্তু দেখেছেন শহরের ভগ্ন দশা। এলফিনস্টোন লিখেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণে।

১৮০১ সালের ২২ আগস্ট সন্ধ্যায় দুই ইংরেজ তরুণ হায়দারাবাদের উপকণ্ঠে পৌঁছেন। স্ট্রাচে লিখেছেন, 'শহরের নিকটবর্তী এলাকা আগের চাইতে প্রায় উন্মুক্ত, বৃক্ষহীন, পাথুরে। হায়দারাবাদ পাথরে নির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, যা প্রায় সাত মাইল বলে আমাকে বলা হয়েছিল। এই প্রাচীর অশ্বারোহণে অভিযান ঠেকানোর জন্যে শক্তিশালী হলেও কামানের গোলার মুখে

এক ঘণ্টাও টিকতে পারবে না। দূর থেকে প্রাচীরের ওপর দিয়ে অনেক সাদা রঙের ভবন দেখা যায়, যার অনেকাংশ গাছের আড়ালে ঢাকা, কিছু সুন্দর অট্টালিকা ও মিনার এসবের ওপর দিয়ে দেখা যায়।...এখন দৃশ্য এতটাই ভগ্ন ও ধ্বংসপ্রায় যে, প্রাচীরের স্থানে স্থানে ফাটল ধরেছে এবং ক্ষয়ে গেছে। বুরুজ ভেঙে গেছে এবং অনেক অট্টালিকার ওপর ঘাস ও আগাছা বেড়ে উঠেছে। আমি সহজে অনুমান করতে পারি যে, এগুলো শহরের সমৃদ্ধির যুগে অনুপম ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল... ।'

দুজনের ডায়েরিতেই হায়দারাবাদে তাদের পাঁচ মাস ধরে অবস্থানের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, যার ফলে দুটি ডায়েরিই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হায়দারাবাদের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে বিবেচিত। উভয়ের মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার যে, তারা ধরে নিয়েছেলেন ভারতের এমন ঘটনাপ্রবাহ তারা লিপিবদ্ধ করছেন, যা বহু শতাব্দীতে পরিবর্তিত হবে না। কিন্তু বাস্তবে ডায়েরি দুটি এমন এক সময়ে লিখিত হয়েছে; যখন খোদ হায়দারাবাদই বিরাট ও দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। যে ধ্বংসস্তূপগুলোর কথা স্ট্রাচে যত্নের সাথে লিখেছেন, সেগুলো হায়দারাবাদে মোগল হামলার অল্প কিছুদিন পূর্বে টাভারনিয়ারের বর্ণিত প্রমোদ উদ্যান ছিল। কয়েক বছর পরই কার্কপ্যাট্রিকের রেসিডেন্সির চারপাশ ঘিরে সেই জায়গাগুলোকে পড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

অনুরূপ, হায়দারাবাদ পৌঁছার এক মাস পর নিজামের দরবার পরিদর্শনের যে বর্ণনা এলিফেনস্টোন দিয়েছেন, সেটিও প্রাচ্যের স্বেচ্ছাতন্ত্রের চিরাচারিত নীতি অথবা মধ্যযুগীয় ধারার রেকর্ড নয়। তারা বরং তাদের ধারণার বিপরীত চিত্রই দেখেছেন। আনুষ্ঠানিক রূপান্তরের যুগের কিছু চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করেন তারা, যখন দিল্লির লাল কিল্লায় আচরিত মোগল সম্রাটদের পুরনো পদ্ধতির অনুসরণ থেকে ধীরে ধীরে ইউরোপ থেকে আসা নতুন ধারার সাথে মিশে যাচ্ছিল দরবারি রীতি। তিনি লিখেছেন, 'মেজর কার্কপ্যাট্রিক দরবারে গমন করেন অত্যন্ত জাঁকজমকের মধ্যে, তার সাথে থাকে বেশকিছু হাতি, সুসজ্জিত পালকি, সামনে ঘোড়া, পতাকা, দীর্ঘ দণ্ডধারী প্রহরী এবং তাকে স্বাগত জানায় পদাতিক অশ্বারোহী সৈন্যের দশটি কোম্পানি।' এলিফিনস্টোন লিখেছেন, 'মহামান্য নিজামের কাছে উপনীত হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে বেশ ক'টি চত্বর অতিক্রম করতে হলো, ফটকগুলো সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত, তাদের কারো কারো দাড়ি আছে, একজন বা দুজনের মাথায় ইস্পাতের টুপি (হেলমেট) ও হাতে দস্তানা। প্রহরীদের অনেকের পরিচ্ছদ চমৎকার।.. শেষ চত্বরে পৌঁছার পর উজির আজিম-উল-ওমরাহ (আরিস্তু জাহ) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আলিঙ্গন করলেন। একটি দরবার কক্ষের ভেতর দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেলেন 'দিওয়ান খানায়', যেখানে নিজাম উপবিষ্ট ছিলেন। আমি

তার কাছে গিয়ে আমার 'নজর' পেশ করলাম। মেজর কার্কপ্যাট্রিকের মুনশি আজিজ উল্লাহ্ কীভাবে নজর ধরতে হবে এবং একজন লোক আমাকে চাপ দিয়ে নত করে এটি প্রদানের যথাযথ পদ্ধতি দেখিয়ে দিল। মহান নিজাম হেসে আমার নজর গ্রহণ করলেন। আমি নিচু হয়ে তাকে কুর্নিশ করলাম।

নিজামের পরনে ছিল ব্রোকেড। তিনি তার ডান হাত রেখেছিলেন আলখিল্লায়, হাতটি ছিল নিশ্চল। মাথায় টুপি পরা ছিল তার এবং টুপির চারদিকে একটি শাল পেঁচানো। পুরো পাগড়ির আকৃতি কৌণিক। তিনি সুদর্শন পুরুষ এবং অনেক চমৎকার মণির অলংকার ধারণ করেছিলেন। দরবারে আরও অনেক লোক ছিল উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। দণ্ডায়মানদের মধ্যে কিছু মহিলা প্রহরী ছিল যাদের পোশাক অনেকটা মাদ্রাজের সিপাহীদের মতো। দরজায় অধিকসংখ্যক প্রহরী এবং আরও বিশ-ত্রিশজন মহিলাকে প্রহরীকক্ষের সামনে দেখা গেল। যে কক্ষে আমরা ছিলাম তার পেছনের অংশে অনেক মহিলা বসা ছিল।

নিজাম আমাদেরকে অনেকগুলো ঘড়ি এবং কৌতূহলোদ্দীপক যন্ত্র দেখালেন। যার কিছুসংখ্যক আদৌ দর্শনীয় নয়..। আমি তাকে একটি কথা বলতেও শুনিনি। ...অধিকাংশ সময় তিনি নিজেই হেসে উঠছিলেন ঘড়ির মতো ছোট্ট যন্ত্র প্রত্যক্ষ করে। মেজর কার্কপ্যাট্রিক একজন দেশীয় লোকের মতোই আচরণ করছিলেন এবং সবকিছু উপভোগ করছিলেন। নিজাম আমাদেরকে পাগড়ির রত্ন প্রদান করলেন প্রতিটি নজরের বিনিময়ে। এক পর্যায়ে আমরা মাথা নত করে দরবারের এক পাশের কক্ষে গেলাম।

এখানে আমরা থামলাম উজির আরিস্তু জাহের সাথে কথা বলতে। তাকে দেখতে নিজামের চাইতে বয়সে অনেক ছোট মনে হচ্ছিল এবং পরনেও ছিল সাধারণ পোশাক। তার একমাত্র অলংকার ছিল একটি সুবর্ণ পেটি ও তাতে সংযুক্ত হীরকখচিত খাপে একটি ছুরি। তিনি মামা বরুণ নামে এক বৃদ্ধা পরিচারিকার সাথে কথা বললেন...।

অতঃপর রেসিডেন্ট আমাদেরকে একটি ঘটনা বললেন, যা তখনই ঘটেছে এবং যার মাধ্যমে নিজামের সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া গেল। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে শহরে বেশ কিছু ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল এবং নিজাম ঘোষণা করলেন, আর একটি ডাকাতির ঘটনাও যদি ঘটে তাহলে তিনি কিছু অপরাধীর শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। একদিন সকালে কোতোয়াল নিজামের সামনে তিনজন লোককে উপস্থিত করে জানালেন যে, রাতের বেলায় শহরের রাস্তায় মাতাল অবস্থায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিজাম নির্দেশ দিলেন কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে তাদের উড়িয়ে দিতে। লোকগুলোর দণ্ডাদেশ কার্যকর হয়ে যাওয়ার পর প্রধান ওমরাহদের একজন দরবারে এসে জানালেন যে ওই লোকগুলো তার অধীনে কর্মরত সৎ

BanglaBook.org

লোক। তারা একটি আনন্দ উৎসব থেকে ফিরছিল, যেখানে তারা মদ পান করেছিল। উজির আরিস্তু জাহ এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোতোয়ালকে ধমক দিলেন তার দায়িত্বহীন বয়ানের কারণে তিনজন লোকের প্রাণদণ্ড হওয়ায় এবং তাকে ত্রিশ হাজার রুপি জরিমানা করলেন।”

মুহূর্তটি ছিল চমকপ্রদ: মোগল আনুষ্ঠানিকতা, নজর প্রদান ও গ্রহণ- তাৎক্ষণিভাবে বিচার নিষ্পত্তি করার রীতি-যদিও কোম্পানির দাপট ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়ে চলছিল এবং নতুন ইউরোপীয় ধারা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এলফিনস্টোনের বর্ণনায় সে যুগের হায়দারাবাদ দরবারে মহিলাদের প্রাধান্য ও আকস্মিক উপস্থিতি লক্ষ করার মতো এবং আরও লক্ষণীয় ছিল দুই প্রবীণা পরিচারিকার মধ্যে মামা বরুণের প্রভাব, যিনি রাজ পরিবারের আয়া এবং পাঁচ বছর আগে খার্দলা অভিযানের সময় মহিলা ব্যাটালিয়নের প্রধান ছিলেন। এখন দরবারে তিনি অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রধান হিসেবে দায়িত্বশীল এবং তার মহিলা সিপাহীরা নিজামের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করছে।

হায়দারাবাদ সম্পর্কে স্ট্রাচে ও এলফিনস্টোনের বর্ণনায় সবচেয়ে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন, যা আগের কোনো পর্যটকও উল্লেখ করেননি, তা হচ্ছে নতুন ব্রিটিশ সেনানিবাস সম্পর্কে কেউ কোনো বিবরণ দেননি, যে সেনানিবাস ছিল পুরনো শহরের দশ মাইল উত্তরে বানজারা পাহাড়ের ওপরে।

সেনানিবাস স্থাপনা ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁবুর শহর, যেখানে নিজামের সাথে জেমসের দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য বসবাস করছিল। স্ট্রাচে সেনানিবাস দুই মাইল এলাকা জুড়ে ছিল বলে বর্ণনা দিয়েছেন। সৈন্য ও তাদের অনুসারীদের বসবাসের জন্যে নির্মিত কুঁড়ে ও তাঁবু মিলিয়ে বেশ বড় শহরের মতো মনে হচ্ছিল। অবস্থান উঁচুতে হওয়ায় হোসেন সাগরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যেত সেখান থেকে। এলফিনস্টোন যোগ করেছেন যে, তাঁবুর শহর অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। এক অর্থে তিনি বলেছেন যে, প্রাচীর বেষ্টিত প্রমোদ উদ্যান পুরনো কুতুব শাহী বরাদরিতে ছিল না ব্রিটিশ রেসিডেন্সি। সেনানিবাস পুরোপুরি ভারতীয় পরিবেশে অগোছালো ইংরেজ প্রভাবপূর্ণ ছিল বলা চলে। এখানে দুই ইংরেজ তরুণ ইউরোপীয় দোকানে কেনাকাটা করতে গেছেন—দোকানটিতে শুধু ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত বিলাসসামগ্রী বিক্রি হত—এলফিনস্টোন গনোরিয়া সারাতে ইউরোপীয় চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করেন, খোলা মাঠে রেজিমেন্টাল থিয়েটার উপভোগ করেন। তারা শিকারেও যান (যদিও মাত্র একটি পেঁচ শিকার করতে পেরেছিলেন), সৈন্যদের সাথে বল নাচে অংশ নেন, জুয় খেলেন এবং অফিসার্স মেসে বিলিয়ার্ড খেলেন। তখনো সেনানিবাসে স্থায়ী কিছু গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এই সেনানিবাস ছিল ভ্রূণের মতো যা শিগগির

হায়দারাবাদের জমজ শহর সেকেন্দ্রাবাদের রূপ নিতে থাকে এবং বর্তমানে সেটি সম্প্রসারিত হায়দারাবাদের সাথে একাকার হয়ে গেছে। তাছাড়া সেনানিবাসের বিকাশ ছিল অতি দ্রুত। 'মাত্র আঠারো মাস পর ১৮০৪ সালে শরৎকালের মধ্যে সেনানিবাস আয়তনে কানপুরের মতো বড় শহরে রূপান্তরিত হয়।'

এই সেনানিবাস শুধুমাত্র নিজাম ও তার দরবারের জন্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রই ছিল না, জেমস এবং রেসিডেন্সিরও প্রতিপক্ষ ছিল। কারণ, রেসিডেন্সির নিয়ম সেনাবাহিনীর নিয়মের পরিপন্থী হয়ে যেত। জেমস অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করতেন যে, হায়দারাবাদে ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের প্রধান তিনি। কিন্তু তার কর্তৃত্বকে বিরক্তির সাথে প্রতিহত করছে তারই সাবেক কমান্ডার একজন লে. কর্নেল। তদুপরি সেনাবাহিনীর মধ্যে জেমসের অনেক পুরনো সহকর্মীও ছিল, যারা তার দ্রুত পদোন্নতি ও কোম্পানির কূটনৈতিক দায়িত্ব লাভ করায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল, বিশেষ করে তাদের যখন মনে পড়ত যে মাত্র আট বছর আগে জেমস অজ্ঞাত একজন জুনিয়র লেফটেন্যান্ট ছিল। দূরবর্তী এক উপজাতীর দুর্গের কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে কোম্পানির চাকরিতে অন্যতম লোভনীয় একটি পদে তার উত্থান তার নিজের মেধার চাইতে বরং তার ক্ষমতাধর সৎ-ভাইয়ের প্রভাবের কারণে ছিল। জেমসের মুসলিম পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান, হায়দারাবাদি রীতিপ্রথার প্রতি তার পক্ষপাতিত্বের কাহিনির কারণে তার সাবেক সেনা সহকর্মীদের সাথে সদ্ভাব থাকার কথা নয়। বিশেষ করে কর্নেল জেমস ড্যালরিম্পেলের মতো কিছু সহকর্মী, যারা টিপুর কারাগারে কাটিয়েছেন এবং তাদের বেশকিছু সহকর্মীক ইসলাম গ্রহণ করতে দেখেছেন, দাক্ষিণাত্যের মুসলিম পোশাক পরিধান, পাগড়ি ধারণ ও গোঁফ রেখেছেন সহজ শর্তের বিনিময়ে। কয়েদিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমনকি টিপুর সৈন্যদের আধুনিক ইউরোপীয় সামরিক কৌশল প্রশিক্ষণ দিতেও সম্মত হয়েছিলেন মহীশূরের স্ত্রী, অফিসার ও ড্রিল সার্জেন্ট হিসেবে পদ লাভের বিনিময়ে। সে কারণে সেনানিবাসের সৈনিকেরা ধর্মান্তরিত ও ইসলামী মনোভাবপন্ন ইউরোপীয়দের পক্ষত্যাগী বিবেচনা করত এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুরোপুরি মিশে যাওয়া জেমসকে গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত।

জেমসের প্রতি অপছন্দ ও অবিশ্বাস সম্পর্কে স্ট্রাচে ও এলফিনস্টোন আঁচ করেছিলেন যখন তারা হায়দারাবাদে আসার পথে শ্রীরঙ্গপতমে আর্থার ওয়েলেসলি ও তার গ্যারিসনের সাথে অবস্থান করেন। তাদের ডায়েরির বক্তব্য অনুসারে 'ওয়েলসলি বিদ্রুপ করে জেমসকে উল্লেখ করতেন 'হাশমত জং' বলে এবং এলফিনস্টোন জেমসের প্রতি বিরূপ ধারণা নিয়েই হায়দারাবাদ পৌঁছেন। তাদের হায়দারাবাদের পথে যখন জেমসের একজন দূত সাক্ষাৎ করতে আসে, উদারভাবে রেসিডেন্সিতে তাদের বসবাসের প্রস্তাব দেয় তখন ডায়েরিতে তার

প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল: 'বিরক্তিকর! হাশমত জং-এর সাথে কে যাবে থাকতে?' কিন্তু হায়দারাবাদে পৌঁছার পর জেমস তাদের অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে অভ্যর্থনা জানানোর ফলে তারা বিস্মিত হন এবং আবিষ্কার করে লিখেন যে, 'জেমস সকল বিচারে একজন ইংরেজের মতোই।' জেমস তাদেরকে দুসপ্তাহ ধরে অতি জাঁকজমকের সাথে আতিথেয়তা প্রদানের পরই কেবল এলফিনস্টোন জেমস সম্পর্কে উষ্ণতার সাথে লিখতে শুরু করেন। যদিও তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল জেমসের শিকারের দক্ষতা। 'মেজর কার্ক লক্ষ্যভেদী শিকারি', বানজারা পাহাড়ের বালি হাঁস শিকারে যাওয়ার পর এলফিনস্টোন সপ্রশংস মন্তব্য লিখেন।

১৮০১ সালের আগষ্ট মাসে যখন স্ট্রাচে ও এলফিনস্টোন হায়দারাবাদে আসেন, তখন অতিরিক্ত ব্রিটিশ বাহিনী ও রেসিডেন্সির মধ্যে উত্তেজনা অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল, যদিও তখনো তা প্রকাশ্য হয়নি। কিন্তু তিন মাস পর তারা চলে যাওয়ার আগে নিরীহ দর্শন সেনানিবাসের তাঁবুর সারি কার্কপ্যাট্রিকের জীবনে ঝড় তোলার মতো রূপ নিচ্ছিল।

সেপ্টেম্বর মাসে পুরনো শহরে মহররমের অনুষ্ঠান চলাকালে জেমসের সাথে ক্ষুব্ধ অসন্তোষ প্রকাশ্য রূপ নেয় এবং বহুলভাবে জেমসই তার নিজের ওপর এ ঝড় আনার জন্যে দায়ী।

হায়দারাবাদ শহরের ওপর পবিত্র মহররম মাসের চাঁদ দেখা দেয়ার পর হযরত ইমাম হোসেনের প্রতীক ঘোড়ার নাল এবং অসংখ্য ফুলের মালা নিজামের কাছে প্রেরণ করেন উজির আরিস্তু জাহ এবং 'নিজামের হাজার বছরের শাসন' করার সৌভাগ্য কামনা করেন। গোলাম হোসেন খান হায়দারাবাদের ওপর লিখিত তার ইতিহাস গ্রন্থ 'গুলজার-ই-আসিফিয়ায়' লিখেছেন: চাঁদ দেখা দেয়ার দ্বিতীয় রাতে নিজামের প্রহরীদের উপস্থিতিতে ফুলের মালা পৌঁছার পর প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী নিজাম গোসল করে সুগন্ধি মেখে সবুজ রঙের জামা এবং মণিরত্নের অলংকার পরে, চুলে তেল মেখে শ্রদ্ধার সাথে মালাভর্তি পাত্রটি মাথায় তুলে নেন এবং খালি পায়ে ধাপে ধাপে মানুষের মধ্যে মিশে যান, রাস্তার দুপাশে শরবত ও খাবার নিয়ে অপেক্ষমাণ লোকদের অতিক্রম করে অগ্রসর হন ' হোসাইনি আলম' সৌধের পানে। সেখানে তিনি হোসেনের প্রতীকের সাথে মালাগুলো বেঁধে দেন এবং ফাতেহা পাঠ করতে থাকেন।'

এভাবেই শুরু হয় প্রতি বছরের দশদিনব্যাপী মহররমের অনুষ্ঠান। হায়দারাবাদের দুটি বিখ্যাত উৎসবের একটি যদি মাওলা আলীর উৎসব হয়ে থাকে, তাহলে অন্যটি মহররমের অনুষ্ঠান। দুটিই প্রধানত শিয়াদের উৎসব, কিন্তু একটি থেকে আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মাওলা আলীর উৎসব উপভোগ্য অবকাশ যাপনের, প্রাচীন শহর হায়দারাবাদের সংকীর্ণ গলি থেকে নিষ্কৃতি

BanglaBook.org

লাভের, আর মহররমের অনুষ্ঠান পালিত হয় শহরেই এবং এর মাঝে আন্তঃবিভাগ ও বৈচিত্র্য আছে।

উৎসব আয়োজিত হয়, মধ্যযুগের ইয়র্কের রহস্যজনক নাটক প্যালিও অফ সিয়েনার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী মহল্লাবাসীদের দ্বারা, যারা একে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় শোক মিছিলের আকৃতি ও জাঁকজমকের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে সুফি, ফকির এবং আধ্যাত্মিক লোকজন বিশেষ করে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং নিজ মহল্লার প্রতীক বহন করে রাস্তা প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রা নিয়ে, তারা পড়শি মহল্লার বিরুদ্ধে নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় প্রস্তুত। 'এভাবে তারা প্রত্যেকে তাদের মহল্লা থেকে বের হয় প্রথা অনুসারে পদমর্যাদা বজায় রেখে। রীতি বহির্ভূতভাবে শোভাযাত্রায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করলেই বিবাদের সূত্রপাত ঘটে এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা গ্রেফতার হয়। নিজাম মিছিলকারীদের অস্ত্রধারণ ও রক্তপাতের বিরুদ্ধে কঠোর নির্দেশ জারি করার পূর্বে অতীতে এভাবে বহু খুনোখুনির ঘটনা ঘটেছে।'

মহররম মাস আসলে শোকের হওয়ার কথা। এ মাসকে, বিশেষ করে ১০ মহররম আশুরা পালন করা হয় কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদের বাহিনীর হাতে মহানবীর প্রিয় নাতি এবং মাওলা আলীর পুত্র ইমাম হোসেনের শাহাদাত বার্ষিকী হিসেবে। এ ঘটনা ঘটেছিল ৬৮০ সালে। শোক মিছিলে প্রতীক বহন করা হয় কারবালায় হোসেনের বাহিনীর বহনকৃত প্রতীকের প্রতিনিধিত্বের স্মারক হিসেবে। ইমাম হোসেনের স্মরণে সুন্দরভাবে রচিত 'মর্সিয়া' গায় মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। মর্সিয়ায় হোসেন, তার সঙ্গী নারীপুরুষের তৃষ্ণা, ইয়াজিদের হাতে নির্মম নিপীড়নের বিষয় তুলে ধরা হয়। এ ঘটনাকে শিয়া সম্প্রদায় ইতিহাসের সবচেয়ে বিয়োগান্তক শাহাদতের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে।

এ সময়ে কালো বস্ত্র ধারণ করা হয়। মাংস খাওয়া, ধূমপান, পান চিবানো এবং যৌন মিলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মদ্য পানের ওপর দুর্বল নিষেধাজ্ঞা থাকলেও স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বরং বেশি পান করতে দেখা যায়। পুরুষরা নগ্ন পায়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটে। মহিলারা তাদের চুলের বেণী খুলে দেয়, চুড়ি খুলে ফেলে শোক বস্ত্র ধারণ করে। জেনানা মহল থেকে চারপায়া অপসারণ করা হয়, যার ফলে সবচেয়ে অভিজাত বেগমকেও মহররমের সময় ভৃত্যদের মতো মেঝেতে বসে কাটাতে হয়। দিনের পর দিন ধার্মিক শিয়া পুরুষেরা তাদের বুক চাপড়ায় এবং যাদেরকে মহানবীর যথার্থ উত্তরাধিকারী বিবেচনা করে তাদের ওপর ঘটে যাওয়া করুণ অধ্যায়ের স্মরণে নিজেদের শরীরে চাবুকের আঘাত করে। মিছিলের দর্শকরাও অসহনীয়ভাবে আর্তনাদ করে, মহিলারা তীক্ষ্ম বিলাপে ভেঙে পড়ে, যেন দুনিয়ার সমাপ্তি চলে এসেছে। তারা সমস্বরে চিৎকার করে, 'আল্লাহ আমাদের বাঁচাও! মা'আধ আল্লাহ! মা'আধ আল্লাহ!' মর্সিয়া গায়করা

BanglaBook.org

দলে দলে বের হয়ে আসে তাদের একান্ত 'আশুরাখানা' থেকে। তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় শ্রোতাদের অশ্রু বিসর্জন বাধ্য করতে অথবা এমন আধ্যাত্মিক পর্যায়ে তোলে যে তারাও বিলাপ করে বুক চাপড়াতে শুরু করে। কিছু কিছু বাড়িতে মহিলারা তাদের নিজস্ব 'মজলিশ' আয়োজন করে, যেখানে আলোকসজ্জিত জেনানায় গালিচার ওপর বসে গায়িকারা মর্সিয়া এবং আধ্যাত্মিক গান গায়। কখনো অভিজাত মহিলারা তাদের নিজেদের রচিত কবিতাও আবৃতি করে।

আরিস্তু জাহ এবং মীর আলম অন্যতম সংস্কৃতিবান ওমরাহ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী ছিলেন। তাদের দুজনই তরুণ মেধাবী হায়দারাবাদি কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন 'মর্সিয়া' রচনায় চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করতে। প্রতি বছর জেমস ও তার সহকারীরা আসতেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর 'আশুরাখানায়' তাদের পৃষ্ঠাপোষকতা লাভকারী কবিদের মর্সিয়া শুনতে। একজন ইতিহাসবিদ লিখেছেন, 'আরিস্তু জাহ এ ধরনের সমাবেশের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং প্রতি রাতেই তিনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। আরিস্তু জাহের সমাবেশে উপস্থিত কবিরাও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন যে, অন্যান্য মর্সিয়া গায়ক ও বিলাপকারীরা পরিচয় গোপন করে সমাবেশে আসত এবং জনপ্রিয় মর্সিয়াগুলো কণ্ঠস্থ করে নিজেদের সমাবেশে পরিবেশন করত, যার ফলে অনিবার্যভাবে কলহ হত এবং শহরের কবিদের মধ্যে এ নিয়ে বিবাদ বাধত। নিজাম এবং তার উজির মর্সিয়া অনুষ্ঠানের সাথে এতই একাত্ম ছিলেন যে মর্সিয়া অভিজাতদের মধ্যে রেওয়াজে পরিণত হয় এবং তারা দিল্লি ও লক্ষ্মৌ থেকেও কবিদের আনতে প্রতিযোগিতা শুরু করেন। এক বছর আরিস্তু জাহ ১৭টি এবং নিজাম ২০টি মর্সিয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং সাধারণ ওমরাহ্‌রা প্রত্যেকে দু'তিনটি করে অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন।

সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ আশুরাখানা ব্যবহার করতেন নিজাম আলী খান সেটি প্রাচীন বাদশাহী আশুরাখানা। আওরঙ্গজেব হায়দারাবাদ দখলের পর শিয়াদের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে নিপীড়নের অংশ হিসেবে এই আশুরাখানাকে তার ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করেছিলেন, যা নিজাম সম্প্রতি সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেছেন। সাফাভি স্থাপত্যকলার অনুসরণে নির্মিত এই অনুপম আশুরাখানা দেখতে ইস্ফাহানের চাইতে ব্যতিক্রম মনে হবে না, যা এখনও ভারতে বিদ্যমান সবচেয়ে সুন্দর টালির কাজে সমৃদ্ধ। জটিল কারুকাজে সমৃদ্ধ টিয়ার মতো সবুজ, ক্যানারি পাখির মতো হলুদ এবং সারসের মতো সাদা রঙের টালি মন কাড়ার মতো। এখানে প্রতি মহররম মাসে তামা ও রৌপ্য নির্মিত চৌদ্দটি প্রতীক (মহানবী, তাঁর কন্যা ফাতিমা এবং আলীসহ বারোজন ইমামের স্মরণে স্থাপিত) সোনালি কারুকাজ করা কোরআনের আয়াত খচিত গিলাফ দ্বারা আচ্ছাদন করে দেন নিজামের পরিবারের সদস্যরা। খ্রিস্টানদের

মতো শিয়া ইসলামের অভ্যন্তরে নিরীহদের ওপর অন্যায় নিপীড়নের ঘটনায় পূর্ণ। ঠিক মধ্যযুগের খ্রিস্টানরা সত্যিকারের ক্রসকে কেন্দ্র করে যেভাবে তাণ্ডবে লিপ্ত হয়েছিল।

বাদশাহী আশুরাখানার প্রাচীর এবং অভ্যন্তরভাগ খিলান শোভিত। মহররমের প্রথম রাতে নিচু হাজারটি খিলান মাটির প্রদীপে সজ্জিত করা হয় এবং পরবর্তী রাতগুলোতে পর্যায়ক্রমে ওপরের খিলানে প্রদীপ জ্বালানোর হয় এবং ১০ মহররম পর্যন্ত এ আলোকসজ্জা অব্যাহত থাকে। প্রতিটি প্রাচীর জ্বলজ্বল করতে থাকে হাজার হাজার প্রদীপের আলোতে। এক কবি এর বর্ণনা দিয়েছেন, 'আলীর আলোকিত উদ্যান' বলে, 'যা দশ হাজার জ্বলন্ত, ব্যথিত হৃদয় দ্বারা উজ্জ্বল।' এসবের বাইরে ভেতরের চত্বরের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলি খনন করা হয়, যা পূর্ণ থাকে আগরবাতি দ্বারা এবং গোলাপের সুগন্ধিযুক্ত ধোঁয়ার মেঘ 'আশুরাখানার' ওপর দিয়ে শোক মিছিলকারীদের মতো ভবনটি প্রদক্ষিণ করে।

মহররমের অনুষ্ঠানের সকল বিষাদ ও যে ঘটনার স্মরণে এসব পালন করা হয়, তার মধ্যেও একটি বিশেষ দিক থাকে—প্রতি রাতে আতশবাজি। প্রতিটি বাড়ি তেলের প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়, ঠিক যেভাবে হিন্দুদের দিওয়ালি উৎসবে করা হয়। ভারতে এবং বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে ইসলাম স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়ে গেছে, রূপান্তরিত হয়েছে এবং ব্যাপকতর হিন্দু পরিবেশে মিশে গেছে। ভারতে মহররমের মিছিলে কারবালায় হোসেনের সমাধির কাঠের প্রতিকৃতি 'তাজিয়া' বহন করা হয় শোকার্তদের দ্বারা। হায়দারাবাদে কখনো কখনো দুশোটি তাজিয়া পর্যন্ত বহন করা হয়। এই প্রথা উড়িষ্যার পুরীতে অবস্থিত বিখ্যাত রথ মন্দির জগন্নাথ মন্দিরের অনুকরণে চালু হয়েছে বলে প্রায় নিশ্চিত ধারণা করা যায়। এর চাইতেও হিন্দু রীতি তাজিয়ার ক্ষেত্রে পালিত হয়, তাজিয়ায় শস্য, চাল, রুটি, ফল, ফুল, পানির পাত্র ইত্যাদি হোসেনের উদ্দেশে নিবেদন করা, যেমন হিন্দুরা মৃতের উদ্দেশে 'পিণ্ড' দানের ক্ষেত্রে করে থাকে।

১৮০১ সালের সেপ্টেম্বরে আবদুল লতিফ শুস্তারি হায়দারাবাদে মহররমের যে অনুষ্ঠানমালা প্রত্যক্ষ করেছেন তার সাথে ইরানের কট্টর শিয়া পরিবেশে বেড়ে উঠার সময় দেখা অনুষ্ঠানের কোনো মিল খুঁজে পাননি। তার পরিবর্তে এগুলো রূপান্তরিত হয়ে গেছে ইন্দো-ইসলামী সাংস্কৃতিক বলয়ে, যার সাথে হিন্দুদের নদী উৎসব কুম্ভ মেলার অভিন্নতা খুঁজে পান তিনি। শুস্তারি লিখেছেন, 'আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, ভারতে মুসলমানরা কীভাবে শোক প্রকাশ, উপবাস ও আশুরাখানায় পালিত অনুষ্ঠানে হিন্দুদের নিয়মগুলোর নকল করেছে। দুটি দল আর্তনাদের প্রতিযোগিতা করে, বুক চাপড়ায় এবং শরীর থেকে রক্তপাত না হওয়া পর্যন্ত এবং অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত নিজের শরীরে

BanglaBook.org

চাবুকের আঘাত করতে থাকে।...এর চাইতে অদ্ভুত হলো, নীচু স্তরের লোকজন ছদ্মবেশ ধারণ করে, পশুর চামড়া দিয়ে শরীর আবৃত করে, কেউ উট সাজে, কেউবা সিংহ, এরকম। সড়কের মোড়ে, গলিপথে নিজ নিজ প্রতীক নিয়ে অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে, তারা আগুন জ্বালায়। নারীপুরুষ তাদের বুক চাপড়ায় ও নাচে। কিন্তু কখনো ক্ষুধার্তকে খাবার ও তৃষ্ণার্তকে পানি দেয় না।'

গোলাম হোসেন খানও মহররমের অনুষ্ঠানে পশুর চামড়া ধারণকে অদ্ভুত বলে বর্ণনা করেছেন: 'কিছু সিংহ ভেড়ার গলায় কামড় বসায় এবং শিরায় দাঁত ফুটে রক্ত বের হয়। এই রক্ত সিংহের চামড়া পরিহিত মূর্তিকে আরও ভয়ংকর দর্শন করে তোলে। শহরে এবং বেগম বাজারে এ ধরনের চামড়া পরা মানুষের সংখ্যা দুশোর কম নয়।

দশম দিবসে অধিকাংশ মানুষ পুরাতন সেতুর নিচে সমবেত হয়। অনেকে উন্মাদের মতো হয়ে যায়, মাথায় বহু রং বিশিষ্ট টুপি পরে, অন্যেরা হরকরার মতো কোমরে পেটি বাঁধে। তাদের ঢোলক বাজিয়ে শহর প্রদক্ষিণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে বিবাদ হয়, সংঘর্ষ ঘটে, যা সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকলে আরও ভয়াবহ পরিণতির দিকে যেতে বাধ্য।

এ সময় দুজন তরুণ সুগঠিত দেহের অধিকারী ইথিওপীয় আবির্ভূত হয় তাদের দেহ সোনালি পাতায় আবৃত করে। তাদের মাথায় পাগড়ি, তারা রাস্তায় নামে আরও ২৫ জন ইথিওপীয় ও আরবসহ। সকলে সশস্ত্র। অন্য সকল সিংহরূপধারী ভীরু শৃগালে পরিণত হয় এবং ওই দুজনের মুখোমুখি হতে সাহস করে না। কেউ যদি সাহস করে এগিয়ে যায়, তাহলে তারা তাদের কাঠের লেজ কেটে ফেলে। এইসব অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম একসাথে অংশ নেয় এবং দশম দিবসে যেদিন হোসেন শাহাদাত বরণ করেন, সেদিন সকালে তাদের প্রতীক, তাজিয়া এবং পূর্ণ আকৃতির 'বোরাক' বা উড়ন্ত ঘোড়ার কাঠের মূর্তি বহন করে মুসি নদীর দিকে 'হোসাইনী আলম'-এর দিকে যায়। তখন থাকে হাতি এবং আরব ও পাশ্চাত্যের প্রশিক্ষণ দেয়া সিপাহীরা..হিন্দু ও মুসলমানরা হাজারে হাজারে যোগ দেয়, সবার মাথা খালি এবং পা নগ্ন। তারা বুক চাপড়িয়ে আর্তনাদ করে 'হায় হোসেন! হায় হোসেন!' বলে। হিন্দুরা বিশেষ করে পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে প্রতীকের সাথে ঝুলিয়ে দেয় ফুলের মালা..। ধনী দরিদ্র সকলের বাড়ি থেকে লোকজন পুরাতন সেতুর ফটকের কাছে যায়। বিলাপকারীরা তাদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে নদীর পানে যায়। দরবেশ, হরকরার পোশাকধারী, সিংহের ছদ্মবেশধারী সকলে আলীর প্রশংসা করে সেখানে সারা রাত অবস্থান করে। লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হবে। হাতির সংখ্যাও অনেক এবং হাতির ওপর থেকে লোকদের ওপর ছিটানো হয় সুগন্ধি। ঘোড়া অগণিত। যাদের পক্ষে সম্ভব তারা তাঁবু এনে নদী

BanglaBook.org

তীরে স্থাপন করেন। সমগ্র হায়দারাবাদে এর চাইতে চমৎকার দৃশ্য আর নেই।”

গোলাম আলীর বিবরণে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমস্যার বিষয়টি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অতীতে কীভাবে সংঘর্ষে কত মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। বিশেষ করে শহরের বিভিন্ন মহল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী ফকিরদের মিছিলের সংঘর্ষ। সাধারণতা সংঘর্ষ বাধত যখন তারা মুসি নদীর তীরে সমবেত হত, যেখানে তারা তাদের প্রতীক ধৌত করত-কুম্ভ মেলায় প্রতি এক যুগ পর বিভিন্ন মতের সাধুরা যে প্রতীক ধৌত করে ও মালা পরায় মহররমের প্রতীক ধৌত করার সাথে তার প্রত্যক্ষ মিল রয়েছে। একই সাথে মিল রয়েছে উভয় ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংঘর্ষের।

এই আধ্যাত্মিক উন্মাদনার সাদৃশ্যের ব্যাপারটিও ১৮০১ সালের মহররম উৎসবের সময়ে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের মন জুড়ে ছিল নিরাপত্তার দিকটি।

এক রাতে শোকের প্রাবল্যে আচ্ছন্ন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে নিজাম জেমসকে প্রাসাদে তলব করেন এবং তাকে বলেন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে অতিরিক্ত বাহিনীকে নিয়োগ করা যেতে পারে। জেমস এতে সম্মতি দেন। নির্দেশ পাঠানো হয় ব্রিটিশ সেনানিবাসে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সৈন্যের একটি খণ্ডাংশ মাত্র শহরে আসে। দশ দিন পর জেমস উইলিয়ামকে লিখেন, ‘গত মহররম উৎসবে নিজাম শহরে শৃঙ্খলা রক্ষায় একটি শক্তিশালী ব্যাটেলিয়ন পাঠানোর প্রয়োজনের কথা বলেন এবং আশা করেন যে, কর্নেল ভাইগর (নতুন কমান্ডার) একটি শক্তিশালী ব্যাটেলিয়ন পাঠাবেন। কিন্তু তিনি মাত্র সাতশো আশিজন বন্দুকধারী সৈন্যকে পাঠান অনেক চেষ্টা করে এবং আমি শুনেছি যে, অতিরিক্ত বাহিনীকে যদি কালই কোথাও পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে তাহলে উপরোক্ত সংখ্যার অধিককে পাওয়া যাবে না।’

একদিন পর আরও কিছু বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার পর জেমসের সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় তিনি মর্মাহত হন। সেনানিবাসে বড় ধরনের প্রতারণামূলক তৎপরতা চলছে। মাদ্রাজে শয্যাশয়ী উইলিয়ামকে তিনি জানান, ‘বিষয়টি নিয়ে আমি যত ভাবি, ততই বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে, সেনানিবাসে গুরুতর কোনো চক্রান্ত চলছে, যা খুব সহসা বন্ধ করা যাবে না... ।’

জেমস সন্দেহ করেছিলেন যে, নিজাম অতিরিক্ত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম, তাঁবু ও বাহনের জন্যে যে ভাতা প্রদান করেন, অফিসাররা তার অধিকাংশই পকেটস্থ করছে। তাদের কাছে যে প্রয়োজনীয় বন্দুক ও কামান ছিল না, শুধু তাই নয়, পর্যাপ্ত সংখ্যক তাঁবুও ছিল না।

এ বিষয়ে পরবর্তী দিনগুলোতে আরও তদন্ত করার পর প্রকাশ পেল যে, জেমস যে আশঙ্কা করছিলেন প্রকৃত অবস্থা তার চাইতেও খারাপ। তার তদন্তে

BanglaBook.org

দেখা যায়, 'আমার তথ্য যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে সেনানিবাসে চার হাজারের অধিক বন্দুক নেই, অথচ চুক্তি অনুযায়ী থাকার কথা সাত হাজার দুশো বন্দুক। অন্যভাবে বলা যায়, নিজাম যে সংখ্যকের জন্যে ভাতা প্রদান করেন তার অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশি সৈনিক আছে।' জেমস উপলব্ধি করেন, 'এ অবস্থা তাকে অসম্ভব এক যন্ত্রণাকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলবে। কারণ তিনি অনিবার্যভাবে দুর্নীতির অভিযোগে পড়বেন বিষয়টি জানাজানি হলে। কতদিন ধরে এ অসততা গোপন রাখা যাবে। কিন্তু অতিরিক্ত বাহিনীতে কী ভয়াবহ দুর্নীতি চলছে। আমাদের সরকার এবং এই রাজ্য কীভাবে আমার ওপর দায়িত্ব চাপিয়েছে এবং অনিবার্য পরিণতির দায় চাপবে আমারই ওপর, যদি বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় অথবা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই কী গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে।

কর্নেল ভাইগরের শারীরিক ও মানসিক স্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে এবং মনে হয়, আমাদের পর্যায়ে উপনীতদের মধ্যে কমবেশি সাধারণ দুর্বলতা থাকার কথা, কিন্তু তার সম্পর্কে সচেতনতা থাকতে হবে এবং নিজেদেরকে তা মোকাবেলা করতে হবে।'

জেমসের সূত্রগুলোর মধ্যে একজন নিঃসন্দেহে ফায়জির পুত্র ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পামার, যিনি এখন নিজামের অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে যুক্ত এবং সেই পদমর্যাদায় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই ব্রিটিশ সেনানিবাসে তার প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি জেমসকে অবহিত করেন যে, সিপাহীদের পুত্রদের কুচকাওয়াজে হাজির করা হয়, সেনাসংখ্যা কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেখানোর জন্যে।

জেমস নিজেকে নৈরাশ্যজনক এক পরিস্থিতির মধ্যে দেখেন। বিবেক ও তার কর্তব্যবোধের মাঝখানে, ব্রিটিশ ও হায়দারাবাদের মধ্যে আটকা পড়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে, তিনি কি তার সাবেক সেনা সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্যের অবশেষ প্রকাশ ঘটিয়ে দুর্নীতি না দেখার ভান করবেন অথবা নিজামের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করবেন, যার ভিত্তিতে তিনি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর শেষ পর্যন্ত নিজের জনপ্রিয়তা হারানোর বিষয়ে সচেতন জেমস তার ভাই উইলিয়ামকে লিখলেন যে, তিনি জানেন যে তাঁর কর্তব্য কোথায় নিহিত এবং তিনি দুর্নীতি উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর।

BanglaBook.org

একটি বিষয় তিনি জানতেন না যে, তিনি যখন তার তদন্তের কথা লিখেন, তখন তা সেনানিবাসে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো, যখন উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক কমান্ডারকে লিখলেন সৈন্য তালিকা, অস্ত্রশস্ত্রের বিস্তারিত জানাতে এবং বললেন যে, তিনি হায়দারাবাদের কারো কাছ থেকে এই উদ্বেগজনক খবর পেয়েছেন। জেমস অক্টোবরে

উইলিয়ামকে লিখেন, 'তারা এখন জানে যে তাদের প্রতি লক্ষ রাখা হচ্ছে।' কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিলেন যে, ঊর্ধ্বতন অফিসাররা ইতোমধ্যে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করে ফেলেছে-মনোযোগ তার দিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে।

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে হায়দারাবাদ থেকে গভর্নর জেনারেলের কাছে অজ্ঞাত পরিচয়ে কেউ একটি চিঠিতে খায়রুন্নিসা ও তার সন্তান এবং তাদের রেসিডেন্সিতে চলে আসার-যা জেমস কলকাতা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন সবই লিখে পাঠায়। চিঠি ওয়েলেসলি পান পাটনায় অবস্থানকালে। তার সাথে সফররত জেমসের সাবেক সহকারী জন ম্যালকমের কাছে প্রথমে বিষয়গুলো সম্পর্কে খোঁজ নেন এবং চিঠি পাওয়ার এক সপ্তাহ পর গভর্নর জেনারেল তার কলম তুলে নিয়ে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের কাছে অশুভ লক্ষণযুক্ত একটি চিঠি লিখেন—

**একান্ত এবং গোপনীয়**
**পাটনা, ৭ অক্টোবর ১৮০১**

"প্রিয় মহোদয়,
অত্যন্ত বেদনা ও দুঃখের সাথে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, বিভিন্ন মহল থেকে আমার কাছে গোয়েন্দা তথ্য পৌঁছেছে, যার ফলে আমার মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনার ভাই, হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট অপরাধমূলক আচরণ দিয়ে আমার আস্থার অপব্যবহার করেছেন এবং বকর আলী খানের নাতনির সঙ্গে জড়িত ঘটনায় আমাকে ও আপনাকে প্রতারণা করেছেন, যা অতি জঘন্য অপরাধ।

আমার কাছে রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছে তা হচ্ছে, তার অবস্থানের প্রভাব খাটিয়ে এই দুর্ভাগা মহিলার পরিবারকে বাধ্য করেছে তার সাথে বিয়ে দিতে। এই অভিযোগ নিজামের কাছেও গেছে এবং আমি ভেবেছিলাম আপনার ভাই মহামান্য নিজামের কাছে নিজের দোষ স্খালন করে নিয়েছেন এবং তখন হায়দারাবাদের একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিও তার পক্ষে বক্তব্য দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে, কার্কপ্যাট্রিক এই বিয়ের জন্যে প্রভাব প্রয়োগ করে থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি বকর আলীর নাতনিকে প্রতারণা করেছেন, মহিলার গর্ভে তার সন্তানের জন্ম হয়েছে এবং তিনি এখন সেই মহিলার সাথে বাস করেছেন।

হায়দারাবাদে এই অপকর্মের প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ, যা সাধারণ নীতিবোধ এবং মুসলমানদের মর্যাদাগত অবস্থানের ওপর চরম আঘাত এবং তার ক্ষুব্ধ প্রকাশ আশা করা মোটেও অসমীচীন হবে না। আমি এই অপরাধের পরিণতিতে পরিস্থিতির অবনতি চাইবো না। কারণ আমি আপনার

BanglaBook.org

ন্যায়বোধ, সম্মান ও মনের পবিত্রতা সম্পর্কে জানি। সে জন্যে আমি মনে করি সরকারি কর্তব্যের নীতি অথবা ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধ স্মরণে রেখে আমি যে পদ্ধতির অনুসরণ করব তা আপনি ধারণা করতে পারবেন। অতএব, এক্ষেত্রে আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা নতুন কিছু নয়।

মেজর কার্কপ্যাট্রিকের অভিযোগের ব্যাপারে আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মালেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত সাপেক্ষে প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা আমার নেই। অভিযোগের প্রমাণ পদ্ধতি অনুসারে এলে আমি রেসিডেন্টকে তার অবস্থান থেকে অপসারণ করবো এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পুরো সুযোগ দেবো, যাতে তিনি কোনো কঠোর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করতে পারেন। এই পদ্ধতিই আমার কাছে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে বর্তমান অভিযোগের প্রেক্ষিতে। হায়দারাবাদে আমার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির দ্রুত অপসারণের জন্যে উপযুক্ত ও সম্মানজনক প্রমাণ প্রয়োজন।"

এটুকুই যেন যথেষ্ট ছিল না, চিঠি আরও কঠোর হয়ে ওঠে। জেমস যে মারাত্মক প্রতারণার দায়ে দোষী সেই বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে ওয়েলেসলি উইলিয়ামকেও বলেন তার নিজের সুনাম রক্ষা করতে চাইলে প্রকাশ্যে ভাইয়ের নিন্দা করতে—

"আমার প্রিয় মহোদয়, এখন আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, মেজর কার্কপ্যাট্রিক আমার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছেন (যা আপনি জীবনের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন) তা আপনার চরিত্র ও সম্মানকেও আঘাত করেছে। আমি জানি, আপনার ভাই, আমাকে ও সরকারকে প্রতারণা করার চাইতে বেশি প্রতারণা করেছে আপনাকে। এ ঘটনা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে থাকতে পারে, কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস এবং সরকারও কিছু জানতে না পারে এবং এই ভুল চলতেই থাকবে, যদি আপনি কার্যকরভাবে বিশ্বের কাছে বিষয়টি তুলে না ধরেন। আমার কাছে স্পষ্ট যে, আমি যা বলছি তা আপনাকে পীড়া দেবে।

আমি আপনাকে বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আপনার ভারতে অবস্থান অত্যন্ত জরুরি এবং আপনার জন্যেও একটি সুযোগের প্রয়োজন, যাতে আপনি আমাকে এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে আপনার ওপর যাতে কোনো দোষ না আসে তা থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

মেজর কার্কপ্যাট্রিকের ব্যাপারে এরপর যে তথ্যই আসবে আপনি তার বিস্তারিত জানতে পারবেন। ইতোমধ্যে আমার কাছ থেকে আর কোনো তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত আপনি এ বিষয়ে তার কাছে কিছুই প্রকাশ করবেন না বলে আমি আশা করি। তার বিশিষ্ট অবস্থান এবং আপনার সাথে তার

BanglaBook.org

সম্পর্কের কারণে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া মন্থর করতে হচ্ছে, যতক্ষণ না সত্য বিনা দ্বিধায় প্রকাশের মতো উপযুক্ত হয়। অতএব, আমাকে আমার সরকারি কর্তব্যের সবচাইতে বেদনাদায়ক কাজটি করার জন্যে এগুতে হচ্ছে। বেদনাদায়ক হলেও আমাকে শান্তভাবে ধীরে সুস্থে এগুতে হবে।

মহোদয়, বিশ্বাস করুন, আপনার সার্বক্ষণিক বিশ্বস্ত, শ্রদ্ধাশীল, অনুগত বন্ধু ও সেবক

—ওয়েলেসলি।"

এ চিঠি যখন উইলিয়ামের কাছে পৌঁছে সেই সময়ের মধ্যে হায়দারাবাদে লে. কর্নেল বাউসার ও মেজর ওরের কাছে নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছিল যাতে তারা সোজা মাদ্রাজে গিয়ে লর্ড ক্লাইভের কাছে অতি গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে রিপোর্ট করেন। জেমসের জানা ছিল না যে অতিরিক্ত বাহিনীর দুর্নীতি তদন্ত করতে গিয়ে তিনি নিজের জীবন এবং ভারতে তার চাকরি জীবনের ওপর সবচেয়ে গুরুতর হুমকি ডেকে এনেছেন।

সব দিক থেকে তিনি যখন সতর্ক হলেন যে, নভেম্বরের শেষ দিকে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে তদন্ত গুরু হয়ে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

# ৭

১৮০১ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকটি ছিল দাক্ষিণাত্যে চমৎকার এক সময়, যখন আলো অনুজ্জ্বল, সন্ধ্যাগুলো শীতল এবং ছায়া দীর্ঘ-উইলিয়াম এবং ফায়জি পামার তাদের সবকিছু গুছিয়ে পুনায় রেসিডেন্সি থেকে শেষবারের মতো যাত্রা করেন। তারা অগ্রসর হন প্রাচীন গোলকুণ্ডা সড়ক ধরে হায়দারাবাদের দিকে।

ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পশ্চিমের ঘাটগুলো হয়ে তাদের বহর ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। পাহাড়ি এলাকার পরই সীমাহীন সমতলে উন্মুক্ত ফসলের ক্ষেত। উর্বর, পানি সিঞ্চিত কালো মাটি, হাল চষা হয়েছে বলদ দিয়ে এবং ক্ষেতের পরই তাল গাছের সারি ও আমের বাগান। ১৮০২ সালের ৪ জানুয়ারি পামার পরিবার ধূলিপূর্ণ তুলার শহর হিসেবে পরিচিত নিজামের ভূখণ্ডের সীমান্ত সংলগ্ন শহর তুলজাপুরে। জেমস সেখানে উপস্থিত ছিলেন পামারকে স্বাগত জানাতে। কিন্তু খায়রুন্নিসা হায়দারাবাদ রেসিডেন্সিতে ছিলেন, যদিও জেমস এ ব্যাপারে কাউকে বলেননি—খায়রুন্নিসার গর্ভে তাদের দ্বিতীয় সন্তান এবং পাঁচ মাস চলছিল।

পুনায় পামাররা চার বছর কাটিয়েছেন। মুতা ও মূলা নদীর সঙ্গমস্থলের তীরে সাত ঘাটের ঠিক বিপরীতে সুবিশাল ব্রিটিশ রেসিডেন্সি লক্ষ্ণৌ, আগ্রা ও পুনায় সংগৃহীত তাদের বিভিন্ন সম্পদে পূর্ণ ছিল। অতএব সে যুগের মান অনুসারে পামার পরিবারের বহর ছিল বিশাল এবং জেমস গরুর গাড়ির সংখ্যা, মালবাহী গরু, হাতি, উট, মহিষ, সিপাহী, বেয়ারার এবং ফায়জির মহিলা পরিচারিকাদের সংখ্যা দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যান।

পামার পরিবার হায়দারাবাদে মাত্র এক সপ্তাহ বিশ্রাম নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এরপর তারা স্থলপথে নতুন সামরিক সড়ক ধরে কলকাতা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। সড়কটি সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত। কিন্তু দুই পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে যে জেমস তার অতিথিদের আরও কিছুদিন থেকে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, তারা যদি বসন্তের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তাহলে মসলিমপতম থেকে দ্রুতগামী জাহাজ ধরে কম কষ্ট করে দ্রুত কলকাতায় পৌঁছতে পারবেন, যা স্থলপথে সম্ভব নয়। জেনারেল পামার তার কথা মেনে নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ও ফায়জি এপ্রিল পর্যন্ত রাস্তায় নামলেন না। তখন গ্রীষ্মের খরতাপ চলছিল।

BanglaBook.org

হায়দারাবাদের তিন মাসের অধিক সময় ধরে অবস্থানকালে ফায়জি ও খায়রুন্নিসার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, যদিও তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল পনেরো বছর। তারা একত্রে দিন কাটাতেন। শরফ-উন-নিসাও থাকতেন। খায়রুন্নিসার এক বছর বয়সী পুত্রকে নিয়ে তারা খেলতেন। জেমসের মতে, সে সুন্দরভাবে আবোল তাবোল কথা বলতে শুরু করেছিল। ফায়জি তার একুশ বছর বয়সী পুত্র উইলিয়ামকে খায়রুন্নিসার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যার জন্যে জেমস নিজামের অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। খায়রুন্নিসাও ফায়জিকে পরিচয় করিয়ে দেন উজির ও নিজামের জেনানার মহিলাদের সাথে। তাদের সাথে এসেছিল ফায়জির দত্তক কন্যা ফ্যানি খানুম। সম্ভবত সে ছিল পামারের কোনো রক্ষিতার কন্যা এবং ফায়জি তাকে নিজ পরিবারে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন। তখন প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এ ধরনের ঐতিহ্য ছিল।

ফ্যানির বয়স তখন প্রায় দশ বছর। নিজামের নয় বছর বয়সী পুত্র শাহজাদা সোলায়মানের সাথে আনন্দে খেলত সে। পামার পরিবার কলকাতায় রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর জেমস উইলিয়ামকে লিখেন, 'আমি যেন ফায়জি এবং তার ছোট্ট দত্তক কন্যার কথা লিখতে ভুলে না যাই, যার সাথে শাহজাদা সোলায়মান এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যে, সে আমার পরিবারের মহিলাদের পর্যন্ত অনুনয় করে তার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করতে। তারা সকলে ফায়জিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে...।' পরবর্তীতেও জেমস ফ্যানির কথা লিখেন, যাকে সোলায়মান জাহ তার বধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। ক্রমে ক্রমে ফ্যানির প্রভাব শাহজাদার ওপর এতটাই চেপে বসে যে, সে কখনোই তার খোঁজখবর নেয়া থেকে বিরত থাকত না। এপ্রিলের শেষদিকে ফ্যানি গুরুতর অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠার পর জেমস জেনারেল পামারকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, খায়রুন্নিসা তার আরোগ্য লাভের খবর উজিরের পরিবারের মহিলাদের জানাবেন এবং আশ্বস্ত করেন, 'ফ্যানির রোগ মুক্তির খবর যখন উজিরের বাড়িতে আমার পরিবারের বেড়াতে যাওয়ার সময় পৌঁছবে, তখন তার ছোট রাজ প্রেমিকের বুকে আগুন জ্বলে উঠবে।'

BanglaBook.org

জেমস ও খায়রুন্নিসার বংশধরদের কাছে এখন হায়দারাবাদের দরবারি শিল্পী ভেঙ্কটচেলামের অংকিত সোলায়মান জাহ ও তার ছোট ভাই কাইওয়ান জাহের মিনিয়েচার চিত্র আছে। চিত্রে দেখা যায়, সাত-আট বছর বয়সী দুই বালক হোসেন সাগর লেকের পাশে মার্বেলের ছাউনির নিচে অলংকৃত চেয়ারে বসে আছে। তাদেরকে বাতাস দিচ্ছে এক নগ্নপদ পরিচারক। সোলায়মান জাহের পরনে শিশু সৈন্যের পোশাক। নিজাম আলী খানের কনিষ্ঠ পুত্র কাইওয়ান জাহকে আরিস্তু জাহের কাছে দত্তক দেওয়া হয়েছিল ১৭৯৫ সালে উজিরের পুত্রের মৃত্যুর পর। তার পরনে কমলা রঙের পাজামা, গলায় মুক্তার

মালা এবং হাতে একটি দণ্ড। সম্ভবত সোলায়মান জাহকে নিয়মিতই উজিরের জেনানায় আনা হত তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে খেলতে এবং সন্দেহ নেই যে, সেখানেই ফ্যানি ও ফায়জি তরুণ শাহজাদাকে প্রথম দেখে।

ফায়জি এবং খায়রুন্নিসার বন্ধুত্ব সত্যিকারভাবেই গভীর ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে মিল ছিল: উভয়েই পারসিক বংশোদ্ভূত এবং কথা বলতেন ফারসিতে। দুজনই ভারতে দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসী, যারা বড় হয়েছেন ভারতের শিয়া শাসকদের সেনাবাহিনীর পদস্থ পিতার সাথে এবং তাদের মা স্থানীয় ভারতীয়। তদুপরি তারা যাদের প্রেমে পড়েছেন উভয়কে একই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করেছেন। ভিন্ন জগতের ইংরেজকে তারা নিজেদের করে নিয়েছেন। ফায়জি সম্ভবত বয়সের দাবিতেই খায়রুন্নিসার উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তিনি খায়রুন্নিসাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং খায়রুন্নিসাও ফায়জির ভক্ত ছিলেন। পামার পরিবার হায়দারাবাদ ত্যাগ করার পর থেকেই দুই মহিলার মধ্যে চিঠি ও উপহারের প্যাকেটের আদান প্রদান চলতে থাকে। দুজনই শিক্ষিতা এবং চিঠি লেখার প্রতি যত্নশীল। যদিও তাদের চিঠির সবই হারিয়ে গেছে অথবা খায়রুন্নিসার ক্ষেত্রে সজ্ঞানে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, কিন্তু তাদের চিঠির বিষয়বস্তু কী হতে পারে তা তাদের স্বামীদের চিঠি থেকেও ধারণা করা যেতে পারে, যেগুলো এখনও ভালোভাবে রক্ষিত আছে।

ফায়জি এবং পামার উপকূলের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার দু দিন পর জেমস লিখেন, 'আমার ছোট্ট পুত্রের মা ও নানি অত্যন্ত আবেগের সাথে ফায়জি বেগমের নামে শিশুকে প্রগাঢ় চুম্বন করেছে, যাকে আমরা অনুক্ষণ স্মরণ করি।' পরদিন সকালে খায়রুন্নিসা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেমস, খায়রুন্নিসার মা শরফ-উন-নিসা এবং সম্ভবত ডাক্তার ওরে। জেমস ছোট্ট চিরকুটে কন্যার জন্মের সঠিক সময় ও তারিখ টুকে তেরো মাস আগে সাহিব আলমের জন্মের পর লেখা চিরকুটের পাশে রেখে দেন—

> "১৮০২ সালের ৯ এপ্রিল শুক্রবার অর্থাৎ ১২১৬ হিজরি সালের ৫ জিলহজ্ব সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে আমার রেসিডেন্সির (হায়দারাবাদ) বাসভবনে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় তার খালার নাম অনুসারে নূর-উন-নিসা সাহিব বেগম।"

নূর-উন-নিসার অর্থ 'রমণীদের আলো' এবং 'সাহিব বেগম' উপাধির অর্থ 'উচ্চ বংশজাত রমণী', যা শিশুটির ধর্মমাতা ফায়জি বেগমের স্মরণে রাখা হয়েছিল। যথাশিগ্‌গির জেমস জেনারেল পামারকে লিখেন, 'আমার পরিবারের মহিলারা ফায়জিকে তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এবং তার নামের ছোট্ট সাহিব বেগমও, যার অবস্থার উন্নতি ঘটছে প্রতিদিন।' কিছুদিন পর জেমস

BanglaBook.org

উইলিয়ামকে জানান, 'আমার পরিবারের ছোটবড় সকলে ভালো আছে এবং যখনই তারা আলোচনা করে তখন ফায়জির আন্তরিকতার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকে। ফায়জির জন্যে ছোট বেগম এক সেট চুড়ি তৈরি করেছে, যা ছোট্ট ফ্যানি খানুমের জন্যে আরেকটি ছোট সেট তৈরির পর একত্রে পাঠাবো।'

এপ্রিলের শেষ দিকে খায়রুন্নিসা তার বান্ধবীর জন্যে আরও চুড়ি তৈরি করান এবং জেমস লিখেন, 'ফায়জি এবং আপনার ছোট্ট আদরিনীর জন্যে তৈরি চুড়ি পাঠানো সম্ভব হলো না, ডাকে সেগুলো পাঠানোর অনুমতি নেই বলে। আমি সেগুলো জন ম্যালকমের দায়িত্বে দেব এবং আপনাকে অনুরোধ করব বেগমকে আশ্বস্ত করতে যে যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে, আমি তার খেদমতে পাঠিয়ে দেব। এর মধ্যে ফায়জির জন্যে চার সেট এবং ফ্যানি খানুমের জন্যে দুই সেট আছে।'

ফায়জির সাথে খায়রুন্নিসার সম্পর্ক এতই প্রবল ছিল যে তা জেমসের সাথে বিয়ের সম্পর্কের চাইতেও শক্তিশালী এবং বহু বছর পর খায়রুন্নিসার মৃত্যুশয্যায় তার হাত ধরে বসেছিলেন ফায়জি। খায়রুন্নিসার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পরও ফায়জি বিষাদে মুষড়ে পড়া অবস্থায় ছিলেন বলে জেমসের সহকারী হেনরি রাসেল লিখেছেন, 'তিনি বলেন যে, তিনি তার প্রকৃত বন্ধুকে হারিয়েছেন তিনি।'

জেমস এবং জেনারেলের মাঝেও সুসম্পর্ক ছিল, যদিও তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা আসেনি। তারা একত্রে দরবারে যেতেন এবং শিকার করতেন। দীর্ঘ রাত ধরে তাদের নৈরাশ্যের আলোচনা করতেন, বিশেষ করে ওয়েলেসলি ভারতে কোম্পানিকে যে দিকে পরিচালিত করছেন সেসব বিষয় নিয়ে। জেনারেল হায়দারাবাদ ছেড়ে যাওয়ার পর জেমস তাকে আবেগময় ভাষায় এক চিঠি লিখেন, তিনি চলে যাওয়ার পর জেমস যে বিষাদ ও শূন্যতার মধ্যে পতিত হয়েছেন তার উল্লেখ করে। বন্ধুত্বের স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি।

BanglaBook.org

জেমস পামারের কাছে এক চিঠিতে খোলামেলাভাবে স্বীকার করেন যে কীভাবে তারা ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃরি সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। পামার চলে যাওয়ার পরপরই জেমস তাকে পরামর্শ দিয়ে লিখেন, 'আপনার ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলতে চাই যে, আমি নিশ্চিত নই। আপনার শুভাকাঙ্খীরা, যারা আপনার সুদীর্ঘ আয়ু ও সুখ কামনা করত, তারা ভারতের গুমোট আবহাওয়ায় আপনার জীবনের অর্ধেক সময়ের বেশি কাটিয়ে যাওয়ার পর সেভাবে উল্লাসিত হবে কিনা।' এই পর্যায়ে তিনি জেনারেলের জন্যে তার উৎকণ্ঠার ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে দেননি। কিন্তু পরবর্তী এক চিঠিতে এ বিষয়ে আলোকপাত করেন, 'আমি জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছি

যে, ছোট্ট ফ্যানি খানুমকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু আপনি ওর সাথে যাচ্ছেন, এ ধারণার সাথে আমি একমত পোষণ করতে পারছি না এবং আমি জানি না, ব্যাপারটি যদি আমার ওপর নির্ভর করত তাহলে হয়তো আমি আপনার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দিতাম না। কারণ, এদেশে আপনি আপনার জীবনের বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছেন। প্রিয় বন্ধু, স্মরণ করার চেষ্টা করুণ, দীর্ঘদিন আগে আপনি নিজেই সংশয় ব্যক্ত করেছিলেন যে, ইংল্যান্ডের গ্রীষ্মের কঠোরতা আপনি মোকাবেলা করতে পারবেন কি না? তাহলে কীভাবে আপনি মনে করছেন যে, সেখানকার শীত সহ্য করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে।'

জেমস পুরোপুরিই বিশ্বাস করতেন যে, জেনারেল পামার সত্যিকার অর্থে আর ব্রিটেনের নন। ভারতই এখন তার আসল বাসস্থান। জেমস মনে করেন, তাকে যদি কখনো পাশ্চাত্যে ফিরে যেতে হয়, তাহলে তিনি গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়বেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের সাহেবদের দৃষ্টিভঙ্গির চাইতে এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিংশ শতাব্দীর সাহেবরা ভারতে এসে স্বপ্ন দেখত টার্নব্রিজ ওয়েলেসের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির এবং ভারতের জঘন্য আবহাওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করত। জেমসের দৃষ্টিতে তার বন্ধুর বেশি ভয় ব্রিটেনের মধ্য শীতের কনকনে বাতাস। ভারত ও তার বৃদ্ধ বন্ধু জেনারেল পামারের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছিল। পামারের জন্যে তার সন্তানের ইউরোপে পাঠিয়ে ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করা এক জিনিস এবং নিজে গিয়ে অবসর জীবন কাটানো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সম্ভবত জেমস পামারের মতো একজন শ্বেতাঙ্গ মোগলকে পিকাডেলির ভিড়পূর্ণ রাস্তায় লোকজন বিদ্রুপ করতে পারে সন্দেহে তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

পামারের কাছে লেখা জেমসের চিঠিতে বৃদ্ধ জেনারেলের প্রতি তার ভালোবাসা শ্রদ্ধা এবং বন্ধুর জন্যে উদ্বেগই প্রকাশ পেয়েছে এবং এই অনুভূতিগুলোর সাড়াও দিয়েছেন পামার। জেমসের জীবনের এক ঝড়ো পরিস্থিতিতে পামার পরিবার তার সাথে থাকতে এসেছিল। তার মনোবল যখন খুব বিপর্যস্ত তখন তাদের উপস্থিতি জেমসকে শান্ত ও উৎফুল্ল রেখেছিল। ১৮০১ সালের অক্টোবরে উইলিয়াম যখন সাংকেতিকভাবে তাকে ক্ষুব্ধ পত্র পাঠান তখন জেমস প্রথম উপলব্ধি করেন যে, কলকাতার সাথে তার আবার সমস্যা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। উইলিয়াম লর্ড ওয়েলেসলিকে কথা দিয়েছেলেন যে, মাদ্রাজ থেকে পরিচালিত গোপন তদন্ত সম্পর্কে তিনি জেমসকে কিছু জানাবেন না। লর্ড ক্লাইভের তদন্তের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও সাংকেতিক চিঠির উদ্দেশ্য ছিল, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে ভাইকে সতর্ক করা। চিঠিতে উইলিয়ামের সাধারণ গালগল্প ছিল না, আচমকা ও সরাসরি মূল প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছিলেন তিনি। 'প্রিয় জেমস, আমি যখন একজন বিশেষ

BanglaBook.org

মহিলার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তখন তুমি এমনভাবে উত্তর দিয়ে নিজেকে পরিতৃপ্ত করেছিলে যে, এ ব্যাপারে আমি সহজ থাকতে পারি। কিন্তু তা তোমার স্পষ্ট কোনো উত্তর ছিল না।

'আমি বিশ্বাস করি যে, এবার আমি প্রতারিত হবো না, যদি আমি জানতে পারতাম, যে মহিলাটিকে নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে সে এখন এবং অন্য কোনো সময় তোমার সাথে বাস করেনি, তাহলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম।

'এ বিষয়ে অলস চিন্তা আমার একার নয়। তোমার শত্রু আছে। ঈশ্বর জানেন, তারা কে-তারা কোথায় তা অনুমান করা কঠিন কোনো ব্যাপার নয় (সেনানিবাসে অতিরিক্ত সৈন্যদের মাঝে)। লিখিতভাবে অথবা আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো বিষয়ে এ সময়ে তোমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার যোগাযোগ করা উচিত। সবকিছু যেন প্রহরাধীনে এবং সংরক্ষিত থাকে। আমি সংরক্ষিত বলতে বিশেষ করে তোমার সম্পর্কেই বুঝাতে চাচ্ছি।

'আমি যাদেরকে শত্রু বলেছি, হয়তো তাদেরকে সঠিকভাবে বললে অহেতুক বাজে কথা ছড়ানোর লোক বলতে হবে। কিন্তু তারা যেই হোক না কেন, সতর্কতা এবং বাকসংযমী হওয়া তোমার জন্যে জরুরি হয়ে পড়েছে।'

একদিন পর জেমস আরেকটি চিঠি পেলেন, আরও স্পষ্ট। কলকাতা থেকে অজ্ঞাত এক বন্ধু তাকে সতর্ক করেছে। তৃতীয়বারের মতো খায়রুন্নিসার সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্ত হতে যাচ্ছে। যদিও এবারের তদন্তে জেমসের পালন করার মতো কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, তদন্তের বিবরণীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও জেমস যাতে জানতে না পারেন।

এ খবরে জেমস সত্যিই চমকে গেলেন। কিন্তু একই সাথে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। নিজেকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন যে, ওয়েলেসলি তার প্রণয়কে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছেন, ঠিক যেভাবে তিনি পামারকে অপসারণ করেছেন। 'কারণ, আমি তার দায়িত্বহীন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সোজাসুজি গ্রহণ করতে চাইনি, হয়তো তার ধারণা হয়েছিল যে, আমার কাছে তিনি প্রশ্নাতীত আনুগত্য আশা করতে পারেন।' ডিসেম্বরের শুরুর দিকে তিনি উইলিয়ামকে সাংকেতিক চিঠিতে জানান, 'আমার প্রতি লর্ড ওয়েলেসলির আচরণে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ক্ষুব্ধ, বিরক্ত এবং আমি দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতেও উদ্যোগী হয়েছিলাম। এর ফলে কিছু বিদ্বেষী লোকের মধ্যে তাদের বিজয় সূচিত হয়েছে বলে যদি ধারণা না হত তাহলে আমি এজন্যে তদন্তের মুখোমুখি হতে ভীত হতাম না।' চিঠির শেষে তিনি উইলিয়ামকে বলেছেন যে, তিনি ঘোষিত হামলার অপেক্ষা করছেন দৃঢ়তার সাথে এবং দোষী সাব্যস্ত হবার কারণ সম্পর্কে না জেনে পদত্যাগের ইচ্ছা পরিহার করেছেন।

BanglaBook.org

জেমস বিশেষ করে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তার বিয়ের ব্যাপারে জন ম্যালকমের সাম্প্রতিক ভূমিকায়। তারা একত্রে যখন হায়দারাবাদে ছিলেন, দুজনের সম্পর্ক ভালো ছিল এবং জেমসই তাকে তার যে পদমর্যাদা প্রাপ্য ছিল তার চাইতে পাঁচ বছর এগিয়ে এনে হায়দারাবাদে তার সহকারীর দায়িত্ব গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তরুণ স্কট মেধাবী ও উচ্চাভিলাষী এবং ১৭৯৯ সালে জেমসের কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি ভালো উন্নতি করেছেন। এক বছর আগে তিনি ওয়েলেসলির একান্ত সচিবের পদে উন্নীত হয়েছেন। খুব শিগ্‌গির এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তদন্ত যদি জেমসের বিরুদ্ধে যায় তাহলে হায়দারাবাদের তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অগ্রবর্তী সারিতে আছে ম্যালকম। গুজব ছড়াতে শুরু করেছিল যে, ম্যালকম উইলিয়ামকে একের পর এক চিঠি লিখে এই বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে তার বিব্রত হওয়ার বিষয় ব্যাখ্যা করছিলেন। তার বক্তব্য অনুসারে নিজের স্বার্থ ও পুরনো বন্ধুর প্রতি আনুগত্যের মধ্যে একটি বেছে নিতে তাকে বাধ্য হতে হচ্ছে। তিনি কখনো জেমসের বিঘ্নের সুযোগ নিতে চান না এবং উইলিয়ামকে আশ্বস্ত করেছেন যে, হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতি যদিও আমার আকাঙ্ক্ষার বিষয়, কিন্তু বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমার জন্যে এ দায়িত্ব খুব প্রীতিকর ও আনন্দদায়ক হবে না। 'কী করে আমার পক্ষে একজন বন্ধুর সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, যার প্রতি আমার হাজারো বাধ্যবাধকতা আছে, যার কাছে আমি পৃথিবীর অন্য যে কারো চাইতে অধিক ঋণী।'

কিন্তু জেমসের কাছে জন ম্যালকম পুরোপুরি অজ্ঞতার ভান করে যাচ্ছিলেন। জেমসের ব্যাপারে কী ঘটছে তার কোনো ইঙ্গিত দেননি, বা তার ভাগ্য সম্পর্কে কোনো সতর্কতা উচ্চারণ করেননি। এ কারণেই জেমস ম্যালকমের বন্ধুত্ব ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে এখনই সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। ১৮০১ সালের শেষ দিকে তিনি উইলিয়ামকে লিখেন, 'এইমাত্র জন ম্যালকমের একটি চিঠি পেলাম, আবার কী ঘটতে যাচ্ছে তা যদি তিনি জানতেন তাহলে আমাকে বলতেন, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, আমার সাথে তিনি অদ্ভুত আচরণ করছেন।'

জেমসের উৎকণ্ঠার সাথে যোগ হয়েছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ক্রমবর্ধমান আশঙ্কা। অতিরিক্ত বাহিনীর সৈন্যদের সাথে তার সম্পর্ক একেবারে নিম্নতর পর্যায়ে। সেনানিবাসে জেমস এখন শত্রু হিসেকে বিবেচিত, পক্ষত্যাগী ইসলামপ্রেমিক, যিনি অদ্ভুত দেশীয় পোশাক পরেন এবং সেনাবাহিনীর অফিসারদের সততা ও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো অবস্থায় তিনি নেই। কমান্ডার কর্নেল ভাইগর গত অক্টোবরে জেমসের তদন্ত করার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে লিখেছেন: 'শুনতে পাচ্ছি, অতিরিক্ত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার ঘাটতি সম্পর্কে আপনার কাছে খবর গেছে। আমি জানি, এটা আমার কর্তব্য এবং

BanglaBook.org

বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে তাদের দফায় দফায় পরিদর্শন করা আমার আওতায়। আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, তাদের মান অত্যন্ত উঁচু, শুধু উপযুক্ত লোকের সংখ্যার প্রশ্ন নয়.. পোশাকের সামঞ্জস্য এবং তাদের শৃঙ্খলাও দেখার ব্যাপার।'

ভাইগর যথাসময়ে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করার জন্যে জেমসকে আমন্ত্রণ জানান এবং জেমস অবিলম্বে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই পরিদর্শন ছিল বিপর্যয়ের মতো। জেমসকে স্বাভাবিক সতেরো বার কামানের গোলা ছুড়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়নি, কোনো গার্ড অফ অনারের ব্যবস্থা করা হয়নি, এমনকি ব্রিটিশ পতাকাও উত্তোলন করা হয়নি তার সম্মানে। তার চাইতেও অপমানজনক ব্যাপার ছিল, যাদেরকে তিনি পরিদর্শন করতে এসেছেন সেসব অফিসার তার সাথে নৈরাশ্যজনক আচার আচরণ করেছে। রেসিডেন্সিতে ফিরে তিনি একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ লিখেন এবং কপি করে কলকাতায় পাঠান। উইলিয়ামকেও তিনি লিখেন, তার সাথে ভাইগরের আচরণের কথা জানিয়ে: ''ভাইগরের ধনলিপ্সা অত্যন্ত নোংরা পর্যায়ে নেমে গেছে। তার লোভের সাথে কোনো কিছুর তুলনা করা সম্ভব নয়, আর যেক্ষেত্রে অর্থ সীমাহীন। এটা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বিলম্বে হলেও আমি তাকে একটি মাসিক রিপোর্ট পাঠাতে বলেছিলাম, যাতে তার বিপুল সম্পদ আহরণের প্রবণতার লাগাম টানা যায়। এর ফলে তার অহংকারে আঘাত লেগেছে এবং তার প্রকাশও ঘটিয়েছে। তার সব কাজই নিঃসন্দেহে বাজে, কিন্তু এর অসংযত প্রকাশ তুলনাবিহীন যে, তাকে লেখা আমার একান্ত চিঠিও সে তার অনুগতদের পাঠ করে শুনিয়েছে, ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দিয়েছে এবং আলোচনার মাঝেও তারই প্রকাশ ঘটিয়েছে। কর্নেল নিঃসন্দেহে আমার সাথে প্রবঞ্চনা করেছে।'

পরবর্তী বসন্তকালেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটল না এবং পামার হায়দারাবাদ ত্যাগ করার পরই একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। জেমস জানতে পারলেন, অতিরিক্ত বাহিনীর কিছু অফিসারকে জানতে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি আমন্ত্রিত হলে তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে না। জেমসের চিঠিতে সেনানিবাসে তার শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে খোলামেলা ও নিয়মিত উল্লেখ থাকত, 'যারা তার সুনাম ক্ষুণ্ন করা ও ভিন্নভাবে উপস্থাপন করত। তিনি এ ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন যে, তার এসব শত্রু তাকে ভয়ও করে না এবং এমন আচরণ করে যে, তার মর্যাদার ওপর রীতিমতো আঘাত স্বরূপ।'

পুনায় পামারের স্থলাভিষিক্ত কর্নেল ব্যারি ক্লোজের সাথে জেমসের সম্পর্কও একটি ইস্যু ছিল। ব্যারি আর্থার ওয়েলেসলির অ্যাংলো-আইরিশ বন্ধু, যিনি সাধারণভাবে ভারতীয়দের সম্পর্কে ওয়েলেসলির দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করতেন এবং বিশেষভাবে ভারতীয় রাজন্যদের প্রতি। ব্যারি ক্লোজ যখন সরকারি নির্দেশ ও পরিচিতি ছাড়াই অর্থাৎ কূটনীতির প্রাথমিক সৌজন্য পর্যন্ত

BanglaBook.org

ভঙ্গ করে পুনায় আসেন দায়িত্ব গ্রহণ করতে তখন পামার স্তম্ভিত হয়ে যান। জেনারেল পামার জেমসকে লিখেন, ' পেশোয়া'র মধ্যে যদি এক শস্য পরিমাণ সাহসও থাকত, তাহলে তিনি তাকে স্বাগত জানাতেন না। এছাড়া তিনি এত আহম্মক যে, যাকে পাঠানো হচ্ছে তার সম্পর্কে কোনো পরিচয় না দিয়েই তাৎক্ষণিকভাবে তার দরবারে একজন দূত প্রেরণ করাকে তিনি অপমানজনক বলে বিবেচনা করতেন।'

কিন্তু পেশোয়া'র জন্যেই ব্যাপারটি অপমানজনক ছিল তা নয়। ১৮০২ সালের বসন্তকালের মধ্যে জেমসের ভাগ্য অনিশ্চিত, তখন ব্যারি ক্লোজ কলকাতায় তার রিপোর্ট পাঠাতে শুরু করেছেন, যা হায়দারাবাদ হয়েই গেছে। কিন্তু রিপোর্টগুলো বন্ধ থাকত বলে জেমস রিপোর্টের বিষয়বস্তু জানতে পারতেন না। বিদ্যমান ব্যবস্থা হতে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন ছিল। কারণ ব্যারি ক্লোজ পুনায় দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে মারাঠা সীমান্তের ঘটনাবলি সম্পর্কে হায়দারাবাদ রেসিডেন্টের মতামত জানতে চাওয়া হত। ব্যারি ক্লোজের গৃহীত পদক্ষেপে জেমসের জন্যে উপলব্ধি করার যথেস্ট কারণ ছিল যে, তাকে আর নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত বিবেচনা করা হচ্ছে না, বরং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যে তিনি ঝুঁকি হয়ে উঠেছেন। ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গপতমে টিপু সুলতানের প্রাসাদে স্থাপিত ব্রিটিশ চ্যান্সেলরিতে প্রাপ্ত জেমসের পক্ষ থেকে পাঠানো কয়েক শত চিঠি পাওয়ার পর ব্যারির বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, হায়দারাবাদকে যতটা নিরাপদ ভাবা হত, আসলে তা নয়। কিন্তু এসব বিষয় ফাঁস করার জন্যে দায়ী ছিল রেসিডেন্সির গুপ্তচর লক্ষ্মী নারায়ণ, যাকে দ্বৈত ভূমিকা পালনের অভিযোগে তিন বছর আগে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু ব্যারি যে জেমসের নির্ভরযোগ্যতায় সন্দেহ করেছেন তাতে জেমস নিশ্চিত ছিলেন। আরিস্তু জাহের সঙ্গে জেমসের গোপন রফার ব্যাপারে মীর আলম আর্থার ওয়েলেসলিকে যে অভিযোগ করেছিলেন ব্যারি ক্লোজ তার সাক্ষী। তিনি খায়রুন্নিসারকে জানতেন এবং সন্দেহ করে থাকতে পারেন যে, খায়রুন্নিসার ওপর নির্ভর করা যায় না এবং জেমসের ঘরোয়া আলোচনা অনায়াসে হায়দারাবাদের জেনানায় পৌঁছে যেতে পারে। কারণ যাই হোক না কেন, জেমসের প্রতি তার সন্দেহ অব্যাহত ছিল। এ ব্যাপারে জেমসের প্রতিবাদে কোনো ফল হয়নি। পুনার ডাক হায়দারাবাদে আসত, কিন্তু সিলমোহর করা অবস্থায়।

শেষ পর্যন্ত উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের হস্তক্ষেপে জেমস অবহেলিত অবস্থা থেকে মুক্তি পান এবং তার চাকরিও রক্ষা করেন। ঠিক যেভাবে তিনি নয় বছর আগে জেমসকে নতুন পদমর্যাদায় তুলে এনেছিলেন। যদিও উইলিয়ামের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তখন কেপ অফ গুড হোপে থাকার কথা, কিন্তু তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় যে, কয়েক সপ্তাহ খনিজ পানিতে সন্তরণ বা স্নানেও কোনো উন্নতি হবে না। কিন্তু এসবের

BanglaBook.org

গভীরেও তার উপলব্ধি ছিল যে, তার চাকরি জীবনের অবসান ঘটেছে এবং তিনি যদি ভারতে অবস্থান করেন অথবা কখনো যদি ফিরেও আসেন তাহলে সম্ভবত তার মৃত্যু ঘটবে। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তার সৎ-ভাই এর চাকরি রক্ষার্থে তার পক্ষে যা করা সম্ভব তা তিনি করবেন। এর জন্যে যদি ওয়েলেসলির কাছে তার নিজের সুখ্যাতি ক্ষুণ্ন হয়, তাতেও তিনি নিরস্ত হবেন না।

জন ম্যালকমের চিঠি হতেই উইলিয়াম জানতেন যে, জেমস খায়রুন্নিসাকে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে মুক্ত অথবা তাকে তার তুলে দেওয়ার জন্য তার পরিবারের ওপর চাপ প্রয়োগ বা হুমকি প্রদানের প্রমাণও পাওয়া যায়নি। ক্লাইভের তদন্ত মেনে নিয়েছে, ব্যাপারটি অস্বাভাবিক হলেও এটিই সত্য যে, খায়রুন্নিসার পরিবারের মহিলারাই রেসিডেন্টকে মেয়েটির ব্যাপারে প্রলুব্ধ করেছেন, রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে তেমন উদ্যোগ ছিল না। একটি মাত্র গুরুতর রাজনৈতিক অভিযোগের কোনো নিষ্পত্তি হয়নি, তা হচ্ছে ঘটনা গোপন করা। খায়রুন্নিসাকে শয্যায় নেওয়ার মতো নৈতিক স্খলন থেকে জেমসকে ক্ষমা করতে গভর্নর জেনারেল আগ্রহী, এমনকি বিয়ের মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়ার বিষয়ে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি খাটাতে যে জেমস ব্যর্থ হয়েছে এবং তিনি যে অবস্থানে আছেন সেখান থেকে হায়দারাবাদ দরবারের প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণকেও অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। ম্যালকম লিখেছেন, ওয়েলেসলি মনে করেন যে, জেমস একটি দেশীয় দরবারের নারী বিষয়ক অভিসন্ধির কাছে হার মানার মাধ্যমে অতি নিন্দনীয় কাজ করেছেন তার পদমর্যাদাগত কারণে। তবু জেমসের কাজ নিন্দনীয় বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও ম্যালকমের ইঙ্গিত ছিল যে, এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু এটা চাকরি হারানোর জন্যে পর্যাপ্ত কারণ হতে পারে না। ওয়েলেসলি এ যুক্তি মানতে সম্মত ছিলেন না...তার কারণ ঊর্ধ্বতন অফিসাররা রাজনৈতিক তথ্য গোপন করার জন্যে জেমসকে দায়ী করে আসছিল বলে ওয়েলেসলির কান ভারি করছিলেন। ক্লাইভের তদন্ত শেষে দেখা গেল, জেমসের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়ে গেছে যে, তিনি তার প্রণয়ের ঘটনা ঊর্ধ্বতনদের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করেছেন এবং সে প্রসঙ্গে তার চিঠি ও ব্যাখ্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

এই অভিযোগগুলো আসলে উত্তর দেওয়ার মতো ছিল না। কারণ জেমস বাস্তবিক পক্ষেই তার ভাইসহ প্রায় সকলের কাছে খায়রুন্নিসার সাথে তার প্রেমের গভীরতার মাত্রা সম্পর্কে নির্জলা মিথ্যা বলেছেন। তা সত্ত্বেও উইলিয়াম দীর্ঘ বিশ বছরে অর্জিত তার খ্যাতি বিনাশের ঝুঁকি গ্রহণ করে জন ম্যালকমকে লিখলেন যে, জেমস সঙ্গত কারণেই সরকারি চিঠিপত্রে এ ধরনের একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে দ্বিধা করেছেন, কিন্তু উইলিয়ামের কাছে

ব্যক্তিগত পত্রালাপে সবকিছু সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যাতে তিনি গভর্নর জেনারেলের কাছে একান্তে বিষয়টি জানতে পারেন। কিন্তু উইলিয়ামও গভর্নর জেনারেলকে জানাতে দ্বিধা করেছেন, কারণ, 'আমি নিজেকে অতটা স্বাধীন বা বাধামুক্ত ভাবতে পারিনি অথবা এ বিষয়ে আলোকপাত করিনি এক্ষেত্রে আমার ওপর জেমস আস্থা রাখার কারণে।' অন্য কথায় বলা যায়, উইলিয়াম বলতে চেয়েছেন যে, জেমস নয়, তার ব্যর্থতার কারণেই আসলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, জেমসের কারণে নয়।

এই ব্যাখ্যা পুরোপুরি সত্য ছিল না। তবুও জেমসকে অপরাধমুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি আবরণ ছিল এবং প্রণয়ঘটিত সত্য উদঘাটনে ব্যর্থতার দায়ভার পড়ল বড় ভাইয়ের ওপর। জন ম্যালকম এক পর্যায়ে উইলিয়ামকে লিখেন, 'আপনার দেয়া ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড ওয়েলেসলি শেষ পর্যন্ত অন্যায়ভাবে তথ্য গোপন করার অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তার দায়িত্ব অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেখানে তিনি অত্যন্ত সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। ম্যালকম কিছুটা অনাকাঙ্খিত শুভেচ্ছা দিয়েছেন জেমস সাফল্যের সঙ্গে নিজামকে কোম্পানির সাথে তৃতীয় চুক্তিকে স্বাক্ষর করানোর ক্ষেত্রে, যা ছিল পুরোপুরি বাণিজ্যিক বা আর্থিক লেনদেনের-যা নিজামের ওপর জেমসের বিপুল প্রভাবের আরেকটি দৃষ্টান্ত ছিল এবং কোম্পানির প্রতি তার আন্তরিকতারও প্রমাণ ছিল।

পাঁচ মাসের অনিশ্চয়তা এবং তিনটি তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর জেমস আবার প্রেমের কারণে তার পেশা ও সুনামের অবসান ঘটে যাওয়ার পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী স্বস্তি ছিল। ওয়েলেসলি জেমসকে ক্ষমা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও সারেননি, তখনই কলকাতায় অজ্ঞাত লোকের পাঠানো একটি চিঠি পৌঁছল। এটি ছিল, জেমসের সমর্থনে, কিন্তু তা অন্যান্য সমালোচনামূলক চিঠির চাইতে অনেক বেশি ক্ষতিকর ছিল। চিঠিতে ওয়েলেসলিকে গভর্নর জেনারেল হিসেবে 'অত্যন্ত উগ্র, সমস্যা সৃষ্টিকারী, অস্থির' হিসেবে বর্ণনা করা ছাড়াও তার মানহানিকর উক্তি ছিল, যা পাঠে বুঝা যায়, জেমসের ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধুই এটি লিখেছে। চিঠির ওপরের সিলমোহর থেকেও স্পষ্ট, চিঠিটি রেসিডেন্সি থেকেই পাঠানো এবং তাতে প্রমাণিত হয় যে, হায়দারাববাদে যে গুটিকয়েক লোকের রেসিডেন্সি ডাকঘরে প্রবেশাধিকার আছে, তাদেরই একজনের লেখা এই চিঠি। এর প্রেক্ষিতে ওয়েলেসলি জেমসকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে পত্র লেখককে শনাক্ত করতে, যিনি ওয়েলেসলির মতে, 'সে শ্রদ্ধা ও অধীনতার আইনের লঙ্ঘন ঘটিয়েছে ভারতের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর ও স্বেচ্ছাধীন ভাষা প্রয়োগ করে।'

এ ছিল আরেক কেলেংকারির সূচনা এবং এমন এক সময়ে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটল, যখন জেমসের এ ধরনের ঝামেলায় জড়ানোর প্রয়োজন ছিল না।

আরও বাজে দিক হচ্ছে, তিনি যখন তদন্ত শুরু করেন তখন দেখা গেল, পত্র লেখক তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু পামার ও তার স্ত্রী ফায়জির পুত্র ছাড়া আর কেউ নয়। নিজামের অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর তরুণ অধিনায়ক উইলিয়াম পামার।

১৭৮০ সালে লক্ষ্মৌতে উইলিয়াম পামারের জন্ম। এর এক বছর আগে ফায়জি পামারের সাথে যোগ দেন। উইলিয়ামের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন জোফানির আঁকা একটি চিত্রে তাকে সাদা রঙের অযোধ্যার জামা পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। তার জীবনের প্রথম বছরগুলো অতিবাহিত হয় লক্ষ্মৌর উদার, বিশ্বজনীন পরিবেশে। তখন লক্ষ্মৌ ছিল উত্তর ভারতের দরবারি সংস্কৃতির স্বর্ণযুগের কেন্দ্র। এক পর্যায়ে উইলিয়ামকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় শিক্ষালাভের জন্যে এবং ওলউইচে অবস্থিত রাজকীয় সামরিক একাডেমিতে শিক্ষা শেষ করে ১৭৯৮ সালে আঠারো বছর বয়সে ভারতে ফিরে আসে। সংক্ষিপ্ত সময় কাটায় কলকাতার সফল ব্যাঙ্কার তার সৎ-ভাই জন পামারের সাথে। সে ইংরেজি ও ফারসি অনর্গল বলতে পারত এবং ইংরেজ ও মোগল পরিবেশে একই ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বছরগুলো বহু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তাদের মিশ্র উত্তরাধিকারকে প্রধান সংকট হিসেবে দেখতে পায়। যেমন, উইলিয়ামের সমসাময়িক লে. কর্নেল.জেমস স্কিনার অনুভব করতেন যে, তার মিশ্র রক্ত দুধারী অস্ত্রের মতো, যা তাকে দু'দিক থেকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্যে তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্কিনার এবং অধিকাংশ অ্যাংলো ইন্ডিযানের চাইতে উইলিয়ামের ব্যতিক্রম হলো, ব্রিটিশ মোগল সমাজের উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিতদের মাঝে তাদের জন্ম হয়েছে। তার পিতা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, যাতে সে তার উভয় বংশগত পরিচয়কে উত্তমরূপে কাজে লাগাতে পারে এবং মিশ্র রক্তকে প্রতিবন্ধকতার চাইতে আশীর্বাদ হিসেবে দেখতে পায়। উইলিয়াম তার শিক্ষা সমাপান্তে ভারতমুখী জাহাজ ধরলে জেনারেল পামার গর্বের সাথে তার পুরনো বন্ধু ওয়ারেন হেষ্টিংসকে পুত্রের কৃতিত্বের প্রশংসা করে লিখেন।

জেমসের সুপারিশে পামারের প্রথম নিয়োগ হয় নিজামের সেনাবাহিনীর অভিজাত অংশ ফিংলাস ব্রিগেডে। তার যোগদানের পরপরই ১৭৯৯ সালের শ্রীরঙ্গপতমের অভিযান দেখার সুযোগ হয় তার। এরপর তিনি দ্রুত একের পর এক পদোন্নতি লাভ করেন। অতএব বেশ আগে থেকেই তিনি একটি ব্যাটেলিয়ানের অধিনায়কত্ব এবং হায়দারাবাদের বিভিন্ন জেলায় কর আদায়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি যখন এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন তখন ১৮০২ সালের জানুয়ারিতে তার পিতামাতা হায়দারাবাদে আসেন।

BanglaBook.org

কিন্তু উইলিয়াম সৈনিক হিসেবে যা করতে আগ্রহী ছিলেন তা করতে পারেন নি। নিজামের বাহিনীর সাথে তার দায়িত্ব পালনের সময় তিনি বিধ্বস্ত, কিন্তু উর্বর সমৃদ্ধ জেলা বেরার-এ কাটিয়েছেন। মোগল ও মারাঠাদের মধ্যে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে অবিরাম যুদ্ধের পর বেরার অত্যন্ত শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে কাটিয়েছে। পানি-সেচের সুবিধাসহ ভূমিকে অত্যন্ত লাভজনকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। কর সংগ্রহের জন্যে উইলিয়াম পামার যেসব এলাকায় গমন করতেন, সম্ভবত ভাইয়ের উদ্যোগী ভূমিকা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি বিধ্বস্ত এলাকায় পুনরায় বসতি স্থাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। তুলা, নীল ও আফিম চাষের উদ্যোগ নেন এবং উপলব্ধি করেন যে তার স্বপ্নের বাস্তবায়িত হলে তা অত্যন্ত লাভজনক হবে। কারণ, উৎপাদিত ফসল খুব সহজে উপকূলীয় বন্দরে নেয়া যাবে যদি উর্দা গোদারবী নদীকে নাব্য করে তোলা যায়।

হায়দারাবাদে বেড়াতে এসে উইলিয়াম পামার নিশ্চয়ই জেমসকে অন্যান্য পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করতে শুনে থাকবেন, যা নিজামের বিশাল ভূখণ্ডের অনাহরিত সম্পদ কাজে লাগানো সম্পর্কিত। একটি পরিকল্পনা তার মনে বিরাট প্রভাব ফেলে থাকতে পারে-গোদাবরীর উজানে বহু দূরে ম্যালেরিয়াপ্রবণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও সেগুন বনের কাঠ কাটা সম্পর্কে এক বেসরকারি ব্যবসায়ী এবেনিজার রোবাক-এর পরামর্শ। পরিকল্পনাটি কখনো বাস্তবায়িত হয়নি, কিন্তু ১৮০২ সালের মার্চে পিতার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েও উইলিয়াম এ ব্যাপারে রেসিডেন্সিতে প্রচুর আলোচনা ও পত্র বিনিময় হতে দেখেছেন।

এ ধারণা নিশ্চয়ই উইলিয়ামের মাথা থেকে উৎরে যায়নি। কারণ যথাসময়ে তিনি প্রচুর পুঁজি জড়ো করতে সক্ষম হলেন-এর কিছু অংশ কলকাতায় তার সৎ ভাই জন-এর কাছ থেকে। তখন জন পামারের খ্যাতি ছিল, 'প্রিন্স অফ মার্চেন্টস' হিসেবে। তার লক্ষ্য ব্যাপকভাবে গাছ কর্তন ও জাহাজ নির্মাণে নিয়োজিত হওয়া, যাতে নিজামের সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে দূর প্রান্ত ও জঙ্গল থেকে খনিজ সম্পদ, কাঠ ও কৃষিপণ্য আহরণ করা সম্ভব হয়।

তাছাড়া, এক পর্যায়ে উইলিয়াম উপলব্ধি করেন যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চাইতে তার প্রধান একটি সুবিধা রয়েছে, যা ব্যাপক ভিত্তিতে কাজে লাগাতে আমলাতন্ত্রে তিনি চিহ্নিত ছিলেন 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' হিসেবে, ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে নয়। সে কারণে নিজামের ভূখণ্ডে তার জন্যে ব্যাংকিং তৎপরতা পরিচালনার অনুমতি ছিল, যা নিজামের সাথে জেমসের স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তির শর্ত অনুসারে ব্রিটিশ প্রজাদের জন্যে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তার মর্জি অনুযায়ী যে কোনো হারে সুদ আরোপের এখতিয়ার ছিল তার। অন্যদিকে ব্রিটিশ ভারতে ব্যাংকাররা আইনত ১২ শতাংশের অধিক সুদ আরোপ করতে পারত

BanglaBook.org

না। কোম্পানির আইনের প্রতিবন্ধকতামুক্ত উইলিয়াম কয়েক বছরের মধ্যে 'ব্যাংকিং এবং এজেন্সি লেনদেনের' জন্যে একটি মার্চেন্ট হাউজ চালু করার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা তৈরি করেন, যার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমের বাইরেও গোদাবরী নদীতীরের জঙ্গল থেকে কাঠ সরবরাহ, যা জাহাজ নির্মাণে কাজে লাগানো হবে। এই বনগুলো কাঠ সম্পদে সমৃদ্ধ। আকৃতি ও মানের দিক থেকে সেরা। উইলিয়ামের পরিকল্পনা অনুসারে, 'আমরা আরও আশাবাদী যে, বছরের চার মাস আমরা গোদাবরী ও উর্দার চারশো মাইল নৌপথ নাব্য রাখতে সক্ষম হবো। নৌপথ চালু হলে বেরার এবং উপকূলের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগও স্থাপিত হবে।'

উইলিয়ামের উচ্চাভিলাষের মাঝে কনরাডের জগতের প্রতিধ্বনি ছিল, যার সাথে সংশ্লিষ্ট, বাষ্পীয় জাহাজ, উজানে কাঠ কাটা, হাতির দাঁত আহরণ, ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত জঙ্গল উন্মুক্তকরণ ও নদীতে চলাচল উপযোগী নৌযান তৈরি। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিপুল শ্রম দিয়ে এর মধ্যে উইলিয়াম তার কিছু কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়নে সক্ষম হন এবং ১৮১৫ সালের মধ্যে উইলিয়াম পামার এন্ড কোং উপমহাদেশে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতের বাইরে সবচেয়ে সম্পদশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই কোম্পানি নিজামের আর্থিক লেনদেন এবং উজিরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

উইলিয়াম পামার মোগল আমলের শেষার্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ধারণাকে বাস্তবায়ন করেন দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে তার ব্যবসা পাশ্চাত্যের ধাঁচে ছিল না এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছিল। তিনি স্থানীয় মহাজনদের কাজে লাগিয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় অর্থ বিনিয়োগ এবং পরিচালনা করেছেন আংশিকভাবে ভারতীয় রীতি পদ্ধতি অনুসারে। তাছাড়া মোগল কৌশল ব্যবহার করে তিনি উপঢৌকন প্রদান ও নিজামের জেনানায় তার মায়ের বান্ধবীদের আনুকূল্য নিয়ে তিনি প্রভাব বিস্তার ও পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে হায়দারাবাদের একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বলেছেন, 'উইলিয়ামের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে যদি কোনো বাধা আসত তাহলে প্রাসাদের মহিলারা তার দরখাস্তের অনুকূল্যে ভূমিকা রাখতেন।'

১৮০২ সালের সবকিছু ছিল ভবিষ্যতের জন্যে। কিন্তু পুরো সময় জুড়ে উইলিয়াম কাজ করেছেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। উচ্চ বংশজাত অ্যাংলো-মোগল জীবন তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, যা তার পিতামাতার বাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। হায়দারাবাদে তার বাসভবন ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ এক মিলনস্থলে পরিণত হলো, যেখানে ব্রিটিশ ও হায়দারাবাদিরা সমমর্যাদায় মিলিত হত। এক অজ্ঞাত পরিচয় ইংরেজ পর্যটক উইলিয়ামের বাসভবনের বর্ণনা তুলে ধরেছেন, যিনি ১৮১০ সালের দিকে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

BanglaBook.org

> "একদিন সকালে আমি সেখানে যাই এবং বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবসায়ীর সাথে নাশতা করি, যিনি প্রতিদিন সকালে ছোটখাটো দরবারে মিলিত হতেন, যেখানে মহাজন, ব্যবসায়ী, অফিসার, অভিজাতরা আসতেন তাদের আবেদন নিয়ে, অর্থ ঋণ করতে, অর্থ জমা দিতে অথবা ব্যবসায়িক লেনদেন করতে। দেশীয় রীতি অনুসারে সব কাজ হত। মি. পি নামের এই লোকটি সবকিছুর নজরদারি করেন, দরবারের সাথে তার সুসম্পর্ক আছে যখন তিনি একা থাকেন তখন তাদের কায়দায় মেঝের ওপর বসে খাবার খান, মুসলিম স্ত্রীর সাথে আরব্য উপন্যাস পাঠ করেন, বাইজি নাচের অনুষ্ঠানে যান এবং দেশীয় গান উপভোগ করেন।
>
> লোকটি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন এবং বহু তথ্যের আধার। অবশ্যই তিনি দেশীয় লোকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় এবং ব্রিটিশদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক। কারণ তিনি উদার, সকলের সাথে সাড়া দেয়ার মতো, মার্জিত এবং অতিথি বৎসল। দরিদ্রদের প্রচুর দান করেন। তিনি যে প্রাচ্য ধরনে জীবনযাপন বাছাই করে নিয়েছেন, তা তার ক্ষেত্রে বেমানান লাগে না। তিনি দেশীয় মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তার মা দিল্লির অভিজাত বংশের মহিলা।"

উইলিয়াম পামার একজন খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু মুসলিম হিসেবেই তার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখেছিলেন। অতএব সঙ্গত কারণেই উইলিয়াম ভালোবাসা ও সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করতেন মুসলিম রমণীদের, ব্রিটিশ রমণীদের নয়। তিনি ব্রিটিশ ও মোগল সমাজের মধ্যে তাঁর মেধাকে কাজে লাগানোর খাঁটি আওতা বলে বিবেচনা করতেন এবং তা জেমস কার্কপ্যাট্রিকের হায়দারাবাদ রেসিডেন্সির ছায়ায়।

পরিবারের অন্যান্যের মতোই উইলিয়াম পামারও জেমসের জন্যে আন্তরিকতা ও উষ্ণতা অনুভব করতেন, যার বাড়ির ব্যবস্থাপনা তার নিজের বাড়ির মতোই ছিল। একজন লোকের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতেন যিনি তাকে ব্যবসায়ী ও সৈনিক হতে সহায়তা করেছেন, তিনি জেমস কার্কপ্যাট্রিক। জেমস ও উইলিয়াম পামারের মধ্যে এ সময়ের যথার্থ সম্পর্ক অনেকটা অস্পষ্ট। কিন্তু জেমস নিঃসন্দেহে এই তরুণকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন এবং আগে না হলেও ১৮০৫ সালের মধ্যে তিনি রেসিডেন্সির ভবনগুলোর কোনো কোনোটিতে উইলিয়ামের নতুন বাণিজ্যিক অফিস চালু করার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে উইলিয়াম পামারের ব্যবসার সূচনার জন্যে যে উপকার হয়েছিল তাই নয়, তার ব্যবসা খানিকটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রূপ নিয়েছিল, অথচ কোনোভাবেই এটি কোম্পানির সাথে জড়িত ছিল না। বিনিময়ে উইলিয়াম জেমসের অতি গোপনীয় কিছু কাজ করে দিতেন, যার মধ্যে সেনানিবাসে অস্ত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও দুর্নীতির কেলেংকারিও ছিল।

BanglaBook.org

এসব কারণেই উইলিয়াম যখনই জেমসকে তার শত্রুদের আক্রমণের মুখে দেখতেন তখন তার পক্ষে প্রবল ভূমিকা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তার ভূমিকায় জেমস যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখতেন। ওয়েলেসলির কাছে তিনি চিঠি লিখেছিলেন 'ফিলোথেটিস' নাম দিয়ে। পনেরো পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠি চমৎকার গদ্যে, অনুপযোগী ক্লাসিক্যাল দৃষ্টান্তে পূর্ণ আবেগময়ভাবে শুধু জেমসের অবস্থানকে পক্ষপাতিত্বই করেননি, ভারতীয় মহিলাদেরকে বিয়ে করা ও তাদের সাথে বাস করার ব্যাপারে ইংরেজ অফিসারদের সাধারণ অধিকারের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া চূড়ান্ত মন্তব্য করেছেন যে, তিনি কোনো বিধানের কথা স্মরণ করতে পারেন না, যার দ্বারা প্রাচ্যের রাজন্যদের দরবারে নারীসঙ্গ উপভোগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, অথবা এ ধরনের কোনো দৃষ্টান্তকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

চিঠির অসংযত ভাষার মাধ্যমে সেনানিবাসে জেমসের প্রতি আচরণের কারণে ক্ষোভের ছায়াপাত ঘটেছে। 'ফিলোথেটিস'-এর মতে, 'হায়দারাবাদ শিবিরে দলবাজিতে লিপ্ত একটি অংশ আছে, যাদের পরামর্শ সকল দুর্নীতির উৎসধারা।' এই অংশটি জেমসের ত্বরিত উত্থানে ঈর্ষাকাতর, 'ক্যাপ্টেন কার্কপ্যাট্রিক থেকে মহামান্য লর্ডের পক্ষে দাক্ষিণাত্যের দরবারে প্রতিনিধিত্ব — তার যৌবনের দিনগুলোর সঙ্গীরা রেসিডেন্সিতে এসে তাকে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু মহামান্য লর্ড, তাদের অভিনন্দনের মাঝে ঈর্ষার শীতলতা থাকে এবং তাদের উপহারের মাঝে থাকে কূটিলতার অস্থিরতা।' কার্কপ্যাট্রিকের সাবেক সহকর্মীরা এতটাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল যে, 'ফিলোথেটিস' যখন প্রথম হায়দারাবাদে আসেন তখনকার কথা লিখেছেন, 'হাশমত জং-এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসার কথা অহরহ আমার কানে আসত।' এবং যখন তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন মনে হয়, 'হায় ঈশ্বর; তুমি কি মহান! আন্তরিকতা, নম্রতা এবং আতিথেয়তার হাসি তার প্রতিটি কথায়। আমার চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যায়।'

ফিলোথেটিস দাবি করেন যে, তার এই মনোভাব কি একার, যে তিনিই শুধু প্রভাবিত হয়েছেন জেমসের শোভন আচরণ ও আন্তরিক সম্বোধনে। 'জেমস হায়দারাবাদ দরবারে ব্যতিক্রমী ধরনের জনপ্রিয়।' খায়রুন্নিসার জ্ঞাতি ভাই আবদুল লতিফ শুস্তারি, 'যিনি একজন শ্রদ্ধেয় মুসলিম, যার নাম ও পরিচয় মহামান্য লর্ডের অজ্ঞাত নয়' তিনিও খায়রুন্নিসার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জেমসকে নির্দোষ বিবেচনা করেন। 'সবচেয়ে আনন্দময় ব্যাপার হচ্ছে, আমি শুনেছি, দরবারের জেনানার এক মহিলা মেজর কার্কপ্যাট্রিকের প্রেমে নিমগ্ন হয়েছে এবং তিনি তার পক্ষ থেকে এ সম্পর্ককে স্থায়ী করে নিয়েছেন। তিনি কখনো সেই মহিলাকে প্রলুব্ধ করেননি অথবা কখনো অবৈধভাবে উপভোগ করতে চাননি। মেয়েটির আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে সে ছিল

BanglaBook.org

বেপরোয়া। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলে যে আত্মহত্যা করত। ঘটনা যাই ঘটে থাকুক, এই পরিস্থিতির কারণে মেজর কার্কপ্যাট্রিককে কোনোভাবেই দোষারোপ করা যায় না। তবে নৈতিকতার অবস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়ার দৃষ্টান্ত ইউরোপীয় অধিকতর মার্জিত সমাজেও আছে।'

তিনি চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন যে, অতিরিক্ত বাহিনীর সৈনিকরা জানত না যে, 'হায়দারাবাদ শিবিরে এমন একজন লোকও নেই, যার দাক্ষিণাত্যের ভাষা বা ফারসির ওপর পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে কোনো আলোচনা করা মতো।' শুধু জেমস এসব ভাষায় কথা বলতে পারতেন এবং ওয়েলেসলির উপলব্ধি করা উচিত যে, 'মহান গভর্নর জেনারেলের উচিত রেসিডেন্টের প্রতি সীমাহীন আস্থা রাখা।' এরপর ফিলোথেটিস তাকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, সকল বিষয় সম্পর্কে ওয়েলেসলি নিশ্চয়তা পেতে 'পুনার সাবেক রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, তিনি আপনাকে সকল বিষয়ে তথ্য দিতে পারবেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে তার কলকাতায় পৌঁছার কথা।'

যদিও এসব বিষয় অদ্ভুতভাবে এবং কোনো কৌশল অবলম্বন না করেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও শুধু চিঠির ফলে জেমসের কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু 'ফিলোথেটিস' অত্যন্ত ভুল করেছেন এমন আচরণ করে, যাকে হুমকি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং ওয়েলেসলি ইচ্ছে করলে সেটাকে তাকে প্রতারণা করার উদ্যোগ হিসেবে মনে করতে পারতেন, তা ছিল, গভর্নর জেনারেলও কি স্বয়ং এ ধরনের প্রণয়ের সমালোচনা করতে পারেন: 'মহামান্য লর্ডের জন্যে কি এহেন দোষারোপ শোভনীয়? আপনার গোপন কক্ষের রহস্য অনুসন্ধানের দুর্বিনীত কৌতূহল কি ঔদ্ধত্য নয়? আপনার অন্তরের গহীন থেকে আপনি কী আপনার সকল কর্মের প্রকাশ্য তদন্ত ও প্রকাশযোগ্য মনে করেন?'

এর উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক। কারণ এর সবকিছুই জেমসের সাথে জড়িত প্রসঙ্গ। ওয়েলেসলি পবিত্র আত্মা নন। তিনি বাস্তবিক পক্ষে অতিমাত্রায় যৌনকাতর। লন্ডনে স্ত্রী হায়াসিন্থেকে লিখেছেন যে, তিনি যদি তার কলকাতায় যোগ না দেন, তাহলে তিনি যে তার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে পারবেন, এমন ধারণা করা শক্ত। কারণ, 'আমি তোমাকে বলতে চাই যে, এই আবহাওয়া যে কাউকে যৌন উত্তেজিত করে তোলে এবং তা ভয়াবহ রূপে।' পরবর্তীতেও তিনি একই বিশ্বাসের পুনরুক্তি করেছেন এবং একই সাথে স্বীকার করেছেন যে, তিনি তার হুমকি দিয়েছেন যথার্থভাবেই এবং সব ধরনের অপকর্মে জড়িয়ে গেছেন; 'কারণ যৌনকর্ম, এই আবহাওয়ায় একজনকে করতেই হবে—'

সামান্য সমালোচনা সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল এটিকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গ্রহণ করেন। 'ফিলোথেটিস'-এর মতো কারো লেখা এ ধরনের চিঠি ওয়েলেসলির চোখে ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য এবং হুমকিস্বরূপ—তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং চিঠির উত্তর কী হবে তা বলে দিলেন তার দীর্ঘদিনের সচিব

BanglaBook.org

নীল এডমনষ্টোনকে। জেমসের অজ্ঞাত পরিচয় সমর্থক যা লিখেছে সেজন্যে জেমস দায়ী নয়, তা স্বীকার করে ওয়েলেসলি অনেকটা অযৌক্তিকভাবেই এই চিঠিকে জেমসের কূটনৈতিক সাফল্যের বিরুদ্ধে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। তিনি দাবি করেন, জেমস বর্তমানে যে পদে আছেন সেই পদে উন্নীত হওয়ার কোনো যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাকে সেখানে বসানো হয়েছে। চিঠিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং কলকাতা থেকে প্রেরিত নির্দেশ প্রতিপালনে তার আপত্তির উল্লেখ করে জেমসকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, 'তুমি তোমার পদে বর্তমান স্থানেই অবস্থান করতে পারো এবং এ দয়াশীলতার কৃতিত্ব মহামান্য লর্ডের, অন্তত তার সহনশীলতার এবং ন্যায়বিচারের প্রতি তার ভালোবাসার।'

দীর্ঘ তিরস্কারমূলক বার্তার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, জেমস লর্ড ওয়েলেসলির আস্থা পুনরায় লাভ করতে পারে, তার একটাই উপায় আছে, তা হচ্ছে, অবিলম্বে অজ্ঞাত মানহানিকর পত্র লেখককে অনুসন্ধানের ব্যাপারে তার সর্বোচ্চ উদ্যোগ প্রয়োগ করা। ...'মহামান্য লর্ডের এ বিশ্বাস আছে যে, সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তোমার লক্ষ্য, তোমার বৈশিষ্টের প্রতি, বোধ সবকিছু মিলিয়ে তুমি তাকে খুঁজে বের করবে এবং মহামান্য লর্ডকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। এ ধরনের অপরাধীদের জন্যে প্রয়োজন আইন অনুসারে কঠোর শাস্তি।'

জেমস এই চিঠি প্রাপ্তির পর উপলব্ধি করলেন, এই দায়িত্ব পালনে তিনি কখনো সফল হবেন না। ওয়েলেসলির চিঠির প্রেক্ষিতে তার উত্তর ছিল পরিমিত ও মর্যাদাসম্পন্ন রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের ব্যতিক্রমী অতীতকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে তিনি উল্লেখ করেন, 'আমার কূটনৈতিক দায়িত্বের বিস্তারিত বিষয় এবং সে সম্পর্কে লর্ড ওয়েলেসলির অভিমত সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে' এরপর তিনি লর্ডকে ক্রুদ্ধ করারা মতো চিঠির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে জানান যে, 'ফিলোথেটিস'-এর পরিচয় উদ্ধার করার মতো তল্লাশি চালানোর মতো উপায় তার নেই। অথবা কোনো ব্যক্তির অমর্যাদা ও সর্বনাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা তিনি পালন করতে পারেন না। কারণ, তিনি মহামান্য লর্ডের অপমানকে গুরুতর বিবেচনা করা সত্ত্বেও বিবেচনা করেন যে, সমগ্র বিশ্বও এটিকে সহজভাবে নেবে না বলে মনে করেন।

ওয়েলেসলির চাহিদা অনুসারে তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। ক্লাইভ রিপোর্টে তাকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার এবং কোম্পানির কোনো অফিসারের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর পরিচালিত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সবচেয়ে ব্যাপক তদন্তের হাত থেকে নিষ্কৃতি

BanglaBook.org

পাওয়ার এক মাসের কম সময়ের মধ্যে মে মাসের প্রথম দিকে জেমস নিজেকে আবার ঝামেলার মধ্যে দেখতে পেলেন।

এবার তিনি অত্যন্ত বিরক্ত এবং পরোয়া করার মতো মানসিকতায় ছিলেন না। চাকরি ও সরকারি জীবন তাকে হতাশ করলেও তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অজ্ঞাত পত্র লেখককে খুঁজে বের করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে ওয়েলেসলি তাকে চাকরিচ্যুত করতে পারবেন না। জেমস তার গৃহস্থালি ও পিতৃত্বের আনন্দের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। মানসিকভাবে রাজনৈতিক সম্মুভাগ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে ওয়েলেসলির অহংকারকে কমবেশি অগ্রাহ্য করে জেমস স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েন।

জেমস রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও তার চিঠিতে স্পষ্ট ছিল যে, কলকাতায় তার মনিবরা কীভাবে তার প্রতি ক্রমাগত অসন্তুষ্ট হচ্ছে এবং তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে মোটেও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। নিজামের সাথে সমঝোতা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে তিনি পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে বেশ ক'টি চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয়েছিলেন, যা হায়দারাবাদ ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়েছিল এবং স্থায়ী ও টেকসই রূপ দিয়েছিল। ওয়েলেসলি যদি তার লোভের বশবর্তী হয়ে সবকিছুকে তছনছ করে দিতে চান তাহলে জেমসের জন্যে সেটি একটি বড় সংকট।

একই পরিস্থিতিতে এর আগে অনেক কাজ করলেও জেমস এখন নিজেকে পিছনে হটিয়ে নিলেন এবং পরিবারের জন্যে অধিক সময় ব্যয় করতে লাগলেন। তিনি বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি ও উদ্যানের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত হলেন। তিনি এসব করছিলেন তার আধুনিক উত্তরাধিকারীদের চাইতে কিছুটা ভিন্ন ঢং-এ। জন ম্যালকমের মতে, কোম্পানির নতুন উত্তরাধিকারীরা তাদের স্বপ্নপুরী তৈরি করতে শুরু করেছিল যা কলকাতায় 'গভর্নমেন্ট হাউজের' 'জাঁকজমক ও বিশালতাকেও' ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো।

তখন জেমস উপলব্ধি করেন, তিনি যে প্রাসাদসম রেসিডেন্সির পরিকল্পনা করেছিলেন তা হবে মোগল ও ব্রিটিশ স্থাপত্য কৌশলের মিশ্রণে এবং তহবিল যোগান দেবেন নিজাম—যা শুধু নিজের কৃতিত্বের প্রতীক হিসেবেই থাকবে না, বরং ব্রিটেন ও হায়দারাবাদে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৌধ হিসেবেও বিবেচিত হবে, যে সম্পর্ক জোরদার করার জন্যে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং এখন তা বিপদাপন্ন ও যে কোনো সময়ের চাইতে তিক্ত।

উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে জেমস হায়দারাবাদে যে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি লাভ করেছিলেন মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের মতে তা ছিল আংশিকভাবে ইংরেজ ও আংশিক হিন্দুস্থানি রুচির।

১৭৭৯ সালে হায়দারাবাদে প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেন্ট জন হল্যান্ডের আগমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নদীতীরে অবস্থিত একটি সুন্দর, ধ্বংসপ্রায় কুতুবশাহী উদ্যান ভাড়া নিয়েছিল, যেখানে ছিল এক দেশীয় অভিজাতের বাড়ি, যা পরিবেষ্টিত ছিল ছোট ছোট বাগান ও ফোয়ারা দ্বারা। ধ্বংসপ্রাপ্ত উদ্যানের কেন্দ্রস্থলে ছিল বাড়িটি-উন্মুক্ত বারান্দা বা প্যাভিলিয়নসহ। সেটিকে প্রধান ডাইনিং হল ও অভ্যর্থনা কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। এর চারপাশে নির্মাণ করা হয় নতুন বৈশিষ্ট্যের বাংলো এবং রেসিডেন্সির কর্মচারীদের বসবাসের জন্যে ভবন, যার অনেকগুলোই উদ্যান প্রাচীরের ওপর দিয়ে মুসি নদীর শোভা দেখার মতো অবস্থানে ছিল। তা ছাড়িয়ে শহরের গম্বুজ ও মিনারও পরিদৃষ্ট হত।

হায়দারাবাদ রেসিডেন্সি কমপ্লেক্সকে অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, এর বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের প্রতিফলন হিসেবে। কিন্তু বাস্তবে এগুলোকে ১৮০০ সালের মধ্যে অগোছালোভাবে নির্মিত কিছু ভবন হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। জেমসের বাংলো চুয়ে পানি পড়ে এবং তা বন্ধ করার উদ্যোগ সফল না হওয়ায় পুরো বাংলো স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। ১৮০০ সালের আগষ্ট মাসে জেমস উইলিয়ামকে লিখেন যে, বাংলোর ওপরের অংশ আর বাসযোগ্য নেই। বর্ষার অবশিষ্ট দুই মাসে বাংলো প্রায় ধসে পড়ার উপক্রম হয় এবং জেমস কলকাতায় লিখতে বাধ্য হন রেসিডেন্সির কিছু ভবন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় সেগুলোর সংস্কারে তহবিল চেয়ে।

ভবনের ধ্বংসপ্রায় অবস্থাই একমাত্র সমস্যা ছিল না। রেসিডেন্সির কর্মচারী সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অধিক সংখ্যায় ব্রিটিশ সৈন্য, হায়দারাবাদে আসায় পুরনো কুতুব শাহী বরাদরি কোনো পার্টির আয়োজন করার মতো পর্যাপ্ত ছিল না। জেমস কলকাতায় লিখেন, 'যে মুসলিম ভবনটি সবসময় ডাইনিং হল ও বিনোদনের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে তা আর আরামদায়ক ও সুপরিসর নয়। কারণ এর দক্ষিণ দিক উন্মুক্ত, এর ছাদ একটি বিরাট গথিক স্তম্ভের ওপর দাঁড় করানো, যে স্তম্ভ রুমের কেন্দ্রস্থলে এতটা জায়গা দখল করে আছে যে, কোনো অনুষ্ঠানে স্থান সংকুলানে বিরাট অসুবিধা হচ্ছে। কারণ অতিরিক্ত সৈন্যদের উপস্থিতি অতিথি সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি করেছে।'

প্রথম দফায় জেমস বরাদরির দক্ষিণ দিকের খোলা অংশে সুপরিসর একটি হল রুম যুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। এছাড়া তিনি পৃথক একটি স্যুট অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের অনুমতিও প্রার্থনা করেন যেখানে কোনো উপলক্ষে আগত দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনা কক্ষ, একটি শয়নকক্ষ এবং ছোট দুটি কক্ষ থাকবে লেখার কাজের জন্যে অথবা শয়ন কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। পুরো ভবনটির দুপাশে থাকবে বারান্দা, যে দুই দিক আবহাওয়ার জন্য অধিক উন্মুক্ত।

BanglaBook.org

রেসিডেন্সি পুনঃনির্মাণে জেমসের আকস্মিক আগ্রহের আরেকটি কারণ ছিল। ১৮০০ সালে গ্রীষ্মে তিনি যখন নিজামের সাথে সম্পূরক চুক্তির শর্ত আলোচনা করছিলেন তখন তার জমিদার হায়দারাবাদের বিশিষ্ট আমীর নওয়াব শমশের জং বার্ধক্যজনিত কাণে মৃত্যুবরণ করেন। এটিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে জেমস নিজামের কাছে নিবেদন করেন রেসিডেন্সি এলাকা এবং তার সাথে যুক্ত চারপাশের আরও কিছু জমি কোম্পানিকে হস্তান্তরের শর্ত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে। নিজাম এতে সম্মত হন এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার চারদিনের মধ্যে জেমস কলকাতায় লিখেন রেসিডেন্সি পুনঃনির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে। জেমস এখন আর ভাড়াটে নন, তিনি রেসিডেন্সির মালিক, ভবন পুনঃনির্মাণের অর্থ লাভের ক্ষেত্রে কলকাতার জন্যে অপেক্ষা করতে হলেও উদ্যানের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য সাধনের পরিকল্পনা করতে তাকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না।

জেমস ইতোমধ্যে পুনা থেকে জেনারেল পামারের প্রেরিত চারা দিয়ে চমৎকার আম বাগান গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন। এবার তিনি তার ভাই উইলিয়ামকে বললেন প্রথম শ্রেণির পীচ-ফলের চারা সংগ্রহ করে দিতে, কিছুদিন পর প্রচুর কমলা গাছ রোপণ করলেন। চাহিদার বিস্তারিত দেখলেই বোঝা যাবে যে, তিনি উদ্যান রচনায় কতটা উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভাই উইলিয়ামকে তার স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে লিখেন, 'আমি আশা করি তুমি আমার জন্যে এসব সংগ্রহ করে সতর্ক বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু বা পরিচিত কারো মাধ্যমে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিছু সংখ্যক বাড়ন্ত কমলা গাছের চারা, যা অবশ্যই ভালো জাতের হতে হবে। আমার বিশ্বাস সেগুলো পর্তুগাল থেকে আনা যেতে পারে। মাল্টার কমলা আসলেই ইউরোপের সর্বোচ্চ স্বাদের ফল এবং এর রস যেহেতু লাল, সেজন্য বাতাবি লেবুর সাথে এর কলম কেটে ব্যবহার করা যেতে পারে। কাজটা কঠিন হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অবাস্তব হবে না। তুমি জানো, বিলম্বে হলেও আমি এখন উদ্যান প্রেমিকে পরিণত হয়েছি। আমি পর্তুগালের কমলার শ্রেষ্ঠত্ব শুনেছি, যা এখানে নেই। আমার ইচ্ছা আছে, এখানে আমি সেই কমলার আরও উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবো ইউরোপীয় মানের কিছু চারা পেলে। আমি শুনেছি, লক্ষ্মৌতে জেনারেল মার্টিনের একটি ইউরোপীয় কমলা গাছ আছে, যার ফল সেখানে উৎপাদিত যে কোনো কমলার চাইতে সেরা।'

তিনি চিঠিতে আরও যোগ করেন, 'আমাদের বন্ধুর (পামার) কাছ থেকে কিছু আলফনসো ও মাসাগন আমের চারা পেয়েছি এবং আশা করি কয়েক বছরের মধ্যে আমি এই আমের আরও উন্নতি করতে সক্ষম হবো।'...এক বছর পর জেমস অন্যান্য জাতের আমের চারার সন্ধান করছিলেন এবং বোম্বেতে নিয়োজিত তার দূতকে জানান যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে উন্নত জাতের একটি

আম বাগান কিনে ফেলতে। তিনি লিখেন, 'এখন আমার বাগানে রাস্তার দু'ধারে ছয় বছর বয়সী গাছের চারা, সেগুলোতে আগামী মৌসুমে ফল ধরবে বলে আশা করছি। আমি সবগুলোকে পূর্ণবয়স্ক গাছের কলম দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চাই।'

'ফিলোথেটিস'-এর চিঠি নিয়ে ওয়েলেসলির সাথে মত বিনিময়ের পরবর্তী মাসগুলোতে জেমসের চিঠির বিষয়বস্তু কেন্দ্রীভূত ছিল রেসিডেন্সির উন্নয়ন সংক্রান্ত তার পরিকল্পনা কেন্দ্রিক। কূটনীতি ও কোম্পানির উচ্চাভিলাষে বিভ্রান্ত জেমস দেখতে পাচ্ছিলেন, যে পৃথিবী ও সভ্যতাকে তিনি ভালোবাসতে এসেছিলেন তা ধ্বংসের বিপদের সম্মুখীন। অতএব তিনি তার ছোট্ট পরিবারের জন্যে একটি বাসস্থান নির্মাণে এবং মোগল রুচির মিশ্রণে সৃষ্ট পরিবেশে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। অবশ্য তখনো তার মধ্যে জর্জীয় যুগের লক্ষ্য অনুযায়ী নিজের খামার বা উদ্যান সৃজনের মানসিকতা ছিল।

একবার তিনি মাদ্রাজে তার দূতকে লিখেন একটি সুদৃশ্য দেয়াল ঘড়ির জন্য, গাড়ির জন্যে কিছু সুন্দর চাকা, বাঁশি, বারো ডজন মালমসে মদ পাঠাতে। আবার তিনি লক্ষ্মৌতে লিখেন তার পছন্দসই মোগল রুচির জিনিসপত্র-হুক্কার উন্নত মানের নল, লক্ষ্মৌর সুগন্ধি তামাকের বড় একটি প্যাকেট এবং কিছু সোরাহির জন্য। কারণ পানি শীতল রাখার উত্তর ভারতীয় কলসির মধ্যে তিনি লক্ষ্মৌর সোরাহিকে প্রাধান্য দিতেন।

জেমসের অব্যাহত উৎকণ্ঠা ছিল অতিথি আপ্যায়নে চমৎকার চীনামাটির পাত্র ও টেবিল আচ্ছাদনের সুদৃশ্য বস্ত্রের ব্যাপারে। বছরের পর বছর ধরে তিনি তার দূতদের লিখছিলেন উপযুক্ত ধরনের চীনামাটির পাত্রের জন্যে। যা তার রেসিডেন্সির সাথে মানানসই হতে পারে। কারণ তিনি দায়িত্ব গ্রহনের আগে এ ব্যাপারে কোনো মনোযোগ দেয়া হয়নি এবং তিনি আসার পরও সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। 'আমার টেবিল ক্লথ ও ন্যাপকিন স্থানীয় বাজার থেকে সংগৃহীত এবং অত্যন্ত উন্নতমানের, কিন্তু চীনামাটির পাত্রগুলো মাঝেমধ্যে অনুষ্ঠিত নিলাম থেকে সংগ্রহ করা।'

উন্নত জাতের সব্জির বাগান করা জেমসের আরেকটি লক্ষ্য ছিল। কলকাতায় এক বন্ধুর কাছে তিনি মটর শুঁটি, ফ্রেঞ্চ বীন, লেটুস, সেলারির বীজ চেয়ে পাঠান, যাতে এগুলো বাঁধাকপি ও ফুলকপির সাথে নতুন সংযোজন হতে পারে। এসবের বিনিময়ে তিনি হায়দারাবাদে উৎপাদিত সবজির বীজ পাঠানোর প্রস্তাব করেন। জেমস উন্নত জাতের আলু উৎপাদনে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু দু'বছর পর্যন্ত তিনি হায়দারাবাদে আলু পাননি বললেই চলে। মজার ব্যাপার হলো, তখনকার দিনে ভারতে আলু উৎপাদিত হত কলকাতা, বোম্বে ও

BanglaBook.org

মাদ্রাজের আশপাশের এলাকায়, যদিও এখন ভারতীয় রান্না আলু ছাড়া কল্পনা করা কঠিন।

জেনারেল পামারের উত্তরাধিকারী পুনার রেসিডেন্ট কর্নেল ব্যারি ক্লোজের সাথেও সম্পর্কের উন্নয়নে জেমস চেষ্টা চালান। এক্ষেত্রে তিনি ফল-গাছ বিনিময়ের কূটনীতির সাহায্য নেন। এক পর্যায়ে দুজনের মধ্যে হাতি বিনিময়ের সময় জেমস পামারের পুরনো পীচ বাগান থেকে কিছু চারা সংগ্রহের প্রস্তাব করেন এবং লিখেন, 'কয়েকদিনের মধ্যে সিংহলের হাতি পাঠানো হবে এবং আমি এই সুযোগে কিছু পীচ চারা পাওয়ার আশা করছি, যা আমি সাদরে গ্রহণ করব। আমার বাগানে এখন-তিনটি চীনা পীচ গাছ আছে, যা কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে আরও কিছু চীনা গাছের সাথে পাঠিয়েছিলেন ডাক্তার বক্সবার্গ। এগুলো যদি বেড়ে উঠে—অনেকগুলোর অবস্থা এখনও ভালো নয়, আমি পুনা থেকে তিন-চারটি ভালো জাতের ফলের চারা যোগ করতে চাই-পীচগুলো অতি চমৎকার, বিলম্বে পেলেও আমি সাদরে গ্রহণ করব।'

দুই বছরের মধ্যে জেমস এইসব ফল গাছ নিয়ে একটি বিশাল উদ্যান এবং সবজি বাগান সৃষ্টি করেন, যা প্রায় অর্ধমাইল ব্যাসার্ধের। পুরোটাই প্রাচীর বেষ্টিত এবং পীচ, আপেল, কমলা, আনারস, আম, স্ট্রবেরি, রাসবেরি, আঙ্গুর সবমিলিয়ে অপূর্ব এক ভারতীয় বাগান, যাকে পরবর্তী বছরগুলোতে ইউরোপীয় উদ্যান হিসেবেই বলা হত।

এছাড়া জেমস বিভিন্ন ধরনের বাগান সৃষ্টিতে উপযুক্ত লোক সংগ্রহের চেষ্টাও করেছেন। ১৮০২ সালে তিনি মাদ্রাজে তার দূতকে অনুরোধ জানান একজন ভালো ইংরেজ উদ্যান বিশারদ খুঁজে বের করতে। পাঁচ মাস পর তিনি বোম্বেতে লিখেন চীনের একজনকে পাঠাতে, কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, বোম্বেতে চীনা উদ্যানবিদ পাওয়া যায় এবং তারা সবজি চাষের ব্যাপারে বিশেষভাবে পারদর্শী। বিনোদনের প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন ধরনের রঙিন বাতি সংগ্রহের চেষ্টাও চালান, যাতে আলোকসজ্জার জন্যে ব্যবহার করা যায়। তিনি লিখেন, 'চীনে উপযুক্ত মূল্যে এই উপকরণগুলো প্রচুর পাওয়া যায় বলে শুনেছি। আমার দু'ধরনের বাতির প্রয়োজন, একটি বড় বাতি, যাতে গাছ থেকে ঝুলানো যায়। অন্যগুলো ছোট ও গোলাকৃতির, সাধারণ আলোকসজ্জায় ব্যবহার করার জন্যে। প্রথমটি কয়েক শত অথবা একশো হলেও সম্ভবত আমার কাজ চলে যাবে, কিন্তু ছোটগুলো প্রয়োজন কয়েক হাজার, যা জাঁকজমকপূর্ণ আলোকসজ্জার জন্যে প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এসবের মূল্যের ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই...কিন্তু সংগ্রহ করতে যদি মাঝারি দামও লাগে, তাহলেও তা আমাকে ডোবাবে না। আমাকে যদি আপনি চীন থেকে আনার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাহলে আমি আপনার বিশেষ আনুকূল্য হিসেবেই গ্রহণ করব।'

BanglaBook.org

জেমসের একটি অংশে ইংল্যান্ডের জন্যে তার গৃহকাতর অনুভূতি ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু অন্য অংশে ১৮০০ সালের চুক্তির ফলে লব্ধ মোগল সেচধারায় পাশের জমিতে হিন্দুস্থানি উদ্যানকে তিনি চমৎকার সাজানো পরিপাটি বাগানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, যা উইলিয়াম কেন্ট, ক্যাপাবিলিটি ব্রাউন এবং হামফ্রে রেপটন তাদের যৌবনে ইংল্যান্ডে তৈরি করেছিলেন—যা ছিল শান্তিপূর্ণ, পরিশীলিত সভ্যতা সম্পর্কিত ব্রিটিশ ধারণার কেন্দ্রীয় চেতনা। বহমান শীতল পানি, ওপরিভাগে বড় বড় পাতাসমৃদ্ধ গাছের ছায়া, যা মোগলরা পছন্দ করত, ব্রিটিশ রুচি তারই অনুকরণ ছিল। এই উদ্দেশ্যে কিছু লোককে নিয়ে তিনি পরিকল্পনা তৈরি করেন। মোগল বরাদরি থাকবে কেন্দ্রস্থলে এবং তাকে ঘিরে এক মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে প্রমোদ উদ্যান ও হরিণের জন্যে একটি বেষ্টনী। হরিণের সঙ্গ দেওয়ার জন্যে তিনি বোম্বে থেকে ভিন্ন প্রজাতির বড় হরিণ এবং ইথিওপীয় ভেড়া আনান।

ভারতের কেন্দ্রস্থলে তথাকথিত ব্রিটিশ উদ্যান তৈরি সমস্যার ঊর্ধ্বে ছিল না। বছরের শেষদিকে জেমসকে উদ্যানের গাছে পানি সেচের জন্য একটি বা দুটি ইঞ্জিন আনাতে হয়, যাতে দাক্ষিণাত্যের প্রচণ্ড উত্তাপে গাছ শুকিয়ে না যায়। রেসিডেন্সিতে আগত দর্শনার্থীদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে, বিশাল এলাকা জুড়ে নির্মিত উদ্যান প্রধানত ভারতীয় অনুপ্রেরণার ফল। ম্যালকমের মতে, 'জেমসের উদ্যানে ইউরোপের চাইতে প্রাচ্য ধাঁচ অধিক।' জেমস ক্যানাওয়েকে বলেছিলেন, 'তিনি তার উদ্যানকে 'হিন্দুস্থানি হিসেবেই রাখতে চান এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই অপরিবর্তিত দেখতে আগ্রহী। এই 'হিন্দুস্থানীয় উদ্যান' পানিসিঞ্চিত মোগল চারবাগের মতোই, যেখানে পানির ধারা, ফল গাছের সারি, ফোয়ারা আছে। উদ্যানটির শুরু ছিল খায়রুন্নিসার রং মহলের পাশ থেকেই।'

জেমসের মনে ভারতীয় স্বর্গোদ্যানের প্রতি ঝোঁক থাকার প্রেক্ষাপটে এটা সত্যিই বিস্ময়কর লাগে যে, উদ্যানের ব্যাপারে তিনি নিজাম, আরিস্তু জাহ এবং হায়দারাবাদ দরবারে তার বন্ধুদের সাথে কতটা আলোচনা করেছিলেন। কারণ, নিজাম আলী খানের পৃষ্ঠপোষকতায় হায়দারাবাদ দক্ষিণাত্যের শিল্প সাহিত্যের পুনর্জাগরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, অতএব উদ্যান শিল্পের প্রতি নিজামের আগ্রহ দাক্ষিণাত্যের ইন্দো-ইসলামিক ঐতিহ্যের বিকাশের সাথে জড়িত ছিল।

১৭৯০-এর দশক থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত নিজামের শাসনকালের বিবরণী লেখকরা হঠাৎ করে উদ্যানে বেড়ানো এবং হায়দারাবাদের আশপাশে নতুন উদ্যান নির্মাণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যেমন, আরিস্তু জাহের প্রধান বিবি সারওয়ার আজফা বেগম বিশাল এক 'চারবাগ' নির্মাণ করেন, যার নাম 'সুরুর নগর' যেখানে উজির যেতেন অবসাদ কাটাতে। এছাড়া আজফা বেগম একটি হরিণ উদ্যানও তৈরি করেছিলেন, যেখানে আরিস্তু জাহ, নিজাম ও তার

BanglaBook.org

পরিবারের সদস্যরা যেতেন কালো হরিণ শিকার করতে। মীর আলমও উদ্যান প্রেমিক ছিলেন এবং তার সৃষ্টি করা উদ্যান সম্পর্কে এত গর্বিত ছিলেন যে, জীবনের শেষভাগে এসে তিনি বসন্তকালে জনসাধারণের জন্যে তার উদ্যান খুলে দিতেন। 'গুলজার-ই-আসাফিয়া'র বর্ণনা অনুসারে লোকজন সেখানে দলে দলে যেত অবসর কাটাতে ও ঘুড়ি উড়াতে। তখনকার হায়দারাবাদি মিনিয়েচার চিত্রে, বিশেষ করে দরবারি শিল্পী ভেংকটচেলামের আঁকা চিত্রে প্রমোদ উদ্যানের বৃক্ষরাজিই দেখানো হয়েছে। তাছাড়া আছে ফোয়ারা ও সেডার গাছ। হায়দারাবাদি চিত্রের পটভূমিকে এসবের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ভেংকটচেলামের অংকিত আরিস্তু জাহের পুত্র মা'আলী মিয়ার চিত্রে দেখা যায়, তিনি এক উদ্যানে বসে একটি ফুলের সুগন্ধ নিচ্ছেন, একটি পোষা বাজকে আদর করেছেন, পাঁচটি ফোয়ারার ধারা পড়ছে তার পায়ের কাছে রাখা গোলাপ ও একটি পতঙ্গের ওপর। গোলাপি রঙের টিয়ার ঝাঁক গিয়ে বসছে কলাগাছের পাতায়।

নিজামের শাসনকালেই লিখিত, অনূদিত ও কপি করা হয় উদ্যান বিষয়ক গ্রন্থ। একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যান তৈরির ম্যানুয়েল 'রিসালা-ই-বাগবানি' লেখা হয় ১৭৬২ সালে নিজাম আলী খানের শাসনামলে গোলকুণ্ডায়। এতে হায়দারাবাদের উদ্যানপ্রেমিকদের চমৎকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্যে। যা মালিদের বাগান পরিচর্যা ও তাদের বৃদ্ধা স্ত্রীদের কল্পকথার চাইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে সে যুগে। 'রিসালা' গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে, তরমুজ বিশেষভাবে মিষ্টি ও সুস্বাদু করা যায়, যদি বীজ রোপণের আগে বীজগুলোকে সংরক্ষণ করা হয় গোলাপের তাজা পাঁপড়ির স্তূপে এবং যদি মধু, খেজুর, গরুর দুধ এবং যষ্টিমধু কেটে টুকরা টুকরা করে তরমুজ গাছের শিকড়ে দেওয়া যায়। কলাকে দীর্ঘ এবং হাতির শুঁড়ের মতো দৃঢ় করে ফলানো সম্ভব, যদি পশুর বর্জ্যে একটি লৌহ শলাকা সিক্ত করে সেটি উত্তপ্ত করার পর কলাগাছে সেঁকা দেওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের উদ্যান কলার ওপর সমসাময়িক আরেকটি বই 'খাজানা-ওয়া বাহার', বৃক্ষ পরিচর্যা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যে পূর্ণ, যা জেমসের অত্যন্ত কাজে লেগে থাকতে পারে। এটি বিশেষ করে ফলের গাছের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রযোজ্য ছিল। এতে বলা হয়েছে, ফল গাছ যদি ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের ম্লান আলোতে রোপণ করা যায় তাহলে গাছের আকৃতির চাইতে ফলের আকৃতি বৃদ্ধি পাবে। রোগবালাই দমন করার লক্ষ্যে মাটিতে মেশাতে হবে কবুতরের বিষ্ঠা, জলপাই পাতার রস এবং গাছের চারপাশে পুঁতে দিতে হবে বুনো পিঁয়াজের গাছ। বইটির অজ্ঞাত লেখক জেমসের মতো উৎসাহী উদ্যান প্রেমিকদের আম গাছের ভালো আম না হওয়ার সমস্যা সমাধানের উপদেশ দিয়েছেন। যে গাছে আম হয় না, কুঠার হাতে সেটির কাছে গিয়ে যদি চিৎকার করে কেটে ফেলার হুমকি

BanglaBook.org

দেয়া হয় অথবা যদি কোরআনের উপযুক্ত আয়াত গাছের ডালে বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে বেঁধে দেয়া সেই গাছে সহসা প্রাণের মঞ্চার হবে এবং ফল ফলবে। জেমস 'খাজানা-ওয়া বাহার' পাঠ করে থাকলে তিনি জানতে পারতেন যে, বীজশূন্য আঙ্গুর উৎপাদন করতে হলে আঙ্গুর গাছের গোড়ায় মৃগনাভি ও আফিম প্রয়োগ করতে হবে। লাল টকটকে আপেল ফলাতে লোহার দণ্ড দিয়ে নিচের দিকের ডালগুলোকে ঝুঁকিয়ে দিতে হবে এবং পীচ গাছের বৃদ্ধি দ্রুত করতে হবে গাছের শিকড়ে পাইন বা উইলো গাছের কলম জুড়ে দিয়ে। কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পরিবেশসম্মত কিছু চমৎকার পদ্ধতিও তিনি জানতে পারতেন বইটি পাঠ করলে। বাগানের প্রবেশ পথে যদি সরিষা গাছ রোপণ করা হয় তাহলে সাপ সবসময় দূর থাকবে। সবজি চাষ করলে বাগান থেকে মশা বিদূরিত থাকবে।

হায়দারাবাদের উদ্যান প্রেমিকদের কাছে জেমস আরও একটি বিষয় জেনে থাকবেন, তা হলো সান্ধ্য উদ্যান। দিনের বেলায় 'সূর্যের আলোয় ফলগুলো প্রশংসিত হয় তাদের সৌন্দর্যের জন্যে।' কিন্তু সূর্য যখন ডুবে যায়, তখন 'রাতের ফুলগুলো' প্রস্ফুটিত হয় এবং বিস্ময়করভাবে রাতের ফুল সুবাস ছড়ানো এবং চাঁদের আলোতে উজ্জ্বলতর। বিশেষভাবে রোপিত বাগানের এই অংশে থাকে মার্বেলের ছাউনি, তার নিচে বিছানো গালিচার ওপর তাকিয়া রাখা। সেখানে রাত মদ্যপানের, সংগীত, কবিতা ও নারীসঙ্গ মাতোভর। ছাউনির চারপাশে যত্নের সাথে নির্বাচিত নৈশ ফুলের কেয়ারী। এখানে অতি সুগন্ধি যুক্ত গোলাপের সাথে চাঁদনি ফুলের সুবাস মিলে চন্দ্রালোকিত রাতে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় ধারণার সাথে যুক্ত এ ধরনের সুগন্ধি চর্চা। এ ধারণা এসেছে হাদিস থেকে। 'সুগন্ধি হচ্ছে আত্মার খোরাক এবং আত্মা মানুষের গুণের বাহন।'

এতদিন পর একথা বলা অসম্ভব যে, জেমস দাক্ষিণাত্যের নান্দনিক উদ্যানের সাথে পরিচিত ছিলেন কিনা এবং সেই ঐতিহ্য অনুসারেই তিনি রেসিডেন্সির 'চারবাগ' সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিনা। কিন্তু হায়দারাবাদি খাবার, স্থাপত্য, পোশাক, কবিতা ও মহিলাদের প্রতি তার আকর্ষণ থেকে এবং গাছ ও উদ্যানের প্রতি তার অনুভুতিই প্রমাণ করে যে, তার ওপর দাক্ষিণাত্যের উদ্যান শিল্পের প্রভাবও অনিবার্যই ছিল। দুটি স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, জেমস হায়দারাবাদের প্রচলিত উদ্যান শৈলী গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমটি, রেসিডেন্সির জন্যে বাছাইকৃত বৃক্ষ রোপণ, যেগুলোর অনেক গাছ এখনো টিকে আছে এবং তার গাছগুলোর সাথে মাওলা আলী পাহাড়ের পাদদেশে মাহলাকা বাই চান্দা তার মায়ের প্রাচীর বেষ্টিত কবরের উদ্যানে রোপিত গাছের সাদৃশ্য আছে। দু'স্থানেই 'মুলসারি' নামে এক ধরনের

BanglaBook.org

গাছের প্রাধান্য পরিলক্ষিত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, রেসিডেন্সির কবুতর খোপ, যা খায়রুন্নিসার মহলের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও আছে। কবুতর পোষার ব্যাপারটি কখনো জর্জীয় ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকার কারণ নেই এবং ব্রিটিশ ভারতে এ ধরনের নজির পাওয়া যায় না। এটি বিশেষভাবে মোগল অভিজাতদের সামাজিক জীবনের পরিশীলিত এক ধারণা ছিল এবং তাদের প্রমোদ উদ্যানের বিনোদনের অনিবার্য উপসর্গ হিসেবে বিবেচিত হত। হায়দারাবাদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। 'খাজানা-ওয়া-বাহার'-এর একটি অধ্যায় নিবেদিত হয়েছে কবুতর এবং হায়দারাবাদের সংস্কৃতিবান আমীরদের উদ্যানে এর স্থানের ওপর।

কবুতর যে শুধু সাপকে দূরে রাখে তাই নয়, কবুতরের বিষ্ঠা ফল গাছের পরিচর্যার আদর্শ জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কবুতরের বাকবাকুম শব্দ এবং অন্যান্য আচরণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়ক বলে বিশ্বাস করা হয়। অজ্ঞাত পরিচয় লেখক পাঠকদের পরামর্শ দিয়েছেন আগরবাতি জ্বালাতে, কবুতরের পানীয়তে মধু মিশিয়ে দিতে, যাতে উদ্যানে তারা সুখী ও পরিতৃপ্ত থাকে।

এই উপদেশগুলো জেমস ও খায়রুন্নিসা অনুসরণ করেছে কিনা তা অনুমান করা অসম্ভব ব্যাপার।

BanglaBook.org

১৮০২ সালের এপ্রিলে পামার পরিবার চলে যাওয়ার পর জেমসের প্রতিদিনের কার্যক্রম তার দুই সন্তান ও তরুণী স্ত্রী কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, যেন ফায়জি ও জেনারেলের সফরের সময় তাদের ওপর এক ঝলক সূর্যের আলো পড়েছিল, তা থেকে হঠাৎ তারা আবার ছায়ার পেছনে হারিয়ে গেছেন। আমরা জানি যে, তারা সেখানে আছে এবং জেমস তার অধিকাংশ সময় তাদের সাথে কাটাচ্ছেন। শুধুমাত্র মেঘের আড়ালে থেকে সূর্য উঁকি দেওয়ার মতো হঠাৎ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আলো ছড়িয়ে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। একদিন খায়রুন্নিসা ও সাহিব আলমকে ফায়জি ও ফ্যানির জন্যে শুভেচ্ছা ও আরও কিছু চুড়ি পাঠাতে দেখা যায় তো অন্যদিন দুই শিশুকে পাঠানো হয় ডাক্তার ওরের কাছে বসন্ত বা কলেরার প্রতিষেধক নিতে। ১৮০২ সালের অক্টোবরে জেমস পামারকে লিখেন: 'আমার দুই সন্তানকেই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে এবং তাদের স্বাস্থ্য ভালো আছে..ধীরে ধীরে আমি নিজাম ও আরিস্তু জাহকে বুঝাতে চেষ্টা করছি, যাতে তারাও তাদের পরিবারে প্রতিষেধক গ্রহণের চর্চা শুরু করেন।'

জেমসের চিঠির কথাগুলো এক এক করে সাজালে তার পরিবারের একটি পুরো চিত্র সামনে চলে আসে যে, তিনি পরিবার ও সন্তান পরিচর্যায় মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। এটি স্পষ্ট ছিল যে, সন্তান লালনপালন করতেন খায়রুন্নিসা

ও তার মা। তাদের সহায়তার জন্যে ছিল প্রচুর সংখ্যক আয়া ও পরিচারিকা এবং পরিবেশ ছিল পুরোপুরি হায়দারাবাদি। তারা বড় হয়েছে মুসলিম হিসেবে, মোগল ধরনের নাম রাখা হয়েছে এবং কথা বলত ফারসিতে (সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের উর্দুতে)। খায়রুন্নিসা ইংরেজি জানতেন না। এছাড়া হায়দারাবাদি অভিজাত শ্রেণির পোশাকই পরত তারা। তাদেরকে রেসিডেন্সির ইংরেজদের সাথে মেলামেশা করতে দেওয়া হয়েছে এমনও মনে হয় না। তাদের অভিজাতসুলভ মর্যাদার কারণেই সম্ভবত অন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিশুদের সাথে খেলাধূলা করতে উৎসাহিত করা হত না। যেমন হেনরি রাসেলের অজ্ঞাত পরিচয় রক্ষিতার গর্ভে জন্মলাভকারী সন্তানের সাথেও মিশতে দিত না খায়রুন্নিসার সন্তানদের। সকল বিবরণ থেকে মনে হয়, মহলটি পুরনো শহরের বিক্ষিপ্ত একটি অংশ ছিল রেসিডেন্সির অর্ধ ইংরেজ পরিবেশের মাঝখানে। তাছাড়া জেমসের সন্তানেরা প্রধানত অন্যান্য হায়দারাবাদি অভিজাত জেনানার শিশুদের সাথেই খেলত, বিশেষ করে আরিস্তু জাহের প্রাসাদের সদস্যদের সাথে।

মোগল হায়দারাবাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আলিঙ্গনের মাঝে জেমসের সন্তানেরা সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম শিশুদের মতোই স্বাভাবিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়েই কাটিয়েছে। জন্মের সময়টাই ছিল আনুষ্ঠানিক যাত্রার প্রথম ধাপ। প্রসবের দিনে শিশুকে পরিচ্ছন্ন করার পরই তার ডান কানের কাছে উচ্চারণ করা হয় 'আজান', এরপর বাম কানের কাছে পাঠ করা হয় 'কালিমা'। চোখ খোলার সাথে সাথে শিশুকে পবিত্র শব্দের সাথে পরিচিত করানোই এই উদ্দেশ্য। অপেক্ষমাণ কৌতুহলী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ের মাঝে বিতরণ করা হয় পান। এরপর শুকনো খেজুরের ছোট্ট টুকরা একজন শ্রদ্ধেয় কাজী সাহেব চিবিয়ে শিশুর মুখে দেন, এর খানিক পর মুখে দেওয়া হয় সামান্য মধু মিশ্রিত পানি—যা প্রথমে পরিষ্কার নরম কাপড়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। প্রথম প্রথাটি মধ্যপ্রাচ্য আর দ্বিতীয়টি হিন্দুদের আচরিত প্রথা, যা দাক্ষিণাত্যের মোগল সংস্কৃতিতে একাকার হয়ে গেছে। এরপর শিশুটির মুখে প্রথমবারের মতো পুরে দেওয়া হয় মায়ের স্তনের বোঁটা। অভিজাত মোগল মহিলাদের প্রথা অনুসারে খায়রুন্নিসা স্বয়ং তার সন্তানদের স্তন দান করেননি, পরিবর্তে তাদের দেওয়া হয়েছে দাই মায়ের কাছে, যারা কোনো কোনো মোগল জেনানায় শিশুদের তিন থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করাত।

দাই নির্বাচন করাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, তার দুধ শিশুর মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলির অনুপ্রবেশ ঘটাবে। সৎ, ধার্মিক, ভালো মেজাজ সম্পন্ন মহিলা, যাদের সর্ব বিষয়ে খ্যাতি আছে তাদেরকে এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য বাছাই করা হয়। বিশেষ করে অভিজাত ও সাইয়িদ পরিবারের মধ্য থেকে, যারা কোনো কারণে দারিদ্রে নিপতিত হয়েছে। দুধ পান করানো শেষ হলে দাই মা সেখানেই তার নিজের

BanglaBook.org

সন্তানদের নিয়ে চলে আসত এবং প্রাসাদের সদস্যদের মতোই সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বাস করত। সাহিব আলম ও সাহিব বেগমের দাই মা যথাক্রমে উম্মাতুল ফাতিমা ও মাহাম আলুপাইম-এর বংশগত পটভূমি সম্পর্কে কোনোকিছু জানা যায় না, কিন্তু তারা শরফ-উন-নিসার সাথে তাদের পুত্র কন্যাদের নিয়ে বাস করছিল এবং চল্লিশ বছর পর শরফ-উন-নিসা যখন তার দুই নাতি নাতনিকে শুভেচ্ছা পাঠান তখনো তারা সেখানেই ছিল।

কোনো মেয়ে শিশুকে দুধ পান করানোর দুই বা তিন দিন পর আরেকটি ছোট্ট প্রথা পালন করা হয়। ভারতে সব সময় এই প্রথা চালু ছিল—যা পাশ্চাত্যে পুরোপুরি অজানা। দুধপানরত শিশুর বোঁটার চাপ দেওয়া হয়, এতে বোঁটা দিয়ে দুধেল ক্ষুদ্র ফোঁটার মতো তরল বের হয়, যার ঔষধি গুণ আছে বলে বিশ্বাস করা হয় এবং বলা হয় যে, ভবিষ্যতে সুগঠিত স্তন নিশ্চিত করার জন্যে এর প্রয়োজন আছে। মোগল পরিবারের মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুটির ভাইকে এই দুধের ফোঁটা পান করানো হয়, ভাইবোনের মধ্যে গভীর বন্ধনের সৃষ্টি করা হয় বলে বিশ্বাস। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দিনপঞ্জিতেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে। তার বোন শাকার ইন-নিসা বেগম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: ' সে অত্যন্ত সুন্দরী এবং মানুষের প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল। শৈশব ও বাল্যকালে সে আমার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল, সচরাচর খুব কম সংখ্যক ভাইবোনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। প্রথমবার শিশুকন্যার বোঁটা চেপে দুধ বের করার প্রথাটি যখন আমার শিশু বোনের ক্ষেত্রে পালিত হয় তখন আমার পিতা (সম্রাট আকবর) আমাকে বলেন, 'বাবা, এই দুধ পান করো, তাহলে বাস্তবে সে তোমার মায়ের মতো হবে।' আল্লাহ্ সকল গোপনীয়তার রহস্যের মালিক, তিনিই জানেন, সেই দুধের ফোঁটা পান করার দিন থেকে আমি আমার বোনটির প্রতি এত ভালোবাসা অনুভব করে আসছি, ঠিক যেভাবে শিশুরা তাদের মায়ের প্রতি এত ভালোবাসা পোষণ করে... ।'

এই প্রথা এখনও বহু ভারতীয় পরিবারে আচরিত হয়..হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই। জেমসের আমলে মোগলদের মধ্যেও নিশ্চয়ই এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সন্দেহ নেই যে, খায়রুন্নিসার পরিবারের মহিলারা এভাবেই সাহিব আলমকে তার বোনের দুধের ফোঁটা মুখে দিয়ে থাকবেন।

জন্মের ষষ্ঠ, সপ্তম বা নবম দিবসে মোগল পরিবার সাধারণভাবে 'ছাত্তি' বা জন্ম উৎসব পালন করত, যখন মা ও শিশুকে পরানো হত মূল্যবান নতুন বস্ত্র এবং তার আগে দুজনকেই গোসল করানো হত। একই দিনে শিশুর মস্তক মুণ্ডন করানো হত রুপার ক্ষুর দিয়ে, মুণ্ডিত মস্তক মুছে দেওয়া হত গেরুয়া বস্ত্র দিয়ে। অতঃপর অপবিত্রতা ও অশুভ দৃষ্টি থেকে শিশুকে রক্ষার জন্যে বকরি কোরবানি করা হত (ছেলের ক্ষেত্রে দুটি, মেয়ের ক্ষেত্রে একটি)। ভিক্ষুকদের মধ্যে বিতরণ করা হত ভিক্ষা।

'ছাত্তি' অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি আলোকসজ্জিত করা হত এবং অতিথিদের আপ্যায়ন করা হত আতশবাজি, গান ও নাচ উপভোগের পর উপাদেয় খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে। অতিথিরা শিশুদের উপহার দিত সূচিকর্ম করা কুর্তা, টুপি, অলংকার খেলনা ও মিষ্টি—অধিকাংশ শিশু মাতৃকূল থেকে আসত। 'ছাত্তি' অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত শিশুর মা ও তার বান্ধবীরা শিশুটিকে আনত খোলা চত্বরে এবং প্রথমবারের মতো রাতের আকাশে তাকে তারকা প্রদর্শনের চেষ্টা করানো হত (এ অনুষ্ঠানের নাম 'তারে দিখানা')। এই প্রথার পেছনে মোগলদের বিশ্বাস ছিল, শিশুর ভাগ্য নির্ধারিত হয় ফেরেশতার দ্বারা, যিনি মানুষের ভাগ্যের বিষয় নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করেন।

যে কেউ ধারণা করতে পারেন যে, প্রথা অনুসারে সাহিব আলমের ক্ষেত্রে সকল অনুষ্ঠান পালনের জন্যে খায়রুন্নিসা তার সন্তানের নাম আলী বলে স্থির করেন হযরত আলীকে স্বপ্নে দেখার পর, অর্থাৎ তার সন্তানের ওপর আলীর করুণা রয়েছে। জেমসও তার সন্তানদের মুসলিম হিসেবে বড় হওয়ার প্রশ্নে কোনো আপত্তি করেননি। বিশেষ করে খায়রুন্নিসাকে বিয়ে করার জন্যে স্বয়ং তাকেই ধর্মান্তরের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়েছে এবং যদিও স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই যে তিনি নতুন ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী নিয়মিত ইবাদত করেছেন, অথবা নিজেকে সক্রিয় মুসলিম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তার শাশুড়ি, যিনি তার সাথে বাস করতেন, নিশ্চয়ই আশা করেছেন যে, তার জামাতা মুসলিম হিসেবে আচরণ করবে, ঠিক মুনশি আজিজ উল্লাহ যেভাবে করে থাকেন।

জেমসের ক্ষেত্রে যা সুনির্দিষ্ট ছিল, তা হচ্ছে তিনি ইসলামকে শ্রদ্ধা এবং হায়দারাবাদের সুফি দরগাহগুলোয় অর্থ দান করতেন। ইসলামের প্রতি তার আকর্ষণ ধর্মীয় দিকের চাইতে অধিকতর সাংস্কৃতিক ছিল। ইউরোপীয়দের কাছে লেখা তার চিঠিতে ঈশ্বর সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ করতেন না এবং এই অস্পষ্টতার কারণে মনে হতে পারে যে, তার ধর্মীয় সীমানা ব্যাপক ভারতীয় বিশ্বাসের সাথে মিশে গেছে এবং তাও দাক্ষিণাত্যের প্রবল সুফি ও ভক্তি প্রভাবিত সংস্কৃতির মধ্যে-যার মূল সুর হচ্ছে, সকল বিশ্বাসই আসলে এক এবং পর্বতে আরোহণের নানা পথই থাকতে পারে। হায়দারাবাদের প্রধান অনুষ্ঠানগুলোতে শিয়া মুসলমানরা ছাড়াও সুন্নি মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিষ্টনরা যোগ দিত। কঠোর ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত সীমান্ত নিশ্চিত করে বিভিন্ন ধর্মকে পৃথক করার ব্রিটিশ ধারণা হায়দারাবাদি সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বিদেশি ধারণা। এর ফলে খুব সহজে জেমসের বিশ্বাসের সাথে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়, যারা নিজেদের স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল তাদের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। তাছাড়া হায়দারাবাদের প্রভাব তো ছিলই।

তা সত্ত্বেও জানতে ঔৎসুক্য জাগে যে, রেসিডেন্সি কম্পাউন্ডে স্ত্রী ও সন্তানদের 'ছাত্তি' অনুষ্ঠানের মতো বড় ধরনের ও প্রকাশ্য অখ্রিস্টান অনুষ্ঠান তিনি আয়োজন করেছিলেন কিনা, বিশেষ করে তার অনুদার ইউরোপীয় সহকর্মীদের চোখের সামনে। তার দ্বিধার কারণে, এ অনুষ্ঠান শহরে বকর আলী খানের বাড়িতে আয়োজন করা হয়ে থাকতে পারে। খায়রুন্নিসা ও শরফ-উন-নিসা তাদের শহরের বাড়ি ব্যবহার করতেন তার প্রমাণ আছে এবং সেখানে বসবাসরত দুরদানা বেগমের সাথে তাদের সাক্ষাৎ করতে যেতে হত। আমরা আরও জানি যে, জেমসের তিন বা চারটি অতিরিক্ত মোগল আলখেল্লা ছিল, এছাড়া সমসংখ্যক কোমরবন্দ, পাগড়ি ইত্যাদি। কোনোটি অত্যন্ত উন্নত মানের, সাধারণত দরবারের ওমরাহদের ব্যবহার করার মতো। অতএব, মনে হয়, 'ছাত্তি' অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য স্থান ছিল বকর আলী খানের বাড়ি, যেখানে খায়রুন্নিসার আত্মীয়রা কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া সহজে আসতে পারে—যদিও হায়দারাবাদিদের কাছে অনুষ্ঠান কিছু বিসদৃশ লেগে থাকবে, তারণ মোগল পরিবারের মতো করে অনুষ্ঠান পালনের জন্যে জেমসের পক্ষে তার কোনো মহিলা আত্মীয় ছিল না।

জেমসের সন্তানদের জন্মের পরবর্তী সপ্তাহ ও মাসগুলোতে একের পর এক অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে এবং তার সন্তানরা ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে যত্নে প্রতিপালিত হচ্ছে তা সহজে বোঝা যায়। এসব অনুষ্ঠানের অধিকাংশই আয়োজিত হয়েছে জেনানা মহলে এবং শুধুমাত্র মহিলারাই আমন্ত্রিত হয়েছে। 'চিল্লাহ' বা শিশুর চল্লিশ দিন বয়স হলে মা তার আঁতুড় ঘর থেকে বের হয়ে আসেন, মেয়ের ক্ষেত্রে এ অনুষ্ঠানে তার কান ফুটো করা হয় নাপিতের দ্বারা, যাতে সে কানে দুল পরতে পারে। অথবা মেয়ে যখন প্রথম বেণী বাঁধতে পারে, তখন আয়োজিত হয় পৃথক অনুষ্ঠান। সব অনুষ্ঠান শেষে সাধারণভাবে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। শৈশবের শেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে 'বিসমিল্লাহ', যখন শিশুর শিক্ষা শুরু হয়, সাধারণত তিন-চার বছর বয়সে। এ সময় মেয়েকে সাজানো হয় বিয়ের কনের মতো, তার সারা শরীরে মাখা হয় সুগন্ধি পাউডার, ছেলের ক্ষেত্রে সাজানো হয় বরের পোশাকে। অতিথিদের উপস্থিতিতে তাদেরকে আনা হয় শিক্ষকের সামনে। শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রথম উচ্চারণের পর সূরা ইকরার পুরোটাই তার সাথে পড়তে হয়। এরপর আরবি বর্ণমালা দিয়ে শুরু হয় তাদের শিক্ষা।

খায়রুন্নিসার সন্তানদের শৈশবের পুরো সময়ে তার জীবনের অন্যকিছু সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া। যদিও তিনি ছিলেন জেমসের পরিবারের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং স্পষ্টত অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তার চিঠিগুলো হারিয়ে যাওয়ায় আমরা তাকে পরোক্ষভাবে দেখি তার প্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে, তার স্বামী, মা ও সন্তানদের মাধ্যমে।

খায়রুন্নিসা অত্যন্ত ধার্মিক এবং আবেগপ্রবণ মহিলা ছিলেন। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সাহসী ও সংকল্পবদ্ধ বলে মনে হয় এবং তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তার পথে তার মা, নানি বা স্বামী দাঁড়াতে সাহস করতেন না। তিনি শিক্ষিতা এবং নিয়মিত চিঠি লিখতেন। এছাড়া তিনি উদার ছিলেন—বান্ধবীদের সবসময় পোশাক ও অলংকার উপহার দিতেন এবং বন্ধুত্বে তার তুলনীয়া কেউ ছিল না। সবসময় বান্ধবী পরিবৃত্ত থাকতেন। তার সন্তানরা তাকে স্মরণ করেছে নম্র ও প্রেমময়ী মা হিসেবে এবং জেমসের চাইতে নমনীয় বলে। সাহিব আলম তার পিতাকে কিছুটা কঠোর বলে মন্তব্য করেছে অন্তত প্রথম দিকে। বহু বছর পর সে তার বোনকে লিখেছে যে, সে সুদর্শন কর্নেলের কাছ থেকে তার পিতার কিছু চিঠি উদ্ধার করেছে, যাতে এটা পরিষ্কার যে, 'তুমি (সাহিব বেগম) আমার পিতার প্রশ্রয়ে বখে যাচ্ছে, যা আমার ওপরও হয়েছে তার কঠোরতার কারণে।' যে কঠোরতার কথা তিনি বলেছেন, পরবর্তীতে তার আদরেও তা কেটে যায়নি।

খায়রুন্নিসার শখ ও অবসর বিনোদনের উপায় সম্পর্কেও অল্প দারণা করা যায়। তার মহলে কবুতরের খাঁচার উপস্থিতিতে স্পষ্ট যে, তিনি কবুতর উড়ানো পছন্দ করতেন, যা অনেক হায়দারাবাদি বেগমই করতেন। হায়দারাবাদের সমসাময়িক চিত্রে এর অনেক প্রমাণ আছে। তিনি সৃজনশীল ছিলেন, অলংকার ও চুড়ির জন্যে ডিজাইন করতেন এবং তিনি ও জেমস মূল্যবান পাথর, হীরার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। উইলিয়ামকে লেখা জেমসের একটি চিঠিতে দেখা যায় যে, তিনি এবং খায়রুন্নিসা প্রায় দুর্ঘটনার মতোই আবিষ্কার করেছেন একটি শুভ্র মণি যা গরম হাওয়ায় একেবারে অস্বচ্ছ হয়ে যায় এবং পানিতে রেখে দিলে যাবতীয় অস্বচ্ছতা দূর হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মণিটি নিঃসন্দেহে পানির মণির মধ্যে গণ্য। কল্পনা করার জন্যে চমৎকার এক দৃশ্য, খায়রুন্নিসা অলংকারের ডিজাইন তৈরিতে ব্যস্ত, জেমস তা লক্ষ্য করেছেন, সৌখিন জর্জীয় মণি বিশারদ তার মাথা চুলকাচ্ছেন উজ্জ্বল মণির রং বদলাতে দেখে এবং এর ভূতাত্ত্বিক শ্রেণিভেদ করার চেষ্টা করছেন।

খায়রুন্নিসা তার ডিজাইন করা অলংকার পাঠিয়েছিলেন তার ভ্রাতৃস্পুত্রীদের অর্থাৎ উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের কন্যাদের। বহু বছর পর এসব অলংকারের মধ্য থেকে একটি নেকলেস ফিরে আসে সাহিব বেগমের কাছে, যেটি বহুদিন পূর্বে মৃত তার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। শরফ-উন-নিসার কাছে এক চিঠিতে সে লিখে, 'আমি, আমার মায়ের তৈরি করা নেকলেস ও ব্রেসলেট ফিরে পেয়েছি, যা ছোট ছোট মুক্তা বসানো। এটি আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে হয়।' খায়রুন্নিসা পোশাকও তৈরি করতেন (অন্তত ডিজাইন করতেন বলে ধরে নেয়া যায়), যেগুলো তিনি পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের উপহার দিতেন। মোগল বেগমদের

বৈশিষ্ট্য ছিল সূচিকর্মের প্রতি আকর্ষণ এবং এই শিল্পে নূরজাহান, আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসার মতো অনেক শাহজাদির দক্ষতা ছিল। পরিণত বয়সে সাহিব বেগমের অন্যতম শৈশবের স্মৃতি ছিল একটি স্থান, 'জায়গাটিতে (সম্ভবত মহলের বাইরে) দর্জিরা কাজ করত।'

খায়রুন্নিসা যেসব খেলনা দিয়ে সাহিব বেগমের সঙ্গে খেলতেন সেগুলো সম্পর্কে পরে সাহিব বেগম স্মরণ করেছেন, মহলের ছাদে স্লাইডের মতো কিছু বসানো হয়েছিল। অনদিকে জেমস তার দূতকে বলেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে কিছু ইউরোপীয় পুতুল, যেগুলোর পরনে অভিজাত পোশাক, সেগুলো পাঠাতে। সম্ভবত ইউরোপীয় পোশাক ও চেহারার সাথে তিনি তার সন্তানদের পরিচিত করাতে চেয়েছেন।

পুতুলের কক্ষ হিসেবে জেমস নতুন রেসিডেন্সি ভবনে চারফুট উঁচু একটি মডেল তৈরি করান। মডেলটি এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে খায়রুন্নিসার মহলের পেছনে প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যেই। রেসিডেন্সির পরবর্তী সময়ের ঐতিহ্য অনুসারে এটি নির্মিত হয়েছিল খায়রুন্নিসার জন্যে। যিনি কঠোর পর্দা অবলম্বন করতেন এবং বাড়ির সামনের দিক দিয়ে বাড়িটি দেখতে পারতেন না বলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই কাহিনি এখনও হায়দারাবাদে প্রচলিত থাকলেও এর কোনো বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যায়নি। কারণ খায়রুন্নিসা যে পুরনো শহরে তার আত্মীয় ও বান্ধবীদের কাছে ঘনঘন বেড়াতে যেতেন তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অভিজাত মোগল মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্দা রক্ষা করে চলাফেরা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কারণ তারা নিয়মিত বনভোজনে, দরগাহ এবং শিকারে যেতেন। অতএব মডেলটি পুতুলদের জন্যেই হয়ে থাকবে, হয়তো তার দুই সন্তানের কোনো একজনের জন্মদিনের উপহার হিসেবে।

BanglaBook.org

ভগ্নপ্রায় রেসিডেন্সি ভবন পুনঃনির্মাণের জন্যে জেমস অর্থ চেয়ে কলকাতায় যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তার উত্তর পেতে বেশ সময় লেগে যায়। অর্থ বরাদ্দ করা হলেও জেমসের চাহিদার চাইতে তা অনেক কম ছিল। একটি ছাদ সংস্কার করতেই লেগে যায় পঁচিশ হাজার রুপি।

এই কৃপণ বরাদ্দ এসেছিল ওয়েলেসলির কাছ থেকে, যিনি কলকাতায় বিশাল 'গভর্নমেন্ট হাউজ' নির্মাণের জন্যে বিপুল অর্থ রেখে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি 'বাজে ও নিম্নজাত লোকদের থেকে' নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। ডার্বিশায়ারের কেডেলস্টোন হলের মডেলে চার বছরে নির্মিত ভবনের ব্যয় দাঁড়ায় ৬৩ হাজার ২শ ৯১ পাউন্ড। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স-এর লেফটেন্যান্ট চার্লস ওয়াটের ডিজাইনে নতুন ভবনের প্রশংসা অবশ্যই দর্শনার্থীরা করে থাকবে এবং লর্ড ভ্যালেনটিয়া মন্তব্য করেন যে, 'একটি হিসাবখানার চাইতে ভারত শাসিত হবে একটি প্রাসাদ থেকে। কিন্তু কোম্পানির অর্থের এই বিপুল ব্যয়ও অন্যান্য

বিষয়ের মধ্যে ক্রমশ কোম্পানির ডাইরেক্টরদের মধ্যে ওয়েলেসলির সমর্থন বিনষ্ট করেছিল এবং লন্ডনে তার বিরুদ্ধে একের পর এক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যার পরিণতিতে ১৮০৫ সালে তাকে অব্যাহতি দিয়ে ইংল্যান্ডে তলব করা হয়।

১৮০৩ সালের মধ্যেই কোম্পানির ডাইরেক্টররা ওয়েলেসলির ধনুক অতিক্রম করে তীর ছুড়তে আরম্ভ করেছিলেন, মাদ্রাজে লর্ড ক্লাইভের স্বল্প জাঁকজমকপূর্ণ নির্মাণকাজের এবং স্পষ্টভাবে বলছিলেন যে, 'ভারতে আমাদের সরকারের সাফল্যের জন্যে দেশীয় রাজাদের জাঁকজমক, ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজন নেই। এ ধরনের ব্যবস্থার ব্যয় স্বাভাবিকভাবে আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে।' কিন্তু লন্ডনে কারো সামান্যতম ধারণাও ছিল না যে, ওয়েলেসলি কত বিশাল ভবন নির্মাণ করছিলেন এবং লিডেনহল স্ট্রিটে অবস্থিত কোম্পানির সদর দফতরে যখন নির্মাণ ব্যয়ের হিসাব এসে পৌঁছল তখন তারা বিস্মিত হন যে, 'নজিরবিহীন বিশালতা ও জাঁকজমকর্পূর্ণ কাজ করার আগে অথবা নিয়মিত পদ্ধতিতে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি।'

রেসিডেন্সির আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জেমস আরিস্তু জাহকে কোনো ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কিনা অথবা উজির রেসিডেন্সি ভবনগুলোর অবস্থা সরাসরি জানতে পেরেছিরেন কিনা সে সম্পর্কে পরিষ্কার জানা না গেলেও ১৮০২ সালের কোনো এক সময় তিনি জেমসকে পরামর্শ দেন কোম্পানির তহবিল সংকটের ক্ষেত্রে নিজামের কাছে অর্থের জন্যে দরখাস্ত করতে। জেমস প্রস্তাবটি লুফে নেন। জেমস পরে জন ম্যালকমকে জানান যে, তিনি হায়দারাবাদে নিয়োজিত ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারকে অনুরোধ করেন জায়গাটি জরিপ করতে এবং একাজ শেষ হওয়ার পর একটি বড় কাগজ দরবারে নিয়ে নিজামকে দেখানো হয়। নিজাম ইংরেজ সরকারকে জমি প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন করেন। শাহজাদা জরিপটি মনোযোগের সাথে দেখে বলেন যে, অনুরোধে সাড়া দিতে পারছেন না বলে তিনি দুঃখিত।

BanglaBook.org

অনুরোধে সাড়া না পেয়ে জেমস সামান্য হতাশ না হয়েই বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন উজির হেসে তাকে বলেন, 'ক্ষুব্ধ হবেন না, আপনার পরিকল্পনার আকৃতি দেখে নিজাম ভয় পেয়েছেন। আপনার জমি তার রাজ্যের যে কোনো মানচিত্রের চাইতে বৃহৎ, যা তিনি আগে কখনো দেখেননি। আপনি ছোট করে পরিকল্পনা বানান, তখন আর সমস্যা থাকবে না।' রেসিডেন্ট বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, এটি কোনো কারণ হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সাক্ষাতে তিনি যখন একই পরিকল্পনা ছোট কার্ডের ওপর একে পেশ করলেন, তখন নিজাম সানন্দে সম্মতি দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করলেন। উজির তার ধারণায় যথার্থ ছিলেন।

যৌবনে নিজাম আলী খান সিংহাসন জয় করেছিলেন কঠোরতা ও ব্যক্তিত্বের জোরে। বক্তা হিসেবেও তার জুড়ি ছিল না। কিন্তু ১৮০২ সালের মধ্যে এই শক্তিশালী যোদ্ধা দন্তহীন আটষট্টি বছর বয়সী বৃদ্ধে পরিণত হন। সারাজীবন তিনি কাটিয়েছেন কর্মব্যস্ততায় এবং সম্প্রতি দু'বার স্ট্রোক হয় তার, যার ফলে দুর্বল, অস্থির ও আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এখন তিনি দিন যাপন করেন উটের দুধ পান করে (ইউনানী চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে উটের দুধ পানে তার ডান হাত ও পায়ের পক্ষাঘাত সেরে যাবে)। এছাড়া প্রাসাদের পুকুরে পোষা কাতল মাছ ধরার চেষ্টা করতেন বড়শি ফেলে এবং মাঝে মাঝে জেমসকেও আমন্ত্রণ জানাতেন তার সাথে অংশ নিতে। তার অন্যান্য শখের মধ্যে ছিল কবুতর উড়ানো, সন্ধ্যায় গান ও কবিতা শোনা এবং ইউরোপীয় ঘড়ি খুলে দেখা।

হায়দারাবাদের দীর্ঘ সময়ের অবস্থানকালে নিজামের অনুরক্ত ভক্তে পরিণত হন জেমস এবং তিনি শুধু নিজামের মর্জির কাছেই যে সাড়া দিতেন তা নয়, অনেক সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করার জন্যে গভীর রাতে গানের জলসায় উপস্থিত থাকতেন এবং মাহলাকা বাই চান্দার নৃত্যে অতি উচ্ছ্বসিত হওয়ার কারণে নিজামের প্রথমবার স্ট্রোকের সময় জেমস উপস্থিত ছিলেন। এক পর্যায়ে জেমস তাকে 'মসল্লা দ্বীপের' এক জোড়া ঘুঘু উপহার দেন, 'এক একটি ছিল হাঁসের মতো বড়' এবং নিজামের কবুতরের সংগ্রহের মধ্যে এ দুটি ছিল অলংকারের মতো। এছাড়া একটি কমবয়সী সিংহীও জোগাড় করে দেন তার চিড়িয়াখানার জন্যে। এই উপহারগুলো শুধু জেমসের উদারতার দৃষ্টান্ত ছিল না, এগুলো নীতি হিসেবে ছিল অত্যন্ত মোক্ষম এবং জেমস একান্তে বিশ্বাস করতেন যে, নিজামের কাঙ্ক্ষিত তিনটি বস্তু সংগ্রহ করে না দিলে সম্পূরক চুক্তি করা হয়তো সম্ভব হত না। এগুলো ছিল জটিল কারুকাজ করা ঘড়ি, গান গায় এমন কৃত্রিম পাখি যা মণিমুক্তা খচিত থাকতে হবে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে নেপলসে তৈরি ফারের ওভারকোট—বৃদ্ধ ভদ্রলোকের অত্যন্ত পছন্দের উপহার। গরমের দিনেও তিনি সবসময় পশমি আলখিল্লা বা শাল জড়িয়ে থাকতেন।

নিজামকে সন্দেহভাজন জাদুকর, ওঝা ও দরবেশদের হাত থেকে রক্ষা করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন জেমস, যারা আরিস্তু জাহের ইঙ্গিতে তার রোগশয্যার পাশে জড়ো হয়েছিল। ইংরেজ হাতুড়ে ডাক্তারদের তিনি নিজামের উপস্থিতি থেকে বহিষ্কার করেছেন—১৮০২ সালের মে মাসে তিনি হায়দারাবাদ থেকে এক ভুঁয়া ব্যক্তিকে বের করে দেন, যে ব্যক্তি নিজাম ও আরিস্তু জাহের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিল 'আলকেমিষ্ট' বলে। হায়দারাবাদের ওঝা ও চিকিৎকদের ওপর জেমসের তেমন প্রভাব ছিল না এবং একজনের ব্যাপারে

BanglaBook.org

তিনি বিশেষভাবে শঙ্কিত ছিলেন, যে লোকটি নিজামকে মাত্রাতিরিক্ত পারদ সেবন করাতে শুরু করেছিল। জেমস উইলিয়ামকে জানান—

> "তোমাকে জানানো প্রয়োজন যে, যদিও নিজামকে আগেরবার যখন দেখি তার চাইতে ভালো দেখাচ্ছিল, তার মাথায় ঢুকানো হয়েছে একটি ওষুধ সেবনের কথা, যদি তিনি সেটি অব্যাহতভাবে গ্রহণ করেন তাহলে আমি তাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আগামী ১২ মাস বা তারও কম সময়ে তিনি অনন্ত আবাসে চলে যাবেন। এ ওষুধ কমবেশি পারদের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। উচ্চাভিলাষী এক হাতুড়ে চিকিৎসক তাকে এটি সেবনের পরামর্শ দিয়েছে পক্ষাঘাত থেকে অনিবার্য আরোগ্যের জন্য। এই অবস্থার মধ্যে তিনি আরিস্তু জাহ ও বখশি বেগমকে কাছে রাখেন এবং আমার শেষ সাক্ষাতে আমি আরিস্তু জাহ ও নিজামকে একসাথে এই ওষুধ সেবন করতে প্রত্যক্ষ করেছি।"

ছয় মাস পর জেমস বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেন যে, নিজাম তখনো পারদ সেবন করছেন এবং তখনো তার শরীরে দুর্বলতার লক্ষণগুলো ছিল। যদিও জেমস আশা করেছিলেন যে, নিজাম সেই হাতুড়ের ওপর বিরক্ত হয়ে যাবেন। কর্নেল পামার লক্ষ করেন, 'নিজামের নিশ্চয়ই বিড়ালের মতো জীবন, অথবা নিশ্চিতভাবেই তার বয়স, অসুস্থতা, নারীসঙ্গ এবং হাতুড়ের চিকিৎসা নেওয়ার কারণে ইতোমধ্যে তার পূর্বপুরুষদের সাথে থাকার কথা। তিনি আবার পারদ সেবন করছেন এক হাতুড়ে চিকিৎসকের পরামর্শে, যাকে তাঁর সাথে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন আরিস্তু জাহ। তার চিকিৎসার দক্ষতা সম্পর্কে আরিস্তু জাহের দারুণ বিশ্বাস। আমার তথ্য যদি সঠিক হয় তাহলে ওই লোক ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে। কারণ তার কেরামতি ধরা পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে বলে তার ধারণা।'

নিজামের প্রতি জেমসের ভালোবাসার অনুভূতি ফিরিয়ে দেওয়ার মতো নয়। নিজাম তাকে 'প্রিয় পুত্র' সম্বোধন করতেন এবং রেসিডেন্সির পরিকল্পনা কার্ডের ওপর এঁকে দেওয়ার পর তিনি আনন্দের সাথে শুধু সংলগ্ন এলাকা হস্তান্তরেই সম্মত হলেন তা নয়, পুনঃনির্মাণের ব্যয় বহনেরও প্রস্তাব করেন।

নিজাম রেসিডেন্সির জন্যে অর্থ প্রদানে রাজি হওয়ার পর জেমস রেসিডেন্সি ভবনকে তার মূল পরিকল্পনা অর্থাৎ কলকাতায় অর্থের আবেদন করতে যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তার চাইতে অনেক বড় আকারে করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চমৎকার রেসিডেন্সি ভবনের প্রশংসা করেছেন স্যামুয়েল রাসেল, যিনি এর নির্মাণকাজের শেষ দিকে তত্ত্বাবধান করেছেন এবং তার চূড়ান্ত পরিকল্পনাকে আরও কার্যকর করে থাকতে পারেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে নির্মাণকাজ যে জেমস নিজেই শুরু করেছিলেন তা তার চিঠিপত্রে স্পষ্ট। তার সাথে ছিলেন অজ্ঞাত পরিচয় এক ভারতীয় স্থপতি, যিনি দৃশ্যত মোগল স্থাপত্য

BanglaBook.org

কৌশলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাজের ধারায় তাকে নতুন যুগের ব্রিটিশ স্থাপত্যের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল।

১৮০২ সালের অক্টোবর অর্থাৎ 'ফিলোথেটিস'-এর চিঠি নিয়ে ঝড়ের ছয় মাস পর জেমস মাদ্রাজে তার এক বন্ধু জেমস ব্রুনটনকে লিখেন তার বিরাট প্রকল্পে কাজ করার লোক ও উপকরণ সংগ্রহ করতে। তখনকার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থাপত্যের বিস্তারিত জানা যায় না, কারণ ভবনগুলো নির্মিত হয়েছে সাময়িক ভিত্তিতে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থপতিদের পরিবর্তে সামরিক প্রকৌশলীদের দ্বারা। তিনটি ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সি শহরে নির্মিত অধিকাংশ ব্রিটিশ ভবন ইংল্যাণ্ডের ভবনের অনুকরণ করেন এবং এগুলোর ডিজাইন নেওয়া হয়েছে রবার্ট অ্যাডামসের 'ওয়ার্কস অফ আর্কিটেকচার' অথবা কলিন ক্যাম্পবেলের 'ভাইট্রুভিয়াস ব্রিটানিকাস' থেকে। যদিও এগুলোতে হালকা প্রাচ্যের ছাপ পরিদৃষ্ট। যেমন বারান্দা ও উপরিভাগের জানালা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার জন্যে যা জরুরি। ১৮০২ সালের ৬ অক্টোবর জেমস তার বন্ধু ব্রুনটনকে লিখেন, 'রেসিডেন্সি ভবন নির্মাণে আমি রুচি ও দৃঢ়ভাবে নির্মাণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। এজন্যে আমাকে পরামর্শ দিতে আমি মাদ্রাজ থেকে একজন দেশীয় স্থপতি ও কিছুসংখ্যক মিস্ত্রি পেতে চাই। সেই সাথে কিছু পাথর খোদাইকারী ও কাঠমিস্ত্রি। প্রথমে আমার প্রয়োজন একজন স্থপতি। এরপর বাদবাকিদের। আমি তাদের যাতায়াত খরচ এবং মাদ্রাজের তুলনায় এখানে যে মজুরি দেওয়া উচিত তাদেরকে দিতে আগ্রহী, তা তুমিই স্থির করে দিয়ো। স্থপতিকে দক্ষ হতে হবে, যাতে ইউরোপীয় স্থাপত্যের বিভিন্ন দিকের সাথেও তার পরিচয় থাকে। মিস্ত্রিরা ইট ও মিশ্রণ নিয়ে কাজ করবে, যাতে তাদের কাজ হায়দারাবাদের মিস্ত্রিদের চাইতে ভালো হয়। চুন ও সুরকির মিশ্রণ দিয়ে প্লাস্টার করবে যারা তাদেরও সেরা কাজ হতে হবে। খোদাইকারী ও কাঠমিস্ত্রিদেরও হস্তশিল্পে দক্ষ হওয়া জরুরি। তাদেরকে ছাদ, মেঝে, দরজা ও জানালার কাজ করতে হবে। এখানকার এসব কাজের মিস্ত্রিরা তেমন দক্ষ নয়।'

এরপরের এক চিঠিতে জেমস লিখেন যে, যারা কাজ করতে আসবে, তিনি তাদের মজুরির একটি অংশ মাদ্রাজে তাদের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেয়ারও ব্যবস্থা করবেন। কয়েক মাসের মধ্যে মিস্ত্রি ও স্থপতি পাওয়া গেল এবং যথাসময়ে হায়দারাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ১৮০৩ সালের গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে দাক্ষিণাত্যে একশো বছরের মধ্যে নির্মিত সবচাইতে উচ্চাভিলাষী এক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হলো। এখন জেমসের প্রধান উৎকণ্ঠার বিষয়ে পরিণত হলো প্রকল্প সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত হায়দারাবাদে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করা এবং এ নিয়ে তার উৎকণ্ঠিত হওয়ার যথার্থ কারণও ছিল।

তিনি যে লর্ড ওয়েলেসলির প্রিয়ভাজন ছিলেন না শুধু তাই নয়, তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল। ১৮০২ সালের পর তার বাতজ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি

পেয়েছিল এবং বছরের শেষদিকে গুরুতর হেপাটাইটিস সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যার ফলে তাকে প্রায় এক মাস ধরে শয্যাশায়ী থাকতে হয় এবং ১৮০৩ সালের প্রথম দিকের কয়েক মাস তিনি দুর্বল ছিলেন। জীবনের অবশিষ্ট সময়েও তিনি এই ব্যাধি থেকে পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেননি এবং মাঝে মধ্যেই তাকে শয্যাশায়ী হতে হয়েছে। প্রথম বারের মতো ডাক্তার ওরে জেমসের ব্যাপারে বলতে থাকেন যে, জেমসও তার ভাই উইলিয়ামকে অনুসরণ করে ইউরোপে ফিরে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছেন।

কিন্তু ইংল্যান্ডকে নিজ আবাসস্থল হিসেবে ভাবার কোনো কারণ ছিল না জেমসের। তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এগারোটি বছর ছাড়া জীবনের পুরো সময় কাটিয়েছেন ভারতে। জেনারেল পামারের মতো তিনিও ভারতকে নিজের দেশ বলে ভাবতে শিখেছিলেন এবং ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া তার কাছে কেবল সর্বশেষ কাঙ্ক্ষিত বিষয়ই হতে পারে। কিন্তু তার স্বাস্থ্য যেহেতু ক্রমাবনতির দিকে যাচ্ছিল, অতএব এই সম্ভাবনাকে তিনি ধরে রাখতে বাধ্য হলেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে—যদি তাকে একান্ত এই সিদ্ধান্ত নিতেই হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৮০৩ সালের ৬ আগষ্ট নিজাম আলী খান তার ঘুমের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স ঊনসত্তর বছর। একই দিনে লর্ড ওয়েলেসলি মারাঠা কনফেডারেসির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তার ছোট ভাই আর্থারকে যুদ্ধে পাঠান। জেমস দুটি ঘটনার ব্যাপারেই দীর্ঘদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং দুটি নিয়েই অত্যন্ত আশঙ্কার মধ্যে ছিলেন।

যে সময়গুলোতে জেমস নিজামের মৃত্যুর আশঙ্কা, তার মৃত্যুর পর যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা নিয়েও তিনি শঙ্কিত ছিলেন। তার এ ধরনের আশঙ্কার কারণ ছিল। প্রায় প্রত্যেক মোগল সম্রাটই ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের মধ্য দিয়ে এবং মোগল কায়দার অনুসারী হায়দারাবাদেও একই লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছিল। নিজাম আলী খানের পিতা নিজামুল মুলক যখন ১৭৪৮ সালে মারা যান তখন তার ছয় পুত্রের ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর পরিণতিতে হায়দারাবাদ চৌদ্দ বছর ধরে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেছে। তদুপরি নিজাম আলী খানের নিজের উত্তরাধিকারীরাও নৈরাজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে: ১৭৯৫ ও ১৭৯৬ সালে নিজামের বড় পুত্র আলী জাহ এবং তার উচ্চাভিলাষী জামাতা দারা জাহ বিদ্রোহ করেন। যদিও দুটি বিদ্রোহই দ্রুততার সাথে দমন করা হয় (এবং মীর আলমের দায়িত্বে থাকার পর দৃশ্যত আলী জাহ আত্মহত্যা করেন)। কিন্তু এসব অভিজ্ঞতায় প্রেক্ষিতে নিজামের আকস্মিক মৃত্যুর ভয় জেমসকে হায়দারাবাদে রেখেছিল। দুটি বছর ধরে তিনি হায়দারাবাদ ছেড়ে দূরে কোথাও যাননি। একই কারণে ইংল্যান্ডগামী ভাই উইলিয়ামকে বিদায় জানাতে তিনি মাদ্রাজেও যেতে পারেননি—দুজনেই জানতেন এ সাক্ষাতই হত তাদের শেষ সাক্ষাৎ।

কিন্তু ঘটনাচক্রে সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্পন্ন হলো সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে। ১৮০৩ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে নিজামের আরেক দফা স্ট্রোক হয় এবং এরপর জেমস দুঃখের সাথে কলকাতায় জানান যে, 'তার পুরো চেহারা ফুলে গেছে, চোখের দৃষ্টি ম্লান ও ক্লান্ত, শরীর ভেঙে গেছে, তার কথা ক্ষীণ ও দুর্বোধ্য এবং বোধশক্তি প্রায় রহিত।' একমাস পর লিখেন, 'বৃদ্ধ নিজামের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। তার সেরে উঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ। পক্ষাঘাত বাম দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বাম হাতও প্রায় অক্ষম।' বৃদ্ধের জীবন যেহেতু একেবারে শেষ পর্যায়ে আসছিল, জেমস এবং

BanglaBook.org

আরিস্তু জাহ-যিনি মনোনীত উত্তরাধিকারী সিকান্দার জাহের স্ত্রীর নানা—তিনিও জেমসের মতোই দ্রুততার সাথে উত্তরাধিকার গ্রহণের ব্যাপারে একমত ছিলেন—দুজনই অনতিবিলম্বে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সক্ষম হন।

৬ আগষ্ট সকালে নিজাম চৌমহলা প্রাসাদে ইন্তেকাল করার পর হায়দারাবাদে বিখ্যাত মক্কা মসজিদ চত্বরে তার মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয় সেদিনই সন্ধ্যায়। পরদিন জেমস আর্থার ওয়েলেসলিকে জানান যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সচরাচর যা ঘটে রাজধানীতে সে ধরনের উত্তেজনা বা গোলযোগ সৃষ্টির আভাস দেখা যাচ্ছে না এবং আগামীকাল আমি আপনাকে খবর দিতে পারবো যে, সিকান্দর জাহ শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরাধিকার লাভ করেছেন।

এটি ছিল বাস্তব অবস্থা। একত্রিশ বছর বয়স্ক সিকান্দর জাহ একবারের জন্যে তার তরবারি বের না করেই সরকারের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হন, যা ছিল রীতিমতো চমক সৃষ্টি করার মতো ঘটনা। পরদিন সন্ধ্যায় জেমস রিপোর্ট লিখতে কলম তুলে নেন, 'দাক্ষিণাত্যের শূন্য মসনদে সিকান্দার জাহের আরোহণ অনুষ্ঠানে সহায়তা ও প্রত্যক্ষ করেই ফিরেছি। যথারীতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে, যদিও তেমন জাঁকজমক হয়নি-নিজাম সদ্য মারা গিয়েছেন বলে।' সিকান্দর জাহের মসনদ আরোহণ উপলক্ষে সেনানিবাসে তোপধ্বনি করা হয়, নগর প্রাচীর ও গোলকুণ্ডা দুর্গ থেকেও গোলা নিক্ষেপ করে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। জেমস শঙ্কার সাথে উল্লেখ করেছিলেন যে, মনে হচ্ছে, 'এ উপলক্ষ পালনে অতিরিক্ত ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে অতি উচ্ছ্বাস দেখানো হয়েছে। এছাড়া সর্বত্র স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, শহরের মধ্যে এবং শহরের বাইরেও। আশা করছি, সামান্যতম হস্তক্ষেপও ঘটবে না কোনো পক্ষ থেকে।'

সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করা উত্তরাধিকার পর্বের পরই জেমস উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, তিনি তাঁর বৃদ্ধ বন্ধুকে হারানোর পরিস্থিতি কীভাবে অনুভব করছেন। তিনি লিখেন: 'তার স্মৃতি আমার কাছে চিরদিনই প্রিয় থাকবে। আট তারিখে তার পুত্র সিকান্দর জাহ মসনদে আরোহণ করেছেন জনগণের সার্বজনীন প্রশংসার মধ্যে। আমি গভর্নর জেনারেলকে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, উত্তরাধিকার পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে এবং আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি যে, সবকিছু ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমার বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে কোনো মহলে এ নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করা হতে পারে। আমি যে শঙ্কা ব্যক্ত করেছিলাম তা যদি যাচাই না করা হত, তাহলে ব্যাপক আকারে না হলেও উল্লেখযোগ্য গোলযোগ হতে পারত।'

ব্যক্তিগতভাবে জেমসের মধ্যে নিজাম আলী খানের উত্তরাধিকারী সম্পর্কে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। পাঁচ বছর আগে তিনি হায়দারাবাদ থেকে প্রেরিত তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যে রিপোর্ট ওয়েলেসলির কাছে পাঠান, তাতে সিকান্দার জাহকে জনগণের বিরাগভাজন এবং কামলোলুপ হিসেবে উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, 'তার মেধার ঔজ্জ্বল্য নেই এবং বিচার বিবেচনার শক্তিও প্রবল নয়।' সব কিছু সত্ত্বেও তার সম্পর্কে আরও লিখেন, সিকান্দার জাহ রাজসিক...তার আচরণ স্বচ্ছন্দ, মৃদুভাষী এবং ভদ্র।' কিন্তু শিগ্‌গির দেখা গেল এসব তার একান্ত নিজস্ব মূল্যায়ন ছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল যে, নতুন নিজাম প্রকাশ্যে তার রক্ষিতাদের পদাঘাত করছেন এবং পরিবারের কোনো কোনো সদস্যকে তার রুমাল গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার উপক্রম করেছেন। এসবের প্রেক্ষিতে গুজবের আরও ডালপালা গজাল যে, কখনো কখনো তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। জেমসের সহকারী হেনরি রাসেলের মতে, 'সিকান্দার জাহের অভিব্যক্তি নীরস, বিষাদপূর্ণ এবং দায়িত্ব জ্ঞানহীন..এবং দেখতে তার বয়সের চাইতেও বেশি মনে হয় তাকে। তাকে কিছুটা পাগল বলে ভাবা হয় এবং তার আচরণেও এ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ আছে। নিজের ভয় ও ঈর্ষার শিকার তিনি এবং তার পাশে ঘুরঘুর করা বিবেকবোধ বিবর্জিত কিছু লোকের অশুভ প্রভাব আছে তার ওপর।

নতুন নিজাম প্রায় বিচ্ছিন্ন জীবন অতিবাহিত করতেন এবং পারতপক্ষে প্রকাশ্যে বের হতেন না। উজিরদের সাথেও কমই সাক্ষাৎ করতেন। তাদের মধ্যে যে সামান্য মতবিনিময় হত তা চিরকুটের মাধ্যমে, মহিলা পরিচারিকাদের দ্বারা তার কাছে বার্তা প্রেরিত হত এবং একইভাবে তা দরবারে ফিরে আসত। সময় কাটাতেন নিজস্ব কক্ষে একাকী অথবা চাটুকার স্বভাবের গুটিকয়েক লোক পরিবৃত অবস্থায়। তারা তার উজিরদের কল্পিত চক্রান্তের কাহিনি ফেঁদে নিজামের মনকে বিষিয়ে তুলত। পরিবারের ব্যাপারে ঘনিষ্ঠতম পুরুষ সদস্যের সাথেও তার কোনো কথা হত না, তবে কোনো ভাই অথবা সন্তান তার সাথে সাক্ষাৎও করত না। বড় ধরনের উৎসবেই শুধু অন্যান্যের সাথে তারাও সাক্ষাৎ করতে পারত, যেখানে তিনি সাধারণত নজর গ্রহণ করতেন এবং কারো সাথে কথা না বলেই তাদের বিদায় করে দিতেন।'

হায়দারাবাদের সিংহাসনে আসীন একজন বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তির ওপর নির্ভর করার দিন আর জেমসের ছিল না।

এ সময়ে নিজামের ভূখণ্ডে অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। উত্তর দিকে মারাঠারা এবং হায়দারাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধের ডামাডোলে সহিংসতা দেখা দেয়।

BanglaBook.org

ওয়েলেসলির জটিল অভিযানের লক্ষ্য ছিল মারাঠাদের বিভক্ত ও অধীনস্থ করা, কারণ তারাই ভারতে বিদ্যমান শেষ সেরা শক্তি, যারা ব্রিটিশদের মোকাবেলা করতে সক্ষম। এ বিষয়টি তার মাথায় বিরাটভাবে প্রবেশ করেছিল। জেনারেল পামার লিখেছিলেন 'মারাঠা প্রধানমন্ত্রী নানা ফাদনাভির মৃত্যুর পর, মারাঠা সরকারের পরিচালনার পেছনে বিজ্ঞতা ও গতি বিদায় নিয়েছিল।' কলকাতায় বসে ওয়েলেসলি মারাঠা কনফেডারেসির ক্ষয় প্রত্যক্ষ করতে পারেন। নানা ফাদনাভির অনুপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধবাজদের মধ্যে চক্রান্ত শুরু হয় এবং একে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে।

তরুণ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাও বিভিন্ন উপদলকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না, অথচ তারাই ছিল তার ক্ষমতার ভিত্তি। বিশেষ করে তিনি শক্তিশালী হোলকার সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন এবং তার নির্দেশে সেই সম্প্রদায়ের এক প্রবীণ সদস্যকে হাতির পদতলে পিষ্ট করে হত্যা করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। মৃত ব্যক্তির ভাই, যশোবন্ত রাও হোলকার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পুনায় হামলা চালিয়ে শহর দখল করে নিয়ে চমক সৃষ্টি করেন। যশোবন্ত রাও শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালান যে পুনা থেকে দেড়শো মাইল এলাকার মধ্যে একটি কাঠিও আর দাঁড়িয়ে ছিলা না। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্যে পেশোয়া ব্রিটিশ ভূখণ্ড বাসেইন আশ্রয় নেন। বাসেইন বোম্বের উত্তর দিকে অবস্থিত সাবেক ক্ষুদ্র পর্তুগীজ শহর। সেখানে বেশ কিছু ধ্বংসপ্রায় জেসুইট চার্চ ও ডোমেনিকাল কনভেন্ট ছিল।

জেনারেল পামার যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেখানে ওয়েলেসলি সফলতা লাভ করেন এবং ক্ষমতাহীন পেশোয়াকে অপমানজনক সম্পূরক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। বাসেইন চুক্তি হিসেবে খ্যাত এই চুক্তির বদৌলতে ওয়েলেসলির মনে বিশ্বাস জন্মে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি মারাঠাদেরকে ব্রিটিশের ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে সফল হয়েছেন। চুক্তির শর্ত হিসেবে মারাঠা ভূখণ্ডে বিরাট ব্রিটিশ গ্যারিসন প্রতিষ্ঠা করা হয় পুনায় পেশোয়ার প্রাসাদের ওপর নজর রাখার জন্যে, অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তির ওপর ভর করে তাকে ক্ষমতায় আসীন হতে হয়।

জেমস চুক্তির বিস্তারিত শোনার পরই ধরে নিয়েছিলেন যে, এতে কোনো কাজ হবে না এবং তিনি খোলামেলা তার কথা বলতেন। ১৮০৩ সালের মার্চ মাসে এক সরকারি রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন, মারাঠা ভূখণ্ডে ক্ষমতার আসল ভিত্তি যে যুদ্ধবাজ দলপতিরা তারা কখনো বাজি রাওকে ব্রিটিশের পুতুল হিসেবে থাকতে অথবা মারাঠা সাম্রাজ্যকে এত হীন ভাবার উদ্যোগকে সহজে মেনে নেবে না। তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেন যে, মারাঠাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাজি রাও ব্যর্থ হলেও ওয়েলেসলির কর্মপন্থা তাদের ঐক্যের চালিকা

BanglaBook.org

শক্তিতে পরিণত হবে এবং বিচ্ছিন্ন মারাঠা দলপতিদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

জেমসের ধৃষ্টতায় ওয়েলেসলি অত্যন্ত ক্রুব্ধ হন এবং তার কাছে কঠোর একটি চিঠি পাঠিয়ে তাতে উল্লেখ করেন যে, ঐক্যবদ্ধ মারাঠা প্রতিরোধের উদ্যোগ এখন 'পুরোপুরি অসম্ভব' এবং 'কার্কপ্যাট্রিক অজ্ঞতা, ষড়যন্ত্রের দায়ে দোষী', কারণ সে ভিন্নভাবে চিন্তা করছে। কিন্তু জেমস তার অবস্থানে অটল। তিনি উত্তর দেন যে, তার গোয়েন্দা তথ্য ইঙ্গিত দিয়েছে যে এ ধরনের ঐক্যের সম্ভাবনাই অধিক। যশোবন্ত রাও পুনা পুনরাধিকার করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং অন্যতম মারাঠা প্রধান বেরার-এর রাজা তার সাথে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তার তথ্য আর্থার ওয়েলেসলিকে জানিয়ে নিজের অবস্থানকে দৃঢ়তর করেন। কর্নেল ব্যারি ক্লোজকেও তিনি জানান এই যুক্তিতে যে, অনাকাঙ্খিতভাবে উদ্ভূত কোনো ঘটনার জন্যে যাতে সৈন্যদের মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়, তা না হলে তাদের মাঝে সাময়িক উত্তেজনা ও অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। তার তথ্য যদি ভুল হয়, তাহলে ওয়েলেসলি যাতে তাকে বরখাস্ত করে—এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে তিনি চিঠির সমাপ্তি টানেন। অতঃপর জেমস প্রতীক্ষা করছিলেন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের, যা তার মনে হচ্ছিল, খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু তার চাকরি অল্পের জন্যে রক্ষা পেল যখন মারাঠাদের সম্পর্কে তার সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হলো। জেমসকে 'অযোগ্য আহাম্মক' হিসেবে অভিযুক্ত করার এগারো দিন পর ওয়েলেসলি আবার তার সচিবকে লিখতে বললেন যে, বেরার-এর রাজার শিবিরে অতি দ্রুত একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে গভর্নর জেনারেল জেমসকে নির্বাচন করেছেন, কারণ একাজে তিনিই সবচেয়ে উপযুক্ত। অথচ ক'দিন আগেই মারাঠা কনফেডারেসির ঐক্য সম্পর্কে তার অভিমতের কারণে তাকে অজ্ঞ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে দাবি করে।

ওয়েলেসলির আগ্রাসী নীতি গ্রহণের ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে উদ্যোগটি ছিল বিলম্বিত। আগস্টে সংঘাতের সূচনা হয়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পাঁচ দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ মারাঠা বাহিনীর ওপর হামলা করে বসে। পাঁচ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আর্থার ওয়েলেসলি একের পর এক জয়লাভ করেন। এসবের মধ্যে আসায়ে'র যুদ্ধ ওয়েলিংটনের ভবিষ্যৎ ডিউক ওয়েলেসলির সমগ্র সামরিক জীবনে সেরা কৃতিত্ব বয়ে এনেছিল। কিন্তু বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে। শুধু আসায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ওয়েলেসলিকে তার বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ সৈন্য হারাতে হয়। এর পরই তার এক ঊর্ধ্বতন অফিসার তাকে লিখে পাঠান: 'আশা করি এত উচ্চ মূল্যে তুমি আর কোনো বিজয় ক্রয়ের চেষ্টা করবে না।' জেমস কার্কপ্যাট্রিক মনে করতেন পুরো দ্বন্দ্বই

BanglaBook.org

অপ্রয়োজনীয় এবং ভ্রান্ত, 'লর্ড ওয়েলেসলির শান্তি স্থাপনের অজুহাতে তৈরি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে রক্তের সমুদ্র এবং সম্পদের ভাণ্ডার অপচয় হয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল ভারতের সাধারণ অধীনতা অর্জন। যার ফলে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অস্থিরতা ও শত্রুতার মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছে, যা অন্য সকল ভারতীয় রাজাদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে।'

জেমসের ক্ষেত্রে তার মনিবের প্রতি শুধু অতিরিক্ত ঘৃণাই যোগ হয়েছিল অহেতুক সংঘাত সৃষ্টি করায়। তিনি উইলিয়ামকে (তিনি তখন ইংল্যান্ডে কন্যাদের সাথে মিলিত হয়েছেন) লিখেন যে, তিনি এখন গভর্নর জেনারেলকে ঘৃণা ও নিন্দার দৃষ্টিতে দেখেন। ভাইয়ের প্রতিও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, এমন একজন লোকের জন্যে তিনি তার নীতিবোধ বর্জন করেছিলেন এবং উল্লেখ করেন, 'আমাদের মধ্যে প্রচুর রাজনৈতিক মতপার্থক্য রয়েছে, যা সমঝোতার সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হয় না।'

তিনি উইলিয়ামকে আরও জানান, লর্ড ওয়েলেসলি যে আচরণের মাধ্যমে জেনারেল পামারের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, তাকে পুনার রেসিডেন্সি থেকে বের করে এনেছেন উদারভাবে ভাতা প্রদান ও কলকাতায় তার পাশে একটি পদে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু পামার বাংলায় পৌঁছার পর ওয়েলেসলি তাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেন। তিনি যে শুধু প্রতিশ্রুত চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, কোনো ধরনের আর্থিক ক্ষতিপূরণও পাননি তিনি। মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় এ বিষয়ে পামারের সাথে আলোচনা করার জন্যে একবার তাকে তলব না করেও অপমান করা হয়েছে। যদিও বাস্তব অবস্থা ছিল যে, শুধু কলকাতায় নয়, সমগ্র ভারতে পামার যেভাবে পেশোয়া এবং অন্য মারাঠা দলপতিদের মনের কথা জানতেন তা আর কোনো ইংরেজের জানা ছিল না। পামার অসহায়ের মতো তার পুরনো পৃষ্ঠপোষক ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখেন, 'লর্ড ওয়েলেসলি বিশেষ বৈঠক পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন, কারণ তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেন না, তার কাছে আমার প্রবেশাধিকারও নেই।' মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পুরো সময় জুড়েই জেমসের চিঠিতে জেনারেল পামারের করুণ অবস্থার বিষয়ে উদ্বেগ লক্ষণীয় এবং লিখেন, 'তার প্রতি অসদাচরণ আমাকে বিস্মিত করার চাইতে বরং বেদনাহত করে।'

সাত মাস পর জেমসের আকাশ যেন আরও অন্ধকার হয়ে গেল। কারণ ১৮০৪ সালের ৯ মে তার আরেক মহান বন্ধু হায়দারাবাদের প্রধান উজির আরিস্তু জাহ ইন্তেকাল করেন এবং একই দিনে তার সুরুর নগর উদ্যানে তাকে কবরস্থ করা হয়।

নিজামের মৃত্যুর জন্যে সকলের মধ্যে এক ধরনের প্রস্তুতি থাকলেও আরিস্তু জাহের মৃত্যু এসেছিল আকস্মিকভাবে। যদিও তিনি নিজাম আলী

খানের সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু তাকে নিজামের চাইতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, অধিক কর্মক্ষম ও প্রাণোচ্ছল মনে হত। ষাট ও সত্তর বছরের মাঝামাঝি বয়সের আরিস্তু জাহ নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, বিশেষ করে তার আরবীয় ঘোড়া নিয়ে, যেগুলোর প্রজনন ও রক্ষণাবেক্ষণ তিনি স্বয়ং তদারক করতেন। এপ্রিলের শেষ দিকে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং এক সপ্তাহ ধরে জ্বর থাকে প্রবলভাবে। দিন দশেক পরে জ্বর সেরে শরীর ভালো হয়ে উঠছিল বলে মনে হলো। জেমস কলকাতায় লিখেন, 'চিকিৎসকরা তাকে বিপদের বাইরে বলে ঘোষণা করার পর সন্ধ্যায় আবার প্রবল জ্বর আসে এবং সারা রাত ধরে জ্বরের প্রকোপে তিনি প্রলাপ বকতে থাকেন। আজ সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার মৃতদেহ জাঁকজমকের মধ্যে শহর থেকে এক মাইল দূরে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে। শোক মিছিলে দরবারের অধিকাংশ ওমরাহ ও শহরের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী যোগ দেয়।'

জেমস যখন বন্ধুকে হারানোর শোক কাটিয়ে উঠছিলেন তখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, নিজাম সিকান্দার জাহ আরিস্তু জাহের স্থলে প্রধান উজির হিসেবে যাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন তিনি আর কেউ নয়, জেমসের পুরনো ও বড় দুশমন মীর আলম। এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মীর আলমের প্রার্থিতাকে কলকাতা থেকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন ওয়েলেসলি। মীর আলমের পক্ষে ওয়েলেসলির সমর্থন প্রদানের সিদ্ধান্তের পেছনে অবদান হেনরি রাসেলের। ১৮০১ সালের শেষ পর্যন্ত রাসেল হায়দারাবাদে জেমসের সহকারী হিসেবে ছিলেন এবং জেমসের সুপারিশেই মাত্র একুশ বছর বয়সে সম্প্রতি তিনি রেসিডেন্সির প্রধান সচিব পদে উন্নীত হয়েছেন। হায়দারাবাদে ব্রিটিশদের মধ্যে রাসেলই জেমসের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও বন্ধু ছিলেন। জেমস উইলিয়ামকে লিখেন, 'তরুণ হেনরি রাসেল আমার অত্যন্ত অনুরক্ত এবং আমার অত্যন্ত উপকারী তরুণ বন্ধু।'

BanglaBook.org

দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান উনিশ বছর হলেও উভয়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ছিল এবং জেমসও সঙ্গী হিসেবে রাসেলকে পছন্দ করলেন। তদুপরি, জেমসের মতো রাসেলও হায়দারাবাদের সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং একজন ভারতীয় বিবি গ্রহণ করেন, তার গর্ভে রাসেলের যে সন্তানের জন্ম হয় সে সাহিব আলমের সমবয়সী।

রাসেলের একটি বড় ত্রুটি ছিল, যদিও জেমস কখনো তার উল্লেখ করেননি। কিন্তু চিঠিতেই তার সম্পর্কে মন্তব্য থেকে তা বুঝা যায়। তা হলো, রাসেল অস্বাভাবিক কেতাদুরস্ত ও আত্মগর্বে গর্বিত ছিলেন নিজের সুন্দর চেহারা ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে। পিতার দশ সন্তানের মধ্যে রাসেল ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং তার শৈশবেই পিতা তাকে মনে করতেন অতি প্রতিভাসম্পন্ন এবং ছোট ভাই চার্লসের পৃষ্ঠপোষকতা করে তিনি বড় হন, ঠিক যেভাবে তিনি পরবর্তীতে

তার কর্মচারীদের, তার প্রেমিকা ও স্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আঠারো বছর বয়সে হায়দারাবাদে আসার পর তিনি তার প্রথম চিঠি লিখেন চার্লসকে। সে চিঠি এবং পরবর্তী চিঠিগুলোও পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষের মতো করে লেখা, যার মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তির রহস্যের গভীরতা সম্পর্কে ছোট ভাইকে জ্ঞানদানের উদ্যোগ ছিল তার।

১৮০২ সালে চার্লস কলকাতায় পৌঁছার পরই হেনরি রাসেল ভাইকে উপদেশ দিয়ে লিখেন, 'মহিলাদের প্রতি তোমাকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন নেই, আমার পদক্ষেপ অনুসরণ করো, তাহলেই তুমি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। মহিলাদের সঙ্গ মন ভালো রাখে এবং ভদ্রলোকদের আচরণও স্বাভাবিক রাখে। কারো বিতৃষ্ণার পাত্রে পরিণত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখো এবং 'মহিলাদের পুরুষ' বলে নিজেকে নিন্দনীয় করে তুলো না।' এর সাথে তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি দিনের অধিকাংশ সময় সুন্দরী তরুণী বন্ধুদের সাহচর্যে কাটাই, যাদের নাম ও বিবরণ পরবর্তীতে আমার চৌরঙ্গি চিঠিতে উল্লেখ করব...আমার জন্যে ইউরোপ থেকে কিছু আনোনি? একটি ভালো জামাও নয়?'

একমাস পর হেনরি তার ছোট ভাইকে কলকাতার মহিলাদের প্রলুব্ধ করার কৌশল সম্পর্কে লিখেন, 'তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো মহিলার প্রশংসা করা মোক্ষম অস্ত্র। তুমি যদি নিশ্চিত হও যে, কোনো মহিলা সত্যিই সুন্দরী এবং তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করো তাহলে নিঃসন্দেহে সে তা বিশ্বাস করবে, কিন্তু তোমার সম্পর্কে তার মধ্যে অনুকূল কোনো প্রভাব পড়বে না। কিন্তু অন্য কোনো পুরুষের কাছ থেকে যদি সে জানতে পারে যে, তুমি তার সৌন্দর্য ও বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করেছ, তাহলে সে তোমাকে নিজের মতো করে ভাববে...।' এইসব উপদেশ চার্লসের ক্ষেত্রে সামান্যই আছর ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ একমাস পর হেনরি আবার লিখেন, 'তোমার মতো সুদর্শন পুরুষের ক্ষেত্রে কি আসলেই সম্ভব যে, একজনের ওপরও তোমার চাটুকারিতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হওনি?'

BanglaBook.org

হেনরি রাসেল হায়দারাবাদে স্থায়ীভাবে থাকলেও আরিস্তু জাহের মৃত্যুর খবর যখন বাংলায় পৌঁছে, তখন তিনি তার পিতা ও সৎ মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে কলকাতায় ছিলেন। যথা শিগ্‌গির তাকে গভর্নমেন্ট হাউজে তলব করা হয়। ওয়েলেসলি তার সাথে পরামর্শ করেন যে পরবর্তী উজির হিসেবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাকে সুপারিশ করা উচিত। অতি মর্যাদায় অভিষিক্ত হেনরি রাসেল আনন্দের আতিশয্য সামলাতে না পেরে গভর্নর জেনারেলকে হায়দারাবাদ পরিস্থিতির ওপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তাতে মীর আলমের নামও উল্লেখ করেন, যাকে তিনি কখনো দেখেননি এবং তার ধারণা, দরবারে ওমরাহদের মধ্যে তিনিই অধিকতর ব্রিটিশপন্থী। ওয়েলেসলি বিষয়টি লুফে নেন এবং

হায়দারাবাদ পরিস্থিতির ওপর জেমস কার্কপ্যাট্রিকের পাঠানো বিস্তারিত সুপারিশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। হায়দারাবাদের ওমরাহ্‌দের মধ্যে শুধুমাত্র মীর আলমের সাথেই ওয়েলেসলির সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন তিনি। রাসেলের রিপোর্টের মার্জিনে তিনি লিখেন, 'হায়দারাবাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসেলের রিপোর্ট তার বিচার বিবেচনা, জ্ঞান ও অধ্যাবসায়ের ফল। মীর আলম প্রধান উজির হওয়ার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি এবং মৈত্রীর চেতনায় কাজ করতে সক্ষম। অতএব তার পক্ষেই সুপারিশ করা উচিত।'

নিজাম সিকান্দার জাহও লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক সমর্থিত হয়ে মীর আলমের নিয়োগের বিষয় চূড়ান্ত করলেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে মীর আলম তার গ্রামের উদ্যানের বাসভবনে গৃহবন্দি অবস্থায় ছিলেন। আরিস্তু জাহের নির্দেশে হায়দারাবাদ শহরে প্রবেশ তার জন্যে নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু একটি সমস্যা সম্পর্কে কেউ ধারণা করতে পারেননি। মীর আলম চার বছর যাবত নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিলেন এবং এ সময়ে তাকে একবারেরও জন্যে শহরে দেখা যায়নি। শহরের কেউ (অথবা কলকাতায়) জানত না যে, মীর আলম সে সময়েও গুরুতর অসুস্থও ছিলেন। ১৭৯৯ সালে তার শরীরে প্রথম যে কুষ্ঠরোগ শনাক্ত হয়েছিল তা আরও বিস্তৃত হয়েছে। হায়দারাবাদে পৌছার পর মীর আলমকে যে শুধু তার তিক্ততার মধ্যে দেখা গেল তা নয়, প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতাও ছিল দৃঢ়ভাবে, যদিও তার শরীর কমবেশি ভেঙে পড়েছিল। মীর আলম ফিরে আসায় প্রথম দফা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে জেমস আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। উইলিয়ামকে তিনি লিখেন, 'লোকটির দেহের সাথে মানসিক বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট অবক্ষয় হয়েছে, যা তার বাঁকা নাকের মতো বিরাট দুর্নীতি ও বিকলাঙ্গতার আকারে মূর্ত হয়ে উঠেছে।'

মীর আলমকে দেখে জেমস শুধু যে ভীত হয়েছিলেন তা নয়, 'তারিখ-ই-আসফ-জাহি' অনুসারে, 'হায়দারাবাদে মীর আলম যখন ফিরে আসেন, তার শরীর কুষ্ঠরোগে পুরোপুরি আক্রান্ত, শরীর থেকে পুঁজ গড়িয়ে পড়ছিল। বহু ভারতীয় ও ব্রিটিশ চিকিৎসকরা তাকে সুস্থ করার জন্যে চেষ্টা করলেও কোনো ফলোদয় হয়নি। শেষ পর্যন্ত এক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের পরামর্শে একটি বিষাক্ত, ক্রুদ্ধ সাপকে তার বিছানায় আনা হয়। কারণ প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, কুষ্ঠরোগীকে যদি সাপে দংশন করে তাহলে রোগ সেরে যাবে। কিন্তু সাপ তাকে দংশন করে না। পরিবর্তে সা'পটি মীর আলমের দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত সম্ভব কেটে পড়ে।'

কিন্তু তখন করার মতো কিছুই ছিল না। ১৮০৪ সালের ৩১ জুলাই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মীর আলম‌কে নিজাম সিকান্দার জাহের প্রধান উজির হিসেবে ঘোষণা করা হয়। চার বছর আগে তার অবমাননার জন্যে যারা দায়ী বলে তার বিশ্বাস তিনি তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা প্রদর্শন করতে

BanglaBook.org

বিলম্ব করলেন না। ২০ অক্টোবর জেমস শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, জুফ্ফার পল্টন-এর মহিলা সৈনিকেরা সেদিন সকালে আরিস্তু জাহের জ্যেষ্ঠা বিধবা পত্নী সারওয়ার আজফা বেগমের প্রাসাদ ঘেরাও এবং ভেতরে তছনছ করেছে। তিনি কলকাতায় রিপোর্ট পাঠান, 'মীর আলম নতুন নিজামের সুদৃষ্টি ও আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যে তাকে জানান যে, আরিস্তু জাহ ১২ লাখ রুপি মূল্যের মণি হাতিয়ে নিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে সরকারের প্রাপ্য। তিনি জানিয়েছেন, এগুলো আছে সারওয়ার আজফা বেগমের কাছে, অতএব এসব বাজেয়াপ্ত করা উচিত। এগুলো সহজে পাওয়া যাবে না বলে নিজাম কিছু সংখ্যক পরিচারিকা ও পাঁচজন মহিলা সৈনিককে তার প্রাসাদে প্রেরণ করেন। সেখানে বেশ বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। তারা বেগমের হাত ধরে টেনে চত্বরে এনে মেঝে খনন করে আনুমানিক ১২ লাখ রুপি মূল্যের মণিমুক্তা ছাড়াও ৩৫ হাজার স্বর্ণের মোহর, ৫০ হাজার প্যাগোডা (স্থানীয় মুদ্রা), ৭ লাখ ৯২ হাজার রুপি, একটি হাতির অলঙ্কৃত হাওদাসহ সোনার ফুলদানি উদ্ধার করেছে, যার আনুমানিক মূল্য এক লাখ রুপি।'

সারওয়ার আজফা বেগমের আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও নিজাম তাকে সাহায্য করতে কিছুই করেননি। অথচ তিনি তার প্রথম স্ত্রীর নানি। বরং তার দুর্দশা আরও বৃদ্ধি করার লক্ষে তিনি নিজের স্ত্রী অর্থাৎ আরিস্তু জাহের প্রিয় নাতনিকে প্রকাশ্যে অপমান করেন। নাতনির বিয়েতে আরিস্তু জাহ অশ্রু বিসর্জন করেছেন, এখন তার মৃত্যুর পর আদরের নাতনি অরক্ষিত, নিরাপত্তাহীন এবং সিকান্দর জাহ তার অন্য মহিলাদের সাথে যে অমর্যাদাকর আচরণ করে থাকেন, তিনি অনুরূপ আচরণের শিকার। আরিস্তু জাহের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মিত্রদের প্রত্যেকের বাড়িঘর লুট করার ব্যাপারে মীর আলমের পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও নীরবতা পালন করেন নিজাম। মীর আলমের নিগ্রহের শিকার হলেন আরিস্তু জাহের সহকারী রাজা রাগোতিম রায়।

১৮০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে জেমসের অবস্থান পূর্বের যে কোনো সময়ের চাইতে দুর্বল পয়ে পড়ে। কলকাতায় তিনি তখনো যে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' হিসেবে পরিগণিত ছিলেন শুধু তাই নয়, বারো মাসের মধ্যে তিনি হায়দারাবাদে তার ঘনিষ্ঠ দুজন মিত্র ও বন্ধুকে হারিয়েছেন। তাদের স্থলে এসেছেন এক উন্মাদ বুদ্ধিভ্রষ্ট সিকান্দার জাহ এবং তার জাত শত্রু, তিক্ত, পরশ্রীকাতর মীর আলম। তারপরও জেমসের অবস্থান, তিনি যেভাবে বিশ্বাস করতেন তার চাইতেও শক্তিশালী ছিল।

জেমসের জানা ছিল না যে, লন্ডনে কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টরও ওয়েলেসলির অপ্রয়োজনীয় ও অপচয়মূলক নীতির ব্যাপারে তার মতোই অভিমত পোষণ করছিলেন। যদিও তাদের চিন্তা কোনো নৈতিক বিবেচনার

চাইতে গভর্নর জেনারেলের পরিচালিত অব্যাহত যুদ্ধের ব্যয়জনিত উৎকণ্ঠা দ্বারা পরিচালিত ছিল। একই সময়ে নেপোলিয়ন ইউরেপে যে পরিমাণ ভূখণ্ড জয় করেছিলেন, ওয়েলেসলির অর্জিত ভূখণ্ড তার চাইতেও বিশাল ছিল। কিন্তু এর পরিণতিতে কোম্পানির তহবিল সংকট সৃষ্টি হয়, যা এক পর্যায়ে বার্ষিক ২০ লাখ পাউন্ড ঘাটতিতে দাঁড়ায়। ওয়েলেসলি প্রথম যখন ভারতে পৌঁছেন তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ড, এখন তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ১৫ লাখ পাউন্ড। ওয়েলেসলির বিশাল নতুন গভর্নমেন্ট হাউজ নির্মাণের ব্যয়ের খবর লন্ডনে পৌছার পর সেটি ছিল সর্বশেষ পর্যায়। কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস ঘোষণা করলেন যে, 'ওয়েলেসলির অধীনে সরকার স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত হয়েছে।'

চাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল এবং ১৮০৪ সালের শরৎকালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ওয়েলেসলিকে ডেকে পাঠানো এবং লর্ড কর্নওয়ালিসকে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্যে তার সাতষট্টি বছর বয়সে ভারতে প্রেরণ করা হলো। ১৮০৪ সালের শেষদিকে তিনি ইংল্যান্ড ত্যাগ করেন, যদিও ১৮০৫ সালের মে মাস পর্যন্ত লর্ড ওয়েলেসলি জানতে পারেননি যে, তাকে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

ওয়েলেসলির অধীনে ভারতে প্রধান যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, তা তার সমর্থকরাও স্বীকার করেছেন যে, কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সাহসও করত না। তার ভাই আর্থার ওয়েলেসলি ভারতে অবস্থানরত তাদের তৃতীয় ভাই হেনরি ওয়েলেসলিকে জানান, 'গভর্নর জেনারেলের কাছে কে তার মনের কথা বলবে। তুমি এবং ম্যালকম তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর তার সম্পর্কে বোঝার সামর্থ্য আর কারো নেই যে, কোনো বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করে এবং তার কোনো ভুল সম্পর্কে আপত্তি জানায়।'

পদস্থ অফিসারদের মধ্যে একজন মাত্র তার সামনে দাঁড়াতে সাহস করতেন। কর্নওয়ালিস কলকাতায় পৌছার পূর্বেই নতুন গভর্নর জেনারেলকে বলা হয়েছিল, ওয়েলেসলির সম্প্রসারণবাদী নীতির বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের দৃঢ় অবস্থান সম্পর্কে তাকে জানানো হয়। কর্নওয়ালিস তার সহকারীদের নির্দেশ দেন যত শিগগির সম্ভব হায়দারাবাদের এই সাহসী রেসিডেন্টের সাথে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে। তিনি জেনারেল পামারের সাথেও সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কর্নওয়ালিস ভারতে তার প্রথম মেয়াদে দায়িত্ব পালনকালেই পামারের সাথে পরিচিত এবং তার বিশ্বাস ছিল মারাঠাদের প্রসঙ্গে পামারও ওয়েলেসলির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে থাকেন।

পাঁচ বছর ধরে অব্যাহত তদন্ত, শত্রুতা, বিচ্ছিন্নতার পর জেমসের সহাবস্থানের ধারণা এবং ব্রিটিশ-ভারতীয় সম্পর্কের প্রতি তার আপোসমূলক ভূমিকাকে সহসা নতুন দৃষ্টিতে দেখা শুরু হলো। একথা সত্য যে, কর্নওয়ালিস

মোটেও উদারপন্থী ছিলেন না এবং ভারতীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার সূচনার জন্যে তিনিই দায়ী ছিলেন। সেই প্রক্রিয়াই ওয়েলেসলির সময়ে আরও ত্বরান্বিত হয়। তবুও বৃদ্ধ কর্নওয়ালিস নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হুমকি ও যুদ্ধের নীতিকে পছন্দ করতেন না এবং ওয়েলেসলির চাপিয়ে দেওয়া নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন আছে বলেও বিশ্বাস করতেন না। অপ্রয়োজনীয় রক্তক্ষয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দেখে কর্নওয়ালিস রীতিমতো বিস্মিত হন। তিনি দেখতে পান, তার প্রধান কাজ যুদ্ধ এড়ানো এবং ব্রিটিশদের ন্যায়বিচার ও মধ্যপন্থার ওপর ভারতীয়দের মধ্যে আস্থা প্রতিষ্ঠা করা—জেমস হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই নীতিগুলো সম্পর্কেই বলে আসছিলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল বিচারে জেমসের ভবিষ্যৎ বাস্তবে কখনো উজ্জ্বল হয়নি।

জেমসের নতুন রেসিডেন্সি ভবনের পুতুলের ঘরের মডেল-এর নির্মাণকাজ যখন সমাপ্ত হচ্ছিল, তখন মহল থেকে সামান্য উত্তর দিকে আসল ভবনের ভিত্তি ধীরে ধীরে ওপরে উঠছিল। ১৮০২ সালে জেমস প্রতি মাসেই মাদ্রাজে তার বন্ধু জেমস ব্রুনটনকে উৎকণ্ঠার সাথে লিখেছেন নতুন ভবন নির্মাণে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের জন্যে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে। নভেম্বরের শুরুতেও শ্রমিক পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি এবং জেমস তার বন্ধুকে মিনতি করেন অগ্রগতি জানাতে এবং লিখেন, 'স্থপতি ও মিস্ত্রিদের আগমনের জন্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছি।' নভেম্বরের শেষদিকে প্রথম দলের নির্মাতাদের দেখা যায় মসলিপতম বন্দর থেকে আসতে। কিন্তু বহু দক্ষ কারিগরের উপস্থিতি তখনো ছিল না। তিনি আবার তাগিদ দেন ব্রুনটনকে, 'জলদি পাঠাও-একজন হেডমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, খোদাইকারী...তাদের মজুরি নিঃসন্দেহে বেশি হবে, আমার বিশ্বাস তারা নিজ নিজ পেশায় দক্ষ হবে এবং হেড মিস্ত্রিকেও হতে হবে স্থপতি মানের।' ধীরে ধীরে একে একে করে পৌঁছতে থাকে দক্ষ কারিগরেরা এবং ১৮০৩ সালের শুরুতে তারা ভিত্তি প্রস্তরের কাজ শুরু করে। বছরের পরবর্তী সময়ে পাথরের কাজ ভূমির ওপরিভাগে মাথা তোলে। রেসিডেন্সির 'চারবাগ' থেকে ময়না ও টিয়া পাখির অবিরাম কিচির মিচির শব্দকে ছাড়িয়ে যায় পাথর কাটার অব্যাহত শব্দে, শ্রমিকদের চিৎকারে এবং কাঠের মই এ তাদের স্ত্রীদের উঠানামার শব্দে।

রেসিডেন্সি পোর্টিকোর স্তম্ভগুলো মহলের উদ্যানের ওপর মাথা তোলে এবং যথাসময়ে ভাস্কররা ত্রিকোণবিশিষ্ট সম্মুখভাগে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশিকা খোদাই করতে শুরু করে, যেখান থেকে দেখা যায় 'হরিণ উদ্যান।' জেমস অত্যন্ত সন্তুষ্টি সহকারে এসব লক্ষ করেন। জেমসের চিঠি থেকে দেখা

BanglaBook.org

যায় যে, রেসিডেন্সি ভবন নির্মাণের কৃতিত্বে তিনি গর্বিত ছিলেন এবং সব সময় এজন্যে তার পরলোকগত পৃষ্ঠপোষক নিজাম আলী ও আরিস্তু জাহের অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার সাবেক পৃষ্ঠপোষক স্যার জন ক্যানাওয়েকে এক চিঠিতে জানান যে, তিনি কীভাবে আরিস্তু জাহের সহায়তায় বৃদ্ধ নিজামের কাছ থেকে জমি লাভ করেছিলেন। তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন যে দুই ব্যক্তি জেমস সেজন্যে অনুতাপও প্রকাশ করেন।

ক্যানাওয়ের কাছেই জেমস রেসিডেন্সি ভবন নির্মাণকাজের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন। উইলিয়ামের ক্ষেত্রে জেমসের মনে হয়েছিল যে, গোটা দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদে তার নির্মাণস্থলকে সকলের আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত করার উদ্যোগকে হয়তো ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু জন ক্যানাওয়ে ছিলেন উন্নত রুচির লোক, যিনি এ ধরনের একটি অট্টালিকা নির্মাণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পর ভারতে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে যে বাড়িটি ক্রয় করেন সেটি রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে তোলেন। জেমস তা জানতেন এবং সে কারণেই তিনি যা করেছিলেন তা ক্যানাওয়ের কাছে প্রকাশ করতে বিব্রত হননি। ১৮০৪ সালের অক্টোবরে নির্মাণকাজ যখন শেষদিকে তখন তিনি গর্বের সাথে লিখেন, 'আপনি একসময় যে স্থানে বাস করেছেন তা এখন কেমন হয়েছে তা কল্পনাও করতে পারবেন না এবং যারা এখন দেখে তারা বিস্মিত হয় এবং প্রশংসা করে। পুরনো পরিকল্পনার মধ্যে হিন্দুস্থানি উদ্যান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সাইপ্রেস গাছ শোভিত এভিনিউ-এর গাছগুলো নিষ্ঠুর কুঠারের শিকার হয়েছে। যে বরাদরিতে আপনি আহার করতেন এবং সংযুক্ত শয়নকক্ষ, একপাশে বর্গাকৃতির জলাধার সবকিছু মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে এবং সেগুলোর স্থানে গড়ে উঠছে এক চমৎকার প্রাসাদ। স্থাপত্য রীতির বিধান অনুসরণ করা হয়েছে এর নির্মাণে। দ্বিতলবিশিষ্ট প্রাসাদ প্রাচীন মহল্লের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এবং এর সম্মুখভাগ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বিনোদনের প্রচুর জায়গা রাখা হয়েছে, যার মধ্যে এক মাইল ব্যাসার্ধের একটি হরিণ উদ্যানও আছে।'

নতুন রেসিডেন্সি ভবনের জাঁকজমক সম্পর্কে তিনি ক্যানাওয়েকে লিখেন, 'আমি শুধু আপনাকে এটুকু জানাচ্ছি যে, সাবেক উজির আমার জন্যে যে ভবনটি নির্মাণ করেছেন সেটির গ্যালারির ছাদ চিত্রাংকিত। উত্তর দিকের পোর্টিকো একই রকম। দক্ষিণে বারান্দার সাথে যুক্ত দুটি সিঁড়ি, বারোটি পৃথক কক্ষ, রাজকীয় মানের উপযোগী সবকিছু। বর্ণিত কক্ষগুলো ছাড়াও নিচতলা খিলানশোভিত এবং এখানে কিছু কক্ষ বিশেষভাবে শীতল এবং তপ্ত আবহাওয়ায় চমৎকার। ভবনের দক্ষিণ পাশে ডিম্বাকৃতির পুকুর, যা সবসময় পানিতে ভরা থাকে, যাকে ঘিরে পাথর বিছানো রাস্তা এবং উপযুক্ত দূরত্বে বাতি বসানো। এখান থেকে রাস্তাটি গিয়ে মিশেছে পোর্টিকোতে।' প্রাসাদটি

BanglaBook.org

জেমসের বাসস্থান হবে। তিনি ভাই উইলিয়ামকে লিখেন তার বড় মেয়ে ষোলো বছর বয়স্কা ইসাবেলাকে ভারতে পাঠাতে এবং ভবনটি তার দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 'আমার ধারণা ইসাবেলাও দেখে একই কথা বলবে এবং আমার বিশ্বাস সে এখানে ভালো বর খুঁজে পাবে না বলে তুমি যে ধারণা পোষণ করছ, তাও ভুল প্রমাণিত হবে। যাই হোক না কেন, একবার পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কী?' ইসাবেলার জন্যে ভারতে যে খরচ হবে তা বহন করার কথাও লিখেন উইলিয়ামকে। সে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসুক অথবা ভারতে যোগ্য স্বামীর সন্ধানে জাহাজে চেপে কলকাতায় চলে আসা মেয়েদের দলে অন্তর্ভূক্ত হয়েই আসুক। 'তুমি জানো, ইসাবেলা আমার দত্তক কন্যা। সে কারণে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তার ব্যয় বহন আমার দায়িত্ব, আমি আনন্দের সাথে তা পালন করব।'

রেসিডেন্সির মাথা যত ওপরে উঠে এবং সেখানে প্রবেশ করার দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে, তখন জেমস ভাবতে শুরু করেন যে, বিশাল নতুন ভবনকে তিনি কীভাবে সাজাবেন। তিনি বিশাল এক গালিচা তৈরির নির্দেশ দিয়ে সূচনা করলেন—দরবার ভবনের জন্যে ষাট ফুট দীর্ঘ ও ত্রিশ ফুট প্রশস্ত গালিচা। বিরাটাকৃতির একটি ঝাড়বাতিও কিনলেন, যা কোম্পানি ক্রয় করেছিল চির অভাবগ্রস্ত প্রিন্স অফ ওয়েলেস-এর কাছ থেকে, যেটি এক সময় ব্রাইটনের রাজপ্রাসাদের প্রধান কক্ষে ঝুলানো ছিল। রেসিডেন্সিতে বিনোদনের ব্যবস্থার কথা ভেবে তিনি মাদ্রাজে তার দূতকে নির্দেশ দেন একজন ব্যান্ড মাষ্টার এবং কোনো এতিমখানা থেকে একডজন বালককে প্রশিক্ষণের জন্যে সংগ্রহ করতে। বিভিন্ন সুরযন্ত্র সংগ্রহের চেষ্টাও চালান তিনি। সেই সাথে নির্দেশ দেন বারোটি গরুর গাড়ি ভর্তি আলু পাঠাতে এবং কিছু সশস্ত্র প্রহরী, যারা রাস্তা পাহারা দেবে।

একই সাথে জেমস ইউরোপে তার চাহিদা পাঠাচ্ছিলেন দুর্লভ ও মূল্যবান সামগ্রীর জন্যে, যার ফলে একজন মোগল শাহজাদার জীবনধারার মতো করে জীবন কাটানোর স্বপ্ন পূরণ হবে তার। ১৮০৩ ও ১৮০৪ সালের পুরো সময়ে এ ধরনের চিন্তাধারা ক্রমবর্ধমানভাবে বাস্তবভিত্তিক মনে হচ্ছিল এবং জেমসের চিঠি 'একটি ভালো ইলেকট্রিফাইং মেশিন' এবং 'বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্দীপক উপকরণের ' চাহিদায় পূর্ণ থাকত। এছাড়া রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর মতো কিছু উপকরণও তার চাহিদার মধ্যে ছিল। ইলেকট্রিক্যাল উপকরণ পথিমধ্যে হারিয়ে গেলেও রাসায়নিকের বাক্সটি যথাসময়ে পাওয়া যায়।

রসায়নে জেমসের আগ্রহের চাইতে একসময়ে জ্যোর্তিবিদ্যার প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে গেল। তিনি রেসিডেন্সির ছাদে একটি মানমন্দির নির্মাণের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা আঁটেন এবং ১৮০৪ সালের শেষ দিকে উইলিয়ামকে লিখেন, জ্যোতির্বিদ্যার কাজে নক্ষত্ররাজি প্রত্যক্ষ করার উপযোগী একটি

BanglaBook.org

টেলিস্কোপ পাঠাতে। তিনি লিখেন, 'বাড়ির ছাদ মানমন্দির স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হতে পারে এবং এখানে এ ভদ্রলোক আছেন, যিনি আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী হতে।'

এই 'ভদ্রলোক' জেমসের পুরনো বন্ধু এবং খায়রুন্নিসার সাথে বিবাহসূত্রে এখন আত্মীয়—আবদুল লতিফ শুস্তারি। ১৮০৪ সালের শেষ দিকে শুস্তারি আরিস্তু জাহের মৃত্যু এবং মীর আলমের ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ নিয়ে বোম্বে থেকে হায়দারাবাদে ফিরে আসেন তার বিখ্যাত স্মৃতিকথা 'কিতাব তুহফাত-উল-আলম' লেখার কাজ শেষ করতে। দর্শনশাস্ত্র ও আইন বিষয়ে পারদর্শিতার মতো জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি সমান দক্ষতা শুস্তারি সাইয়িদের বংশ পরম্পরাগতভাবে ঐতিহ্য। আবদুল লতিফ শুস্তারি ভারতে আগমনের পূর্বে সাইয়িদ আলী শুস্তারির মতো আরও অনেক জ্ঞাতি ভাইয়ের সাথে বেশ কয়েক বছর নক্ষত্রের ওপর গবেষণা করেন। সাইয়িদ আলী তার বংশের অন্যান্যদের মতোই জ্ঞানী ব্যক্তি এবং লতিফ শুস্তারি যখন তার কাছে শিক্ষা নিতে যান, তখন তিনি বাগদাদের প্রধান জ্যোতির্বিদ।

শুস্তারির কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, জ্যোর্তিবিদ্যার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা পারসিকদের চাইতে বেশি জানে এবং বিস্মিত হয়েছিলেন যে, ভারতীয়রাও এক্ষেত্রে অজ্ঞ নয়। তিনি লিখেন, 'কোপার্নিকাস জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণে মুসলিম জ্যোতির্বিদদের চাইতে অনেক সুনির্দিষ্ট। 'সূর্য নয়, পৃথিবী ঘোরে'—এ ব্যাপারে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদদের ধারণা যথার্থ এবং মানুষের ওপর নক্ষত্রের প্রভাবের ধারণাও ইংরেজরা বাতিল করে দেয়..এমনকি জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের কোনো কোনো বিষয়ে হিন্দুরাও আমাদের চাইতে বেশি জ্ঞানের অধিকারী।'

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী জ্যোতির্বিদদের জ্ঞান ইউরোপীয়দের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর—-এই জ্ঞান ভারতে সৌখিন ইংরেজ জ্যোতির্বিদদের রীতিমতো বিস্মিত করেছিল। ১৭৬৫ সালে টমাস ডিয়েনি পিয়ারসি, যিনি ১৭৮০ সালে তার বিখ্যাত দ্বৈতনীতিকে ফিলিপ ফ্রান্সিসের সাথে দ্বিতীয় ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, ১৭৭০-এর দশকের শেষ দিকে জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি তার আগ্রহ ছিল এবং রয়েল গ্রীনউইচ মানমন্দিরে নিয়মিত তিনি তার পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট পাঠাতেন। ১৭৮৩ সালে এক শিক্ষিত মুসলিমের সাথে আলোচনার পর পিয়ারসির মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ফারসি গ্রন্থ 'দি ওয়ান্ডার্স অফ ক্রিয়েশন'-এর প্রতি। তিনি দেখেন এতে শনি গ্রহের অবস্থান প্রদর্শিত হয়েছে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইউরোপীয়রা বিশদ জানত না। ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদরা যেখানে পাঁচটি গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছে, সেক্ষেত্রে পারসিকরা দেখিয়েছি সাতটি। তার বিশ্বাস জন্মে যে, নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের যন্ত্র ইউরোপীয়দের চাইতে মধ্যযুগীয় আরবদের উন্নত ছিল।

BanglaBook.org

সপ্তম গ্রহ শনি আনুষ্ঠানিকভাবে আবিষ্কৃত হয় ১৭৮৯ সালে জ্যোতির্বিদ স্যার উইলিয়াম হারশেল (১৭৩৮-১৮২২)-এর দ্বারা। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে পিয়ারসির চিঠিতে নিয়মিত উল্লেখ থাকত হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলিম বিদ্বানদের কথা।

একইভাবে জেমস ও লতিফ শুস্তারি হয়তো রাতের পর রাত রেসিডেন্সির ছাদে কাটিয়েছেন এবং ভারতীয়, ইসলামী ও ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যার ধারণাগুলোর তুলনা করেছেন এবং কীভাবে এসবের মধ্যে গ্রহণযোগ্য একটি অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৮০৪ থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে জেমসের চিঠিতে জ্যোতির্বিদ্যার পাঠ নিতে প্রয়োজনীয় উপকরণের উল্লেখ বেশি দেখা যায়। এসব সংগ্রহের ব্যয়ের ব্যাপারে মাথা না ঘামাতে এবং পাঠানোর সময় সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন জেমস।

জেমস সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, রেসিডেন্সি ভবন শুধু ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের পরিশীলিত সভ্যতার ধারণা বিনিময়ের স্থানই হবে না, সৌখিন পদ্ধতি জানার কেন্দ্রে পরিণত হবে। দুই ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন পরস্পরকে সমৃদ্ধ করার মধ্য দিয়ে শুরু হলো, যা পরস্পরের কল্যাণ ও আগ্রহের ফলশ্রুতি ছিল।

এ সময়ে স্যার জন ক্যানওয়ের ওপর জেমস খানিক আস্থা স্থাপন করেছিলেন। ওয়েলেসলির অধীনে ভারতে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে তার শঙ্কা ব্যক্ত, তার চাকরিগত সমস্যা সত্ত্বেও হায়দারাবাদে এখন সুখী এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন তা জানান। বড় ভাই জর্জ কার্কপ্যাট্রিকের সাথে জেমসের সামান্য যোগসূত্র ছিল, কিন্তু তিনি তার স্বস্তি প্রকাশ করে তার আনন্দময় জীবনের পরিপূর্ণতার কথা বর্ণনা করেন।

BanglaBook.org

কিন্তু স্বর্গের এডেন উদ্যানতুল্য অনুপম নতুন রেসিডেন্সি, মানমন্দির, পাশের হরিণ ও ইথিওপীয় ভেড়া বিচরণরত উদ্যান, আয়াদের সাথে খেলাধুলায় মগ্ন শিশুদের উচ্ছ্বসিত হাসি, সুবাসিত ফুলের বাগান, অলংকৃত প্রাচীর ও ফোয়ারা থেকে বিচ্ছুরিত পানির ধারা শোভিত রংমহল—সবকিছু সত্ত্বেও অকথিত বেদনা যেন কোথায় আড়াল হয়েই ছিল—তা হচ্ছে ডিমের খোলসের মতো ভঙ্গুর এই সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান এবং এটি যে টিকে থাকবে না সেই ব্যাপারে নিগুঢ় উপলব্ধি।

১৮০৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে জেমসের স্বাস্থ্যের দ্রুত এবং চরম অবনতি ঘটে। জুলাই মাসে ডাক্তার ওরে একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জেমসকে প্রদান করেন কলকাতায় পাঠানোর জন্যে। এতে লেখা ছিল: 'প্রত্যয়ন করা হচ্ছে যে, লে. কর্নেল জেমস কার্কপ্যাট্রিক, দাক্ষিণাত্য সুবার মহামান্য শাসকের দরবারে নিয়োজিত রেসিডেন্ট, গত আঠারো মাস যাবৎ

মারাত্মক হেপাটাইটিস ও বাতব্যাধিতে আক্রান্ত। যদিও তার লিভারের চিকিৎসার জন্যে পারদ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু প্রায় প্রায়ই (প্রতি দুমাস পর) এ ধরনের উপসর্গ দেখা যাচ্ছে এবং এখন নিরাময়ের কমবেশি অসাধ্য হয়ে পড়েছে। আমি নিষ্ঠার সাথে ঘোষণা করতে চাই যে, আবহাওয়া পরিবর্তন তার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে বলে আমি মনে করি এবং সে অনুযায়ী সুপারিশ করতে চাই যে, তাকে সমুদ্রে উপকূলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং উপকূলে পৌঁছার পর প্রয়োজন পড়লে তাকে সমুদ্রের দিকে পাঠানো যেতে পারে।'

জর্জ ওরে
সার্জন, হায়দারাবাদ রেসিডেন্সি
১৩ জুলাই ১৮০৫

জেমস আশা করেছিলেন যে, সমুদ্র ভ্রমণে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু এ ভয়ও তার ছিল যে, বাস্তবে একটি পর্যায় পর্যন্ত শারীরিক অবস্থার উন্নতির চাইতে বেশি আশা করা সঙ্গত হবে না। একই কারণে তিনি তার উইল লিখতেও উৎকণ্ঠিত ছিলেন, কীভাবে তিনি এতদিনে অর্জিত তার সম্পদ তার দুই সন্তান ও ভাতিজীদের মধ্যে এবং তার সুন্দরী স্ত্রী খায়রুন্নিসার মধ্যে বিভাজন করে দেবেন। তিনি এটিও উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমুদ্র যাত্রার ফলেও যদি তার স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয়, তাহলে তাকে জন্যে দুটি সিদ্ধান্তের একটি বেছে নিতে হবে—ভারতেই মৃত্যুবরণ অথবা ইংল্যান্ডে গিয়ে অবসর যাপন। ভারতের সাথে তার চেতনা পুরোপুরি সম্পৃক্ত, কিন্তু তার ভঙ্গুর দেহের জন্যে বোধহয় প্রয়োজন ইংল্যান্ড।

জেমস অবাক হয়ে ভাবছিলেন, দুটি অবস্থার প্রেক্ষিতে তার প্রিয় খায়রুন্নিসার কী ঘটবে? অধিকাংশ ভারতীয় স্ত্রী বা সঙ্গিনী তাদের স্বামীদের চাকরি জীবন শেষ হওয়ার পর তাদের সাথে ইংল্যান্ডে যায় না। যদিও তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধা ছিল না। মোগল ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখক মির্জা আবু তালেব খান প্রায় এসময়েই লন্ডন সফর করেন। তিনি পুরোপুরি ইংরেজ সংস্কৃতির সাথে মিশে যাওয়া কিছু ভারতীয় রমণীর সাক্ষাৎ পান, যারা তাদের স্বামী ও সন্তানদের সাথে ইংল্যান্ড গিয়েছিল। তাদের একজন মিসেস ডুকারেল বিশেষভাবে তাকে প্রভাবিত করেছিলেন। 'তিনি ফর্সা এবং ইংরেজদের আচরণ ও ভাষা এত চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছেন তার সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করার পরই আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি ভারতীয়। মহিলাটি তার দু-তিনটি সন্তানের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন, যারা ষোলো থেকে উনিশ বছর বয়সী এবং তাদের চেহারা ইউরোপীয়দের মতো।'

BanglaBook.org

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় স্ত্রীদের ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার পরিণতি হয়েছে বিপর্যয়কর ও সমস্যাযুক্ত। মির্জা আরেকজন ভারতীয় মহিলাকে দেখেন লন্ডনে, তিনি ছিলেন ফায়জি পামারের ছোট বোন নূর বেগম। 'নূর বেগম ভারত থেকে আসেন জেনারেল ডি বোনের সাথে..তার পরনে ছিল ইংরেজ মহিলাদের মতো পোশাক এবং দেখতে বেশ ভালো', তিনি লিখেন। 'আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন এবং আমাকে অনুরোধ করেন লক্ষ্ণৌতে তার মায়ের কাছে একটি চিঠি পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে।' কিন্তু খান এখানে সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন, কারণ জেমস ও খায়রুন্নিসা যা ভালোভাবেই জানতেন, তিনি তা লিখেননি এবং তিনি নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে, ইংল্যান্ডে আসার পর নূর বেগমের বিয়ে টেকেনি। যদিও তাকে ভালো দেখাচ্ছিল, কিন্তু বাস্তবে তার জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

জেনারেল ডি বোনে ১৭৯৭ সালের মে মাসে ইংল্যান্ডে পৌঁছার কয়েক মাসের মধ্যে লন্ডনের বাইরে ছোট্ট গ্রাম এনফিল্ডে নূর বেগমকে তার দুই ছোট সন্তানসহ বলতে গেলে সকলের দৃষ্টির আড়ালে রাখেন। অ্যানি এবং চার্লসের সাথে নূর বেগম স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত বোঝা নিয়েছিলেন জেনারেল পামারের শ্বেতাঙ্গ মোগল বন্ধু অ্যান্টনি পোলিয়ার-এর এতিম অর্ধ-ভারতীয় পুত্রকে। ভারত থেকে ফিরে আসার পরপরই অর্থাৎ দুবছর আগে তিনি নিহত হন ফরাসি বিপ্লবের ডামাডোলের মধ্যে। ডি বোনে ইতোমধ্যে সুন্দরী এবং তারুণ্যে উজ্জীবিত এক ফরাসি অভিজাত বংশের (পরে জানা গিয়েছিল মেয়েটি ভুয়া পরিচয়ে ভাগ্যশিকারি উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের) মেয়ের প্রেমে পড়েন। তার নাম অ্যাডিলি দেসমন্ড, ডি বোনে তাকে বিয়ে করেন নূরকে সাথে নিয়ে ইংল্যান্ডে আসার তেরো মাস পর ১৭৯৮ সালের জুনে।

নূরের গৃহস্থালির বিবরণ ডি বোনের পারিবারিক আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে চেম্বারিতে। এগুলো পাঠ করলে বেদনাদায়ক চিত্রই ফুটে ওঠে। তাকে বার্ষিক দুশো পাউন্ড দেওয়ার কথা ব্যয় নির্বাহের জন্যে—বাড়ি ভাড়া, সন্তানদের স্কুলের ফি এবং অন্যান্য ব্যয়। অন্যদিকে ডি বোনে ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানে তার নতুন স্ত্রীকে নিয়ে প্রতি উইকএন্ডে ব্যয় করছিলেন ৭৮ পাউন্ড করে—নেকলেস, ব্রেসলেট, ইয়ারিং কিনতে। ফায়জি এবং জেনারেল পামার নূর বেগমের ভাগ্য বিড়ম্বনায় অত্যন্ত ব্যথিত হন। এতে শুধু তার উদ্বেগই বাড়ছিল যে, খায়রুন্নিসা যদি ইংল্যান্ডে যেতে বাধ্য হয় তাহলে তার ভাগ্যে কী ঘটবে?

অন্তত কিছু আশা ছিল যে, জেমসের অনিশ্চিত স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, কিন্তু আরেকটি বড় ধরনের বিষাদ যেন অপেক্ষা করছিল এবং এটা থেকে মনে হচ্ছিল যে, উদ্ধার পাওয়ার আর আশা নেই। খায়রুন্নিসার সন্তান জন্ম নেওয়ার পর থেকেই তিনি জানতেন যে, সাহিব আলমকে পাঁচ বছর বয়সে তার কাছ থেকে নিয়ে 'কালাপানির' ওপারে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেখানে

BanglaBook.org

তাদের শৈশবের পুরো সময় কাটবে তার কাছ থেকে দূরে এবং ইংরেজদের শিক্ষা লাভ করবে—এ ধারণার প্রবল বিরোধিতা করেন খায়রুন্নিসা। জেমসও তার স্ত্রীর আপত্তির মুখে শঙ্কার সাথে পুত্রের বিদায় দিনের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, এটা করতেই হবে। ১৮০১ সালে আলমের পরই জেমস উইলিয়ামকে লিখেন, 'যত শিগ্‌গির সম্ভব আমি আমার ছোট্ট হায়দারাবাদিকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর উদ্যোগ নেব। এতে আমার হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। ওকে পাঠানোর ক্ষেত্রে আমাকে যে বিরোধিতা মোকাবেলা করতে হবে তা এখনই কিছু বলতে চাই না।'

হায়দারাবাদি মুসলিম সন্তানদের ইংল্যান্ডে পাঠানোর ক্ষেত্রে বাবা মা' কারো সঙ্গে না থাকাকে জেমস হৃদয়হীন কাণ্ড বলে ভাবছিলেন না। বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সন্তানদের জন্যে তিনি প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। একটি বিষয় ব্যাপকভাবে এবং সঠিকভাবে বিশ্বাস করা হত যে, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিশুদের জীবনে কিছু করার সুযোগ পাওয়ার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে ব্রিটেনের সরকারি স্কুল থেকে 'পাক্কা' শিক্ষা গ্রহণ। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বর্ণবাদ ভারতে এতটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে 'পাক্কা' শিক্ষা জরুরি ছিল। এছাড়া তাদের সুযোগ চরমভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ার ঝুঁকি পদে পদে। কারণ, ব্রিটিশ বা ভারতীয় কোনো সমাজেই তারা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ সম্পর্কে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাক্ষ্য জেনারেল স্যার ডেভিড অক্টারলোনি মোবারক বেগমের গর্ভে জন্মলাভকারী তার দুই কন্যার প্রসঙ্গে লিখিত চিঠিপত্র। ১৮০৩ সালের দিকে চিঠিগুলো লিখিত। চিঠিগুলোর মধ্যে তিনি এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন যে, তার কন্যাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খ্রিস্টান হিসেবে শিক্ষিত করে ব্রিটিশ সমাজে সম্পৃক্ত করানোর উদ্যোগ নেবেন কিনা অথবা মুসলিম ভারতীয় হিসেবে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে মোগল সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলবেন কিনা। তিনি লিখেন, 'আমার কন্যারা অসাধারণ ফর্সা! কিন্তু তারা যদি ভারতে ইউরোপীয় ধরনের শিক্ষা পায় তাহলে তাদের গায়ের উজ্জ্বল রং সত্ত্বেও তারা 'অক্টারলোনির দেশীয় রমণীর কন্যা' হিসেবে পরিচয়ে যাবতীয় সমস্যার মধ্যে পতিত হবে। একটি বাক্য দ্বারাই যাবতীয় মন্দ প্রকৃতি ও নিন্দার প্রকাশ করা যায়, যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আপনি এদেশে অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ করেছেন।'

অক্টারলোনি বলেন যে, তিনি যদি তার কন্যাদের খ্রিস্টান হিসেবে বড় করে ব্রিটিশ সাহচর্যে রাখার ব্যবস্থা করেন তাহলে তাদেরকে অব্যাহতভাবে তাদের 'কালো রক্তের' জন্যে উপহাস করা হবে। কিন্তু মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতেও তার দ্বিধা ছিল মোগল অভিজাতদের সঙ্গে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে বলে। কারণ, 'আমি সহ্য করতে পারবো না যে, আমার কন্যা হারেমের

BanglaBook.org

অসংখ্য মহিলার একজন হবে (যদিও অক্টারলোনির নিজের হারেমেই তেরো জন স্ত্রী ছিল)'। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন মেজর হাগ সাদারল্যান্ড নামে এক স্কটিশের কাছে, যিনি অক্টারলোনির মতো অবস্থার মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত তার সন্তানদের মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেন।

জেমসের সামনেও একই সমস্যা। সাহিব আলমের জন্মের ছয় মাস পর মাদ্রাজে তার ভাইকে লিখেন যে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পর তার নাম না দেয়া পুত্রের দেখাশুনা করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে। তার চিঠিপত্রেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারতে ব্রিটিশরা মিশ্র বর্ণের সন্তানদের প্রতি যে বর্ণবাদী মনোভাব প্রদর্শন করছিল তা নিয়ে বেদনাহত এবং নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে তিনি উৎকণ্ঠিত তাও প্রকাশ পেয়েছে তার বক্তব্যে। প্রথমে তার ধারণা ছিল, সাহিব আলমকে ব্রিটেনে তার জ্ঞাতি ভাইদের কাছে পাঠানোই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান, কারণ, ভারতে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যে বর্ণবাদী মনোভাব রয়েছে, ব্রিটেনে সে তুলনায় এ ধরনের মনোভাব তেমন নেই। ১৮০১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি তার ভাইকে লিখেন, 'আমি পিতার কাছে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলাম এখন সে অভিমতই পোষণ করি যে, হিন্দুস্তানি সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুখ এবং সম্ভবত জীবনের উন্নতি তার দেশের চাইতে ইংল্যান্ডে থাকলেই বেশি সম্ভব। একই কারণে দেশীয় মায়ের গর্ভের সন্তান, তাদের গায়ের রং যত ফর্সাই হোক না কেন, তাদের ব্যবহার যতই সঠিক হোক না কেন অথবা অদম্য চেতনার অধিকারী হোক না কেন, ব্রিটিশ ভারতে তাদের নিন্দনীয় দৃষ্টিতে দেখা হয়।

আমার ছোট পুত্রের গায়ের রঙের ব্যাপারে বলতে হয়, এক্ষেত্রে সে তার ইংল্যান্ডের ভাইদের চাইতে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। সে এত ফর্সা যে, কোনো ইউরোপীয় মহিলার সন্তানও সাধারণত এমন হয় না। তবুও আমার সন্দেহ হয় যে, সে ভবিষ্যতে নিন্দনীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে পরে, যদি সে ভারতে তার ভবিষ্যৎ সন্ধানে যায়। অন্য যেসব কারণে শিশুটি আমার প্রিয় তা হচ্ছে, আমার প্রিয় পিতার চেহারার সাথে তার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বাস্তবিক পক্ষেই সকল বিবেচনায় সে খুবই সুন্দর শিশু.. ।'

হায়দারাবাদে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পামারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত জেমসের সামনে ছিল। সেজন্যে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্যেই তাদেরকে অবশ্যই ইংল্যান্ডে পাঠাতে হবে। অভিজাত ব্রিটিশ শিক্ষা ছাড়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা দুই সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতেই চরমভাবে নিগৃহীত হবে। জেমসের এই ভয়ের পাশাপাশি পামারের সাফল্যের দৃষ্টান্তে তিনি ভাবেন যে, তার সন্তানরা তাদের বংশগত উত্তরাধিকারের উভয় দিকের সুবিধাই কাজে লাগাতে পারবে এবং তা উভয়

BanglaBook.org

জগতেই। অন্য কথায় বলা যায়, তাদেরকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর সাথে এ চিন্তাও প্রবল ছিল, তাদের ভবিষ্যৎ ভারতেই বেশি উজ্জ্বল।

এ কারণে ১৮০৪ সালের শুরুর দিকে তিনি সুদর্শন কর্নেলকে লিখতে শুরু করেন যে, বৃদ্ধ লোকটি এখন আরও দুটি নাতি নাতনিকে লালন পালন করার অবস্থায় আছেন কিনা। চিঠিতে তিনি তার কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা এবং শিক্ষার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেন। একথাও লিখেন যে, যেহেতু তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ, সে কারণে সাময়িক আবহাওয়া পরিবর্তন প্রয়োজন এবং তখন তিনি যদি ছুটি নিতে পারেন তাহলে সন্তানদের সাথে নিয়ে জাহাজে তুলে দেয়ার জন্যে মাদ্রাজ পর্যন্ত যাবেন ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি মাসের দিকে।

আট মাস পর ১৮০৫ সালের জুনের মধ্যে জেমসের পরিকল্পনা চূড়ান্ত এবং সন্তানদের ইংল্যান্ড যাত্রার বুকিং দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার ওরেও জেমসের সন্তানদের সাথেই তার দুবছর বয়সী পুত্রকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওরের পত্নী তার সাথে যাচ্ছেন। জেমসের মনে হলো, একজন পরিচিত ও উর্দু জানেন এমন মহিলার সাথে যেতে পারা তার সন্তানদের জন্যে চমৎকার সুযোগ। তিনি ভাই উইলিয়ামকে লিখেন, 'ওরা আগস্টে ইংল্যান্ডগামী হকসবারী ইন্ডিয়াম্যান' জাহাজে উঠবে, যা সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে যাত্রা শুরু করবে। তাদের দেখাশুনা করবেন মিসেস ওরে, তার সাথে আমি কথা বলেছি যে, জাহাজের আরামদায়ক ও পরিসর অংশটি নেওয়া হবে এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্যে আমার ব্যান্ডের এক সদস্যের স্ত্রী মেরি নামে এক ইউরোপীয় মহিলা নিয়োজিত থাকবে। জাহাজ যেহেতু সেপ্টেম্বরে ছাড়বে, তুমি আশা করতে পারো যে, সেটি পৌঁছবে আগামী মার্চ মাসে। আমার ধারণা, তুমি এই চিঠি পাওয়ার তিন-চার মাস পর।'

BanglaBook.org

মূল পরিকল্পনা অনুসারে জেমস ও খায়রুন্নিসা মাদ্রাজ পর্যন্ত যাবেন সন্তানদের সাথে। তাদেরকে জাহাজে তুলে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী কলকাতায় যাবেন উইলিয়ামের কন্যা ইসাবেলার বিয়ের ব্যবস্থা করতে। তার পিতা যেমন ভয় করেছিলেন, মেয়েটি 'শূন্য হাতে ফিরে আসবে, কিন্তু তা হয়নি। কোম্পানির তরুণ উৎসাহি এক অফিসার চার্লস বুলার তাকে পছন্দ করে। বুলার সবেমাত্র রেভিনিউ বোর্ডের সচিব হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী অবস্থান এবং জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের তারিখ স্থির করা হয়েছে ২৬ আগস্ট।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটি সমস্যার সৃষ্টি হলো। জেমস হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হলেন, তার ওপর হেপাটাইটিসের আক্রমণ। তাকে শয্যাশায়ী হতে হলো। ওদিকে দাক্ষিণাত্যের দুর্ভিক্ষ হায়দারাবাদেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ওয়েলেসলির মারাঠা যুদ্ধের পরিণতি ছিল এই দুর্ভিক্ষ। জেমস দুর্ভিক্ষ রোধ করতে তার পক্ষে যা করা সম্ভব করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি তার শৈশবের

বন্ধুকে লিখেন, 'যুদ্ধের কঠোরতা ও দুর্যোগের পর আমাদেরকে এখন দাক্ষিণাত্যের ব্যাপক এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়া দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং দুর্ভিক্ষ এগিয়ে আসছে হায়দারাবাদের দিকে। যেখানে কিছুদিন আগেও খাদ্যাভাব হয়েছিল এবং অনেককে ক্ষুধায় কাটাতে হয়েছে। এ ধরনের দুর্যোগ সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকদের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না, কিন্তু এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা কঠিন ব্যাপার।

যদিও আমার লঙ্গরখানা থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে খাওয়ানো হয়, কিন্তু বাইরে গেলেই অসংখ্য ক্ষুধার্ত নারীপুরুষ আমাকে ঘিরে ধরে।'

দুর্ভিক্ষ দূর করার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে জেমসের পরামর্শে নিজাম ও মীর আলম গণপূর্ত ও নির্মাণকাজের কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যা ক্ষুধার্ত শরণার্থীদের কাজের সংস্থান দেবে, যারা দলে দলে হায়দারাবাদে আসছিল খাবারের আশায়। জেমস তার ভাইকে লিখেন, 'রেসিডেন্সি ভবন নির্মাণের ফলে আমি মীর আলম ও সিকান্দার জাহের মধ্যে স্থাপত্য সৌন্দর্যের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। তাদের দুজনকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নির্মাণকাজে নিয়োজিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছি। এর ফলে একদিকে হায়দারাবাদে উন্নতি হবে, অন্যদিকে হাজার হাজার মানুষের খাদ্যের সংস্থান হবে, যারা খাদ্যভাবের এই দিনগুলোতে কোনো সংস্থানের অভাবে মারা পড়ত।

অনেক প্রকল্পের মধ্যে বেশ কিছুর উদ্যোগ নিয়েছে বিত্তবান হিন্দু ও মুসলমানরা। মীর আলম ইঞ্জিনিয়ার লে. রাসেলের তত্ত্বাবধানে একটি খাল খনন করাচ্ছেন, যা শহরে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এবং তিনি হোসেন সাগরের তীর সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই সাথে যার পুরনো খালটিও পুনঃখননের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা নদী থেকে পানি বয়ে আনত হোসেন সাগরে। তিনি ইতোমধ্যে তার নিজস্ব বাসভবনের সামনে পাথরে বাঁধান একটি পুকুর, মসজিদ, হাম্মামখানা, একটি মাদ্রাসা এবং এসব স্থাপনার মুখোমুখি প্রশস্ত রাস্তার অপর পাশে বিপণী সারি নির্মাণ করেছেন।

সিকান্দার জাহও তার পুরনো প্রাসাদের আশপাশে অনুরূপ প্রকল্প নিয়েছেন। আমি তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি রেসিডেন্সির দিক থেকে একটি সেতু নির্মাণ করতে, ঠিক শহরের পশ্চিম দিকে যে সেতুটি আছে তার অনুরূপ।'

দুর্ভিক্ষজনিত সমস্যা ও বিপজ্জনক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি জেমসকে তার সকল কাজকর্ম থেকে প্রায় দূরে রাখে। খায়রুন্নিসাও হায়দারাবাদে অবস্থান করে স্বামীর সেবা করার পক্ষেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন—যদিও জেমস তখনো আশা করছিলেন যে সন্তানদের বিদায় জানাতে তিনি কয়েক দিনের জন্য মাদ্রাজ পর্যন্ত যেতে পারবেন। জুন মাসের শেষদিকে খায়রুন্নিসা বেদনার সাথে তার সন্তানদের বিদায়ের প্রস্তুতি হিসেবে গোছগাছ করছিলেন। তাদের বয়স পাঁচ ও

BanglaBook.org

তিন বছর। খায়রুন্নিসার কাছ থেকে তাদের বিচ্ছেদ ভয়াবহ ব্যাপার। তিনি ভালোভাবে জানেন, সন্তানদের সাথে আবার সাক্ষাতের সম্ভাবনা কত ক্ষীণ এবং তারা কত বদলে যাবে সময়ের ব্যবধানে—তাদের জীবনপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার জন্যে ভালোবাসায়। দুজনই বুঝতে সক্ষম যে, শিগ্‌গির তাদেরকে তাদের পরিচিত সবকিছু দূরে নিয়ে যাওয়া হবে, যা তাদের জন্যেও বেদনার বিষয়। চল্লিশ বছর পর সাহিব বেগম বিচ্ছেদের প্রতিটি বিবরণ তুলে ধরেন, 'আমার মা যে আমাকে ভালোবাসতেন তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। আমার স্পষ্ট মনে আছে তাকে যখন ছেড়ে আসি, তখন তার কান্নার কথা। যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হই তখন তিনি যেখানে বসেছিলেন, জায়গাটি এখনও আমার চোখে ভাসে। আমি যখন থেকে মা হয়েছি, প্রায়ই ভাবি যে, আমাদেরকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনায় তিনি কী যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছেন।'

মাদ্রাজে জেমস তার সন্তানদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন তার মামা ও মামি উইলিয়াম পেট্রি দম্পতির কাছে। পেট্রি অতি সম্প্রতি সেখানকার ব্রিটিশ কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন। খায়রুন্নিসাকে না জানিয়েই পেট্রি'র বাসভবনে আরেকজন লোককে আসতে আমন্ত্রণ করেছিলেন জেমস—অ্যাংলো আইরিশ চিত্রকর জর্জ চিনারিকে।

ব্রিটিশ রাজকীয় শিল্পীদের মধ্যে চিনারি অন্যতম সেরা হিসেবে বিবেচিত। মাদ্রাজে আড়াই বছর যাবত তিনি অবস্থান করছিলেন, যখন জেমস তাকে তার সন্তানদের পূর্ণাবয়ব চিত্র আঁকার জন্যে নিয়োগ করেন। তিনি খায়রুন্নিসাকে এটি উপহার দেবেন। চিনারির জন্যে বড় একটি প্রস্তাব, সম্ভবত এটিই হবে তার প্রথম পূর্ণাবয়ব চিত্র অংকন। আজব কিসিমের লোক চিনারি, প্রাণোচ্ছল, উচ্চ চেতনা সমৃদ্ধ এবং কখনো কখনো বিষাদে পূর্ণ। আবেগজনিত কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ করে সেটিকে পারিবারিক উত্তরাধিকার বলে সন্দেহ করা যায়—তার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল মাদ্রাজের পাগলাগারদে থাকা অবস্থায়। জেমসের সাথে যোগসূত্র চিনারির জন্যে শুভ প্রমাণিত হয়েছিল—পরবর্তী বছরই তাকে নিয়োগ করা হয় হেনরি রাসেলের পিতা বাংলার প্রধান বিচারপতি স্যার হেনরি রাসেল সিনিয়রের চিত্রাংকনের জন্যে। চিত্র আঁকার সময় তাকে প্রত্যক্ষ করতেন স্যার হেনরির অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি, যিনি চিত্রকরের কলমী চিত্র এঁকেছেন তার ডায়েরিতে, 'চিনারি অন্যান্য অনেক ব্যতিক্রমী মেধাবী মানুষের মতোই চরম বিসদৃশ এবং খামখেয়ালি স্বভাবের। মাঝে মাঝে তাকে উন্মাদ মনে হয়। তার স্বাস্থ্য অবশ্যই ভালো নয় এবং তার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ার বাতিক আছে, তখন তাকে অদ্ভুত দেখায়। তার মন ভালো থাকতে তিনি উৎফুল্ল এবং সঙ্গী হিসেবে উত্তম।'

জেমসের পুত্র কন্যা মাদ্রাজে তিন সপ্তাহের বেশি অবস্থান করেনি এবং শিশুদের এক স্থানে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখা কঠিন কাজ। তবু ভারতে ব্রিটিশ

BanglaBook.org

চিত্রের অন্যতম সুন্দর চিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছে সেটি। উজ্জ্বল রঙের হায়দারাবাদি দরবারি পোশাক পরিহিত দুই শিশুকে চিনারি চমৎকারভাবে এঁকেছেন। একটি সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়ানো সাহিব আলমের পেছনে গাঢ় রঙের পর্দা, কালো চোখবিশিষ্ট সুন্দর শিশু, লাল জামা গায়ে, উজ্জ্বল ব্রোকেড লাগানো এবং মানানসই কোমরবন্ধ। মাথায় চকচকে টুপি, পায়ে বাঁকানো চটি। গলায় ঝুলছে বড় মুক্তার মালা। তার বোন সাহিব বেগম আরেক ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে সাহিব আলমের ঘাড়ে একটি হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। সাহিব বেগম অতি ফর্সা এবং টুপির নিচ থেকে বের হয়ে থাকা লাল চুল পরবর্তীতে প্রশংসিত হয়েছে।

সাহিব আলম সরাসরি তাকিয়ে আছে দর্শকদের দিকে অত্যন্ত আস্থাবানের ভঙ্গিতে, সাহিব বেগম চোখ নিচু করে আছে এবং তার মুখে বিষাদের ছায়া। তার ছোট চোখ দুটি কান্নার প্রভাবে সামান্য ফুলে আছে। চিনারি নিঃসন্দেহে বিচ্ছেদের বেদনা পুরোপুরি উপলব্ধি করেছেন, কারণ মাত্র ছ'মাস আগেই তার ভাইয়ের তিনটি সন্তানকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি জানেন যে, চিনারিদের বাড়ি চিৎকার ও হাসির উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে পরিণত হয়েছে শূণ্য বেদনা ও নীরবতায়।

জুলাই-এর শেষ দিকে জেমসের দুই সন্তান মাদ্রাজে পেট্রির বাসভবনে পৌঁছার পরপরই তিনি খবর পেলেন যে, কলকাতায় নতুন কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুটা আকস্মিক ও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাসের মাঝামাঝি সময়ে নতুন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস মাদ্রাজে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি পেট্রির কাছ থেকে ভারতে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেন এবং বিশেষ করে ওয়েলেসলির আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে জেমসের একক প্রতিরোধের বিষয় সম্পর্কে। কারণ, মারাঠা সংকট নিয়ে ওয়েলেসলি যে ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাতে জেমসের প্রবল আপত্তি ছিল। পেট্রি জেমসের কাছেও লিখেন, তিনি কীভাবে কর্নওয়ালিসকে পুরো বিষয় অবহিত করেছেন যে, ওয়েলেসলির কোনো ঊর্ধ্বতন অফিসার তার গৃহীত নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সাহস করেননি। ব্যতিক্রমী সাহস প্রদর্শন করেছেন শুধু হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট, যিনি ব্রিটিশ কূটনীতিকদের মধ্যে একা তার মনোভাব প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন মারাঠা সংকটে ওয়েলেসলির রাজনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে।

১৮০৫ সালের ৩০ জুলাই লর্ড কর্নওয়ালিস কলকাতায় অবতরণ করেন ওয়েলেসলির স্থলাভিষিক্ত হতে। তিনি সকলের কাছে স্পষ্ট করেন যে, ওয়েলেসলি যা সঠিক বলে গ্রহণ করেছিলেন তিনি তার কোনোকিছুই রাখবেন না। তিনি অবতরণ করার পর নদী তীরে হাজার হাজার লোক তাকে স্বাগত জানায়। বৃদ্ধ সৈনিক বিস্মিত এবং বিরক্তি অনুভব করেন তাকে স্বাগত জানাতে

BanglaBook.org

আসা ঘোড়ার গাড়ি দেখে। গাড়ি, প্রহরী দল, ব্যান্ড, ষ্টাফ অফিসার, এডিসি এবং ভৃত্যরা—অসংখ্য লোক। কর্নওয়ালিস বলেন, 'আমি এগুলো চাই না, এসবের কোনোকিছুই না। আমি এখনও আমার পায়ের ব্যবহার হারাইনি। ঈশ্বরের কৃপায় এখনও আমি ভালোভাবে হাঁটতে পারি।'

এবং তিনি হাঁটেন। উইলিয়াম হিকি লিখেন, 'পরদিন সন্ধ্যায় বায়ু সেবনের সময় লর্ড ওয়েলেসলির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঘোড়ার গাড়িতে অসংখ্য লোক পরিবৃত অবস্থায় বের হয়েছেন। দশ মিনিট পরই সাক্ষাৎ হয় নতুন গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিসের সাথে। তিনি ঘোড়ার পিঠে বসা। পাশে আরেকটি ঘোড়ায় তার সচিব রবিনসন। এছাড়া আর কোনো লোক নেই তাদের সাথে।

ওয়েলেসলি ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করার এক সপ্তাহের কম সময় পর জেমস গভর্নর জেনারেলের নচিব রবিনসনের কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণ লাভ করেন কলকাতায় গভর্নর জেনারেলের সাথে সাক্ষাতের জন্যে। সাথে পরিস্থিতির পুরো বিবরণ নিতে বলেছেন। ওয়েলেসলির অধীনস্থ লোকদের কাছ থেকে যেসব চিঠি পাওয়া যেত এ চিঠির সুর তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবিনসন জেমসকে আশ্বস্ত করেন যে, গভর্নর জেনারেল নিজামের মানসিক অবস্থা এবং দরবার সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান।

রবিনসন জেমসকে ইঙ্গিত দেন যে, ওয়েলেসলির আগ্রাসী নীতির পুরো পরিবর্তন চান কর্নওয়ালিস এবং তিনি ভারতীয় রাজন্যদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে চান ন্যায়বিচার ও মধ্যপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে এবং বিশ্বাস করেন যে, সমঝোতা ও অনুগ্রহের মনোভাবই তাদের ওপর ভালো প্রভাব ফেলার জন্যে উপযুক্ত পদ্ধতি। তাছাড়া তিনি চান যুদ্ধ এড়াতে এবং ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি সম্ভাব্য সকল সুযোগ নিশ্চিত করতে চান। রবিনসন আরও জানান যে, এই উদ্দেশ্যে তিনি পরিস্থিতি অনুকূল হলেই কলকাতা থেকে ওপরের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, যেখানে মাত্র কিছুদিন আগেই মারাঠাদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। এটি ছিল কোম্পানির সাথে অবশিষ্ট শক্তিশালী মারাঠা নেতা যশোবন্ত রাও হোলকারের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব। যিনি চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে আধুনিক রাজস্থান-গুজরাট সীমান্ত থেকে হটে আসা ব্রিটিশ সৈন্যদের নির্মূল করতে সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। অন্যান্যের মধ্যে কর্নওয়ালিস জেনারেল পামারের সাথেও সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, যাকে অতি সম্প্রতি বাংলায় গঙ্গার তীরে মুঙ্গেরে একটি গ্যারিসনের কমান্ডার হিসেবে অল্প বেতনের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। চিঠির একটি কপি রবিনসন মাদ্রাজে পেট্রির কাছেও পাঠান, যিনি জেমসকে পরামর্শ দেন অবিলম্বে কলকাতায় যাত্রা করতে। এটা জেমসের জন্য বিরাট সুযোগ বলেই মনে হচ্ছিল। পেট্রি লিখেন, 'গত তিন বছরে আমি যে গোপন তথ্য ও সুপারিশ তৈরি করেছি—তা

BanglaBook.org

কর্নওয়ালিসকে দিয়েছি। কর্নওয়ালিস চান, তুমি কলকাতায় গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করো এবং তিনি যদি কলকাতা ছেড়ে এদিকে আসতে চান তাহলে তোমার উচিত তাকে সঙ্গ দেওয়া। আমি তোমাকে আস্থার সাথে অভিমত জানাতে চাই যে, বিরাট পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে...।'

জেমস তখনো অত্যন্ত অসুস্থ এবং ডাক্তার কেনেডি তাকে পরামর্শ দিয়েছেন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে। কিন্তু জেমসের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তার রাজনৈতিক ও পিতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে যত শিগ্‌গির সম্ভব মাদ্রাজ যেতে হবে। হায়দারাবাদ ত্যাগ করার পূর্বে তার শেষ কাজ মীর আলমের সাথে কোনো ধরনের আপোসে উপনীত হওয়া। এই লক্ষ্যে তিনি মীর আলমকে যে চিঠি লিখেছিলেন পরবর্তীতে সেটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ২০ আগষ্ট মীর আলম জেমসকে যে চিঠি লিখেন তাতে স্পষ্ট ছিল যে, যেহেতু জেমস তার সকল পদক্ষেপকে সমর্থন দিয়েছেন, 'সেজন্যে আমার জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীতেও আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।' মীর জেমসের কাছে একটি আনুকূল্যও কামনা করেন—তিনি যখন মাদ্রাজে অবস্থান করবেন তখন মীর আলমের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আরকটের নওয়াবের কাছ থেকে একটি জমি ক্রয়ে সাহায্য করতে। জেমস তা করতে সম্মত হন।

এক সপ্তাহ পর জেমস তার বেগমকে বিদায় চুম্বন দিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের পর ঘোড়ার পিঠে উঠে দ্রুত মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেন সন্তানদেরকে শেষবার দেখার আশা নিয়ে।

BanglaBook.org

হায়দারাবাদ থেকে মসলিপতমের রাস্তা দাক্ষিণাত্যে সবচেয়ে সুন্দর। রেসিডেন্সি থেকে রাস্তাটি বানজারা পাহাড়ের গোলাকৃতির পাথর পেরিয়ে অতিরিক্ত বাহিনীর শিবির এবং তাঁবু সারির দিকে নেমে গেছে। সেখানে সাপের আকৃতিতে নতুন প্যারেড গ্রাউন্ড কবরস্থানের পাশ দিয়ে চলে গেছে সামনে। পাঁচ বছর আগে এই কবরস্থানে জেমস তার বন্ধু জেমস ড্যালরিম্পেলকে কবরস্থ করে গেছেন।

এখান থেকে নিচু হতে শুরু করেছে এবং রাস্তা মুসি নদীকেই অনুসরণ করেছে। আগষ্টে নদী পরিপূর্ণ, বয়ে যাচ্ছে উপকূলের দিকে। হায়দারাবাদের আশপাশের ধূসর তুলা ক্ষেতের বিস্তৃতি অতিক্রমের পরই ক্রমশ উপকূলের দিকে ভেজা, সবুজ ধানক্ষেতের বিস্তার। প্রথমে জেমস অতিক্রম করেন সমতলে নতুন আবাদ করা তুলা ক্ষেত, যার মাঝে মাঝেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো নারকেল ও তাল গাছ। এরপর ভূমি হঠাৎই উঁচু হয়ে গেছে, পাথরের নিচু অবস্থান বিশাল পাথুরে পর্বতে পরিণত হয়েছে সমতলের মাঝে উটের কুঁজের আকৃতি নিয়ে।

এক রাতে বৃষ্টিপাতের পর সকালে রাস্তার পাশের চাপা ফুলের গন্ধ অদ্ভুতভাবে ছড়াচ্ছে। জেমস প্রায় তিন বছর হায়দারাবাদের বাইরে যাননি এবং অশ্বারোহণে উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তার কাছে শহুরে ও মুসলিম প্রধান পরিবেশের সাথে গ্রামীণ জীবনের ও পরিবেশের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বিপরীত হিসেবে প্রতিভাত হলো। যত্রতত্র তার চোখে পড়ছে মাছরাঙা, নীল কমল, তিনি দেখতে পান ছত্রি অথবা দীর্ঘদিন আগে মৃত যোদ্ধার চিতায় সতীদাহের স্মরণে নির্মিত ধ্বংসপ্রায় সৌধ। মাঝেমধ্যে তিনি দেখেন কোনো হিন্দু রমণী মাথায় ফুল গুঁজে যাচ্ছে, কোথাও কালো গাত্রবর্ণের লোকজনের হাঁটুর ওপর পর্যন্ত লুঙ্গি পরা অবস্থার দৃশ্য। এসব দেখে তার মনে হয় বিচ্ছিন্ন ইসলামী দ্বীপ হায়দারাবাদ শহর কতটা ভঙ্গুর। তার অতিক্রমের পথে তেলেঙ্গানা এলাকাটি গ্রামীণ হিন্দুদের ক্ষেত্র ছিল মুসলিম অভিযানের পূর্বে এবং এখনও মনে হয়, দূরবর্থী এই এলাকাগুলো পাঁচশো বছরব্যাপী মুসলিম শাসন সত্ত্বেও অপরিবর্তিত এবং যুদ্ধের আঘাতের বাইরে রয়েছে।

প্রথম দিকে বর্ষা ও কর্দমাক্ত রাস্তা সত্ত্বেও যাত্রা ভালোই ছিল। কৃষ্ণা নদী প্রথম বড় ধরনের বাধা। বর্ষাকালে নদী অতিক্রম কখনো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো বিঘ্ন ছাড়াই জেমস নদী অতিক্রম করেন। হেনরি রাসেলের ওপর রেসিডেন্সির দায়িত্ব ন্যস্ত করে হায়দারাবাদ ত্যাগ করার এক সপ্তাহ পর ৯ সেপ্টেম্বর তিনি জেমসকে লিখেন, 'এডিসনের কাছে আমি জানতে পেরেছি যে, গুরুতর কোনো অসুবিধা ছাড়াই আপনি প্রায় নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন ।

নূরুল ওমরাহ ও নীলগোণ্ডায় তার দূত মারফত যা জানতে পেরেছেন তা আমাকে জানিয়েছেন যে, আপনি কৃষ্ণা নদী অতিক্রম করেছেন।

এই চিঠি যখন মাদ্রাজ পৌঁছবে তখন আপনি সেখানে থাকবেন কিনা আমি জানি না। জাহাজ যদি ইংল্যান্ডের উদ্দেশে ছেড়ে না যায়, তাহলে কয়েকদিন আপনার সন্তানদের সাথে আনন্দে কাটাতে পারবেন। আর তা যদি না হয়, তাহলে আমার মনে হয় আপনার অবিলম্বে কলকাতা পৌঁছাই কাঙ্ক্ষিত।

এই মাত্র মহলে লোক পাঠিয়েছিলাম আপনার জন্যে। বেগমের কোনো বার্তা দেওয়ার আছে কিনা জানতে। উত্তরে তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে চাই যে, তিনি ভালো আছেন এবং আপনি নিরাপদে মাদ্রাজে পৌঁছেছেন সে খবর শোনার অপেক্ষা করছেন।'

জেমস ও খায়রুন্নিসার মধ্যে এটিই ছিল সর্বশেষ যোগাযোগ। কৃষ্ণা নদী অতিক্রমের পর জেমসের কী ঘটেছিল তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সময়ের বেশ পরে তিনি মাদ্রাজে পৌঁছেন এবং তার পৌঁছার তিনদিন আগে জাহাজ ছেড়ে গেছে। ১২ সেপ্টেম্বর যখন শহরের অবস্থান জেমসের চোখে পড়ে তখন দুর্গ প্রাচীরের ওপর দিয়ে উড্ডীন পতাকা, সেন্ট মেরির চার্চের চূড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 'লর্ড হাকর্সবারি' ইংল্যান্ড রওয়ানা হয়ে গেছে ৯ সেপ্টেম্বর।

BanglaBook.org

এক সপ্তাহ পর কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত যাত্রী তালিকায় মিসেস ওরে, মিস ক্যাথরিন কার্কপ্যাট্রিক এবং উইলিয়াম জর্জ কার্কপ্যাট্রিকের নাম ছিল। এই প্রথম বারের মতো জেমসের সন্তানদের খ্রিস্টান নামে উল্লেখ করা হয়। এ নামই তারা অবশিষ্ট জীবনে ধারণ করবে। তাদেরকে আর কখনো সাহিব আলম অথবা সাহিব বেগম নামে ডাকা হবে না। উচ্চ বংশজাত শিশু কন্যা এবং বিশ্বের মালিক হিসেবে যে নাম দেওয়া হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তাদের সেই মুসলিম পরিচিতি সাপের খোলস ত্যাগের মতোই অনিবার্যভাবে ঝরে গেল।

জেমস তার সন্তানদের অনুপস্থিতিতে দুঃখ পেয়েছেন। তাদেরকে শেষবার দেখার জন্যে তাকে দ্রুত পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। অব্যাহত বর্ষণ এবং কৃষ্ণ নদী ফুলে ফেঁপে ওঠায় তাদেরকে বিদায় জানাতে পারেননি।

মাদ্রাজে তিনি দুই সপ্তাহ কাটান দুর্বলতা কাটিয়ে উঠানোর জন্যে। কিন্তু স্বাস্থ্যের খুব উন্নতি হয়নি। এখানে সময়ক্ষেপণ অর্থহীন বিবেচনা করে তিনি ২২ সেপ্টেম্বর আরকটের নওয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান এবং মীর আলমকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার নিবেদন পৌঁছান। কর্নওয়ালিসের সাথে সাক্ষাতের জন্যে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর ' মেটকাফি' নামে একটি জাহাজযোগে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন। যে সময়ের মধ্যে জাহাজ মসলিপতম বন্দর ত্যাগ করে জেমসের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে।

এরপর হঠাৎ করে আর কিছুই পাওয়া যায় না।

একটি কাহিনির গতি যেখানে ছিল বিভিন্ন সূত্র দ্বারা চালিত—চিঠি, ডায়েরি, রিপোর্ট, বিবরণী, যা এই গ্রন্থের উপজীব্য, তা যেন হঠাৎ সংকুচিত হয়ে আসে এবং উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়। কারণ আর কোনো চিঠিপত্র নেই, রেকর্ড শেষ হয়ে গেছে জেমসের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সাথে। নৌযানে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত এবং প্রলাপ বকছেন জ্বরের প্রকোপে। সহসা আলো নির্বাপিত হয়েছে এবং আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছি।

আবার নতুন করে একটি দোলা লাগে, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে জীবনের আলো জ্বলে উঠে। ১০ অক্টোবর কলকাতা গেজেটে যাত্রীদের যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, জেমসের সাথে জাহাজের ডাক্তার ওরেও ছিলেন। স্ত্রী ও সন্তানকে বিদায় জানানোর পর মাদ্রাজে জেমসের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে থাকবে এবং শারীরিক অবস্থা দেখে তিনি তার সাথে কলকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন। এছাড়া একই জাহাজে ছিলেন ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল ড্যালরিম্পেল এবং তার স্ত্রী। স্যামুয়েল লে. কর্নেল জেমসের বন্ধু লে. কর্নেল জেমস ড্যালরিম্পেলের সম্পর্কিত ভাই এবং চার বছর আগে হায়দারাবাদে কোনো পাদ্রি না থাকায় তাদের বিয়ে পরিচালনা করেন স্বয়ং জেমস। কিন্তু অতিরিক্ত বাহিনীর পদস্থ সদস্য স্যামুয়েল সম্ভবত জেমসের প্রতি বিরূপ ছিলেন

BanglaBook.org

এবং তার স্ত্রী মার্গারেট হায়দারাবাদে কলহপ্রিয় মহিলার কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সে সম্ভবত তার স্বামীর সেবায় অতি ব্যস্ত ছিল বলে এই নৌযাত্রায় তার অধিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। স্যামুয়েল অসুস্থ এবং বাংলায় তাকে যেতে হচ্ছিল অসুস্থতজনিত সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে।

৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় ' মেটকাফি' কলকাতায় পৌঁছে এবং জেমসকে মৃতবৎ বহন করে তীরে নামানো হয়। তাকে ভাতিজী ইসাবেলার বাড়িতে নেওয়া হয়। তার সাথে সম্ভবত আগে কখনো তার সাক্ষাৎ হয়নি। হায়দারাবাদে যে বিলম্ব ঘটেছিল সে কারণে তিনি যে শুধু তার সন্তানদের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাই নয়, চার্লস বুলারের সাথে ইসাবেলার বিয়ের অনুষ্ঠান থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। সেদিন বিকেলেই সেন্ট জন'স চার্চে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

ভাতিজীর শুশ্রূষা ও ডাক্তার ওরের চিকিৎসায় জেমস জীবন মৃত্যুর মাঝে আরও এক সপ্তাহ ঝুলে রইলেন। তার অন্তিম সফর যে অর্থহীন হয়ে গেছে এ তিক্ত সংবাদ শোনার জন্যে এ ছিল দীর্ঘ সময়। কর্নওয়ালিস কলকাতা ছেড়ে বাংলার অভ্যন্তরে চলে যাওয়ার কারণেও তার সফর ব্যর্থ হয়। লর্ড কর্নওয়ালিসও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জেনারেল পামারের সাথে সাক্ষাতের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যান। জেনারেল তার সাবেক পৃষ্ঠপোষক ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখেন, ' বেচারি কর্নওয়ালিস চেয়েছিলেন, আমি যাতে নদী তীরে তার সাথে সাক্ষাৎ করি, যাতে তিনি একটি দিন আমার সাথে কথা বলতে পারেন। আমি মুঙ্গের থেকে ভাগলপুর যাই এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন। রবিনসনকে বলেন, আমাকে বলতে যে, কথা বলার মতো অবস্থা তার নেই এবং তাকে বিশ্রাম নেওয়ার সময় দিতে বলেন। তাকে তীরে আনা হয় বহন করে, যেখানে প্রতিদিন তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল। দুটি দিন তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী ছিলেন প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়..এভাবেই ধ্বংসপ্রায় অবস্থা থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা, ন্যায়বিচার আস্থা ও মধ্যপন্থার যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কুঁড়ি থেকেই ঝরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।'

জেনারেল পামার পরদিন ৫ অক্টোবর যে সময়ের মধ্যে চিঠি লেখা শেষ করেন, ততক্ষণে কর্নওয়ালিস মারা গেছেন। জেমস হায়দারাবাদ ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা কখনো তোয়াক্কা করেননি। তার পুরো সফরই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ১৪ অক্টোবর জেমস বেশ কিছুটা সেরে ওঠার পর তার উইলে আরও কিছু শর্ত যোগ করেন। মৃত্যুচিন্তার কারণে তিনি উইলটি সাথে এনেছিলেন। সেই রাতেই তার অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। পরদিন সকালে ১৮০৫ সালের ১৫ অক্টোবর মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক মৃত্যুবরণ করলেন।

BanglaBook.org

সেদিন সন্ধ্যায় বাংলায় প্রচলিত মরদেহ দ্রুত কবরস্থ করার প্রথা অনুসারে জেমসকে পার্ক ষ্ট্রিট সেমিট্রিতে শয়ানে রাখা হলো। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হলেও আনুষ্ঠানিকতা ছিল এবং সামরিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কফিন বয়ে নিয়ে যায় গভর্নর জেনারেলের ৬৭তম রেজিমেন্ট এবং মেজর জেনারেল স্যার এওয়েন বেইলি জেমসের কৃতিত্বের ওপর সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন।

কিন্তু অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া খুব আবেগ প্রবণ কিছু ছিল না। কারণ জেমস মৃত্যুবরণ করেছেন প্রিয়জনদের কাছ থেকে বহুদূরে এবং তাকে যারা ভালোবাসত তাদের থেকে দূরে অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের মাঝে। তার প্রিয় স্ত্রী, দুটি ছোট্ট সন্তান, তার ভাই, বন্ধু এবং পিতা সকলের অনুপস্থিতিতে। যখন তাকে বর্ষার কর্দমাক্ত মাটিতে স্থাপন করা হয় তখন তাদের কেউ জানতেও পারেননি যে, তিনি মারা গেছেন। অশ্রুর পরিবর্তে ছিল শীতল সামরিক অভিবাদন। কফিন নিচে নামানো হলো এবং কবর মাটি দ্বারা পূর্ণ করা হলো।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন অফিসার মন্তব্য করেছে, 'কলকাতা মৃত্যুর শহর। আমরা অনেক দেখেছি যে, দুপুরে কোনো ভদ্রলোকের সাথে মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হয়েছি এবং রাতের খাবারের সময় আমাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছে তাকে কবর দেওয়ার জন্যে উপস্থিত হতে।' অতএব মৃত্যু কোথাও খুব বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে না। একটি কথা চালু আছে যে, 'বাংলায় একজন ইউরোপিয়ানের গড় আয়ু দুই বর্ষা।' একই বছর বাংলায় ১২০০ ইউরোপীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের অধিক মারা গিয়েছিল অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। প্রতি বছর বর্ষা শেষে অক্টোবর পর্যন্ত যারা বেঁচে থাকে তারা তাদের প্রাণ রক্ষা পাওয়ায় 'থ্যাংকসগিভিং' ডিনারের আয়োজন করে। ১৮২৬ সালে কোম্পানির একজন অফিসারের সদ্য আগত স্ত্রী তার ডায়েরিতে লিখেছেন, 'এখানে একদিন লোক মারা যায়, পরদিন তাদের কবর দেওয়া হয়। তৃতীয় দিবসে তাদের আসবাবপত্র বিক্রি করা হয়। চতুর্থ দিবসেই তারা বিস্মৃত হয়ে যায়।'

জেমসের বেলায় কোনো আসবাবপত্র ছিল না। কিন্তু অদ্ভূত ব্যাপার হলো দুই বছর আগে তার অর্ডার দেওয়া 'ইলেকট্রিফাইং মেশিনটি' ছিল। এটি সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল হায়দারাবাদ দরবারের ওমরাহদের আনন্দ দেয়া, যা কোনোভাবে হারিয়ে গিয়েছিল চীনের উপকূলে। জেমসের মৃত্যুর সপ্তাহেই সেটি কলকাতা বন্দরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ২৮ অক্টোবর একটি শোক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার আগে 'ক্যালকাটা গেজেটে' একটি বড় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

> "আগামী শনিবার প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হবে পরলোকগত লে. কর্নেল জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিকের একটি নতুন মূল্যবান বস্তু ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম ও যাদুর ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষার উপকরণ।"

কিন্তু এটি কত মূল্যে কার কাছে বিক্রি হয়েছিল তার ওপর কোনো বিবরণ নেই।

BanglaBook.org

হায়দারাবাদে জেমসের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে আঠারো দিন পর। হেনরি রাসেলের রিপোর্ট অনুসারে, দরবারে অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ পরিবেশে এ খবর ঘোষনা করা হয়। স্বামীকে হারানোর খবরে খায়রুন্নিসার প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই, কিন্তু সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, তার বয়স মাত্র উনিশ বছর এবং জেমসের মৃত্যুর অর্থই হচ্ছে তিনি আর কোনোভাবেই কখনো তার সন্তানদের দেখতে পারবেন না, সেটাই প্রায় নিশ্চিত। তাদেরকে তার কাছ থেকে সরিয়ে রাখা হবে এবং ইংরেজ শিশুতে পরিণত করা হবে। তিনি যে লক্ষ্যে তার জীবন রচনা করেছেন এভাবেই তা হারিয়ে যাবে অথবা তার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটবে। কোনো ভবিষ্যৎ নেই এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো স্বস্তিও নেই।

স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ প্রেমপত্র হিসেবে অন্তত যেটি টিকে ছিল তা হচ্ছে জেমসের উইল। উইলে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, খায়রুন্নিসার অর্থের কোনো প্রযোজন নেই: 'আমার দুটি সন্তানের সুন্দরী ও মর্যাদাসম্পন্ন মা, যার নাম খায়রুন্নিসা বেগম, যাকে প্রচুর পরিমাণে জায়গির এবং অন্যান্য সম্পদ প্রদান করা হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে ও আহরণের মাধ্যমে, যেগুলো তার ব্যক্তিগত সম্পদ ও অলংকারের অতিরিক্ত, যার মূল্য এক লাখ রুপির কম হবে না, আমিও কখনো ভাবিনি যে, এরপরও তার জন্যে আরও কিছু প্রয়োজন আছে কিনা।' কিন্তু জেমসের ধারণা, এর অপব্যাখ্যা হতে পারে, সম্ভবত খায়রুন্নিসাও ভুল বুঝতে পারে অথবা তার সন্তান বা আত্মীয়রাও ভুল বুঝতে পারে। অতএব তিনি খায়রুন্নিসার প্রতি তার সন্দেহাতীত ভালোবাসার কথা ঘোষণা করে লিখেন, 'আমার সীমাহীন ভালোবাসার প্রমাণ হিসেবে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মৃতির স্মারক হিসেবে তাকে আমার মৃত্যুর পরই আমার তহবিল থেকে দশ হাজার হায়দারাবাদি রুপি প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছি।'

এর বাইরেও খায়রুন্নিসাকে আরও দশ হাজার রুপি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যদি সন্তানদের হিসেব মিটিয়ে অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু স্বামীর ভালোবাসার প্রমাণ হিসেবে খায়রুন্নিসার এসবের প্রয়োজন ছিল না। জেমস তার জন্যে সবকিছুর ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার জন্যে ভালোবাসার প্রমাণ জেমসকে দিতে হয়েছে চার দফা। খায়রুন্নিসার সাথে প্রণয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চারটি পৃথক তদন্ত পরিচালিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে। প্রতিটি পর্যায়ে তিনি খুব সহজে তার তরুণী প্রেমিকার প্রতি দুরভিসন্ধির অভিযোগ থেকে সহজে মুক্ত হয়েছেন এবং প্রতিবারই খায়রুন্নিসার প্রতি তার প্রেমের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন।

এগুলো উইলের কোনো কথা নয়, কিন্তু বাস্তব প্রমাণ, যা আঁকড়ে খায়রুন্নিসা তার জীবন কাটাবেন।

আকস্মিক এবং বিয়োগান্তকভাবে কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে বলে মনে হয়। গত দুশো বছর ধরে প্রেমের ঘটনা নিয়ে যেসব বিবরণী লিখিত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে খায়রুন্নিসার জীবনে কী ঘটে থাকতে পারে তার বেশ কিছু সমাধান পাওয়া যেতে পারে সেসব বিবরণীতে। অনেকের মতে খায়রুন্নিসা সকলের অন্তরালে চলে যান এবং শোকে মৃত্যুবরণ করেন। আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, তিনি তার সন্তানদের অনুসরণ করে ইংল্যান্ডে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু শ্রীলংকা উপকূলে সাগরে ডুবে মারা যান। আরেকটি অনুমান, তিনি কলকাতা অথবা মাদ্রাজে যান। কিন্তু এসবের কোনো ধারণাই দালিলিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়নি।

এই গ্রন্থ রচনার জন্যে চার বছর ধরে গবেষণার পরও আমার পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে, খায়রুন্নিসার কী ঘটেছিল। লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির 'কার্কপ্যাট্রিক পেপার্স'-এর কয়েকশো বাক্সভর্তি কাগজপত্রের কোথাও খায়রুন্নিসা সম্পর্কে আর কোনো উল্লেখ নেই। বিস্ময়কর মনে হয়, ১৮০৫ সালের পরও উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের কাছে যথেষ্ট চিঠিপত্র এসেছে, কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অনুসন্ধান করেও খায়রুন্নিসার ভাগ্য সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি। জেমসের এপিটাফেও কোনো ইঙ্গিত নেই। সুদর্শন কর্নেল অর্থাৎ জেমসের পিতার চেষ্টায় কলকাতায় জেন্ট জন'স চার্চের দক্ষিণ প্রাচীরে এপিটাফটি উৎকীর্ণ আছে। ক্যানাওয়ে অথবা পামারের কাগজপত্রেও কিছু পাওয়া যায় না। যেসব হায়দারাবাদি বিবরণী ও ইতিহাস তাদের প্রেম নিয়ে তোলপাড় করেছে, সেগুলোও একইভাবে নীরব। এমনকি আবদুল লতিফ শুস্তারি তার সম্পর্কিত কণিষ্ঠ বোনের ভাগ্যে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে কোথাও একটি শব্দ উচ্চারণ করেননি। মনে হয়, জেমসের মৃত্যুর পর খায়রুন্নিসা নিখোঁজ হয়ে গেছেন, ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছেন।

কিন্তু একটি সূত্র অনুসন্ধান করতে আমি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম। ২০০১ সালের গ্রীষ্মে আমি অক্সফোর্ডে বোদলিয়ান লাইব্রেরিতে যাই 'রাসেল পেপার্স'-এর ওপর ত্বরিত চোখ বুলাতে। রাসেলের নাতি স্যার আর্থার রাসেলের পক্ষ থেকে লাইব্রেরিতে উপহার দিয়েছেন চিঠিপত্র ও রিপোর্টের মোটা মোটা খণ্ডগুলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিবারের ভবনটি বিক্রি করে দেওয়ার সময় তিনি এ ব্যবস্থা করেন।

সুন্দর চামড়ার বাঁধাই করা খণ্ডগুলোর প্রথম দিক হতাশাজনক। গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় ১৮০৫ সালের জুন থেকে ১৮০৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে একটি মাত্র চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিটি স্যার হেনরি রাসেল সিনিয়র কলকাতা থেকে হায়দারাবাদে তার পুত্র রাসেলকে লিখেছেন এবং জেমসের মৃত্যুর দুঃখজনক খবরের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতে জেমসের বেগম সম্পর্কে কিছু নেই।

BanglaBook.org

১৮০৬ সালের এপ্রিলে হেনরি রাসেল কলকাতায় যান জেমসের উইল কার্যকর করার সাথে জড়িত কাজে। রাসেলের মেজাজ খারাপ ছিল, 'এখানে আসার পর থেকে ফোঁড়ার যন্ত্রণায় অস্বস্তির মধ্যে কাটাচ্ছি', ভাই চার্লসকে তিনি লিখেন। এর সাথে তিনি যোগ করেন, 'খুব বেশি বাইরে যেতে পারিনি।' উলটো পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আমার এখানে আসার কয়েকদিন পর বেচারি বেগম এবং মুনশিকে নিয়ে তারা কটক ত্যাগ করেছে। সম্ভবত ২৫ তারিখের মধ্যে এখানে পৌঁছবে।' যেন দম নেওয়ার মতো ভেসে উঠার অবস্থা। চার বছর অনুসন্ধানের পর আসল খবর পাওয়া গেল। বেগম জীবিত এবং মুনশি আজিজ উল্লাহ'র সাথে কলকাতার দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য কী? রাসেলের বিবর্ণ লেখা আমি রুদ্ধশাসে দ্রুত পাঠ করি।

১৮০৫ সালের সেপ্টেম্বরে জেমস মাদ্রাজ ত্যাগ করার পর প্রাপ্ত অস্পষ্ট প্রমাণ যে কাহিনিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল কাহিনির আসল জায়গায় উপনীত হওয়ার পর। জেমসের মৃত্যুর পূর্বের মতো তখনো বিবরণ অস্পষ্ট এবং বহু প্রশ্নের উত্তর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বোদলেয়ান এ এক মাস অতিবাহিত করার পর অপূর্ব এক কাহিনির রূপরেখা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়ে উপস্থিত হলো। জেমসের চিঠির চাইতেও উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটল খায়রুন্নিসার।

জেমসের মৃত্যুর পরবর্তী বছরটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। কিন্তু ১৮০৬ সালের শরৎকাল থেকে খায়রুন্নিসা আবির্ভূত হয়েছেন মঞ্চের আলোকিত স্থানে। যেহেতু তিনি আগে কখনো হায়দারাবাদ ছেড়ে কোথাও যাননি, তিনি ভাবছিলেন যে, এই যাত্রা তিনি কীভাবে শুরু করবেন। এক হাজার মাইল পেরিয়ে ভারতের আরেক প্রান্তে যেতে হবে বছরের ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময়ে, স্বামীর কবরের পাশে গিয়ে শোক প্রকাশ করতে। এটি ছিল স্বামীর প্রতি আস্থা ও নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ। তার মা ও আরিস্তু জাহ যে রেসিডেন্টকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলেন তা নয়, খায়রুন্নিসা যে যথার্থই জেমসকে ভালোবাসত তার প্রমাণ দিতে।

চিঠিগুলোতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খায়রুন্নিসা তার অভিযানে একা ছিলেন না। তার সাথে মুনশি আজিজ উল্লাহ ছাড়াও তার মা শরফ-উন-নিসা ছিলেন। খায়রুন্নিসার নানি দুরদানা বেগমের বয়স তখন সত্তর বা আশি অতিক্রম করেছে, তিনি পুরনো হায়দারাবাদেই রয়ে যান। তাদের জন্যে ভালোই বলতে হবে, হেনরি রাসেল তখন কলকাতায় এবং সবকিছু চিঠিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি পৃথকভাবে আসেন এবং ভিন্ন কাজে। কিন্তু কলকাতায় দুই বেগমের সাথে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা ছিল তার। এই দুই মহিলার পাশে তিনি বসবাস করেছেন, তাদের চিরকূট ও খবর আদান প্রদান করেছেন, কিন্তু

BanglaBook.org

কখনো তাদের মুখ দেখেননি। আরেকটি পরিকল্পনাও ছিলঃ ফায়জি এবং জেনারেল পামার দুই বেগমের সাথে সাক্ষাৎ করতে কলকাতায় আসছেন। জেমসের ভাতিজী ইসাবেলা বুলারও সাক্ষাৎ করবেন, যার সাথে খায়রুন্নিসার সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু খায়রুন্নিসা তাকে মূল্যবান অলংকার উপহার পাঠিয়েছেন। মনে হচ্ছিল যে, কলকাতায় আগমন খায়রুন্নিসার জন্যে পুনর্জন্মের মতো। রেসিডেন্সি মহলের শূন্য খাঁচায় সকল স্মৃতিসহ তার পালিয়ে আসার মতো এবং সম্ভবত ভৌতিক আছর থেকে দূরে থাকার জন্যে।

হেনরির প্রাণবন্ত চিঠির বিবরণে পুরো কাহিনির সবচেয়ে দুঃখজনক পর্যায়ের আগমন তখনো অবশিষ্ট ছিল।

BanglaBook.org

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে উইলিয়াম হান্টার যখন কলকাতায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জুনিয়র ক্লার্ক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করতে আসেন, তখন ইংল্যান্ডে তার বাড়িতে চিঠি লিখেন, 'কল্পনা করো, যা কিছু প্রকৃতিতে উজ্জ্বল গৌরবময়, তার সাথে স্থাপত্যের সকল সৌন্দর্য যুক্ত হলে যা হতে পারে, তুমি কলকাতাকে সেভাবেই কল্পনা করতে পার।' এই অভিব্যক্তির প্রকাশ শুধু এ কারণে নয় যে, তিনি কলকাতার প্রেমে পড়েছিলেন এবং পেকহ্যাম থেকে তিনি সদ্য এসেছেন।

১৮০৬ সালে কলকাতা তার স্বর্ণযুগের শিখরে। কলকাতা পরিচিত ছিল প্রাসাদের নগরী অথবা প্রাচ্যের সেন্ট পিটার্সবার্গ হিসেবে। বাংলায় ব্রিটিশ অবস্থান সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সন্দেহাতীতভাবে লাভজনক ছিল এবং ঔপনিবেশিক ভারতে বৃহত্তম ও জাঁকজমকপূর্ণ শহর ছিল। ১৭৭০-এর দশকে কলকাতায় নবাব ফ্রান্সিস ফিলিপের মতে, বাংলায় সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদের মালিক তিনি, শত ভৃত্য পরিবৃত, সুপরিসর উদ্যান, ঘোড়া, গাড়ি সবকিছু মিলিয়ে অনুপম। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ফ্রান্সিসের 'ওয়াইন বুক' এ কলকাতায় তারা কিভাবে জীবনযাপন করতেন তার বিবরণ পাওয়া যায়— কোনো এক মাসে ফ্রান্সিস, তার পরিবার ও অতিথিরা পঁচাত্তর বোতল 'ম্যাডেইরা', নিরানব্বই বোতল 'ক্লারেট', চুয়াত্তর বোতল 'পোর্টার', ষোলো বোতল 'রাম', তিন বোতল 'ব্র্যান্ডি', এক বোতল চেরি ব্র্যান্ডি-অর্থাৎ মোট ২৬৮ বোতল মদ পান করেন। যদিও এই পরিমাণ মদ পানের অন্যতম একটি কারণ ছিল কলকাতায় সুপেয় পানি অভাব এবং ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হত যে, পানিকে পানযোগ্য করতে এলকোহল মেশাতে হবে, বিশেষ করে সামান্য ব্র্যান্ডি।

শুধু যে ব্রিটিশরাই সবদিক থেকে ভালো করেছিল এবং রাজসিকভাবে বসবাস করত তা নয়, বাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও সমৃদ্ধ হয়েছিল। যেমন মল্লিক পরিবারের মালিকানায় কলকাতার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল প্রাসাদ ও শহরে বেড়ানোর জন্যে তাদের জেব্রায় টানা সুন্দর একটি গাড়িও ছিল।

জর্জীয় যুগের লন্ডন থেকে কোনো ব্রিটিশ কলকাতায় এসে যদি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়, তাহলে মোগল ও পারসিক পর্যটকদের যে হতবাক করবে সেটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তাদের কাছে জাঁকজমকের সাথে এখানে বাড়তি যোগ হয়েছিল ইউরোপীয় শহর ব্যবস্থাপনা ও গ্রিক স্থাপত্যের অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গির আমদানি।

BanglaBook.org

খায়রুন্নিসার জ্ঞাতি ভাই আবদুল লতিফ শুস্তারি ১৭৮৯ সালে প্রথমবার কলকাতায় এসে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি, 'শহরটিতে পাথর বা ইট দিয়ে নির্মিত প্রায় পাঁচ হাজার দ্বিতল বা তিন তলাবিশিষ্ট বাড়ি। কিছু বাড়ির রং সাদা, কোনো কোনোটি মার্বেলের মতো রঙের। শহরের রাস্তা ও বাজারের আবর্জনা অপসারণ করে নদীতে নিক্ষেপ করার জন্যে কোম্পানি সাতশ জোড়া ষাড় ও গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। রাস্তার পাশের নর্দমা ইট দিয়ে তৈরি, বর্ষার পানি বয়ে নিয়ে যায় নদীতে এবং ইট পানি শোষণ করে বলে নর্দমায় কাদা হয় না। রাস্তার পাশে বাড়িগুলোর ভেতরে কি হচ্ছে তা পথচারীদের দৃষ্টিতে পড়ে। রাতের বেলায় ওপরের ও নিচের কক্ষে কর্পূরের বাতি জ্বলে, যা চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা করে। শহরে গম ও চালের প্রাপ্যতা পর্যাপ্ত এবং সস্তা..।

পথেঘাটে দস্যুর ভয় নেই। কেউ জিজ্ঞাসা করবে না যে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন অথবা কোথা থেকে এসেছেন। ইউরোপ, চীন এবং নতুন পৃথিবী থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র, উন্নত বস্ত্র ভর্তি বড় বড় জাহাজ আসছে, সে কারণে মখমল ও সাটিন, পোর্সেলিন ও কাচের জিনিসপত্রের ব্যবহার সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কলকাতা বন্দরে এক হাজারের বেশি ছোট বড় জাহাজ নোঙর করা থাকে এবং জাহাজের অধিনায়করা অব্যাহতভাবে কামানের গোলা ছুড়ে তাদের আগমন ও প্রস্থান ঘোষণা করে..।'

কলকাতা যদি ব্যবসা বাণিজ্যের শহর হয়ে থাকে, তাহলে বাড়াবাড়িও স্থান। প্রতারিত হওয়ার জন্যে এবং বিশ্বের যে কোনো বন্দরের চাইতে নৈতিক মানেও কুখ্যাতি ছিল কলকাতা বন্দর। চল্লিশ বছর আগে রবার্ট ক্লাইভ লিখেছেন, 'দুর্নীতি, লাম্পট্য এবং নীতিবোধের অভাব প্রতিটি বেসামরিক আমলার ওপর আছড় করেছে।' তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেই এই মূল্যায়ন করেছেন। ব্রিটিশ কলকাতা অদ্ভুতভাবে অর্ন্তমুখী, আত্মকেন্দ্রিক ছিল, প্রকৃত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপের মতো। ফ্রান্সিস ফিলিপ যে দশ বছর উপমহাদেশে ছিলেন, তিনি কখনো কলকাতার বাইরে এক বা দুই মাইলের বেশি দূরে যাননি। এমনকি ১৭৯৩ সালে শিল্পী উইলিয়াম হোডস গঙ্গা ও যমুনার উজানে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, একটি দেশ আমাদের এত ঘনিষ্ঠ, অথচ আমরা এর সম্পর্কে এত কম জানি। দেশটির বৈশিষ্ট্য, এর শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে এখনো কমই বলা হয়েছে।'

কোম্পানির বেসামরিক চাকরিতে এবং সেনাবাহিনীতে প্রতি বছর শত শত ব্রিটিশ কলকাতায় আসত—যাদের অধিকাংশই কপর্দকহীন তরুণ, ব্রিটেনের দূর গ্রামের কৃষকের পুত্র। জ্যাকোবাইট অভ্যুত্থানে স্কটরা তাদের জমি ও সম্পদ হারিয়েছিল, তাদের পুত্রদের ইষ্ট এন্ডের রাস্তা থেকে বাছাই করা হত কোম্পানির সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্যে। অ্যাংলো-আইরিশ জমিদার ও যাজকদের পুত্রেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাজার মাইল অতিক্রম করে বাংলা বদ্ধ

BanglaBook.org

জলা ও উষ্ণ জঙ্গলের অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে আসত, তাদের জানাও থাকত যে, আগেভাগে মৃত্যুর আশংকাও আছে। তবু একটি কারণে আসত, 'যদি তুমি বেঁচে থাকো, তাহলে সম্পদ আহরণের মতো এর চাইতে উত্তম জায়গা পৃথিবীতে আর নেই।'

ভারতের অন্য যে কোনো জায়গার চাইতে কলকাতায় ব্রিটিশ বাসিন্দারা পৃথক ছিল, তাদের প্রাচ্যে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল বিত্ত গড়ে তোলা। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষীদের কাছেও এটি অনুকূল স্থান ছিল। গভর্নর জেনারেল এখানে থাকেন, সেজন্যে অহংকারের সাথে সে স্থানের নাম বলা যায়। দ্রুত পদোন্নতি লাভের সুযোগ থাকে। ফিরে যাওয়ার সময় যথেষ্ট মানমর্যাদা নিয়ে যাওয়া যায়। কলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজদের মধ্যে যাদের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা থাকত তাদের লক্ষ লুণ্ঠন।

১৮০৬ সালের মধ্যে উইলিয়াম হিকি হেনরি রাসেলের পিতা বাংলার প্রধান বিচারপতির অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করছিলেন। ত্রিশ বছর যাবত তিনি কলকাতায়। কিন্তু চারপাশে প্রতিদিন যে বাড়াবাড়ি দেখেন তাতে বিস্মিত না হয়ে পারেন না। তার বিখ্যাত ডায়েরিতে তিনি তার বিরক্তির ক্ষেত্রগুলোর বিবরণ দিয়েছেন যেখানে বিত্তশালী রাইটাররা (কোম্পানীর ভাষায় 'ক্লার্ক') কলকাতায় রেষ্টুরেন্টে অর্ধভক্ষ মুরগি টেবিলে ছুড়ে ফেলতো। তাদের মহিলারা রুটি ও পেষ্ট্রি ছুড়ত। রসিকতা ও নিজেদের উচ্চবংশজাত প্রমাণ করার প্রবণতা থেকেই তারা এ ধরনের আচরণ করত।

কলকাতায় তখন চার হাজার ব্রিটিশ পুরুষের জন্যে মাত্র ২শ ৫০ জন ইউরোপীয় মহিলা। এর ফলে তরুণ রাইটাররা তাদের অর্থ ব্যয়ের সুযোগ না পেয়ে কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতো, শহরের বিখ্যাত বেশ্যাপল্লিতে কাটাতো, পানশালায় পড়ে থাকত। শহরের অন্যান্য দিকের প্রশংসা করলেও গুস্তারি কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বেশ্যার সংখ্যা এবং এর ফলে রোগব্যাধির বিস্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, ' বেশ্যালয়গুলো বেশ্যাদের ছবি দরজায় টানিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়....। একটি গুরুতর যৌনব্যাধি 'আতাশাক'-যার কারণে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ফুলে যায়, সব শ্রেণির মানুষ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। কারণ বেশ্যার সংখ্যা এত অধিক, যাদের মধ্যে ভালো স্বাস্থ্যের ও রোগাক্রান্ত উভয়ই মিশে আছে। কেউ পিছিয়ে নেই-এমনকি এই অংশের মুসলমানদেরও অবস্থা অভিন্ন।'

এমনকি তারা নিজের জ্ঞাতিভাইও এ ধরনের কিছুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে গুস্তারি অন্যত্র স্বীকার করেছেন। 'চুলকানির মতো কিছু, যা বাংলায় সাধারণভাবেই দেখা যায়...এটি ক্রমে তার শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং চুলকানির কারণে তার আর কোনো স্বস্তি ছিল না। অতএব তাকে চারজন

BanglaBook.org

ভৃত্য নিয়োগ করতে হয়েছিল অব্যাহতভাবে তার শরীর চুলকানো ও মর্দনের কাজে। ভৃত্যরা এত প্রবলভাবে কাজটি করত যে, অনেক সময় সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তো এবং ঘুমাতেও পারত না।' এই যেখানে অবস্থা সেখানে সামাজিক ব্যাধি ব্যাপক হওয়ারই কথা এবং কলকাতায় ইউরোপীয় অভিজাতদের অবস্থাও ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। অন্তত গুস্তারির দৃষ্টিতে তো নয়ই। শুধু অতিরিক্ত মদ্যপানের ব্যাপারেই গুস্তারির উদ্বেগ নয়, অন্য ব্যাপারেও ছিল, 'রাতে বা দিনের বেলায় কেউ বাড়িতে খায় না এবং যারা নিজেদের মধ্যে পরিচিত তারা পরস্পরের বাড়িতে যায় এবং এক সাথে তাদের লালসা পূর্ণ করে। কোনো পুরুষই তাদের স্ত্রীকে অন্যের সাথে মেলামেশা থেকে রোধ করতে পারে না এবং মহিলারা যেহেতু পর্দা ছাড়াই রাস্তায় বের হয়, সেজন্যে তাদের প্রেমে পড়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার..।

এসবের কোনকিছুই তেমন বিস্ময় উদ্রেক করার মতো নয়। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই রাইটার এবং তাদের বয়স স্কুল পার হওয়া বয়সের সামান্য বেশি হতে পারে, যাদেরকে পনোরো/ষোলো বছর বয়সেই ইংল্যান্ড থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতে। ছয় মাসব্যাপী বিরক্তিকর সমুদ্রযাত্রা শেষে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং প্রথমবারের মতো কারো তত্ত্বাবধানে গণ্ডির বাইরে চলে আসে। একজন পর্যটক মন্তব্য করেছেন যে, ' দৌড়ের ঘোড়া লালন, জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি এবং বিনোদনের মধ্যে তরুণ রাইটাররা সমস্যায় পড়ে যেত এবং বিব্রত হত, কারণ তাদের বিব্রত হওয়ার বয়স তখনো অতিক্রান্ত হয়নি।' আরেকজন লেখকের মন্তব্য, 'রাইটার্স বিল্ডিং-এর ব্যয়বহুল শ্যাম্পেন নৈশভোজগুলো ছিল বিখ্যাত এবং প্রাচীন দেয়ালগুলোতে উচ্ছ্বসিত সংগীতের প্রতিধ্বনি হত।'

ব্রিটিশ কলকাতার অভিজাতের মতোই উজ্জ্বল ছিল কলকাতার সংগীত জগৎ। ১৭৮৪ সালে এক ডেনিশ শিল্পী সদ্য উদ্ভাবিত সুরযন্ত্র ক্লারিনেট নিয়ে কলকাতায় আসেন চাকরির সন্ধানে, তাঁর নাম জোসেফ ফাওকে, যিনি যথেষ্ট সংস্কৃতিবান হওয়া সত্ত্বেও কলকাতায় এসে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি তার ডায়েরিতে লিখেন, 'ক্লারিনেট-এর সুর খসখসে, আমার কানে ঘুগড়া পোকার মতো বাজে।' তিনি মনে করেছেন যে, প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের জন্যে এ যন্ত্র মানানসই নয়।

কলকাতার যাজকরা বিষয়গুলোকে কিভাবে দেখেছেন। উইলিয়াম হিকির মতে, 'সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ব্লান্ট খামখেয়ালি তরুণ, তিনি মদপান করে মাতাল হয়ে পড়েন এবং সেই অমর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় সৈনিক ও নাবিকদের সামনে পড়ে যান, অশ্রাব্য গালিগালাজ করছিলেন তিনি, বেসুরো গান গাইছিলেন, যার সবই অশোভন এবং এভাবে নিজেকে সকলের হাসির পাত্রে পরিণত করেন।' এমনকি কলকাতার শৃঙ্খলা রক্ষীদের অবস্থাও ব্যতিক্রম ছিল

না: '১৭৮০-এর দশকের প্রায় পুরো সময় জুড়ে কলকাতার নারীসুলভ চেহারার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ সি ব্ল্যাকোরে, কখনো কখনো নিজের সুবিধার জন্যে নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করতেন।'

ওয়েলেসলি এই অবস্থার অবসান ঘটাতে কিছু চেষ্টা করেছিলেন এবং তার একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ ছিল রাইটারদের চতুর অংশকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, উপমহাদেশকে শাসন করার জন্যে যা তাদের প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু সামাজিক সংস্কার এবং কঠোর ভিক্টোরীয় নীতিবোধ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় আরও পড়ে, ১৮৩০-এর দশকে। অতএব, ১৮০৬ সালে খায়রুন্নিসা যখন প্রথম কলকাতায় আসেন তখন শহরটি ছিল নৈতিক অবক্ষয়ের।

১৮০৬ সালের মে মাসের শুরুর দিকে একটি ছোট নৌকাভর্তি শিয়া মুসলিম হায়দারাবাদ থেকে কলকাতা বন্দরে নোঙর করে। দুজন বোরখা পরিহিতা বেগমের সাথে ছিল তাদের পরিচারিকা এবং আরেকটি পরিবারের বোরখা পরা মহিলা। তাদের সাথে তাদের উচ্চশিক্ষিত দুই ভাই এবং আসলে তারা দিল্লির। মুনশি আজিজ উল্লাহ, তার ছোট ভাই আমান উল্লাহ এবং তাদের পরিবার আগে কলকাতায় এসেছেন এবং তারা কলকাতা সম্পর্কে জানেন। কিন্তু খায়রুন্নিসা ও তার মায়ের কাছে সবই নতুন, তাদের চোখে ব্যাপক বিস্ময়।

নৌযাত্রার মৌসুম ছিল না তখন। এপ্রিল ও মে মাসে বাতাস এবং আকস্মিক উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস অত্যন্ত বিঘ্নসংকুল। অতএব মসলিপতম থেকে তারা পূর্বাঞ্চলের ঘাট থেকে হাতির পিঠে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উড়িষ্যার নৌ বন্দর কটক পর্যন্ত আসেন। সেখান থেকে তারা তাদের হাতি ও মাহুতদের ফেরত পাঠান হায়দারাবাদে এবং উপকূলে একটি নৌকা ধরে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে কলকাতায় পৌঁছেন।

মে মাসে হায়দারাবাদের শুষ্ক ও সহনীয় আবহাওয়ার তুলনায় বাংলার আবহাওয়া চরম উত্তপ্ত এবং আর্দ্র সময়, যা দুই বেগমের জন্যে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। আবদুল লতিফ শুস্তারিও কলকাতার পশ্চাদভূমির আর্দ্রতাযুক্ত উর্বরতায় বিস্মিত হন-পারস্য অথবা দাক্ষিণাত্যের ধূলিপূর্ণ আবহাওয়ার চাইতে কতো ভিন্ন: 'বর্ষাকাল চার মাস স্থায়ী হয়, যখন মানুষ ও পশুর জন্যে কোথাও যাওয়া দুঃসাধ্য। মাঠ, সমতল ভূমি সবই পানির নিচে চলে যায় এবং বিত্তশালী লোকজন তাদের সময় কাটায় নৌকায়। কলকাতার আশেপাশের ধানক্ষেতে রাতারাতি ধান গাছ এক হাত বেড়ে যায় প্রবল বর্ষণের সময়..। কৃষির সমৃদ্ধি হচ্ছে এখানে, চোখ পরিতৃপ্ত করার মতো দৃশ্য। বাস্তবিক পক্ষেই সমগ্র পৃথিবীতে অতুলনীয়। সকল মৌসুমে সর্বত্র শুধু সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা থাকে।

BanglaBook.org

পাহাড়ের কোথাও একটি শিলাখণ্ডও দেখা যাবে না এবং সবুজের আচ্ছাদন ছাড়া এক মুঠো মাটিও পাওয়া যাবে না।'

হায়দারাবাদি দলটি পুরনো কাস্টম হাউজের পাশে বিবি জনসন'স ঘাটে অবতরণ করে এবং সম্ভবত পর্দাঘেরা ঘোড়ার গাড়ি অথবা পালকিযোগে তাদের নেওয়া হয় অভিজাত চৌরঙ্গি এলাকার এক ভাড়া বাড়িতে।

দুই বেগমের কাছে কলকাতা তাদের নিজস্ব শহরের চাইতে এত ভিন্ন এবং তাদের দেখা জগতের যে কোনোকিছুর চেয়ে ব্যতিক্রম—রীতিমতো শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য।

বিশ বছর আগে আবদুল লতিফ শুস্তারিও নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় শহরের ওপর প্রথম দৃষ্টিতে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন একটির পর একটি সুউচ্চ, সাদা পোর্টিকো-সমৃদ্ধ হুগলি নদী তীরের সারিবদ্ধ প্রাসাদগুলো দেখে, গার্ডেন রীচের সুবিশাল অট্টালিকা দেখে, বৃষ্টিস্নাত সবুজ প্রকৃতি দেখে, নদীতীরের উদ্যানে অচেনা ফুলের কেয়ারী দেখে-সবই ইংল্যান্ড থেকে আনা। তারকা আকৃতির ফোর্ট উইলিয়াম, শত শত ভারতীয়ের কোলাহলে পূর্ণ বন্দর, শহরের কেন্দ্রস্থলে পরিচ্ছন্ন রাস্তা, ঝকমকে ঘোড়ার গাড়ি, শহরের মাঝে ঘুরে বেড়ানো উঁচু হ্যাট ও ঢোলা কোট পড়া পুরুষ, কুকুর কোলে মহিলা, পালক শোভিত টুপি ও উজ্জ্বল ইউনিফর্ম পরা গভর্নর জেনারেলের দেহরক্ষী এবং ওয়েলেসলির নব নির্মিত গভর্নর হাউজ দেখে বিমুগ্ধ।

রাসেলের চিঠি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, তিনি এবং দুই বেগম চৌরঙ্গির কোথায় ছিলেন অথবা এটাও পরিষ্কার নয় যে দুই মুনশির পরিবারের সাথেই দুই বেগমের জন্যে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল কিনা। কিন্তু দৃশ্যত তারা খুব কাছাকাছি ছিলেন এবং মনে হয় অধিকাংশ সময় তারা একই সাথে কাটিয়েছেন। এটাও মনে হয়, সম্ভবত হায়দারাবাদ থেকে আগত পুরো দলটি চৌরঙ্গির বিরাট এক বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেটির বিভিন্ন তলা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন।

কলকাতা থেকে হেনরি হায়দারাবাদে তার ভাই চার্লসের কাছে চিঠিগুলো লিখেছেন ১৮০৬ সালের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সাত মাসে এবং তাতে স্পষ্ট ছিল যে, তিনি বেগম ও মুনশিদের থেকে কখনো খুব দূরে ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, 'আজিজ উল্লাহ ও তার ভাই তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।' আরেকটিতে উল্লেখ করেছেন, 'আমান উল্লাহ এখন আমার কনুই-এর কাছে এবং সে তোমাকে সালাম জানাচ্ছে।' খায়রুন্নিসার ক্ষেত্রে স্পষ্ট যে, কলকাতায় তার এক মাস বা দুমাস কেটেছে স্বামীর কবরের পাশে শোক প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এরপর হয়তো কান্না ও ভাগ্য সম্পর্কে বিলাপ করতে করতে তার ক্লান্তি এসে যায়। তিনি চৌরঙ্গিতে রাসেলের পাশের বাড়িতে চলে আসেন। এক মাস বা আরও কিছু পর তিনি কিছুটা অগ্রসর হয়ে বোরখার মুখ খোলেন এবং

BanglaBook.org

রাসেল তাকে প্রথমবারের মতো দেখতে পান। একটি চিঠিতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যখন হেনরি লিখেন, 'তোমার চিঠি যখন পৌঁছলো, তখন বেগম আমার সাথে বসে আছেন ছবি আঁকার জন্যে।'

তার বিবরণ অনুযায়ী, হায়দারাবাদি দলটির সাথে রাসেল নিজেকেও জড়িত করেছিলেন এবং সব সময় 'আমি'র' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, 'আমরা'। যখন তিনি খায়রুন্নিসার মৃত্যু হয়েছে বলে হায়দারাবাদে ছড়িয়ে পড়া গুজবের কথা শুনতে পান তখন ভাইকে লিখেন, 'খায়রুন্নিসার প্রেরিত মুখ বন্ধ করা চিঠিটি শিগ্‌গির দুরদানা বেগমের কাছে পৌঁছাবে এবং সাক্ষাতে তাকে বলবে যে, ভিত্তিহীন একটি খবর শোনার পর আমরা কতোটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি।' তিনি জানতে চান, 'বৃদ্ধা মহিলার কাছ থেকে আমাদের এত কম চিঠি পাওয়ার কারণ কি?'

বেগম এবং রাসেল পরিবারের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় যে, আগষ্ট মাসে হেনরি লিখেন, খায়রুন্নিসা তার ছোট ভাই হেনরির সামনে উপস্থিত হতেও সম্মতি দিয়েছেন, 'দুই বেগমই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, তুমি তাদের খেয়াল রেখেছ বলে এবং সবসময় তোমার কথা বলে আগ্রহ নিয়ে। খায়রুন্নিসা বলেছেন যে, তিনি যখনই সুযোগ পাবেন, ব্যক্তিগতভাবে তোমার সাথে পরিচিত হবেন।'

রাসেলের চিঠির সুরে মনে হয়, তিনি খায়রুন্নিসার একান্ত সচিব বা ব্যক্তিগত সহকারীর ভূমিকা পালন করেছেন। নভেম্বরে চার্লসকে স্বাগত জানানোর ব্যাপারে খায়রুন্নিসার প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করা হয় এবং রাসেল এত বিশ্বস্ততার সাথে এ বার্তা প্রেরণ করেন যা দরবারি রীতির সাথেই তুলনীয়, 'বেগম অত্যন্ত অনুগ্রহের সাথে তোমাকে স্মরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তোমাকে তার একটি ছবি পাঠাতে তার কোনো আপত্তি নেই, যদি আসল ছবিটা তার রাখার ইচ্ছা না হয় এবং তিনি তার ছবির চাইতে সুন্দরী। তিনি চান, ছবির আগে তাকেই বাস্তবে দেখ।'

খায়রুন্নিসার নতুন ছবিটিই তার অ্যাপার্টমেন্টে একমাত্র ছবি ছিল না। হায়দারাবাদ থেকে হাতির পিঠে করে তিনি সাথে এনেছেন পূর্ণাবয়বের তার দুই প্রিয় সন্তানের চিত্র, তার বিবাহিত ও সাবেক জীবন থেকে পাওয়া আঁকড়ে থাকার মতো এই চিত্রটিই শুধু আছে তার কাছে।

শিগ্‌গির চিত্রটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং বহু লোকজন আসতে থাকে চিত্রটি এক নজর দেখার জন্যে। রাসেল তার ভাইকে লিখেন, 'চিনারির অংকিত কর্নেলের সন্তানদের চিত্র ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং সেই সাথে চিনারিও এখানে খ্যাতিমান ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন।'

হায়দারাবাদ থেকে আগত মিশ্র গ্রুপের একদল লোক-বেগম, মুনশি, পদস্থ ব্রিটিশ কূটনীতিক এবং তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মধ্যে ভৌগোলিক

BanglaBook.org

দূরত্বের চাইতেও অভিন্নতা ছিল। তারা সকলে হায়দারাবাদের নতুন শাসকগোষ্ঠীর কারণে বিভিন্ন পর্যায়ের শরণার্থী।

ওয়েলেসলি'র এক অনুসারী টমাস সিডেনহ্যামকে জেমসের মৃত্যুর পর হায়দারাবাদে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি জেমসের অ্যাংলো-হায়দারাবাদি সম্পর্ক উন্নত করার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন, দরবারে উপস্থিতির অল্পদিনের মধ্যেই নিজাম সিকান্দার জাহের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হন এবং 'তারিখ-ই-খুরশিদ জাহি'র লেখক গোলাম ইমাম খানের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করেন যে, তিনি হাশমত জং-এর সকল কার্যক্রম বন্ধ করবেন। কারণ, তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করেন না। একই সময়ে খায়রুন্নিসাকে রংমহল খালি করে দেয়ার নোটিশ জারি করেন। যদিও সিডেনহ্যামের ইংরেজ স্ত্রী ছিল, কিন্তু তাদের ব্যবহারের জন্যে রংমহলের প্রয়োজন ছিল না। রেসিডেন্সির রন্ধনশালায় জাতিভেদ অনুসারে রান্নার যে ব্যবস্থা ছিল সিডেনহ্যাম তা বাতিল করে দেন এবং রেসিডেন্সি পরিচালনায় মৌলিক পরিবর্তন আসে।

সিডেনহ্যাম নিজেকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার কর্মপদ্ধতি অনুসারে তিনি জেমস কার্কপ্যাট্রিকের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোক। যখন তিনি জেমসের দুটি রৌপ্য নির্মিত হাতির হাওদা ক্রয় করেন, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে টিপু সুলতানের পিতা হায়দার আলীর—তখনই তিনি বিষয়টি কলকাতায় জানানোর প্রয়োজন অনুভব করেন যে, কার্কপ্যাট্রিকের পথ অনুসরণ করার ইচ্ছা তার নেই, যদিও এই ক্রয়ের মাধ্যমে সে ধারণা হতে পারে। তিনি মনে করতেন, ব্রিটিশ প্রতিনিধির মর্যাদা ও সম্মানের ভিত্তি হতে হবে মজবুত এবং ' নেটিভ ইন্ডিয়ার' আচরণ ও অভ্যাস হতে আমাদের ধার করার কিছু নেই, যা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

কিছু অর্থনৈতিক কেলেংকারির ইঙ্গিত ছিল, যা সিডেনহ্যামের বিশ্বাস পরোক্ষভাবে তার আগের রেসিডেন্টের সাথে জড়িত। কিন্তু এর বিস্তারিত সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। সিডেনহ্যাম এজন্যে মুনশি আজিজ উল্লাহকে দায়ী করে সাথে সাথে তাকে বরখাস্ত করেন। যদিও তদন্ত শুরু হয় আরও পরে। সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ঘটনা হেনরি রাসেলকে শংকিত করে তোলে। কারণ মুনশির প্রতি তার প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল এবং আলোচনার ক্ষেত্রে তার দক্ষতার প্রশংসা করতেন এবং জেমস যে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, প্রতিটিতে মুনশি আজিজ উল্লাহর অবদান ছিল। মুনশি সম্পর্কে চার্লসকে তিনি লিখেছিলেন, 'অসাধারণ যোগ্যতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যার যোগ্যতা কোম্পানির জন্যে যে কোনো ইউরোপিয়ানের চাইতে অধিকতর কাজে লেগেছে...।'

রাসেল বিশ্বাস করতেন যে, আর্থিক কেলেংকারি জেমসের প্রহরীদলের প্রধান ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হেমিং-এর সৃষ্টি, যাকে তিনি এবং জেমস অপছন্দ



BanglaBook.org

করতেন এবং বিশ্বাসও করতেন না। তাছাড়াও রাসেলের বিশ্বাস হয়েছিল যে, জেমসের স্মৃতিকে কালিমা লিপ্ত করার লক্ষ্যেই হেমিং একাজ করেছে। রাসেল ব্যক্তিগতভাবে হেমিং ও সিডেনহ্যাম দুজনকে অপছন্দ করতেন এবং কলকাতায় তিনি বড় একটি আশা নিয়ে এসেছেন যে, রেসিডেন্সি থেকে ছুটি নিয়ে জেমসের উইলের একটি নিষ্পত্তি করে ভারতের অন্য কোথাও সুবিধাজনক একটি চাকরির সন্ধান করবেন। এই লক্ষে তিনি বহু সন্ধ্যায় তার হায়দারাবাদি বন্ধুদের ছেড়ে কলকাতায় গভর্নমেন্ট হাউজে নৈশভোজে যোগ দিতেন কোথায় ভালো সুযোগ আছে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে।

রাসেলের অনেক ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু আনুগত্যের অভাব ছিল না। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি জেমসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং জেমসের কর্মধারা ও দৃষ্টান্ত যেখানেই হামলার মুখোমুখি হয়েছে রাসেল তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন। কলকাতায় অবস্থানকালেও তিনি নিয়মিত তার ভাই চার্লসের কাছে জানতে চাইতেন যে হায়দারাবাদের লোকজন জেমস সম্পর্কে এখন কি বলছে এবং জেমসের পুরনো বন্ধুরা তার প্রতি এখনও দুর্বলতা প্রকাশ করে কিনা। একটি চিঠিতে তিনি স্থপতি স্যামুয়েল রাসেল সম্পর্কে চার্লসের কাছে জানতে চাইলে চার্লস উত্তরে জানেন যে, স্যামুয়েল জেমসের অনুপস্থিতিতে আনন্দে আছে এবং জেমসকে নিয়ে রসিকতা করছে। এতে হেনরি রাসেল ক্ষুব্ধ হয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, 'স্থপতির আচরণ সম্পর্কে তুমি যা জানিয়েছ তা আমাকে বেদনা দেয়ার চাইতে বরং অধিক বিস্মিত করেছে। হয়তো আমার খুব আশাবাদ ব্যক্ত করা হবে, তবুও এ আশা না করে পারছি না যে, একদিন হয়তো আমি হায়দারাবার রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবো। সেদিন যদি কখনো আসে, তাহলে সে তার আচরণের জন্যে পস্তানোর যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাবে, কারণ আমার সকল ক্রোধ পড়বে তার ওপর। আমি তাকে জানতে দেব যে, যার কাছ থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতার প্রকাশের চাইতে বড় অপরাধ আমি আর কোনো কিছুকে বিবেচনা করি না।'

পাঁচ বছর পর রাসেল হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন এবং জেমসের সময়ের প্রচলিত নিয়মগুলো ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালান, তার মধ্যে রন্ধনশালায় কঠোর জাতিভেদ মেনে চলার বিষয়টিও ছিল এবং তার পুরনো বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকের প্রতি অকৃতজ্ঞ কাউকে তার অধীনে চাকরি দিতে অস্বীকার করে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

১৮০৬ সালের মে মাসের শেষ দিকে হায়দারাবাদ থেকে আগত দলটি কলকাতার চৌরঙ্গিতে উঠার পর তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অনেকের আগমন ঘটেছিল।

ফায়জি এবং জেনারেল পামার আসেন সর্বপ্রথম। দুজনেরই বয়স বেড়েছে এবং বয়স হওয়ার অনুভূতিও স্মৃতি হয়েছে। জেনারেল বিষন্ন-ওয়েলেসলি তার চাকরি জীবনে যে বিপর্যয় এনে দিয়েছেন সে কারণে এবং তাকে বর্তমানে যে বেতন দেওয়া হয়েছে তার ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে। পামার তার পুরো জীবন কাটিয়েছেন ঋণগ্রস্ত অবস্থায় এবং এ প্রসঙ্গে তার উদ্বিগ্ন পুত্র জন লিখেছেন, 'তার আয়ের নিরাপত্তা না থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো ছ'টি পেন্স সঞ্চয়ের কথাও ভাবেননি।'

পামারের অর্থনৈতিক অবস্থা জন যে রকম ভেবেছিল বাস্তবে তার চাইতেও অনেক শোচনীয় ছিল। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, জেনারেল তার ঋণ ও দায়দায়িত্ব পরিশোধে সক্ষম হবেন না এবং এ সময়ে তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসকে লিখেন, 'আমি নিজেকেই দায়ী করি যে, পরিবারের নিরাপদ জীবনযাত্রার বিষয়কে অবহেলা করে এসেছি এবং বার্ধক্যের কথাও ভাবিনি।' এটি স্বাভাবিক কারণেই তার পরিবারকেও দুশ্চিন্তার মাঝে ফেলেছিল এবং অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল ও তার স্ত্রী তাদের দরবারি জীবনযাত্রা পাল্টাতে রাজি না হওয়ায় তাদের উদ্বেগ আরও বেড়ে চলেছিল। ফায়জির জ্যেষ্ঠ পুত্র উইলিয়াম মায়ের বার্ধক্যের প্রয়োজনের কথা ভেবে কিছু অর্থ সঞ্চয় করতেন। ফায়জি যেহেতু জেনারেলের চাইতে বয়সে বিশ বছরের ছোট, অতএব স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তার পিতার মৃত্যু হবে আগে। তাছাড়া তার পিতার পক্ষে সঞ্চয় করার মতো অবস্থা হবে না। উইলিয়ামের সৎ ভাই জনও এতে সায় দেন। হায়দারাবাদের থেকে একটু বিচ্ছিন্ন জন পামারের লাল বাজারস্থ বিশাল বাড়িতে অবস্থান করেও ফায়জি এবং জেনারেল নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে যেতেন খায়রুন্নিসার সাথে, যদিও রাসেল তার ভাইকে লিখেছেন যে, 'ফায়জি তার ওপর একটু ক্ষেপে ছিলেন হায়দারাবাদে তার পুত্রের কাছ থেকে একটি প্যাকেট আনতে ভুলে যাওয়ায়। আমার মনে আছে, উইলিয়াম আমাকে বলেছিল আমার কাছে কিছু উপহার বা ওই ধরনের কিছু দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর পাইনি, হয়তো সে আমার কাছে পাঠাতে ভুলে গেছে।'

খায়রুন্নিসার সাথে আরেকজন নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে আসত উইলিয়ামের সুন্দরী কন্যা ইসাবেলা বুলার, যার বাড়িতে গত বছর জেমসের মৃত্যু হয়েছে। ইসাবেলা প্রথম সন্তান ধারণ করেছে এবং গর্ভের শেষ দিক চলছে। ইসাবেলা ও খায়রুন্নিসার মধ্যে শিগ্‌গিরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। খায়রুন্নিসা তাকে কিছু চমৎকার দেশিয় পোশাক দেন। তিনি হায়দারাবাদে তার নানির কাছে রেখে আসা পাঁচটি দামি স্যুট ইসাবেলাকে দেয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কারণ, কলকাতায় পোশাক তৈরির ব্যয় অনেক বেশি।

খায়রুন্নিসার একান্ত সচিবের ভূমিকায় নিজেকে স্বীকার করে রাসেল তার ভাইয়ের কাছে সুনির্দিষ্ট কিছু জিনিস পাঠাতে নির্দেশ দেন, 'বন্ধ চিঠিতে বৃদ্ধা

BanglaBook.org

মহিলাকে বলা হয়েছে যে বেগম কোন জিনিসগুলো পাঠাতে বলেছেন। সেগুলো ভালোভাবে প্যাকেট করে অবিলম্বে পাঠাতে হবে, তাই তিনি চান। তুমি নিজেই যদি সেই বৃদ্ধ বালিকার (দুরদানা বেগম) কাছে এটি দাও এবং তিনি যাতে তার কন্যার ইচ্ছা পূরণের বিলম্ব করার সুযোগ না পান, কারণ সমুদ্রপথে পাঠানোর মৌসুম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জিনিসগুলো যাতে ভালোভাবে প্যাকেট করা হয় সেদিকেও খেয়াল রেখ। বেগমের ব্যবস্থা যদি তোমার মনমতো না হয় তাহলে কাপড়গুলো যাতে স্যাঁতস্যাঁতে না হয়ে পড়ে সেজন্যে প্রয়োজনে আমার হিসাব থেকে খরচ করতে পারো। কারণ, সমুদ্রপথে পোশাকের রূপালি কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। সেগুলো পাওয়া মাত্র মসলিমপতমে কোম্পানির এজেন্ট আলেকজান্ডারের কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং প্রথম যে জাহাজটি কলকাতার উদ্দেশে ছাড়বে তাতে আমার নামে পাঠানো নিশ্চিত করবে।'

এ ধরনের আরও বহু চাহিদা দিয়েছেন খায়রুন্নিসা এবং তা পূরণ করা হয়েছে। এক সপ্তাহ পর ইসাবেলা বুলার একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। হেনরি রাসেল হায়দারাবাদে চার্লসকে লিখেন দুই সেট চুড়ি পাঠানোর জন্যে, এক সেট মিসেস বুলারের জন্যে, অন্যটি ইসাবেলার কন্যার জন্যে।

রাসেলের চিঠিগুলো থেকে ফায়জি, ইসাবেলা ও খায়রুন্নিসার মধ্যে এবং খায়রুন্নিসা, তার মা ও নানির মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনের বিষয় জানা যায়। কলকাতা থেকে দুই বেগম নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন হায়দারাবাদে দুরদানা বেগমের সাথে এবং তার কাছে ছোটখাটো গৃহস্থালির জিনিসপত্রের জন্যেও অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। রাসেল ও তার ভাই চার্লস হায়দারাবাদ ও কলকাতার মধ্যে এসব চিঠি ও জিনিসপত্র চালাচালি করছিলেন। খায়রুন্নিসার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছু চিঠির আদান প্রদান হয় এবং হেনরি রাসেল স্পষ্ট করতে সক্ষম হন যে, আসলে কিছুই হয়নি।

রাসেল ও খায়রুন্নিসাকে মৃত্যুর গুজব দূর করার জন্যে আলোচনা করে একটি চিঠি লিখতে হয়েছে যে, দুরদানা বেগমের কন্যা ও নাতনি তাদের জীবনের সবচেয়ে ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে দিন কাটাচ্ছে এবং মৌসুমও অত্যন্ত অনুকূল। চিঠিপত্রের মধ্যে খায়রুন্নিসাকে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে মনে হয়। কারণ, চিঠিগুলো সবই লেখা হচ্ছিল খায়রুন্নিসার পক্ষে এবং তিনিই হায়দারাবাদ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্রের বায়না পাঠাচ্ছিলেন। খায়রুন্নিসা ক্ষমতাহীন একজন সাবেক রক্ষিতা, এমন ধারণা করার কোনো কারণ নেই। তিনি সুন্দরী মোগল অভিজাত রমণীদের মর্যাদার পর্যায়ভুক্ত, যার ফরমায়েশ অনুসারে কাজ করতে দুজন পদস্থ ব্রিটিশ অফিসার ব্যস্ত ছিলেন। বৈধব্য সত্ত্বেও তিনি তার প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, যারা তার সাথে ছিলেন তাদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছেন। হেনরি রাসেল তার নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার পাশাপাশি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তার মায়ের চাইতে

তার অনুরোধ রক্ষায় যত্নশীল ছিলেন। কখনো কখনো রাসেলের প্রতি খায়রুন্নিসার ব্যবহারে মনে হতে পারে যে, তিনি তার সহকারী, তার প্রতিটি চাহিদার খুটিনাটি বলে দিচ্ছেন এবং রাসেল কোনো দ্বিধা না করে হায়দারাবাদ রেসিডেন্সিতে সবকিছু বিস্তারিত জানাচ্ছেন। এমনকি জামার প্যাটার্ন, কোথায় কার কাছে পাওয়া যাবে, কতটুকু কাপড় সংগ্রহ করতে হবে সবকিছু।

সকল যুগে, সব পরিবারে বড় ভাইয়েরা ছোট ভাইদের ওপর সশ্রদ্ধ প্রভাব খাটায় এমন অবস্থা বিরল হলেও খুব কম সংখ্যক ছোট ভাই চার্লস রাসেলের মতো পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। চার্লস হায়দারাবাদ রেসিডেন্সির সহকারী সচিব এবং মোটামুটি মর্যাদাসম্পন্ন সিনিয়র কূটনীতিক। তবু তিনি তার পেশাদারী কাজের মধ্যে দুই বেগম ও রেসিডেন্সির মধ্যে এবং ইরানি গলিতে দুরদানা বেগমের সাথে, পুরনো শহরের কাপড়ের পট্টিতে এবং অন্য কোনো জিনিস যেমন খায়রুন্নিসা কলকাতায় যাওয়ার সময় তার পানের বাটা ফেলে গিয়েছেন, সেসব সংগ্রহ করতে তাকে ঘুরতে হয়েছে।

কিন্তু অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার যে, মহিলাদের এই চিঠিগুলোর মধ্যে কখনো বকর আলী খান, খায়রুন্নিসার ভাই ও মামাদের কোনো প্রসঙ্গ থাকত না। খায়রুন্নিসা তাদের কাছে পৃথকভাবে লিখেছেন এমন দৃষ্টান্তও নেই। অতএব শক্তিশালী বন্ধন শুধু মহিলাদের মধ্যেই ছিল—অবশ্য এমনও হতে পারে যে, বকর আলী খান ও পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিল তারা জেদী ও নিয়ন্ত্রণে রাখার অযোগ্য মহিলা বলে।

কিন্তু ক্রমবর্ধমানভাবে এবং সম্ভবত অনিবার্যভাবেই আরেকটি বন্ধনের কথা ছড়িয়ে পড়ছিল—রাসেল ও খায়রুন্নিসার মধ্যে সম্পর্ক। খায়রুন্নিসা ইতোমধ্যে আঠারো মাস শোক পালন করেছেন। তিনি তার সন্তানদের হারিয়েছেন—এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি যে, উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক তাদেরকে তাদের মায়ের কাছে লিখতে উৎসাহিত করেছেন। যদিও ধারণা করা হয় যে, তারা উইলিয়ামের কন্যা ইসাবেলা বুলারের কাছ থেকে মায়ের খবর জানতে পারছে এবং তিনি তার স্বামীকে হারিয়েছেন। জেমসের সাথে তার প্রেমঘটিত কেলেংকারি এবং এ কারণে মীর আলমকে যে অপমানজনক পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে খায়রুন্নিসা মীর আলমের প্রতিহিংসার শিকার হতে পারেন এবং তিনি এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত। তদুপরি তার বয়স মাত্র বিশ বছর এবং এখনও অপূর্ব সুন্দরী হিসেবে বিবেচিত। ইসলামে বিধবাদের বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত স্বামীর ভাইকে আদর্শ দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জেমসের দুই ভাই এখন ইংল্যান্ডে, তাদের পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকারীর জন্যে বোধহয় সামান্য প্ররোচনা প্রয়োজন যাতে তিনি বেচারি খায়রুন্নিসার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হতে উদ্যোগী হন।

BanglaBook.org

শুরু থেকেই, এমনকি কলকাতায় আসার আগেই হেনরি রাসেল সবসময় খায়রুন্নিসার প্রতি বিনম্র ও দুর্বল ছিলেন।

কলকাতায় যাওয়ার পথে চার্লসকে লিখিত চিঠিতে হেনরি তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, ডাক্তার ওরে এবং অন্যরা জেমস কার্কপ্যাট্রিকের উইলের বাস্তবায়ন করতে কমিশন ভাগাভাগি করতে পারেন, যার ফলে খায়রুন্নিসা তার পুরো পাওনা থেকে বঞ্চিত হবেন। সেজন্যে তিনি সিদ্ধান্ত নেন তার কমিশন দাবি করে সোজা খায়রুন্নিসার কাছে অর্পণ করবেন—খায়রুন্নিসার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে এবং তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে।

হেনরি রাসেল হায়দারাবাদের নতুন দিওয়ান রাজা চান্দুপালকে ধরে খায়রুন্নিসার জাগির থেকে পাওনা বাবদ সমুদয় অর্থ আদায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের তহবিল থেকে জেমসের উইলে উল্লিখিত হিসসা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন, যাতে তিনি আর্থিক সংকটে পতিত না হন।

খায়রুন্নিসা রাসেলের সামনে বিনা পর্দায় উপস্থিত হচ্ছেন, এই খবরের অর্থ ছিল তারা দুজনই দুজনের ঘনিষ্ঠ হতে চলেছেন। জুলাই মাসের মধ্যে তারা ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। জুলাই-এর মাঝামাঝি হায়দারাবাদ থেকে হেনরির কাছে একটি চিঠি আসে, যাতে উল্লেখ করা হয় যে, তার হায়দারাবাদি রক্ষিতা, যার গর্ভে তার একটি সন্তানের জন্ম হয়েছে, সে আবার গর্ভধারণ করেছে। এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, গর্ভস্থ সন্তানের পিতা হেনরি নয়, অন্য কেউ। তবুও তিনি চার্লসের চিঠির শীতল উত্তর দেন, 'মেয়েটির ব্যাপারে তুমি যা লিখেছো, তাতে আমি দুঃখ পেয়েছি। সে গর্ভধারণ করেছে, এ খবরে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। আমার ওপর তার খুব বেশি দাবি নেই, কিন্তু বেগম তার জন্যে আন্তরিকতা অনুভব করতেন এবং তার অনুরোধে আমার কাছ থেকে মাসে ত্রিশ রুপি তুমি ভবিষ্যতে তাকে দিলে আমি তোমার কাছে আরও কৃতজ্ঞ থাকব। তাছাড়া তাকে বলবে বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে এবং আমার কাছেও। সে ইতোমধ্যে যে আচরণ করেছে, ভবিষ্যতে তার চাইতে ভাল আচরণ করতে বলবে।'

রাসেল তার চিঠিতে উল্লেখ না করলেও খায়রুন্নিসা যে তার সন্তানদের অনুপস্থিতি অনুভব করছিলেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সাহিব আলম ও সাহিব বেগমকে তার কাছে নিয়ে আসার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। রাসেল চার্লসকে যেসব চিঠি লিখতেন তা পাঠ করে যদি বেগমের সাথে তার ভাইয়ের গড়ে উঠা সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ হয়েও থাকে, তাহলেও তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। নভেম্বর মাসে উত্তর ভারতে যখন শীত জেঁকে বসেছিল, তখন হেনরি জানান যে, তিনি হায়দারাবাদে ফিরে আসছেন আবার তার চাকরিতে যোগ দিতে। তিনি লিখেন, 'কলকাতায় অবস্থান করে তার ধারণা হয়েছে 'কর্নওয়ালিসের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত ভারপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেল স্যার জর্জ বার্লো তার

BanglaBook.org

কাছে বিশ্বের সবচাইতে অপছন্দনীয় লোক। হায়দারাবাদে রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন সিডেনহ্যাম বাজে এবং তরুণ। তিনি তার পদ আঁকড়ে রাখতেই চেষ্টা করবেন। বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে, বর্তমানের প্রশ্ন নিষ্পত্তির আগে মৃত্যুর আশংকাকে হিসাব থেকে বাদ দেয়া উচিত নয়।'

মন পরিবর্তন করার একটি কারণ প্রদর্শন করলেও সম্ভব এর পেছনে খায়রুন্নিসার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে গভীর কোনো ইঙ্গিত ছিল। এক চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, 'বেগম কর্নেলের কবরে জিয়ারত সম্পন্ন করে যে পরিবেশে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু পরিবৃত্ত হয়ে থাকতে পছন্দ করেন তার অনুপস্থিতিতে বিষণ্ন হয়ে পড়ায় আনন্দের সাথে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আমার নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুযোগ নিয়ে হায়দারাবাদে ফিরে আসতে। আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান এবং বেচারি কর্নেলের মৃত্যুর পর নিরাপত্তা ও সহায়তার জন্যে আমার ওপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায়, তিনি চান, তার পরিবারের বাড়িটি ছাড়াও আমার কাছাকাছি একটি বাড়িতে থাকতে।

সে কারণে আমি তার জন্যে মুনশি আজিজ উল্লাহ'র শাদিখানা' ক্রয় করেছি, যেটি তিনি তার ভাতিজা ইব্রাহিমকে দিয়েছিলেন হায়দারাবাদ ত্যাগ করার আগে। এছাড়া ভৃত্যদের জন্যে ও অন্যান্য প্রয়োজনে বড় কারখানার পাশে 'বাওরাহাখান', ' মোভিগখানা'ও ক্রয় করেছি। আমার ধারণা সেগুলোর কোনো কোনটিতে সিডেনহ্যামের মুনশি ও তার বন্ধুরা বসবাস করছে। তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, তাদের অসুবিধা ঘটানোর জন্যে আমি দুঃখিত। তবু তারা আমার হাযদারাবাদ পৌঁছার ক'দিন পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে পারে। অবশ্যই তার আগে বাড়িগুলো পরিচ্ছন্ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করানোর কাজ তারাই করে দেবে।'

অত্যন্ত কৌশলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, খায়রুন্নিসা হায়দারাবাদে ফিরে রাসেলের বাংলোর পাশেই থাকবেন। রাসেল ব্যাখ্যা করেছেন, মীর আলমের ওজারতির সময়ে খায়রুন্নিসা তার সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত। জেমসের সাথে তার সম্পর্কের জের ধরেই ছয় বছর আগে মীর আলমকে যে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল তার প্রতিশোধ নিয়েছেন আরিস্তু জাহের বিধবা স্ত্রী ও তার মিত্রদের সাথে কঠোর আচরণের মাধ্যমে। খায়রুন্নিসার উৎকণ্ঠিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, জেমসের মৃত্যুতে মীর আলমের প্রতিশোধ স্পৃহা তার ওপরও পড়তে পারে। আরিস্তু জাহ তার বিয়ের সময় যে সম্পত্তি দিয়েছিলেন তা মীর আলম দখল করে নিয়ে থাকতে পারে। সে কারণে তিনি হয়তো রাসেলকেও অনুরোধ জানিয়েছেন রেসিডেন্ট হিসেবে সিডেনহ্যাম যাতে তার সম্পত্তি ও আয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রভাব খাটান সে ব্যবস্থা করতে। সিডেনহ্যাম এতে সম্মত হন। রাসেল চার্লসকে লিখেন, 'আমি বেগমকে তোমার চিঠির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জানিয়েছি যে, ক্যাপ্টেন সিডেনহ্যাম

তার জাগির ও সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার অনুগ্রহে তিনি আমার চেয়ে খুশি এবং তোমার মাধ্যমে তার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তুমি সিডেনহ্যামকে জানাবে যে, তিনি তার অনুগ্রহের অবমাননা করবেন না। তার জাগির নিজাম বাজেয়াপ্ত করবেন, এ ভয় তিনি আর করেন না এবং সেগুলো দখলের চেষ্টায় তিনি সিডেনহ্যামের হস্তক্ষেপ কামনা করবেন...।'

চিঠির উত্তর আসতে বিলম্ব হয়নি। রাসেল তার চিঠিতে সতর্কভাবে শব্দ প্রয়োগ করলেও হায়দারাবাদে কেউ, অন্তত সিডেনহ্যামের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, রাসেল বেগমকে যে 'নিরাপত্তা' দিচ্ছেন তার প্রকৃতি কেমন। অথবা রাসেলের বাংলোর এতো কাছে খায়রুন্নিসার 'জেনানা' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সন্দেহ ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই সিডেনহ্যামের সন্দেহ যথার্থ প্রমাণিত হলো, যদিও ব্যাপারটি খোলামেলা স্বীকার করার মতো অবস্থা হয়েছে বলে রাসেল মনে করছিলেন না যে, জেমসের মৃত্যুর পর কলকাতায় তাদের ঘনিষ্ঠতা বাস্তবে তাদেরকে প্রেমিক প্রেমিকায় পরিণত করেছে।

তিন সপ্তাহ পর যখন সিডেনহ্যামের উত্তর পৌঁছল তখনো রাসেল কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেননি এবং স্থলপথে হায়দারাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সিডেনহ্যামের চিঠির বিষয়বস্তু তাকে খুব বিস্মিত করেনি, কিন্তু রাসেল ও খায়রুন্নিসা উভয়েই হতাশ হয়েছিলেন। সিডেনহ্যাম লিখেছেন যে, বেগমের রেসিডেন্সিতে ফিরে আসার ব্যাপারে তার গুরুতর আপত্তি রয়েছে। কারণ এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, রংমহল দখল করে নেওয়ার পর এবং তিনি যে বিলাসিতা ও জাঁকজমকের মধ্যে বসবাসে অভ্যস্ত ছিলেন তার প্রেক্ষিতে রাসেলের পরিকল্পনা সন্তোষজনক প্রমাণিত হবে না। সাবেক বিলাসিতার স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফিরবে। তার কাছে পদাবনতির মতো মনে হবে। সিডেনহ্যাম লিখেন, 'একই সাথে আমি তাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, তিনি যদি হায়দারাবাদে ফিরে আসতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে থাকেন তাহলে আমি তাকে ব্রিটিশ রেসিডেন্সির নিরাপত্তাধীনে বিবেচনা করে আমার ক্ষমতা বলে সকল মনোযোগ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব। কোনো অসুবিধা ও বিপদ থেকে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি আমার সহযোগিতা ও সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারবেন। মীর আলম ও তার পরিবারের পক্ষ থেকেও যদি তার কোনো আশ্বাসের প্রয়োজন পড়ে, সেটাও আমি সংগ্রহ করে দেব। শুধু তাকে বলতে হবে, আমি কিভাবে তার কাজে লাগতে পারি।'

এই আশ্বাস খায়রুন্নিসার জন্যে বিরাট স্বস্তির ব্যাপার ছিল। চিঠির বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে সিডেনহ্যাম গভর্নর জেনারেল ও মীর আলমকে জানিয়ে থাকবেন। এই পর্যায়ে খায়রুন্নিসার প্রেমের জীবনে আবার আলো জ্বলে ওঠে এবং আরেকটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারীর সূচনা হয়।

BanglaBook.org

স্যার জর্জ বার্লো প্রথমে সাড়া দেন। রাসেলের কাছে তার চিঠি হারিয়ে গেলেও এটা স্পষ্ট যে, নতুন পরিস্থিতির উদ্ভবে তিনি তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। খায়রুন্নিসাকে নিয়ে আবার হায়দারাবাদ ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে কিনা। তিনি খায়রুন্নিসাকে হায়দারাবাদে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত করারও উদ্যোগ নেন। সিডেনহ্যামের কাছে এক চিঠিতে তিনি সম্প্রতি ভ্যালোরে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় মহিলা ও ইউরোপীয় অফিসারদের সাথে জড়িত ব্যাপার ছিল। বেগমের পদমর্যাদাসম্পন্ন জেমসের বিধবা স্ত্রীর সাথে রাসেলের সম্পর্ক নিয়েও তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে বলে তিনি আশংকা ব্যক্ত করেন। এ ধারণা অমূলক হলেও খায়রুন্নিসার কলকাতা ত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হলো।

বেপরোয়া হেনরি রাসেল গভর্নমেন্ট হাউজে গিয়ে জর্জ বার্লোর একান্ত সচিব নীল এডমনষ্টোনের কাছে বেগমের পক্ষে দেনদরবার করেন। এডমনষ্টোন ফারসিতে দক্ষ এবং স্বয়ং এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের কর্তা। বেগমকে কলকাতায় আটকে রাখলে তার জন্যে কি শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে রাসেল সে বিষয়ে আলোকপাত করেন, যার ফলে ভবিষ্যতে তার পক্ষে কোনদিন আর পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। এসব যুক্তির সামান্যই প্রভাব পড়েছিল এডমনষ্টোনের ওপর। রাসেল তার ভাইকে লিখেন, 'সবকিছু স্বীকার করেও তিনি জর্জ বার্লোর আশংকার বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেন যে, বার্লো এটিকে জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে বিবেচনা করছেন, কারো ব্যক্তিগত দুর্দশা বৃদ্ধি করতে নয়।' রাসেল নিজেকে সামলাতে না পেরে রাগের সাথে বলেন যে, খায়রুন্নিসার ওপর জর্জ বার্লোর কোনো এখতিয়ার নেই, কারণ তিনি হায়দারাবাদের নিজামের প্রজা। অতএব গভর্নর জেনারেল তাকে কলকাতায় রাখার নির্দেশ দেয়ার অবস্থায় নেই। এডমেনষ্টোন শান্তভাবে উত্তর দেন যে, তিনি গভর্নর জেনারেলের কাছে যুক্তি উপস্থাপন করবেন। ১৮০৬ সালের ক্রিসমাসের প্রাক্কালে রাসেল বার্লোর সিদ্ধান্ত জানতে পারেন এডমনষ্টোনের চিঠিতে, 'প্রিয় মহোদয়। পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা করে গভর্নর জেনারেল বেগমের হায়দারাবাদে যাওয়ার ওপর আপত্তি প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তিনি মনে করছেন যে, তিনি যাতে কোনভাবেই ব্রিটিশ সরকারের নিরাপত্তাধীনে আছেন বলে মনে না হয়। তিনি হায়দারাবাদে ফিরে গিয়ে নিজ পরিবারের নিরাপত্তাধীনে বাস করতে পারেন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত বিব্রতকর হতে পারে। ক্যাপ্টেন সিডেনহ্যামকেও এ মর্মে জানানোর জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি।'

আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত
এনবি এডমনষ্টোন

BanglaBook.org

সেই রাতেই রাসেল তার যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং সিডেনহ্যামকে লিখেন যে, তিনি অথবা বেগম তাকে এমন কোনো সমস্যায় ফেলবেন না, যা সিডেনহ্যামের কাছে বেআইনি বিবেচিত হতে পারে। তিনি আরও জানান, খায়রুন্নিসা তার মা ও নানির সাথে শান্তিতে কাটাতে চান এবং কোনো মহল থেকে বিপদের আশংকা করেন না। 'কিন্তু যদি আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তিনি আপনার কাছ থেকে কোনো নিরাপত্তা পাবেন না, তাহলে মীর আলমের পক্ষ থেকে কিছু সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা হতে পারে। সেজন্যে এ ধরনের কোনো ঘোষণার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না এবং মনে করি যে, কর্নেল কার্কপ্যাট্রিকের স্মৃতির প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও আপনার নিজস্ব অনুগ্রহই এ ব্যাপারে যথেষ্ট।

খায়রুন্নিসা ও রাসেল দুই মুনশির কাছ থেকে বিদায় নেন। দুই ভাই বেনারসে চলে যান কলকাতা ছেড়ে। পরদিন সকালে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা দুরুদুরু বক্ষে হায়দারাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু এ যাত্রা তারা কখনো শেষ করতে পারেননি।

রাসেল ও খায়রুন্নিসা তিন মাসের অধিক সময় ধরে শরফ-উন-নিসা ও তার ভৃত্যদের নিয়ে ধীরে ধীরে তাদের পরিচিতি পূর্ব দিকের ঘাট বরাবর সেগুন বন ও বঙ্গোপসাগরের সাদা ঢেউ-এর মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

হায়দারাবাদমুখী দলটির খুব তাড়া নেই, বরং পথেই যেন তারা অধিক সময় কাটাতে আগ্রহী। বরং জানুয়ারির শেষ দিকে পথিমধ্যে তাদের কাছে সিডেনহ্যামের পাঠানো একটি খবরে তাদের গতি আরও মন্থর হয়ে পড়ে। রেসিডেন্ট জর্জ বার্লোর নির্দেশ পেয়েছেন এবং দুঃখের সাথে জানিয়েছেন যে, তিনি খায়রুন্নিসার নিরাপত্তার ব্যাপারে তার প্রদত্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি তার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বেগমের হায়দারাবাদ ফিরে আসার ওপর গভর্নর জেনারেলের আপত্তি প্রত্যাহারে সফল হওয়ায় এবং সাথে যোগ করেছেন, 'এটা শুধু নীতির প্রশ্ন: বেগম কোম্পানির অধীনস্থ কোনো ভূখণ্ডে থাকতে চাইলে আমি তাতে অবশ্যই প্রাধান্য দেব, কিন্তু তাতে তিনি বেদনাহত হতে পারেন। তবুও আমি তার হায়দারাবাদে ফিরে আসার ফলে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির আশংকা করছি না, বিশেষ করে তিনি যদি তার পরিবারের নিরাপত্তাধীনে থাকেন। আমি শুনেছি যে, তার মা ও নানির বাড়ি দুটি ভালো এবং সুবিধাজক। আমি কল্পনা করতে পারি যে, তার মধ্যে একটি বেগমের জন্যে উপযুক্ত স্থান হতে পারে।' কিন্তু সিডেনহ্যাম নতুন শর্ত জুড়ে দেন, যা রাসেল ও খায়রুন্নিসাকে আরও আশাহত করে: 'আশা করি আপনি বেগমের সাথে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগে প্রস্তুত, বিশেষ করে তিনি শহরে চলে আসার পর। আমি জানি যে, মীর আলম অবশ্যই আশা করবেন, যাতে আপনি

BanglaBook.org

বেগমের সাথে সাক্ষাৎ না করেন এবং মুসলমানরা তাদের মহিলাদের সম্পর্কে যে রীতি পালন করে তা মীর আলমের আপত্তি থেকেও ধারণা করা যেতে পারে। আমি ইতোমধ্যে আপনাকে বেগমের জন্যে আপনার নিরাপত্তা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণাগুলো সম্পর্কে অবহিত করেছি। ফলে আপনার সাথে তার সাক্ষাৎ সেই সন্দেহগুলোকেই প্রবল করবে।'

চিঠির শেষদিকে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি বেগমকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে চাই এবং সেই সাথে বলতে চাই, স্যার এইচ রাসেল (হেনরির পিতা, বাংলার প্রধান বিচারপতি) অত্যন্ত বদান্যতার সাথে আমাকে তার এক কৌটা চমৎকার নস্যি দিয়েছিলেন। আপনার কি মনে হয় আপনি তার পদাংক অনুসরণ করে সে ধরনের কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন?'

এ মন্তব্য রাসেলের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ার মতো। শিগ্‌গির আরও একটি খোলামেলা চিঠি পেলেন তিনি। এটি তার পুরনো শত্রু হেমিং-এর কাছ থেকে। চিঠি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সুনির্দিষ্ট। ক্যাপ্টেন হেমিং লিখেছেন যে, তিনি মাত্র বেগমের ভাই দোস্তি আলী খানের সাথে নাশতা সারলেন এবং তিনি রাসেলকে কিছু বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জানাতে চান, 'এটি আদৌ অকারণ কৌতূহল হবে না, যদি আমি জানতে চাই যে, আপনি যেদিন এখানে পৌঁছবেন, সেদিনই বেগমের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। এমনও হতে পারে যে, আর কোনোদিন আপনাদের মাঝে সাক্ষাৎ হবে না। আমি একথা বুঝাতে চাই না যে, এ শহরে বাস করলে তার জীবনের ওপর কোনো ঝুঁকি থাকবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের মধ্যে সম্পর্ক মীর আলমকেই শুধু ক্ষিপ্ত করবে..।'

এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর রাসেল নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে, তারা হায়দারাবাদে পৌঁছা মাত্র তাদের প্রেমের সমাপ্তি ঘটবে। ফলে দুজনের গতি আরও মন্থর হয়ে যায়। একজন দ্রুতগামী ডাকহরকরা কলকাতা থেকে মসলিপতম পৌঁছতে পারে দুসপ্তাহের মধ্যে। কিন্তু রাসেল ও খায়রুন্নিসা নিলেন বারো সপ্তাহের বেশি। পৃথকভাবে জীবন কাটানোর জন্যে তাদের মধ্যে কোনো তাড়া দেখা যাচ্ছিল না।

মার্চের শেষদিকে তারা মসলিপতম অতিক্রম করেন এবং হায়দারাবাদ থেকে মাত্র এক সপ্তাহের দূরে ছিলেন, এমন এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন, যাতে বেগমের সফর সঙ্গী ও রাসেলের মুসলিম ভৃত্যরা মহররম পালন করতে পারে। তাদের তাঁবু খাটানো হয়েছে কৃষ্ণা নদীর তীরে। জরুরি বার্তাবাহক উপস্থিত হলো তাদের শিবিরে। চার্লস রাসেলের চিঠি নিয়ে এসেছে সে। এ চিঠিতেও অশুভ খবর। শেষ পর্যন্ত মীর আলমকে হেনরি কর্তৃক খায়রুন্নিসাকে নিরাপত্তা প্রদানের খবরে ক্ষুব্ধ করেছে। সিডেনহ্যামের সাথে আলোচনায় নতুন

উজির তিক্ততার সাথে বলেছেন যে, খায়রুন্নিসা তার পরিবারে জন্যে কলংক এবং হায়দারাবাদে তাকে স্বাগত জানানো হবে না। মীর যে ক্রোধ দেখিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট যে, তিনি কি বুঝাতে চান। খায়রুন্নিসার হায়দারাবাদ প্রত্যাবর্তন নিরাপদ নয়, ফিরলে তার জীবন বিপদাপন্ন হতে পারে।

এ খবরটি সবচেয়ে বাজে নিঃসন্দেহে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না। কলকাতা থেকে সিডেনহ্যামকে নিষেধ করা হয়েছে খায়রুন্নিসারকে কোনো ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করতে। তার সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ অল্প—মীর আলমের প্রতিশোধের মোকাবেলা করার ঝুঁকি নিতে হবে অথবা অন্য কোথাও বসবাস করতে হবে। রাসেল তার ভাইকে লিখলেন যে, তিনি মনে করেছেন যে, তিনি যদি বেগমকে ছেড়ে যান, তাহলে তাকে একা বসবাস করার কষ্ট স্বীকার করতে হবে এবং মীর আলমকে ঠেকাবার আর কোনো উপায় থাকবে না তার। সিডেনহ্যামও এখন তার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে বেগমকে নিরাপত্তা দিতে অক্ষম। তিনি একথাও স্বীকার করেন, 'আমি যদি তোমার ইঙ্গিত ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতাম তাহলে আমি নিজ ক্ষমতাবলে কোম্পানির ভূখণ্ডের কোনো অংশে তার বসবাসের ব্যবস্থার সুপারিশ করে তাকে রক্ষার চেষ্টা করতাম।'

বিলম্বে হলেও তিনি খায়রুন্নিসার সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারে আরও খোলামেলা না হওয়ার কারণে চার্লসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, আসলে তিনি হায়দারাবাদে এসেই ব্যাপারটি তাকে জানাতে চেয়েছিলেন।

রাসেল এবং খায়রুন্নিসা তিন সপ্তাহ তাদের শিবিরে অপেক্ষা করলেন সিদ্ধান্তহীন অবস্থায়। সিডেনহ্যাম ও চার্লসকে তিনি লিখলেন কোনো উপায় বের করা যায় কিনা তা দেখতে। কিন্তু কোনো ফল হলো না। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে চার্লস আবার লিখেন রাসেলকে। খায়রুন্নিসার সাথে তার সম্পর্কের গুজব ব্যাপক। পরিস্থিতি নৈরাশ্যজনক। মীর আলম তার মনস্থির করেছেন। খায়রুন্নিসা হায়দারাবাদে ফিরতে পারবেন না। নিজামের ভূখণ্ডের বাইরে অন্য কোথাও বাস করতে হবে তাকে।

সবচেয়ে গুরুতর ঘটনাটিই ঘটলো। মীর আলম আনুষ্ঠানিকভাবে খায়রুন্নিসার হায়দারাবাদ প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। তিনি মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন। এখন বিশ বছর বয়সে তিনি নির্বাসিত, শরণার্থী।

১৮০৭ সালের ১৪ এপ্রিল হেনরি রাসেল তার ভাইকে লিখেন তিনি ও খায়রুন্নিসা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা জানাতে, 'তোমার চিঠি আমাকে নিঃসন্দেহে করেছে যে, হায়দারাবাদে খায়রুন্নিসার জন্যে বিপদ অপেক্ষা করছে।' তিনি দুই বেগমের কাছেও চার্লসের চিঠির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার পর

BanglaBook.org

তারাও তাদের হায়দারাবাদে না ফেরার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং সবসময় কোম্পানির ভূখণ্ডে বাস করার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও 'আমার কোনো পরামর্শ ছাড়াই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপাতত মসলিপতমে বাস করার। পরে তারা সেখানে অথবা কোম্পানির ভূখণ্ডের যে কোনো স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করবেন কিংবা মীর আলমের জীবনকাল পর্যন্ত তা নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির ওপর। যা হোক, মসলিপতমে তারা নিরাপদে থাকতে পারবেন।'

রাসেল মসলিপতমে কোম্পানির দূত মেজর আলেকজান্ডারকে লিখেন, বেগমকে স্বাগত জানানোর জন্যে একটি বাড়ি ভাড়া করতে। তিনি নিজেও যে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করবেন, তাও তিনি জানান। মোটামুটি খায়রুন্নিসার আরাম আয়েশে থাকার ব্যবস্থা করে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হায়দারাবাদে ফিরে যাবেন বলেও জানিয়ে দেন। এদিকে চার্লসকেও তিনি বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেন যে, দুরদানা বেগমকে উদ্বিগ্ন না করে কিভাবে তাকে এই খবরটি দিতে হবে। সিডেনহ্যামকেও এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের কথা জানাতে বলেন।

এই পর্যায়ে আসার পর রাসেলের চিঠিতে কিছু অস্পষ্টতা ধরা পড়ে। মনে হয়, তিনিও জেমসের মতো খায়রুন্নিসার সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্যে তার চাকরির ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কিন্তু রাসেল জেমস কার্কপ্যাট্রিকের চাইতে ভিন্ন ধরনের। খায়রুন্নিসার আকর্ষণে তিনি সুস্পষ্টভাবেই বিমুগ্ধ এবং নিজেকে তার সাবেক ঊর্ধ্বতনের স্ত্রীর শয্যায় আবিষ্কার করে হয়তো কিছুটা বিস্মিতও হয়েছেন।

রাসেলের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না যে, তিনি খায়রুন্নিসার ভবিষ্যৎ ধ্বংসের জন্যে কতটা দায়ী—তিনি তার জীবনে কি কি সর্বনাশ ডেকে এনেছেন, খায়রুন্নিসার সুনাম হানি, হায়দারাবাদে প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ ও নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য করা। বরং তিনি নিজে নিজেই পরিতৃপ্তি অনুসন্ধান করেন তার কর্মকাণ্ডে। ভাইকে লিখেন, 'বেগমকে শেষ পর্যন্ত বিপদমুক্ত অবস্থা থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছি এবং নিজেকেও। এজন্যে সিডেনহ্যামের কাছে কোনো আনুকূল্য চাইতে হয়নি। আমি এখন তার কাছ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে বোধ করছি এবং আমি নিশ্চিত যে, এখন তার কোনো কিছুই আমাদের ভালোভাবে থাকায় বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। কোনকিছুর জন্যেই আর সিডেনহ্যামকে কিছু বলার প্রয়োজন পড়বে না।'

তার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট ছিল যে, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও খ্যাতির চাইতে খায়রুন্নিসার জন্যে তার উদ্বেগ কম ছিল। চার্লসের কাছে তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'আমাদের (দুই ভাইয়ের) নিজেদের স্বার্থেই আমরা যে এখতিয়ারের অধিকারী সে অনুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। সেটা হায়দারাবাদে প্রচলিত কোনো গুজব হোক অথবা কলঙ্ক লেপনকারী হোক না কেন।

এক সপ্তাহ পর রাসেল, খায়রুন্নিসা এবং তাদের সফরসঙ্গী ও ভৃত্যেরা তপ্ত, ভ্যাপসা বন্দর শহর মসলিপতমে ফিরে আসেন।

কারোমাণ্ডেল উপকূলে এক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র মসলিপতম সপ্তদশ শতাব্দীতে আন্তজার্তিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে রূপ নেয়। এর ফলে গোলকুণ্ডা রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রভাবের সেরা যুগে আন্তজার্তিক বণিকরা এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ বাজারগুলোতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিকের কেন্দ্রগুলোর একটি ছিল মসলিপতম। কিন্তু দীর্ঘদিন আগে মাদ্রাজ এবং বিশাখাপতম এর স্থান দখল করে নিয়েছে। ১৬৬১ সালে প্রথমবার মসলিপতম ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগ করার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মারাঠা হামলায় বন্দরটি আরেকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তার ওপর রাসেল ও খায়রুন্নিসার মসলিপতম পৌঁছার সাত বছর আগে ১৮০০ সালে ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে এখানে ধ্বংসের লীলা নেমে আসে।

১৮০৭ সালের মধ্যে এক কালের ব্যস্ত, সমৃদ্ধ মসলিপতম ছোট্ট, হতশ্রী স্থানে পরিণত হয়। দুর্গ ধসে পড়েছিল, একটি নতুন গির্জা নির্মিত হয়েছিল এবং ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃতেরা কবর পূর্ণ করেছিল। কিছু লোক বাস করত শহরের পশ্চিম দিকে। দক্ষিণে তিন মাইল দূরে ইংলিশ সিভিল লাইন, বন্দরের গভীর পানির জেটি ধীরে ধীরে অগভীর হয়ে যাচ্ছিল পলি জমে যাওয়ায়। বাণিজ্য বন্দরের চাইতে এটি পরিণত হয় মাছ নামানোর বন্দরে, যে কারণে স্থানীয়ভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে 'মছলি-পতনমে' অর্থাৎ মাছের শহরে। নাম থেকেই বুঝা যায় প্রতিদিন সকালে বন্দরে প্রচুর মাছ আসত এবং সমুদ্র তীরে মাছ শুকানোর কারণে চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো।

এখানকার জেলেরা নিম্ন বর্ণভুক্ত, গায়ের রং কালো, অস্পৃশ্য। ইংরেজদের সংখ্যা অল্প এবং উল্লেখ করার মতো মোগল সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি শহরের নওয়াব, জেমস ড্যালরিম্পেলের ভগ্নিপতি এ স্থান ত্যাগ করে আরও একশ মাইল দক্ষিণে মাদ্রাজে চলে গেছেন ভালো পরিবেশে বসবাস করতে। এ সময়ের এক ওলন্দাজ পর্যটক বর্ণনা করেছেন যে, মাছের দুর্গন্ধের চাইতে শহর প্রাচীরের বাইরে কিছু বদ্ধ জলাভূমি রয়েছে, যেগুলো থেকে শুকনো মৌসুমে অসহনীয় দুর্গন্ধ ভেসে আসে। মসলিপতমের উত্তাপ এত অধিক যে, কারো পক্ষে বর্ণনা পাঠ করে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। মসলিপতম কিছুতেই খায়রুন্নিসা বা তার মায়ের জন্যে পছন্দের স্থান হত না স্বাভাবিক অবস্থায়। দুই বেগমই ধারণা করেছিলেন যে, তাদের নির্বাসন কাল হবে সংক্ষিপ্ত।

মসলিপতমে পৌঁছার পর রাসেল এবং খায়রুন্নিসা কোম্পানির বয়োবৃদ্ধ দূত মেজর আলেকজান্ডারের উদ্যানে তাঁবু গাড়েন, তার দ্বিতল বাসভবনের ছায়ায়। আলেকজান্ডারের সহায়তায় রাসেল খায়রুন্নিসার জন্য একটি ভালো বাড়ি সংগ্রহের চেষ্টা করেন। নওয়াবের বাড়ি বাতিল করেন 'খুব বড়' বলে এবং মাঝারি মানের একটি বাড়ি খুঁজতে থাকেন। দ্বিতীয় দিনেই তিনি একটি বাড়ি পেয়ে যান এবং মাসের প্রথম সপ্তাহেই যাতে খায়রুন্নিসা সে বাড়িতে

BanglaBook.org

উঠতে পারেন, সেভাবে প্রস্তুতি চলতে থাকে। সকল দিক থেকে মনে হচ্ছিল, কোম্পানির ভূখণ্ডে তিনি ভালোভাবে থাকতে পারবেন।

তবুও রাসেলের মনে স্বস্তি ছিল না। কারণ মসলিপতমের সমাজ এমন ছিল না যেখানে খায়রুন্নিসার মতো মর্যাদার মহিলা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করতে পারবেন। প্রচণ্ড গরম এবং দুর্গন্ধ অসহনীয়। রাসেলও হয়তো যত শিগ্‌গির সম্ভব মসলিপতম ত্যাগ করতে চাইছিলেন। এ পরিবেশে খায়রুন্নিসা কিভাবে থাকবেন তা নিয়ে তার মাঝে অস্বস্তি ছিল।

এ অবস্থায় চার্লসের প্রতি তার মন্তব্য ছিল কঠোর ও দায়িত্বহীন। তিনি জানিয়েছেন, হায়দারাবাদে রাসেলের বিবি এক কন্যার জন্ম দিয়েছেন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এবং শিশুটি বাঁচবে বলে মনে হয় না। রাসেলের প্রতিক্রিয়া ছিল তিক্ত। তিনি মন থেকে হঠাৎ করেই তার বিবি, মরণাপন্ন শিশুকন্যা ও খায়রুন্নিসাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভাইকে বলেন তার জন্যে বই পাঠাতে। রাসেলের হৃদয়ের ওপর যেন রূপালি বরফ চাপা পড়েছে, যা সামনের মাসগুলোতে দায়িত্বহীনতা, আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে।

আরও এক সপ্তাহ পর রাসেল দৃশ্যত খায়রুন্নিসাকে বাড়িতে উঠান। পরদিন তিনি পালকিযোগে যত দ্রুত সম্ভব হায়দারাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পেছনে রেখে যান ক্রন্দনরত খায়রুন্নিসাকে। অচেনা শহরে শুধু তার মায়ের সাথে। একটি স্বপ্ন থেকে খায়রুন্নিসার মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি রাসেলকে আর কখনো দেখবেন না।

BanglaBook.org

তখন থেকে রাসেলের চিঠি দীর্ঘ আট মাস বন্ধ। খায়রুন্নিসা কীভাবে তার দিন কাটিয়েছেন সে সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিতও কোথাও নেই। কিন্তু তার অবস্থান অনুমান করা কঠিন নয়।

এরপর চিঠির সন্ধান পাওয়া ১৮০৮ সালের জানুয়ারিতে। হেনরি রাসেল দুই সপ্তাহের জন্যে মসলিপতমে ফিরে আসেন হায়দারাবাদ থেকে তার নতুন কর্মস্থল মাদ্রাজে যাওয়ার পথে। খায়রুন্নিসার আন্তরিক অভ্যর্থনায় তিনি মুগ্ধ, সন্তুষ্ট। ভাই চার্লসকে এ সম্পর্কে লিখেন যে, খায়রুন্নিসা তাকে দেখে যতটা আনন্দিত হয়েছে, তিনিও ঠিক ততোটা আনন্দিত। তার মাদ্রাজে নিয়োগ লাভের খবরেও খায়রুন্নিসা আনন্দিত। কারণ এর ফলে তাদের সাক্ষাৎ করার সুবিধা হবে। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের পুনরায় সাক্ষাতের ফলে তার মনে আমার সাথে দেখা হবে না বলে যে আশঙ্কা ছিল তা কেটে গেছে। অতএব, হায়দারাবাদ যাওয়ার সময় তার যে রকম আশঙ্কা হয়েছিল মাদ্রাজ যাওয়ার সময় তা হবে না। আমরা একত্রিত হলে যে আনন্দের সৃষ্টি হয় এখন তিনি সে ব্যাপারে আশ্বস্ত।'

এরপর তিনি দুই বেগম সম্পর্কে লিখেন, 'আমি বেগম ও তার মাকে ভালো অবস্থায় দেখি। উভয়ের স্বাস্থ্য ভালো এবং বৃদ্ধা মহিলার স্বাস্থ্য, তিনি যখন এখানে প্রথম আসেন তার চাইতে ভালো। তাদের মনের অবস্থাও ভালো। তারা প্রথম বাড়িটির চাইতে ভালো একটি বাড়িতে উঠেছেন। ওপরের তলা দখল করেছেন তারা, যেখানে তারা একান্তে থাকেন, সেখানে ভালো বাতাস পান। নিচতলায় তাদের জিনিসপত্র ভৃত্যেরা বাস করে। তারা একজন হাবিলদার প্রহরী রেখেছেন, যার সম্ভবত প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাদের মনে নিরাপত্তার বোধ থাকে সেজন্যে।'

রাসেলের চিঠিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি কেন হায়দারাবাদ ত্যাগ করেছেন। মসলিপতমে তিনি অতিরিক্ত বাহিনীর সাবেক এক বৃদ্ধ সৈনিক বন্ধুর সাথে বাস করছিলেন। তিনি তার সাথে খান এবং পরে দুর্গেও যান এবং আনন্দ ও বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করেন যে, প্রতিটি মহিলা মনোযোগী হতে আগ্রহী এবং রাসেলের জন্যে প্রীতিকর ব্যাপার ছিল যে, সেখানে তিনি কেলেংকারির পাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। হায়দারাবাদ থেকে এটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল তার জন্যে। হায়দারাবাদ শহরে ও ইংরেজদের মধ্যে সৃষ্ট গুজব তার জন্যে মর্যাদাপূর্ণ ছিল না।

খায়রুন্নিসার ব্যাপারে রাসেলের চিঠিতে প্রকাশ পায় যে, তিনি যে তখনো তার সম্পত্তি থেকে অর্থ পাচ্ছিলেন সেজন্যে তার মাঝে স্বস্তি ছিল। কিন্তু তার মনে গভীর একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি তার সন্তানদের চিত্রটি ফিরে পাবেন, যা জর্জ চিনারি কলকাতায় ধার নিয়েছিলেন। বারবার তাগিদ দেয়ার পর মনে হয়, যে, শিল্পী চিত্রটি ফিরিয়ে দিতে অনিচ্ছুক। রাসেল তার ভাই চার্লসকে লিখেন বিষয়টি তাদের পিতা প্রধান বিচারপতিকে জানাতে এবং নিজেও চিনারিকে লিখতে বসেন যে, 'বেগম চিত্রটি ফিরে পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব এবং আপনাকে এ ব্যাপারে জরুরিভাবে লিখেছেন।' খায়রুন্নিসার দুই সন্তান ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার পর তিনি তাদের আর কোনো খবরই পাননি। চিত্রটি সন্তানদের সঙ্গে একটি যোগসূত্র ছিল, তাও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

রাসেলের অন্য চিঠিগুলো বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত। শরফ-উন-নিসা বছরের সবচেয়ে শুভক্ষণ মহররমের সময় হায়দারাবাদে গিয়ে তার কন্যার পক্ষ থেকে মীর আলমের কাছে দরখাস্ত করতে চান এবং রাসেল ভাইকে লিখেন তার যাতায়াতের ব্যবস্থা করার জন্যে। শেষ পর্যায়ে তিনি চার্লসকে অনুরোধ করেন খায়রুন্নিসার সাথে যোগাযোগ রাখতে। তার ভয় হয় যে, মাদ্রাজের ইংরেজ প্রভাবিত পরিবেশে তিনি কোনো ভালো ফারসি জানা মুনশি পাবেন কিনা। কারণ খায়রুন্নিসার কাছে প্রেমপত্র লিখতে বিশ্বস্ত কাউকে প্রয়োজন। মাদ্রাজে তিনি কোনো কেলেঙ্কারিতে পড়তে চান না এবং ভাইকে লিখেন আনুকূল্য চেয়ে। তিনি যদি মাদ্রাজ থেকে চিঠি পাঠাতে না পারেন তাহলে কি

BanglaBook.org

চার্লস তার হয়ে খায়রুন্নিসাকে লিখে তার খবরগুলো জানাবে? খায়রুন্নিসাকে নিয়ে তার দুঃশ্চিন্তা। কারণ তার মা হায়দারাবাদে চলে গেলে মসলিপতমে তাকে একা কাটাতে হবে। অতএব ভাইকে তিনি বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানান নিয়মিত খায়রুন্নিসার খোঁজ নিতে।

চার্লসের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে তিনি মুনশি আজিজ উল্লাহর পুরনো সহকারী কাজীর সাহায্য নিতে পারেন, যিনি রেসিডেন্সির কাজে ফিরে গেছেন এবং রাসেলের চিঠিপত্র সম্পর্কে তার স্বচ্ছ ধারণা আছে। তিনি তাকে আরও বলেন, মাদ্রাজ থেকে তার কাছে খায়রুন্নিসার জন্যে পাঠানো চিঠি তিনি যাতে প্রথম ডাকেই মসলিপতমে পাঠিয়ে দেন।

খায়রুন্নিসার জন্যে এ এক নতুন দিক, যা আগে ছিল না। আমরা তার মানসিক শক্তি, ধৈর্য, উষ্ণতা, সৌন্দর্য দেখেছি, কিন্তু এতোটা ভঙ্গুর অবস্থায় দেখিনি। তিনি এখন বারবার আশ্বাস পেতে চান এবং এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ভালোবাসার। আবার রাসেল চলে যান এবং দুজনের ওপরই পর্দা নেমে আসে আরও তিন মাসের জন্যে।

আমরা পুনরায় যখন রাসেলের দেখা পাই তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের মাঝখানে।

১৮০৮ সালের মাদ্রাজ কলকাতয় তুলনাতার ক্ষমতা ও বাণিজ্যের বিচারে প্রাদেশিক পর্যায়ের স্থান। কিন্তু বাংলার তুলনায় অনেক বিনম্র, জাঁকজমকপূর্ণ ও পরিশীলিত। ব্রিটিশ শাস্তি অন্যান্য শহরের তুলনায় মাদ্রাজের পরিকল্পনা ভিন্ন। বিশাল এলাকা জুড়ে দুর্গ ও সেন্ট টমাস চার্চের মধ্যবর্তী এলাকায় নিচু, সাদা, উঁচু, প্রাচীন ধারার উদ্যান শোভিত অট্টালিকার সারি। কয়েক বছর পর এক পর্যটক লিখেছেন, মাদ্রাজের মূল শহরে মাত্র কিছু সংখ্যক ইংরেজ বাস করে, তাদের অধিকাংশই শহর থেকে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে। এমনকি দোকানদারও যদি পারে, তাহলে পৃথক বাংলোয় তাদের পরিবার নিয়ে থাকে। দুর্গ ঘেরা শহরের কেন্দ্রস্থলেও অনেকটা সেরকম দৃশ্যই দেখা যাবে। ত্রিশ বছর*আগে শিল্পী উইলিয়াম হোজ যখন প্রথম ফোর্ট জর্জের নিচে অবতরণ করেন তখন তিনি মাদ্রাজের দৃশ্য দেখে আলেকজান্ডারের যুগের গ্রেসিয়ান নগরীর সাথে তুলনা করেছিলেন মাদ্রাজকে। 'স্বচ্ছ, নীল মেঘমুক্ত আকাশ, শ্বেতশুভ্র অট্টালিকা, চকচকে উজ্জ্বল সৈকত এবং ঘন নীল সমুদ্রের সমন্বয় একজন ইংরেজের চোখে সম্পূর্ণ নতুন'-তিনি লিখেন।

১৮০৮ সালের মধ্যে মাদ্রাজ তার সামাজিক জীবনের জন্যে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এর মুখ্য কারণ ছিল কলকাতার চাইতে মাদ্রাজে ইউরোপীয় পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ট সংখ্যক ইউরোপীয় নারীর উপস্থিতি। গভর্নর হাউজে বিশাল এক ভোজকক্ষ ছিল, যা এত বড় যে, লর্ড ভ্যালেন্টিনা এবং তার সঙ্গী

অতিথিরা সেখানে বসে নিজেদেরকে পিগমির মতো মনে করেছেন। সেখানে ছিল মাদ্রাজ হান্টিং সোসাইটি এবং পর্বতের নিচে বার্ষিক ঘোড়দৌড় আয়োজিত হত। বেশ কিছু ভালো স্কুল, মেয়েদের জন্যে একটি সেমিনারি স্থাপন করা হয়েছিল। কিছু ভালো স্কুল, মেয়েদের জন্যে একটি সেমিনারি স্থাপন করা হয়েছিল। সেমিনারটি ছিল চিসউইক মলে মিস পিনকারটনে মডেলে, যেখানে তরুণী মেমসাহিবদের পড়ানো হত বিভিন্ন বিষয়। ক্লাসভর্তি ব্রিটিশ তরুণীরা গণিত, ইতিহাস, ভূগোলের ব্যবহার, ফারসি, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শিখতো। এমনকি শহরের মদের দোকানগুলোও তুলনামূলকভাবে ভালো জায়গায় অবস্থিত ছিল এবং নামগুলো ছিল বিখ্যাত: 'ওল্ড লন্ডন ট্যাভার্ন' এবং 'কিংস আর্মস'। সপ্তদশ শতাব্দীতে দুর্গাভ্যন্তরে নির্মিত সেন্ট মেরি চার্চের অনুপম স্থাপত্যের কাছেই ছিল বিখ্যাত ফোর্ট ট্যাভার্ন, যেখানে প্রতিদিন সকালে স্যুপ পরিবেশন করা হত এবং নৈশভোজের আয়োজন করা সম্ভব হত অল্প সময়ের নোটিশে। তাছাড়া সরবরাহ করা হত অত্যন্ত উন্নতমানের মদিরা। উইলিয়াম হিকি বর্ণিত কলকাতার পাঞ্চ হাউজের চাইতে অনেক আকর্ষণীয় ছিল মাদ্রাজের ট্যাভার্ন।

বিগত কয়েক বছর ধরে হেনরি রাসেল হায়দারাবাদের মোগল সমাজের সাথে মিশে ছিলেন। মাদ্রাজের মতো প্রেসিডেন্সি শহরে ব্যস্ত থাকার আনন্দে নিজেকে উষ্ণ করে তুলেছিলেন। তিনি বুদ্ধিদীপ্ত, সুদর্শন, বিত্তবান; সংক্ষেপে বলা যায় কাঙ্ক্ষিত কুমার। ব্যাপারটি তিনি নিজেও ভালোভাবে জানেন। মাদ্রাজে পৌঁছার পরই তিনি ছোট ভাই চার্লসকে এ ব্যাপারে জানান।

মার্চ মাসের মধ্যে হেনরি রাসেল জেমস কার্কপ্যাট্রিকের মামা ও মামির সাথে বাস করছিলেন, যাদের কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে- পেট্রির দম্পতি। পাশাপাশি তিনি হালকাভাবে নিজের একটি বাড়ির খোঁজ করছিলেন। এসময়ে তার চিঠির অধিকাংশ পূর্ণ থাকত নৈশভোজ, ঘোড়াদৌড় ও ঘোড়ার বিবরণে। তিনি লিখেন, 'মাদ্রাজ পদক অর্জন করেছেন ম্যাকডোয়েলের একটি ছোট ঘোড়া, যেটি তিনি আবদুল লতিফের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মিসেস পেট্রির সাথে তিন দিন ছাড়া প্রতি রাতে আমি বাইরে ডিনারে অংশ নিয়েছি। প্রায় প্রতিদিনই তিন থেকে চারটি ভোজের দাওয়াত থাকে। ডিনার খুবই উপাদেয় এবং উপভোগ্য।'

সামাজিক পরিমণ্ডলে রাসেল কিছু লোকের সাথে দ্রুত বন্ধুত্বের সম্পর্কে জড়িত হন এবং এক্ষেত্রে তার কিছু পছন্দ ছিল। আকস্মিকভাবেই তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে মিসেস স্যামুয়েল ড্যালরিম্পেলের, যিনি কলকাতার উদ্দেশে জেমসের শেষ নৌযাত্রায় তার সাথে ছিলেন। যত দিন যেতে তাকে ততো তিনি পার্টি ও নাচের অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে তিনি চার্লসকে লিখেন যে, তিনি এর চাইতে কখনো বেশি সুখী ছিলেন না,

অথবা তার প্রতি কেউ কখনো এতোটা মনোযোগ দেয়নি। তিনি লিখেন, 'আমি মাদ্রাজে এসে অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমি যত এখানকার সমাজ ও লোকজন দেখছি তাদের ততো ভালো লাগছে..। আমি যে বাংলায় বিষণ্ন, নীরব রাজনীতিবিদ ছিলাম, অনেকের কাছে তার চাইতে অনেক বদলে গেছি। এখানে আমি নাচি, মদ পান করি, হাসি, রসিকতা করি.. ।'

তিনি অব্যশই ভাইকে একথাও লিখেন যে, আনন্দে থাকার অর্থ এই নয় যে, তিনি প্রেমের পথ ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তার প্রেম ছিল নির্ধারিত এবং সেখান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রেমের ক্ষেত্রে তার মনপ্রাণ জুড়ে ছিল খায়রুন্নিসা।

হেনরি রাসেল এবং খায়রুন্নিসার বিচ্ছেদের পর খায়রুন্নিসা খুব ঘন ঘন চিঠি পাচ্ছিলেন না। প্রতিটি মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে মসলিপতমে রাসেলের চিঠি অনিয়মিত হয়ে আসছিল। শিগ্‌গির খায়রুন্নিসার পক্ষ থেকে তাকে অবহেলার অভিযোগ উঠল এবং রাসেল তা পাশ কাটাতে চেষ্টা করছেন। এজন্যে তিনি তার ভাই ও 'শরফ-উন-নিসাকে' দোষারোপ করেন। কারণ তিনি চার্লসকে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে চিঠি পাচ্ছি তাতে তিনি আমার নীরবতা ও তাকে ভুলে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন। তিনি জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে, এটা অসম্ভব ব্যাপার। একথা বলে তিনি আমাকে শুধু ব্যথাই দিচ্ছেন।'

তিনি আরও লিখেন যে, খায়রুন্নিসা তার মায়ের সাথে হায়দারাবাদে চলে যাওয়ার কারণে নিঃসঙ্গ এবং চার্লসের উচিত শরফ-উন-নিসাকে বলা যাতে তিনি শিগ্‌গির মসলিপতমে মেয়ের কাছে চলে আসেন। 'তিনি আমাকে বলেছিলেন, মাত্র একমাস হায়দারাবাদে অবস্থান করবেন। তাকে তোমার বলা উচিত এপ্রিলের শুরুতে হায়দারাবাদ ত্যাগ করার জন্যে। কোনো কারণেই তিনি যাতে এরপরও সেখানে না থাকেন, তুমি সেই অনুমতি দেবে না এবং তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেও না।'

BanglaBook.org

কিন্তু তা সত্ত্বেও অবস্থা দৃষ্টে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, খায়রুন্নিসা রাসেলের ভুবনের কেন্দ্রস্থল থেকে সরে পড়তে শুরু করেছিলেন। এটা শুধু রাসেলের অনিয়মিত চিঠির কারণে নয়, অন্য ব্যাপারও ছিল। চার্লস তার ভাইকে বকর আলী খানের সম্পত্তি দখল সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবহিত করেন, সম্ভবত বকর আলীর মৃত্যুর পর মীর আলম এই উদ্যোগ নেন। হেনরি রাসেল চার্লসকে পরামর্শ দেন এই দ্বন্দ্বে জড়িত না হতে। খায়রুন্নিসার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে শরফ-উন-নিসা ব্যর্থ হওয়ার পর চার্লস ও শরফ-উন-নিসা তাকে লিখলে উপযুক্ত সহানুভূতিও জানাতে পারেননি রাসেল। মা ও মেয়ের জন্যে এটি ছিল চরম ও হৃদয়বিদারক এক পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্বেগই যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু রাসেল এটা অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করেছেন।

শরফ-উন-নিসা মসলিপতমের উদ্দেশে রওয়ানা হলে রাসেল লিখেন, 'আমি জেনে আনন্দিত যে, শরফ-উন-নিসা মসলিপতমে গেছেন। তার প্রতি লোকটির (মীর আলম) আচরণ অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। অতএব এ নিয়ে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এর ফলে বেগমের মসলিপতমের অবস্থানই নিশ্চিত হবে। আমার মনে হয় মীর বরাবর যে আচরণ করে এসেছেন বেগমের ক্ষেত্রে তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।'

এরপর রাসেল ফিরে যান মাদ্রাজের সামাজিক জীবনের বিবরণে। পার্টির বিবরণের সাথে একটি চরিত্র চিঠিপত্রে খায়রুন্নিসার স্থান দখল করে নিতে থাকে। বিত্তশালী অ্যাংলো-পর্তুগীজ ব্যবসায়ীর সুন্দরী কন্যা, যার নাম জেন কাসামাজোর।

জেনকে রাসেল প্রথম উল্লেখ করেন টমাস সিডেনহ্যামের ছোটভাই জর্জের বান্ধবী হিসেবে। ১৮০৮ সালের মার্চে তিনি চার্লসকে লিখেন, 'জর্জ সিডেনহ্যাম যদি হায়দারাবাদে পৌঁছে থাকেন তাহলে তাকে বলবে যে, জেন কাসামাজোর অত্যন্ত অসুস্থ। যদিও আজ কিছুটা ভালো, কিন্তু তাকে বিপদের আশঙ্কামুক্ত বলা যাবে না।'

জেন সেরে উঠলে রাসেল তাকে দেখতে যান, 'গতকাল কাসামাজোরকে দেখতে গিয়েছিলাম সে সেরে উঠায় তাকে অভিনন্দন জানাতে। তাকে খুব দুর্বল লাগছিল..আসলেও সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত তার চিকিৎসক উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন যে, কীভাবে তার রোগী রোগমুক্ত হবে।' জেন অবশেষে সুস্থ হয় এবং মার্চ মাস শেষ হয়ে এপ্রিল মাসের সূচনার পর থেকে রাসেলের চিঠির অধিকাংশ স্থান দখল করে থাকে জেন। তিনি চার্লসকে লিখেন, 'জেন অতি চমৎকার মেয়ে এবং তার পরিবার সবকিছুর বিচারে মাদ্রাজে সেরা। কিন্তু কোনো কিছুই আমার হৃদয়ে চরে বেড়াবার মতো ক্ষুরধার অস্ত্র নয়। নিজেকে কঠোরভাবে প্রহরা দিচ্ছি আমি এবং আমার ভদ্রতাকে সমানভাবে ভাগ করে দেই, যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে যে, আমি কারো প্রতি বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছি..এক রাতে আমি মিসেস ওকের সাথে নাচ উপভোগ করি, আরেক রাতে মিসেস ড্যালরিম্পেল ও জেনের সাথে নাচি। যখন মিসেস ড্যালের সাথে থাকি, তখন কেউ আমার দিকে তেমন মনোযোগ দেয় না। কিন্তু জেনের সাথে যখন কাটাই তখন বেশ কিছু কৌতূহলী দৃষ্টি দেখতে পাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে। পরদিন বেশ কিছু লোক আমার কাছে জানতে চায় যে, জেন কাসামাজোর যে সুন্দরী তা কি আমার মনে হয় না?'

বল নাচের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ছদ্মবেশ ধারণের প্রয়োজন পড়ে এবং সে কারণে রাসেল চার্লসকে লিখেন জেমস কার্কপ্যাট্রিকের মোগল আলখিল্লাগুলোর কিছু তাকে পাঠাতে। জেমস পুরনো শহরে বেগমের বাড়িতে

BanglaBook.org

সেগুলো রেখে গিয়েছিলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, রাসেল হয়তো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জেমসকে অনুসরণ করতে চলেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। সম্ভবত ভারতে ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে জেমসই সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সত্যিকার অর্থে নিজের সংস্কৃতি বর্জন করেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি ইংল্যান্ড থেকে নতুন যে সাম্রাজ্যবাদী ধারণার আমদানি করেছিলেন, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তা কোনো ব্যক্তির জন্যে ব্রিটেন থেকে ভারতে—অর্থাৎ জর্জীয় থেকে মোগলে পরিণত হতে বা খ্রিষ্টধর্ম থেকে ইসলামে রূপান্তরে সমস্যার সৃষ্টি করে। ভারত আর আপন করার অথবা রূপান্তরিত হওয়ার স্থান ছিল না, বরং পরিণত হয়েছিল বিজয়ের মাধ্যমে রূপান্তরিত করার। ভারতীয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গি, ১৮০০ সালে রাসেল কলকাতায় যা গ্রহণ করেন, তা হায়দারাবাদে জেমসের সান্নিধ্যে এসে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। জেমসের রেসিডেন্সিতে থাকাকালে প্রতিদিন মোগল পোশাক পরিধান করতেন। রাসেল সেগুলো পরতেন খোশখেয়ালে। দুই ব্যক্তিকে বিভক্তকারী সংক্ষিপ্ত মেয়াদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সীমান্ত অতিক্রমের।

বল নাচের উৎসব শেষে রাসেল লিখেন যে, প্রায় এক সপ্তাহ যাবত জেনের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু সপ্তাহের পরই দেখা হবে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাসেল ও জেনকে নিয়ে সৃষ্ট গুজব হায়দারাবাদে চার্লসের কাছে পৌঁছে এবং ভাইয়ের কাছে তিনি জানতে চান যে, আসলে গুজবের কোনো ভিত্তি আছে কিনা। হেনরি রাসেল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং গুজবের বিস্তারিত জানতে চান। তিনি জেনকে বিয়ে করার ইঙ্গিত দিয়েছেন মর্মে গুজব অস্বীকার করে বলেন যে, চার্লস যে গুজব শুনেছে তা সম্পূর্ণ অসত্য। তিনি লিখেন, 'তুমি বলছো যে, তুমি শুনেছো, যেখানে আমি ডিনারে যাই, জেন কাসামাজোর সেখানে আমন্ত্রিত হয়, যেখানে আমি নাচি, সেখানে সে আমার সাথে নাচে..আমি তোমাকে সহজে আশ্বস্ত করতে পারি যে, এসব গুজবের কোনো ভিত্তি নেই... আমার যৌন ক্ষমতা, আমার যোগাযোগ এবং পরিবেশ, পরিস্থিতির কারণে আমি কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র এবং আমি কোনো মহিলার প্রশংসা করলে লোকজন স্বাভাবিক কারণেই ধরে নেয় যে, আমি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। জেনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।'

মাত্র এক সপ্তাহ পরই রাসেলের সুর পালটে যায় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন, যা কয়েক মাস ধরে মাদ্রাজে সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল। চিঠির মাঝখানে রাসেল আকস্মিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, 'জেন! প্রিয় জেন! ওর সম্পর্কে আমি কি বলব? প্রতিদিন আমি নিজেকে আরও বিপদাপন্ন দেখতে পাচ্ছি। ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই মনে হয় যেন দ্রুত স্থায়ী বিচ্ছেদ নেমে এসেছে আমাদের মাঝে..আর উপস্থিতির সময় তার প্রভাব ও আকর্ষণ

অপ্রতিরোধ্য করে তোলে।' মাত্র আগের রাতের ঘটনা তিনি ভাইকে জানান, 'আমি এমন কিছু বলিনি, যাতে 'ভালোবাসি' শব্দটি ছিল। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার দৃষ্টি এবং আবেগকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমার চোখ ও আবেগও হয়তো কাউকে প্রতারণা করেনি। আমি আমার সঙ্গীর প্রতি অমনোযোগী হতে পারি না।..আসল সত্য হচ্ছে, আমি প্রেমে পড়েছি।'

খায়রুন্নিসার ব্যাপারে রাসেল মনস্থির করে ফেলেছেন। চার্লসকে তিনি লিখেন, 'এই প্রেমের কিছু যদি সামনে আসে তাহলে আমি তোমাকে অনুরোধ করব মসলিপতমের বিষয়টি তুমি যেভাবে পারো সামলাবে এবং সে সময় আসার আগে আমি তোমাকে পুরো ধারণা দেব। তোমাকে শুধু বেদনাদায়ক দায়িত্বটি পালন করতে হবে এক্ষেত্রে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, তুমি আমার হয়ে কাজটি করবে।'

নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক ব্যাপার হতে পারত। কিন্তু হেনরি রাসেলের জন্যে নয়। পরদিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ জেনের সাথে প্রথম সাক্ষাতের দুমাসের কম সময়ের মধ্যে রাসেল জেন কাসামাজোরকে বলেন তাকে বিয়ে করতে।

এক মাস পর ১৮০৮ সালে ২০ জুন চার্লস রাসেলকে হায়দারাবাদ থেকে রওয়ানা হতে হলো ভাইয়ের কাছ থেকে আরেকটি খবর পেয়ে। এবারের কাজের সাথে দীর্ঘ পথযাত্রা জড়িত এবং হায়দারাবাদি মহিলাদের পোশাক সংগ্রহ করে ভালোভাবে প্যাকিং করে পাঠানোর চাইতে জটিল, যে কাজে হেনরি তার ভাইকে বিগত দুই বছর যাব অব্যাহতভাবে জড়িয়ে রেখেছেন। চার্লসকে মসলিপতমে গিয়ে খায়রুন্নিসার কাছে হেনরি ও জেনের বিয়ের কথা প্রকাশ করতে হবে। খায়রুন্নিসার সাথে চার্লসের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু ভাইয়ের অনুরোধে গত জানুয়ারি মাস থেকে প্রতি তিন দিন পর পর তার সাথে যোগাযোগ করতে হয়েছে চিঠির মাধ্যমে।

চার্লস এর আগে হেনরির দীর্ঘ চিঠি পেয়েছেন, যাতে তিনি বলেছেন যে, জেন তার বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং চার্লসের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন খায়রুন্নিসা যে অবশেষে হেনরি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন এই খবরটি জানাতে। তিনি লিখেছেন, 'তোমাকে যে কাজটি করতে হবে তা বিব্রতকর এবং বেদনাদায়ক। বিব্রতকর তোমার জন্যে, আর বেদনাদায়ক আমার জন্যে। কিন্তু কাজটি প্রয়োজনীয়।' দুদিন পর ভাইয়ের চির অনুগত চার্লস মসলিপতমের উদ্দেশে রওয়ানা হন, সেখান থেকে তিনি যাবেন মাদ্রাজে তার ভাইয়ের ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে দেখতে।

মসলিপতমের পথে চার্লস, অপরদিকে মাদ্রাজে হেনরির পরিকল্পনায় অনাকঙ্ক্ষিতভাবেই বড় ধরনের একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। দশ দিন আগে ১০

BanglaBook.org

জুন জেন কাসামাজোর হেনরিকে তার বাড়িতে ডেকে তাকে বলে দিয়েছে, বিয়ে হবে না। সে কোনো কারণও দর্শায়নি। হেনরি নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন হতবাক হয়ে। কারণ, কেউ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এমন কল্পনাও তিনি করেননি। পরদিন সকালে তার মনে পড়ে যে, তার ভাই হয়তো ইতোমধ্যে মসলিপতমের পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন এমন একটি খবর নিয়ে যা খায়রুন্নিসার কাছে চরম আঘাত হিসেবে আসবে।

দ্রুত তিনি দুটি চিঠি লিখেন। একটি পাঠান হায়দারাবাদে, আরেকটি মসলিপতমে মেজর আলেকজান্ডারের কাছে, যাতে চার্লস পৌঁছামাত্র তাকে দেওয়া হয়, এমন জরুরি নির্দেশ দিয়ে। এরপর তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন, কি ঘটে তা দেখার জন্যে।

মসলিপতমে প্রেরিত জরুরি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আজই আমি তোমাকে হায়দারাবাদে একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছি, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা করে যে পরিস্থিতি কেমন আকস্মিক ও অনাকাঙ্খিতভাবে ঘটে গেছে, আমার ও জেনের মধ্যে বিয়ে ভেঙে গেছে।

সতর্কতা হিসেবে আমি আলেকজান্ডারের মাধ্যমে তোমাকে গুটিকয়েক লাইন লিখছি, যাতে মসলিপতমে পৌঁছার পরই তোমাকে দেওয়া হয়, যাতে গতকাল দীর্ঘ চিঠিতে তোমাকে যা লিখেছি সে সম্পর্কে বেগমকে কিছু বলা থেকে বিরত থাকো। অর্থাৎ আমার সম্পর্কে তাকে বলার কিছু নেই। শুধু বলতে পারো, আমি ভালো আছি, আমার সাথে মাসখানেক থাকার জন্যে আসছো এবং তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে, যাতে মনে হয় যে, যদিও আমি তাকে লিখতে পারি না, কিন্তু আগের মতোই আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নিয়ে তার কথা মনে করি।

বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমি এতোটাই বিরক্ত যে, কোনকিছু ঘটে যেতে পারে। কারণ, এ ব্যাপারে আমি বেশ মনোযোগ দিয়েছিলাম এবং সম্ভবত আমি প্রথমে যতটা ভেবেছিলাম, তার চাইতেও বেশি। বেচারি বেগমকে এসব বলা থেকে এড়ানো গেলেই ভালো, কারণ এ ধরনের কিছু জানতে পারলে তার জন্যে বেদনাদায়ক হবে, যা আমি গতকালের চিঠিতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তার ব্যাপারে এখন আমার কোনো উদ্যোগ নেওয়া অনাবশ্যক। আমার ভালোবাসায় তার সন্দেহ উদ্রেক করার প্রয়োজন নেই। আমরা যেভাবে ছিলাম, সেভাবেই সম্পর্কটি থাকুক।"

হায়দারাবাদে প্রেরিত চিঠিটি আরও দীর্ঘ, আত্মসচেতনতা ফুটে ওঠার মতো বক্তব্য ছিল তাতে। হেনরি তার ভাইয়ের কাছে স্বীকার করেন যে, কোনো মহিলার কাছে তিনি প্রত্যাখ্যাত হবেন বলে কখনো ভাবেননি। সে কারণে জেনের প্রত্যাখ্যানে তিনি হতবাক হয়েছেন। তার অহংকারে আঘাত লেগেছে। বিশেষ করে তিনি যখন মনে করেছেন যে, একজন মহিলার সাথে তিনি চিরবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তার কাছে এই প্রত্যাখ্যান এসেছিল চরম আঘাতের মতো।

BanglaBook.org

তিনি ধারণা করার চেষ্টা করেছেন যে, জেন তার মতো যুবকের প্রস্তাব কেন শেষ পর্যন্ত নাকচ করল। এ প্রসঙ্গে তিনি খায়রুন্নিসার সাথে তার সম্পর্ক কেন বিয়েতে গড়ায়নি প্রকারান্তরে তাও প্রকাশ করেন, অথচ খায়রুন্নিসা আশা করেছিলেন, হেনরি তাকে বিয়ে করবেন। হেনরি চার্লসকে তার ধারণা ব্যক্ত করেন যে, জেনের পিতা কিছুতেই হেনরির সাথে তার বিয়ে মানবে না বলে জেনে তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকতে পারে। এর কারণ জেনের দাদিমা এক মালয়ী মহিলা এবং স্যার হেনরি তার সকল সন্তানের পেশার বিকাশের সাথে জড়িত ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। তিনি তার সন্তানদের দীর্ঘদিন আগে কঠোরভাবে বলেছিলেন যে, এক চিলতে কালো দ্বারা দূষিত কারো সাথে তার সন্তানদের বিয়ে তিনি কখনো মেনে নেবেন না। হেনরি রাসেল পিতার এই সংস্কার নিয়ে উৎকণ্ঠিত ছিলেন, যার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত শক্তিশালী। অতএব খায়রুন্নিসাকে বিয়ে করার কথা পিতার কাছে প্রকাশের বিষয় তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। সে তুলনায় জেন কাসামাজোরের সাথে বিয়ে কম বিতর্কিত হত।

হায়দারাবাদে হেনরির চিঠি পৌঁছার আগেই চার্লস মসলিপতম রওয়ানা হয়ে গেছেন বেগমের কাছে ভাইয়ের বিয়ের খবর ফাঁস করতে। আলেকজান্ডারের কাছে জরুরি বার্তা যথাসময়ে পৌঁছেছিল। এক সপ্তাহ সফরের পর চার্লস চিঠিটি পাঠ করে খায়রুন্নিসার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ না করেই হায়দারাবাদের উদ্দেশে মসলিপতম ত্যাগ করেন।

কিন্তু, এটা শুধু অনিবার্য পরিণতি ধামাচাপা দেয়ার মতো ব্যাপার ছিল। পাঁচ মাস পর চার্লস একই বার্তা নিয়ে আবার মসলিপতমে ফিরে আসেন। জেন কাসামাজোর তার সিদ্ধান্ত পালটেছে। ১৮০৮ সালের ২০ অক্টোবর মাদ্রাজের সেন্ট মেরিস চার্চে সে হেনরি রাসেলকে বিয়ে করেছে। হেনরি তার ভাইকে লিখেছেন, 'প্রিয়তমা জেন আমাকে আগের চাইতে দশগুণ বেশি ভালোবাসতে বাধ্য করেছে.. ।'

খায়রুন্নিসাকে এ কাহিনি বর্ণনা করার কৌশল তিনি চার্লসকে লিখেন। তার পিতার সংস্কারের কারণেই যে তিনি এ বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছেন এ ধরনের কিছু বলা যে, এ বিয়ে না করে তার কোনো উপায় ছিল না। এর মধ্যে মিথ্যা যতই থাকুক, আঘাতকে নমনীয় করার ক্ষেত্রে সামান্য ভূমিকা ছিল এসবের। খায়রুন্নিসা ইতোমধ্যে মানসিক যাতনায় ভঙ্গুর ছিলেন। ফলে খবরটি তাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। হেনরি তার ভাইকে যত বেপরোয়াভাবেই খবরটি ফাঁস করে বলুক, কিন্তু তখনো খায়রুন্নিসার ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিল এবং তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাইকে প্রশ্ন করেছেন চিঠিতে।

কিন্তু চার্লসের উত্তরগুলোর অস্তিত্ব নেই। তবে খায়রুন্নিসার জীবনের পরবর্তী অধ্যায় থেকেই হেনরির প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট।

BanglaBook.org

চার্লস রাসেল ও বেগমের মধ্যে আলোচনার পর খায়রুন্নিসার ওপর আবার পর্দা নেমে আসে। এবার এক মাস, এক বছর, বা দুই বছরের জন্যে নয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর কোনো খবরই পাওয়া যায়নি তার। সে সময়ের মাঝে রাসেল হাজারো চিঠি লিখেছেন, কিন্তু কোনটিতে খায়রুন্নিসার উল্লেখ নেই। তিনি যেদিকে তাকিয়েছেন, কোথাও খায়রুন্নিসা ছিল না। যেন ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গেছেন খায়রুন্নিসা।

বেগমকে পরিত্যাগ করার পর হেনরি রাসেলের জীবনেও দুঃখ দুর্দশা নেমে আসে। বিয়ের ছয় বছরের পর জেন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ মারা যায়। হেনরির মন দুঃখ বিষাদে ভরে যায়। চার্লসকে তিনি লিখেন, 'তোমার বেচারি জেন, তোমার বেচারি বোন, আমার স্ত্রী, আমার আনন্দ, আমার প্রিয়তমা, আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আজ সকাল দশটায় তার মধুর, স্বর্গীয় চেতনা তার সুন্দর দেহ ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। সকল আশা, সুখ পালিয়ে গেছে। আমি তার নাড়ির শেষ কম্পন অনুভব করেছি, আমি তার নিশ্বাসের শেষ ম্লান শব্দ শুনতে পেয়েছি এবং সে আমার হাতের ওপর মারা গেছে।'

তিনি মাদ্রাজেই স্বস্তি পেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে যান এক বছরের জন্যে। অধিকাংশ সময় তার কাটে মৃত স্ত্রীর ওপর কবিতা রচনা করে এবং একটির পর একটি এপিটাফ লিখে। ১৮০৯ সালে তিনি ভারতে ফিরে এলে তাকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে পুনায় নিয়োগ করা হয়। সেখান থেকে তিনি তার দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত হায়দারাবাদে রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।

হায়দারাবাদে পৌঁছে তার প্রথম কাজ ছিল আমান উল্লাহকে বেনারস থেকে রেসিডেন্সিতে সম্মানজনক পদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রদানের জন্যে তলব। তার ভাই আজিজ উল্লাহর তখন অনেক বয়স হয়েছে এবং কাজ করতে অক্ষম। আমান উল্লাহ প্রস্তাব গ্রহণ করলেও হায়দারাবাদে আসার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মীর আলম ১৮০৯ সালের ৪ জানুয়ারি কুষ্ঠরোগে মারা যান। এই পর্যায়ে খায়রুন্নিসা ও তার মা মসলিপত্তম থেকে হায়দারাবাদে ফিরে নিজ পরিবারের সাথে জীবন শুরু করার উদ্যোগ নেন। ফায়জি পামারও এ সময়েই হায়দারাবাদে পুনরায় আগমন করেন এবং তার পুত্র উইলিয়ামের সাথে বাস করতে থাকেন এবং সম্ভবত খায়রুন্নিসার সাথেও।

দুই বেগম হায়দারাবাদে ফিরে আসার পর শরফ-উন-নিসা মাঝে মধ্যে রাসেলের চিঠিতে উপস্থিত হতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি নিজাম আলী খানের বিধবা পত্নীদের একজন পিয়ারি বেগমের একটি দরখাস্ত পান। তিনি চার্লসকে পিয়ারি বেগম সম্পর্কে লিখেন, 'বৃদ্ধা বেগমের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বান্ধবী এবং আমার উচিত হবে না তার বিরাগভাজন হওয়া।' একবার শরফ-উন-নিসা হেনরিকে একটি ভাঙা ঘড়ি এবং জেমস কার্কপ্যাট্রিকের চুলভর্তি একটি লকেট

BanglaBook.org

পাঠান। রাসেল ঘড়িটি মেরামত করেন, কিন্তু মূল্যবান লকেট হারিয়ে ফেলেন এবং বেগমকে জানান যে, তিনি যদি আরও কিছু চুল পাঠান তাহলে আরেকটি লকেট বানিয়ে নিবেন। এছাড়া শেষ পর্যন্ত হেনরি কলকাতা থেকে খায়রুন্নিসার সন্তানদের চিত্রটি ফিরে পান এবং বৃদ্ধা বেগমের কাছে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। শরফ-উন-নিসা রাসেলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করলেও তার কন্যা কখনো যোগাযোগ করেছেন—এমন কোনো ইঙ্গিত কোথাও নেই।

কিন্তু ১৮১৩ সালের গ্রীষ্মের শেষ দিকে খায়রুন্নিসা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে রাসেলের জীবনে আসেন। উপলক্ষটি ছিল এক অভিজাত স্কটিশ রমণী লেডি মেরি হুডের হায়দারাবাদ সফর। মেরি হুড সাময়িকভাবে তার ধনবান, বয়স্ক এডমিরাল স্বামীকে ছেড়ে ভারত সফরে বের হয়েছেন। এ সময়ে তিনি অনেক কূটনীতিকের হৃদয় ভেঙেছেন—মাউন্টষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোন, উইলিয়াম ফ্রেসার এবং স্বয়ং হেনরি রাসেল সকলেই কিছু পরিমাণে হলেও মেরি হুডের প্রেমে পড়েছেন, বিভিন্ন মাত্রায়। হায়দারাবাদে অবস্থানকালে মেরি রাসেলের কাছে জানতে চান যে, তিনি হায়দারাবাদের অভিজাত মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন কিনা। রাসেল খায়রুন্নিসা ও ফায়জিকে রেসিডেন্সিতে আমন্ত্রণ জানান মেরির সাথে সাক্ষাতের জন্যে। রাসেল স্বয়ং সাক্ষাতরে সময় উপস্থিত ছিলেন কিনা, খায়রুন্নিসাকে মুখোমুখি দেখেছেন কিনা সে সম্পর্কে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

লেডি হুড 'বেচারি বেগম'-এর বিষাদ, সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তায় অবাক হন এবং খায়রুন্নিসাও মেরিকে এতোটা পছন্দ করেন যে, তাকে একসেট পোশাক তৈরি করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ নিয়ে পরবর্তী তিন সপ্তাহ কিছু চিঠি চালাচালি হয়, কিন্তু কোনো চিঠিতেই খায়রুন্নিসার সাথে রাসেলের সাবেক সম্পর্কের কোনো ইঙ্গিত ছিল না। খায়রুন্নিসা যেন ডানা ভাঙা আহত প্রজাপতি এবং সময়ের ব্যবধানেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। খুব দুঃসময়ে তিনি তার হৃদয় অবারিত করেছিলেন, শুধু নিজে আচ্ছন্ন হতে, নির্যাতিত ও প্রতারিত হতে। রাসেল তাকে পরিত্যাগ করার পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু তার সৌন্দর্য ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি আর কখনো বিয়ে করেননি।

খায়রুন্নিসার সর্বশেষ লিপিবদ্ধ কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৮১৩ সালের সেপ্টেম্বরে। সাবেক প্রেমিকের কাছে তিনি একটি চিঠি পাঠান। পাঁচ বছরের মধ্যে তার প্রথম চিঠি। তাতে জানান যে, তিনি মারা যাচ্ছেন।

রাসেল আরেকবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। সম্ভবত অনুশোচনায় আহত হয়ে খায়রুন্নিসাকে রং মহলে আমন্ত্রণ জানান, যেখানে তিনি এককালে সুখে কাটিয়েছেন, সেখানে জীবনের অবসান ঘটাতে। কিন্তু ১৮১৩ সালের সেই

দিনগুলো সম্ভবত তার জন্যে বহুদূরের ছিল। আট বছর যাবত তিনি বিধবা হয়েছেন, আট বছর আগে তিনি সন্তানদের প্রথমে চুম্বন দিয়েছেন, এরপর স্বামীকে বিদায় জানিয়েছেন।

খায়রুন্নিসার অবস্থা শোচনীয়, তাকে বয়ে আনা হলো রং মহলে এবং যে শয্যা তিনি তার কন্যার জন্য দিয়েছিলেন, সেটিই হলো তার মৃত্যুশয্যা। তার শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণ স্পষ্ট নয়। তিনি শুধু শেষ পর্যায়ে প্রাচীরের দিকে ফিরে শয়ন করেন। হয়তো রেসিডেন্সকে ঘিরে স্মৃতির বন্যা বয়ে চলেছিল তার মনে। তিনি খুবই বেদনার্ত। তার রোগমুক্তির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। দুই সপ্তাহে তিনি ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হলেন, তার নাড়ি ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছিল। অবশেষে ১৮১৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি মারা গেলেন। তার বয়স হয়েছিল মাত্র সাতাশ বছর। তার পাশে শেষ পর্যন্ত তার হাত ধরে বসে ছিলেন ফায়জি পামার ও শরফ-উন-নিসা।

পরদিন সকালে শোকাহত রাসেল লেডি হুডকে খায়রুন্নিসার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে লিখেন। তিনি একথাও জানান যে, তার অসুস্থতা সম্পর্কে ডাক্তারও ধারণা করতে পারেনি। তার মা ও আত্মীয়রা সাথে ছিল মৃত্যু পরবর্তী কিছু মুসলিম রীতি পালনের জন্যে। তাকে তার পিতার কবরের পাশেই কবরস্থ করা হয়েছে।

ছয় সপ্তাহ পর রাসেল ফায়জির দুঃখের কথা বর্ণনা করেন। খায়রুন্নিসার মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে ভবনের ওপরের তলায় গুটিয়ে নিয়েছেন এবং কারো সাথে সাক্ষাৎ করছেন না। তিনি তার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু হারিয়েছেন। রাসেল মেরি হুডকে শরফ-উন-নিসা সম্পর্কেও জানান যে, তাকে সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ চিঠিতে তিনি তার প্রেমিকা ও তাদের অভিজাত্য নিয়েও লিখেন, 'ভারতে অভিজাত মহিলারা ইউরোপীয়রা যেরকম ভাবে তার চাইতে সেরা।'

জেমস কার্কপ্যাট্রিকের প্রিয়তমা স্ত্রী, হেনরি রাসেলের পরিত্যক্তা প্রেমিকা, হায়দারাবাদের অপূর্ব সুন্দরী রমণী খায়রুন্নিসা সম্পর্কে লেডি হুডের কাছে রাসেলের দেখা কথাগুলোই ছিল সর্বশেষ লিপিবদ্ধ বর্ণনা। খায়রুন্নিসা দুঃখময় এক জীবন কাটিয়েছেন, এমন এক সময় ও সমাজে যখন মহিলাদের খুব সামান্য চাহিদা ও ইচ্ছা ব্যক্ত করার উপায় ছিল। নিজেদের জীবনের ওপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। খায়রুন্নিসা সেই রীতিকে অগ্রাহ্য করেছেন, আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন এবং তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকের জন্যে সকল ঝুঁকি নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করতে সফল হয়েছেন। যদিও তার প্রেমিক ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন জাতির এবং ভিন্ন ধর্মের ছিল। তার প্রেম তার পরিবারকে খান খান করে দিয়েছে এবং তাকে, তার মা, নানি ও নানাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। কিন্তু সকল প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে তিনি তার স্বপ্ন পূরণে সফল হয়েছেন। তার স্বামী ও সন্তানরা চিরতরে তার কাছ থেকে হারিয়ে

BanglaBook.org

গেছে, তিনি বিধবা হয়েছেন। তার বৈধব্যের সময়ে তিনি প্রথমে অসম্মানিত হন, পরে বিতাড়িত ও পরিত্যক্ত হন। এই বিদ্রোহী, আবেগপ্রবণ সুন্দরী মহিলা তার শারীরিক অসুস্থতার চাইতে ভগ্ন হৃদয়, অবহেলা ও দুঃখে মৃত্যুবরণ করেন।

১৮০৫ সালে খায়রুন্নিসার সন্তানেরা ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার পর তিনি কবে সরাসরি তাদের খবর পেয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু তিনি ও তার মা যে ইংল্যাণ্ডে বেপরোয়ার মতো চিঠি লিখেছেন তার প্রমাণ আছে। তারা শিশু দুটিকে ফিরে পেতে অনুনয় বিনয় করেছেন। তাদের চিঠির কোনো উত্তর কখনো আসেনি। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, ১৮১৩ সালে তার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পর নভেম্বর মাসে একটি একটি চিঠি ও তার দুই সন্তানের ছবি হায়দারাবাদে পৌঁছে। খায়রুন্নিসার জন্যে বিলম্ব হলেও শরফ-উন-নিসার প্রতিক্রিয়া রাসেল ব্যক্ত করেছেন লেডি হুডের কাছে। 'মেয়েটি সুন্দরী, তার মায়ের মতো দেখতে। ছেলেটিও সুদর্শন এবং পিতার মতো। বৃদ্ধা মহিলা ছবি দেখে আনন্দিত। আমি বিশ্বাস করতে পারি না, প্রথম যেদিন ছবি দেখলেন, পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ছবির ওপর থেকে তিনি চোখ সরাননি। তিনি মনে করেন, তারা বড় হয়ে তাদের সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করতে আসবে।..আমি স্বীকার করছি যে, তাকে একথা বলার সাহস নেই যে, তিনি যে তাদেরকে কখনো দেখতে পাবেন, সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে।'

এখানেই কাহিনির শেষ নয়। ত্রিশ বছরের অধিক সময়ের ব্যবধানে চূড়ান্ত এবং ব্যতিক্রমী একটি দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

'লর্ড হকসবারি' জাহাজের রাউন্ড হাউজে অবস্থান নিয়ে মাদ্রাজ ত্যাগের পর সাহিব আলম ও সাহিব বেগম অথবা তাদের নতুন নাম উইলিয়াম জর্জ কার্কপ্যাট্রিক ও ক্যাথারিনকে দীর্ঘ ছয় মাস স্থলভাগের দৃষ্টির বাইরে থাকতে হয়।

এই সমুদ্রযাত্রায় তারা চারজন অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টিতে ছিল: মাতৃসুলভ মিসেস ওরে, অজ্ঞাতনামা ভারতীয় আয়া, জেমসের ব্যান্ডদলের সদস্যের বয়স্কা স্ত্রী মিসেস পেরি এবং জেমসের বিশ্বস্ত ভারতীয় পরিচারিকা, যাদেরকে দুটি শিশুই জানতো। জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ, ইকুয়েটর অতিক্রম করে উত্তরের দিকে অগ্রসর হয়।

দীর্ঘদিন ভারতে কাটিয়েছেন কোম্পানির এমন কর্মচারীদের জন্যে ইংল্যান্ডের শীতল আবহাওয়া চমকে উঠার মতো অনাকাঙ্খিত। এক দশক প্রাচ্যে কাটিয়ে এবং মাসের পর মাস স্বর্গতুল্য ব্রিটেনের আকাঙ্ক্ষা করে পৌঁছার পর অনেকে আকস্মিক শীতের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে যান। তাদের এককালের পরিচিত শহরকে মনে হয় জনহীন, পরিত্যক্ত। আর যারা ভারতের আলো, উষ্ণতা ও রঙের মাঝে বড় হয়েছে, যারা কখনো শীতের প্রচণ্ডতা অনুভব করেনি, ভারি কুয়াশার আবরণ দেখেনি, তাদের কাছে ইংল্যান্ড রীতিমতো উদ্বেগজনক।

জাহাজ নোঙর করে পোর্টসমাউথ থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে। একই জাহাজে এসেছিলেন দ্বাদশ পদাতিক রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন জর্জ এলার্স। তিনি লিখেছেন যে, বেচারি মিসেস ওরে তার নিজের সন্তান এবং জেমসের দুই সন্তান, একজন কালো লোক, কালো নার্স এবং এক ইংরেজ পরিচারিকা নিয়ে বিপদে পড়ে যান। তার সাথে দুই হাজার পাউন্ড মূল্যের চাইতে অধিক সামগ্রী ছিল, যা কাষ্টমসের কাছে বাজেয়াপ্তযোগ্য। কারণ প্রতি যাত্রী জাহাজ থেকে একটির বেশি ট্রাংক নিতে পারবে না। তিনি কাঁদতে শুরু করেন। এলার্স তাকে সান্ত্বনা দেন নিরাপদে লন্ডনে পৌঁছে দেয়ার এবং তার সম্পদ যথাসম্ভব রক্ষা করার। কিন্তু সবকিছুর দায়িত্ব তার ওপর দিতে হবে, চাবিসহ। ক্যাপ্টেন এলার্সের কাছে মাত্র বিশ গিনি ছিল লন্ডনে যাওয়ার ভাড়া হিসেবে। তিনি মিসেস ওরের কাছে জানতে চান যে, তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ আছে কিনা, কারণ তিনি কাষ্টমসের লোকদের ঘুষ দিতে চান তার ট্রাংকগুলো ছাড়িয়ে নিতে। তার কাছে অর্থের ঘাটতি ছিল না এবং যে কোনো মূল্যে তাকে সহাযতা করতে

BanglaBook.org

বলেন। এরপর এলার্স মিসেস ওরে ও তার সঙ্গীদেরকে একটি আলাদা নৌকায় উঠিয়ে পোর্টসমাউথের সৈকতে নামান। কাষ্টমসের লোকজন এসে মালপত্রসহ তাদেরকে কাষ্টম হাউজে নিয়ে যায়। কালো মোটা নার্সের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তার মোটা দেহে শাল লুকিয়ে রেখেছে বলে। ক্যাপ্টেন এলার্স কাষ্টসের লোকদের ঘুষ দিয়ে মিসেস ওরেকে মুক্ত করে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন এবং যথাসময়ে তারা সুদর্শন কর্নেলের বাড়িতে পৌছেন। শিশুদের চাচা উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক সেখানে ছিলেন। মিসেস ওরে তার গন্তব্যে চলে যান। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে দুই মুসলিম শিশুকে সেন্ট মেরি চার্চে নিয়ে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ভারতের সাথে তাদের আরেকটি সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তারা বেড়ে উঠতে থাকে সুদর্শন কর্নেলের কেন্টের কেসটনের বাড়িতে। প্রায়ই তারা এক্সটারে যেত চাচা উইলিয়াম ও তার চাচাতো ভাইবোনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু তাদের দেশীয় পরিবেশ থেকে দূরে রাখা হয়। তাদেরকে মা, নানি অথবা তাদের ভারতীয় পরিবারের কাউকে লিখতে নিষেধ করা হয়, যারা এক পর্যায়ে নিজেদেরকে পাঠিয়ে দিতে বলে করুণভাবে। বহু বছর পর মেয়েটি তার নিজের সন্তানদের বলেছে যে, সে ও তার ভাই কিভাবে তার বাবা ও মাকে স্মরণ করত এবং ইংল্যান্ডের শীত থেকে হায়দারাবাদে চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত। কিন্তু যখন শুনতো যে, তারা আর সেখানে ফিরে যেতে পারবে না, তখন বিষাদে ভেঙে পড়ত, বিশেষ করে তাদের পিতার মৃত্যুর পর ভারতে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল চিরতরে।

উইলিয়াম অসুস্থতায় অক্ষম হয়ে পড়েন। ১৮০৪ সালের মধ্যে চেয়ার তার স্থায়ী আস্তানা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যথা উপশমের জন্যে তিনি ওষুধের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন এবং প্রাচ্য বিষয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। কোম্পানির লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় তিনি সহযোগিতা করেছেন এবং নেপালের ওপর একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছেন। ক্রমে তিনি টিপু সুলতানের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। ভারত ত্যাগের আগে জেমস তার কাছে টিপুর দুর্গ দখলের পর সংগৃহীত দলিলপত্র পাঠিয়ে দেয়। এগুলো দিয়ে ১৮১১ সাল পর্যন্ত তিনি 'সিলেক্টেড লেটারস অফ টিপু সুলতান' সংকলন এবং তাতে টিপুর ব্যক্তিত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন।

হঠাৎ করে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় টিপু সুলতানের জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষার প্রতি। উইলিয়ামের চিঠির সংকলন ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আছে। তাতে দেখা যায়, জেমসের প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে গঠিত ক্লাইভের তদন্তের সময় তিনি ক্লাইভের একান্ত সচিব মার্ক উইলকসকে লিখেছেন, যিনি পরে মহীশূরের রেসিডেন্ট হন এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে মোগল অধিবিদ্যা এবং টিপুর শাসনামলের রাজনৈতিক ইতিহাসও আছে। উইলকসের কাছে লেখা চিঠিতে

BanglaBook.org

তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, টিপু তার মৃত্যুর সময় সম্পর্কে যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

১৮০৯ সালের নভেম্বরে উইলকস উইলিয়ামকে লিখেন যে, টিপুর চালুকৃত মহীশূরের নতুন বর্ষপঞ্জি অনুসারে টিপুর জন্ম 'আঙ্গিরা' বর্ষের 'মার্গেসের' মাসের সপ্তদশ দিবসে। আঙ্গিরা বর্ষ ইংরেজি ১৭৫২-৫৩ সালের মধ্যে পড়ে। উইলিয়ামের শেষ চিঠিতে তিনি টিপুকে বিপুল ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের লোক হিসেবে অংকন করেছেন, যিনি তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত। তিনি নিজেও টিপুর জ্যোতির্বিদ্যার অনুরসরণে হিসাব করতে শুরু করেন নিজের ক্ষেত্রে অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন কিনা।

১৮১২ সালের গ্রীষ্মে মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি তার এক্সটার টাউন হাউজের সকল সম্পত্তি বিক্রি করে দেন এবং ২২ আগষ্ট তিনি অতিরিক্ত মাত্রার আফিম গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স আটান্ন বছর। তিনি আসলে আত্মহত্যা করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

উইলিয়ামের আফিমের অতিরিক্ত মাত্রা সেবনের পরই আরেকটি অঘটন ঘটে। একমাস পর পরিবারটি যখন শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তখন এগারো বছর বয়স্ক সাহিব আলম বা উইলিয়াম জর্জ ফুটন্ত পানির এক পাত্রে পড়ে যায় এবং চিরজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে পড়ে। অন্তত তার একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে হয়েছিল। বৃদ্ধ সুদর্শন কর্নেল তার কম্পিত হাতে কিটিকে (ক্যাথরিন এ নামে পরিচিত) দুর্ঘটনা সম্পর্কে লিখেন। এর দ্বারা দুঃখিত দাদা ও তার দশ বছর বয়সী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নাতনির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ই প্রমাণিত হয়।

একটি মাত্র ছেলেকে জীবিত রেখে ছয় বছর পর ১৮১৮ সালে ৮৯ বছর বয়সে সুদর্শন কর্নেল মৃত্যুবরণ করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর কিটি এবং উইলিয়াম জর্জ বিভিন্ন মেয়াদে তাদের বিবাহিত চাচাতো বোনদের সাথে বাস করতে থাকেন। প্রথমে ক্লিমেনটিনার কাছে, লেডি লুইস, জুলিয়া এবং শেষে ইসাবেলা বুলারের কাছে। ইসাবেলা কলকাতা থেকে স্বামীর সাথে ইংল্যান্ডে চলে এসেছে। সে নিষ্ঠাবতী ধার্মিক। উইলিয়াম জর্জ এসময়ে কল্পনাপ্রবণ, পঙ্গু কবি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার মাঝে এবং কোলরিজের অধিবিদ্যার মধ্যে আনন্দ খোঁজে। কিন্তু পঙ্গুত্ব সত্ত্বেও সে সক্রিয় এবং সুদর্শন। বিশ বছর বয়সে সে বিয়ে করে তিন সন্তানের পিতা হয়।

১৮২০-এর দশকে উইলিয়ামের অস্তিত্ব যখন প্রায় হারিয়ে যায়, তখন কিটি হয়ে উঠে মধ্যমণি। লক্ষণীয় সৌন্দর্যের আকর্ষণীয় মহিলা হয়ে উঠেছে সে। ১৮২২ সালে কিটির বয়স যখন বিশ বছর তখন ইসাবেলা বুলারের দুই পুত্রকে পড়ানোর জন্যে নিয়োজিত নতুন শিক্ষকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়।

BanglaBook.org

তিনি বয়সে তরুণ, উদ্যোগী স্কটিশ লেখক ও দার্শনিক, কিটির চাইতে তিন বছরের বড়। তার নাম টমাস কার্লাইল। তার কলমের মাধ্যমেই কিটি হঠাৎ করেই সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

কার্লাইল এডিনবার্গে জাহাজ থেকে নেমে লন্ডনে আসেন ১৮২২ সালের বসন্তকালে। লন্ডনে তার প্রথম আগমন। বহু বছর পর তিনি তার যে স্মৃতিচারণ করেন তাতে তিনি কিটির সাথে প্রথম সাক্ষাতেই তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হওয়ার কথা স্বীকার করেন এবং তার ভারতীয় পরিচয়ের কথাও উল্লেখ করেন।

লন্ডনে আসার পর এক সপ্তাহ ধরে কার্লাইল কিটির সৌন্দর্যের প্রশংসা শোনেন। তিনি বাস করছিলেন তার শৈশবের এক বন্ধুর সাথে-এডওয়ার্ড আরভিং। কিন্তু আরভিং-এর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, নিজের বাড়ি গোছানোর সামর্থ্য নেই তার। দুজন বন্ধু তাকে পাঁচশো পাউন্ড দেয়—তাদের একজন ইসাবেলা বুলারের বোন জুলিয়া, অন্যজন কিটি। দুজনই ধার্মিক।

কয়েক মাসের মধ্যে কার্লাইল কিটিকে আরও বেশি সময় দেখতে পান এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হন তার সুমধুর কণ্ঠ, তার রসিকতার জন্যে। প্রথম সাক্ষাতের পরই কিটি তাকে আমন্ত্রণ জানায় জুলিয়ার বাড়িতে।

যদিও কার্লাইল জেন ওয়েলশ নামে এক তরুণীর সাথে গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যাকে পরবর্তীতে বিয়ে করেন; কিন্তু তরুণ দার্শনিক একটু হলেও কিটির প্রেমে পড়েন। তার বাগদত্তাকে কিটি সম্পর্কে লিখেন। সহজে ধারণা করা যায় যে, জেন কিটির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে কার্লাইলের চিঠিতে কিটির প্রশংসা পাঠ করে এবং অত্যন্ত বিরক্তি ও তিক্ততার সাথে কার্লাইলকে উত্তর দেয়, 'তোমার বর্তমান অবস্থার কারণে অভিনন্দন। তোমার চোখের সামনে এক প্রীতিদায়ক সৃষ্টি, অতএব নীল চোখের শয়তানকে বিতাড়ন করেছ। কিন্তু আগে যে সুখ পেয়েছ, তা কখনোই পাবে না। মিস কিটি কার্কপ্যাট্রিক...ঈশ্বর, কী কুৎসিত একটি নাম! আমার একটুও ঈর্ষা হচ্ছে না! তবে তুমি তার কথা আমাকে আর লিখবে না। তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? মিস কিটি কার্কপ্যাট্রিক কি তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে?'

জেনের ঈর্ষা আরও বেড়ে যায় যখন ১৮২৪ সালের শরৎকালে কিটি, কার্লাইল ও জুলিয়া দম্পত্তি প্যারিস সফরে যায়। কার্লাইলের বর্ণনা অনুসারে জুলিয়া ইচ্ছা করেই তাদের দুজনকে একত্রে ঠেলে দিয়েছে। জেন লিখে, 'প্যারিস: তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি কি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ? সেই হিন্দু রাজকন্যা (কার্লাইল ধারণা করে লিখেছেন) কি তোমার ওপর আছড় করেছে?'

দুই বছর পরও যখন কিটি কার্লাইলের জীবনে তখন জেন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে চিঠি লিখে কার্লাইলকে। কিটিকে বিদ্রুপ করে নানান ভাষায়। কারণ জেন

BanglaBook.org

জানত যে, কিটি যেহেতু একজন মহিলা এবং মর্যাদার অধিকারী এবং কার্লাইল সামান্য একজন শিক্ষক, অতএব এ সম্পর্ক না হওয়ারই সম্ভাবনা। এবং বাস্তবেও কিটির ভারতীয় রক্ত এবং কার্লাইলের পরবর্তীতে খ্যাতি অর্জন সত্ত্বেও তাকে কিটির জন্যে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয় দুজনের মধ্যে শ্রেণি ও মর্যাদাগত ব্যবধানের কারণে, যদিও তারা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সবাই যখন এ সম্পর্কের বিরুদ্ধে তখন কিটি আর কী করতে পারে। এখন যে কেউ তার স্ত্রী হিসেবে গর্বিত গতে পারে এবং তিনি তার নিচু মর্যাদার এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন।

১৮২৮ সালে ইসাবেলা বুলারের বড় ছেলে চার্লস কার্লাইলকে কিটির জীবনের এক দুঃখজনক খবর জানায়—তার প্রিয় ভাই উইলিয়াম জর্জের সাতাশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ। তার তরুণী স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে এবং কিটি তার ভাইয়ের সন্তানদের লালন পালন নিয়ে তার বোনের সাথে বিরক্তিকর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে।

এক বছর পর কিটি শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার এবং স্থিতিশীলতার সাহায্য পায়, যা সবসময় তাকে হাতছানি দিয়েছে। এবার তার জীবনে আসে স্যার জন ক্যানাওয়েয়ের ভাগ্নে সুদর্শন ক্যাপ্টেন জেমস উনসলো ফিলিপস। ১৮২৯ সালের ২১ নভেম্বর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। টমাস কার্লাইল ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ফিলিপসকে 'সিপাহীদের সাবেক অলস ক্যাপ্টেন' হিসেবে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাদের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল এবং কিটির কাছে লেখা ফিলিপসের প্রেমপত্রগুলো এখন তার উত্তরাধিকারীদের কাছে আছে।

এই বিয়ের কিছুদিন পর টমাস কার্লাইল তার বিখ্যাত উপন্যাস 'সার্টোর রিসার্টাস' (দি টেইলর রিটেইলড) লিখেন। বইটি যখন প্রকাশিত হয় এবং প্রায় চল্লিশ বছর পরও উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উপন্যাসে ভিন্ন নামে কিটি, জুলিয়া পরিবারকে তুলে আনা হয়েছে। কিটিরও কোনো সন্দেহ ছিল না যে, কার্লাইলের উপন্যাসের ব্লুমিন মানে, কিটি কার্কপ্যাট্রিক।

ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে লিখিত সবচেয়ে বিতর্কিত উপন্যাসের রোমান্টিক নায়িকা হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করার ছয় বছর পর ১৮৪১ সালের মে মাসে কিটি তার শৈশবের বন্ধু মিসেস ডালেরের বাড়িতে চা পান করছিলেন। আগে কখনো কিটি সেখানে যাননি। কিন্তু মিসেস ডালের অবাক হয়ে গেলেন, যখন কিটি বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ বাড়ির সিঁড়িতে ছত্রিশ বছর আগে তাদের ভারত ত্যাগের আগে চিনারির আঁকা তার ও তার ভাইয়ের চিত্রটি টানানো ছিল।

আসলে সেই বাড়িটি ছিল হেনরি রাসেলের, যিনি তখন স্যার হেনরি রাসেল। নামটি আবছা স্মরণ করতে পারেন কিটি। রাসেল সেদিন বাড়ি ছিলেন

না এবং রাসেলের দ্বিতীয় স্ত্রী ফরাসি মহিলা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি স্বামীর কাছ থেকে জেনে নেবেন যে, তিনি কীভাবে ছবিটি সংগ্রহ করেছেন। রাসেল পরে কিটিকে ব্যাখ্যা করেন যে ১৮১৩ সালে খায়রুন্নিসার মৃত্যুর পর তাকে দেয়া হয়েছে এবং তিনি তার উইলে ছবিটি দিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তখনই দিতে চান না এবং তার আচরণে প্রকাশ পায় যে, রেসিডেন্সি মহলে দেখা ছোট্ট মেয়েটিকে দেখার উদ্যোগ নেওয়ার ইচ্ছা তার মধ্যে নেই। তার এই এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কারণ তার পক্ষে কিটিকে কতটুকু সত্য বলা সম্ভব হত।

প্রায় বিশ বছর আগে হেনরি রাসেল ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছেন। কোম্পানির সাথে শেষ পর্যন্ত তার বনিবনা না হওয়ায় তাকে অবমাননা সহ্য করতে হয়েছে। তাকে পদচ্যুত করা হতে পারে আশঙ্কা করে তিনি ১৮২০ সালে হায়দারাবাদের রেসিডেন্টের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন নয় বছর রেসিডেন্ট থাকার পর। তিনি যখন শেষ দফা মসলিপতমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন লন্ডনে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসের কাছ থেকে তার কাছে চিঠি যাচ্ছিল যে, 'রাসেলকে অবিলম্বে হায়দারাবাদ রেসিডেন্সি থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক এবং সে যাতে আর কোনো দরবারে নিয়োজিত হতে না পারে সে ব্যবস্থাও নেওয়া হোক।'

অবিলম্বে রাসেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে কারণ ছিল নিজামের অবগতি ছাড়াই দুজন বিদ্রোহীকে হত্যা। রাসেল নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের বেত্রাঘাত করার। দুজনই পরদিন মারা যায়। এটা আসলে অজুহাত ছিল যে, রাসেল কোম্পানির জন্যে ব্রিবতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া তাকে ঘুষ গ্রহণের জন্যে সন্দেহ করা হচ্ছিল। যদিও রেসিডেন্টের চাকরি থেকে তার সঞ্চয় ছিল মাত্র ৫০০ পাউন্ড, কিন্তু ৮৫ হাজার পাউন্ডের সম্পদ ইংল্যান্ডে পাঠান।

BanglaBook.org

রাসেলের রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও হায়দারাবাদ দরবারের মধ্যে সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। হায়দারাবাদের প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও রাসেল সবসময় ব্যক্তিগতভাবে উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং কলকাতায় তার মনিবদের খুশি করার জন্যে তিনি নিজামের ওপর বেশ কিছু ক্ষতিকর চুক্তি চাপিয়ে দেন। তাকে বাধ্য করেন আরও অপ্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের জন্যে বার্ষিক চল্লিশ লাখ রুপি ব্যয় করতে, যা হায়দারাবাদের আদায়কৃত রাজস্বের প্রায় অর্ধেক। অথচ নিজাম যাদের জন্যে বেতন দিচ্ছিলেন সেই অতিরিক্ত বাহিনী থেকে কোনোভাবেই উপকৃত হচ্ছিলেন না এবং তাদের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণও ছিল না। এর ফলে হায়দারাবাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা হুমকির মধ্যে পড়েছিল।

ভাগ্যান্বেষী ফরাসি সৈনিক কাউন্ট এডওয়ার্ড ডি ওয়ারেন, যিনি রাসেলের দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্রে আত্মীয় তিনি নিজামের অধীনে কর্মরত ছিলেন। রাসেল নিজামের ওপর শুধু অন্যায় বিচার চাপিয়ে দিয়েছেন বলে ওয়ারেন মন্তব্য করেন। তিনি বিস্মিত হন যে, যাদের অর্থে ব্রিটিশরা লালিত হচ্ছিল সেই ব্রিটিশ সৈনিকরাও তাদের সাথে কঠোর আচরণ করতে থাকে। ফায়জির পুত্র উইলিয়াম পামারের আচরণে ওয়ারেন বিশেষভাবে দুঃখিত হন। কারণ রাসেলের অর্থের সিংহভাগ পামারের গোপন ও অবৈধ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালিত হতে থাকে। ১৮১৫ সালের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সবচেয়ে সফল ব্যবস্থা ছিল তাদের। রাসেলের একটি আশঙ্কা ছিল যে, তার অবৈধ আর্থিক সম্পর্ক একসময় প্রকাশ হয়ে যাবে এবং এর ফলে পামারের ব্যবসার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হবে এবং তিনি হায়দারাবাদ ত্যাগ করার পর উইলিয়ামের ব্যবসা ধসে পড়বে। এই দুজনের বাড়াবাড়ি, অবৈধ, কার্যকলাপ, বিলাসী জীবনযাপন সম্পর্কে ডি ওয়ারেন তার 'এল ইন্ডে অ্যাংলোইসে' গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তারা যখন খুশি যে কোনো ধর্ম, বর্ণের মহিলাকে বিয়ে করে হারেম পূর্ণ করত, আবার মর্জি হলেই তালাক দিয়ে দিত।

পামারের পতনের জন্যে রাসেল তার ভূমিকা পালন করেছেন। পামারের ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার পর পরিচালিত তদন্তে দেখা যায় যে, ব্যাংকটি বারো শতাধিক বিনিয়োগকারীকে পথে বসিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে রাসেল পামারের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি এবং তার সাথে কোনো রকমের সম্পর্ক ছিল তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। রাসেল তদন্ত রিপোর্টের সরকারি মুদ্রণকারীকে ঘুষ দেন, যে কারণে তার ও পামারের মধ্যে গোপন সম্পর্কের বিষয়টি 'দি হায়দারাবাদ পেপারস' কখনো প্রকাশ করেনি।

১৮৪১ সালে ওয়ারেনের দেখা পামারের ধসে পড়া বাড়ি, কিটির আকস্মিক তার বাড়িতে আগমন, পামারের একটি চিঠি প্রাপ্তি সবই বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল হেনরি রাসেলের জন্যে। বিস্ময়ের চাইতেও বেশি ছিল চিঠির বিষয়বস্তু—একুশ বছর নীরব থাকার পর শরফ-উন-নিসার উপস্থিতি।

BanglaBook.org

খায়রুন্নিসার মৃত্যুর পর তার মা শরফ-উন-নিসা আশা করছিলেন যে, সাহিব আলম ও সাহিব বেগম তাদের হায়দারাবাদি পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখবে। খায়রুন্নিসার মৃত্যুর পর তারা শুধু তার আনুমানিক ১২ হাজার পাউন্ড মূল্যের অলংকারের উত্তরাধিকারীই হবে না, নিজামের ভূখণ্ডে তাদের জাগিরসমূহের উত্তরাধিকারও লাভ করবে।

কিন্তু কোনো কিছুই পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয়নি। খায়রুন্নিসার দুই সন্তানকে তাদের নানির সাথে যোগাযোগ করতে শুধু নিষেধই করা হয়নি, রাসেলের কাছে লেখা পামারের চিঠিতে প্রকাশ পায় যে, পরিবারটির বিপুল ও লোভনীয় সম্পত্তির প্রতি দুজনের লোভ ছিল, যা সিকান্দার জাহের মৃত্যুর পর এক দশক আগে উজির রাজা চান্দু লাল বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রকাশ পায় যে, শরফ-উন-নিসা, গত বারো বছর উইলিয়াম পামারের দানে জীবন কাটিয়েছেন। পামার যখন নিজেই দারিদ্র্যে নিপতিত তখন তিনি শরফ-উন-নিসাকে পরামর্শ দেন রাসেলকে চিঠি লিখতে, যে লোকটি তিন দশক আগে শুধু তার কন্যার জীবনকেই ধ্বংস করেনি, তার ধ্বংসের কারণও সৃষ্টি করেছে। শরফ-উন-নিসা রাসেলকে অনুরোধ করেন উজিরের ওপর তার প্রভাব খাটাতে। কারণ শেষ অলংকারটিও বিক্রি করে দেয়ার পর তার চলার মতো আর সংস্থান নেই।

কিন্তু শরফ-উন-নিসার বেপরোয়া আবেদন রাসেলের বিবেক জাগ্রত করার নয়। তবু তিনি তার পক্ষে যা করা সম্ভব করবেন বলে আশ্বার দেন। তিনি উইলিয়াম পামারকেও ধন্যবাদ জানান দুজনের মধ্যে যা ঘটেছে তা সত্ত্বেও যোগাযোগ করার জন্যে। এরপর তিনি তার স্বাস্থ্যের অবনতির বিষয়ে লিখেন। চোখ দুটি শুধু অন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং শরফ-উন-নিসাকে তার নাতনি সম্পর্কে জানান যে, 'কর্নেল কার্কপ্যাট্রিকের কন্যা মিসেস ফিলিপ ভালো আছে। তার বাড়ি এ দেশের ভিন্ন অংশে এবং গত বছর সেখানে আমার বোনের বাড়িতে বেড়াতে গেলেও তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি।'

একটি ব্যক্তিগত অনুরোধও রাসেল করেন চিঠির শেষাংশে। তা ছিল খায়রুন্নিসার একটি 'টিকিয়া' সম্পর্কিত, সেটি হীরক দিয়ে তৈরি। তার মা যেহেতু অভাবে পড়ে সব বিক্রি করে দিচ্ছিলেন, সেজন্যে আগ্রহ ব্যক্ত করেন, যদি সেটি এখনো থাকে, কোনো অজ্ঞাত লোকের হাতে পড়ার চাইতে তার হাতে পড়লে আনন্দিত হবেন বলে জানান। ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যে বোঝা দায় এবং বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে। এটি কি কোন বৃদ্ধের যৌন বিলাস, অথবা রাসেল খায়রুন্নিসার ভালোবাসার স্মৃতির অবশিষ্টাংশ?

পামার গোপনে খোঁজ নেন এবং দুঃখের সাথে জানান যে, 'টিকিয়াটি' বহু বছর আগে বিক্রি হয়ে গেছে এবং এর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি আরও জানান, রাসেল বৃদ্ধার সহায়তায় যে পরামর্শ দিয়েছেন তাতে তিনি উপকৃত হয়েছেন। তারপরও তার দুর্দশা লাঘব হয়নি। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে একে একে তার গৃহস্থালির সবকিছু বিক্রি করে দিতে হচ্ছিল।

এ চিঠি পাওয়ার পর রাসেল বৃদ্ধার জন্যে আরেকটি কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কিটির সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে জানান যে তাকে তার নানির খুবই প্রয়োজন।

সোয়ালোফিল্ডের বাড়িতে নিজের চিত্র দেখে আসার কিছুদিন পরই কিটি ১৮৪১ সালে এক্সমাউথ সফর করেন, সেকানে হায়দারাবাদ রেসিডেন্সিতে সদ্য নিয়োজিত সহকারী ক্যাপ্টেন ম্যালকম ডানকানের স্ত্রীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জেমসের সাবেক সহকারী জন ম্যালকমের ভাতিজা।

ম্যালকমকে মধ্যস্থ হিসেবে গ্রহণ করে একজন ফারসি দোভাষীর সহায়তায় কিটি শেষ পর্যন্ত তার নানির সাথে প্রায় চল্লিশ বছর পর সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। দুই মহিলার মধ্যে আবেগময় চিঠির বিনিময় হতে থাকে। একজন ইংরেজিতে লিখে হায়দারাবাদে পাঠায়, সেখান থেকে ফারসিতে অনূদতি হয়ে শরফ-উন-নিসার কাছে পৌঁছে, অন্যজন হায়দারাবাদ থেকে ফারসিতে একজনকে বলে দেয়, যিনি ইংরেজিতে লিখে তা পাঠান ইংল্যান্ডে।

সাগর তীরের ভিলায় বসে কখনো সাগরের পানে তাকিয়ে তিনি নানিকে লিখেন, যে সাগর তাকে ১৮০৫ সালে ইংল্যান্ডে এনেছিল—

> "প্রিয় নানিমা,
> বহু বছর আগে আমার প্রিয় ভাইয়ের মৃত্যুতে আপনি শোক জানিয়েছিলেন আপনার চিঠিতে। আমি সেজন্যে কৃতজ্ঞ ছিলাম, যদিও উত্তর দিতে পারিনি। ..তার মৃত্যুর দুবছর পর আমি স্যার জন ক্যানাওয়েের এক ভাগ্নেকে বিয়ে করেছি। আমার স্বামী আমার বয়সেরই এবং ইংলিশ আর্মির ক্যাপ্টেন। আমার চার সন্তান। বড় মেয়ের বয়স এগারো বছর। ছেলের বয়স সাড়ে আট। এর পরের মেয়েটির সাড়ে সাত বছর এবং মায়ের ছবির মতোই ছোটটির বয়স ১৯ মাস। আমার সাতটি সন্তান বেঁচে থাকতে পারত—কিন্তু একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে চলে গেছে। যারা বেঁচে আছে তাদের নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। ছেলেটি আমার বাবার মতোই চেহারা পেয়েছে। তার মতো বুদ্ধিমান, ধবধবে ফর্সা। আমি সমুদ্র উপকূলে এই উদ্যানশোভিত বাড়িতে বাস করি। আমার প্রিয় স্বামী আমার প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক এবং আমি তাকে ভালোবাসি।
>
> আমি সবসময় আপনার কথা এবং আমার প্রিয় মায়ের কথা স্মরণ করি। প্রায়ই স্বপ্নে নিজেকে আপনার সাথে ভারতে দেখতে পাই এবং আমি আপনাদের দুজনকেই একটি কক্ষে বসে থাকতে দেখি। মাকে ভাবি না এমন একটি দিনও কাটে না। দর্জিরা যেখানে কাজ করত সেই বারান্দাটি যেন এখনো আমি স্মরণ করতে পারি এবং বাড়ির ওপরের একটি জায়গা যেখানে মা আমাকে নিয়ে বসতেন ও দোলা দিতেন।
>
> স্বপ্নে মাকে দেখলেই মনে হয়, আমি ঘুম থেকে জেগেই তাকে দেখতে পাবো। কখনো দুঃখ হয়, যখন দেখি মা আমার ইংরেজি বুঝতে পারছেন না। যে জায়গায় আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছিল, আমি এখনো সে জায়গাটি এবং

BanglaBook.org

> তার কান্না স্মরণ করতে পারি এবং তার দীর্ঘ চুল ছেঁড়াও আমার মনে পড়ে। পৃথিবীতে আর কোথায় আমি এক খোঁপায় এত সুন্দর, এত প্রিয় চুল দেখতে পাবো! ভাবতেও ভালো লাগে যে, এতোগুলো বছর কেটে গেছে, কিন্তু আপনি আমাকে ভালোবেসেছেন এবং আমি যখন আপনাকে লিখতে চেয়েছি এবং এই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে চেয়েছি, মনে হয়েছে আমি কখনো এই অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবো না। পঁয়ত্রিশ বছর পর আপনার চিঠি পেয়ে এত ভালো লাগছে যে, আপনি আমার কথা ভাবেন, আমাকে ভালোবাসেন এবং হয়তো অবাক হন যে, আমি কেন আপনাকে লিখি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে আপনার কাছে আমার অনুভূতি ব্যক্ত করার পথ খুলে দিয়েছেন। এই চিঠি কি আপনার কাছে পৌঁছবে এবং আপনি কি আপনার নাতনির চিঠিকে গুরুত্ব দেবেন? আমার হৃদয় বলছে আপনি গুরুত্ব দেবেন। ঈশ্বর আমার প্রিয় নানিকে শান্তিতে রাখুন।”

চিঠির শেষে কিটি শরফ-উন-নিসাকে অনুরোধ জানান তাকে তার মায়ের এক গুচ্ছ চুল পাঠানোর জন্যে। শরফ-উন-নিসা খায়রুন্নিসার চুলের গুচ্ছের সাথে ফারসিতে চিঠির উত্তর দেন এবং জানান যে, তিনি কিটির জন্যে চুল সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। তিনি আরও লিখেন, ‘যখন আমি জানতে পারি যে তুমি বেঁচে আছ। তখন আমার হৃদয়ে নতুন আশা জাগে এবং অকল্পনীয় আনন্দ অনুভব করতে থাকি, যা আমার পক্ষে লিখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমার প্রিয়, আমার চোখের আলো, আমার হৃদয়ের সান্ত্বনা, আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

তোমার দীর্ঘজীবন ও তোমার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে দোয়া করার পর আমি তোমাকে জানাতে চাই যে, এই মুহূর্তে আল্লাহর রহমতে আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো এবং আমি সবসময় আল্লাহর দরবারে তার কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করি। দিনরাত আমার দৃষ্টি খুঁজে ফিরে আমার সন্তানকে। আমার আদরের ধনের চিঠির লেখার সাথে একমত হয়ে ক্যাপ্টেন ডানকান ম্যালকমের স্ত্রী আমাকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং আমাকে বলেছেন যে, তুমি ভালো আছো এবং তোমার সন্তানরাও ভালো আছে। রাতদিন আমার চোখ খুঁজে ফিরে আমার সন্তানকে। তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেছ তা কখনো আমি আমার মাথায় স্পর্শ করি, কখনো আমার চোখে..। আমি যদি কোনো মহিলা শিল্পীকে পেতাম তাহলে আমার ছবি আঁকিয়ে তোমার কাছে পাঠাতাম। আমার নাতনি নিশ্চয়ই তার ও তার সন্তানদের ছবি পাঠাবে।’

এভাবে তাদের মধ্যে ছয় বছর ধরে চিঠিপত্রে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। চশমা (তিন জোড়া), ট্যাবলেট, অর্থ, চুলের গুচ্ছ এবং ছবি পাঠানো হয় হায়দারাবাদে। বিনিময়ে কিটির কাছে আসে চকচকে পাণ্ডুলিপি, ক্যালিগ্রাফি এবং ফারসি কবিতা। এক উপলক্ষে কিটি স্মরণ করে—

BanglaBook.org

"আমার স্মৃতিতে এখনো আপনার ছবি মূর্ত, বিশেষ করে একটি বিশেষ মুহূর্তের, যখন শৈশবে আমি আপনাকে ভীষণ জ্বালাতন করছিলাম। একদিন খুব দুষ্টুমি করার কারণে আমাকে চটি দিয়ে আঘাত করেছিলেন এবং আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম। এখন আমার সন্তানদের শাসন করতে আমিও একই কাজ করি এবং ওদের বলি যে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার নানিমা আমাকে এভাবেই মারতেন।

তারা একথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং আমার নানিমা সম্পর্কে জানতে চায়। অতএব, আমি যতটা স্মরণ করতে পারি তাদেরকে বলি। আমার ইচ্ছা হয়, আপনি আমার সন্তানদের প্রিয় মুখগুলো যদি দেখতে পারতেন, বিশেষ করে একটিকে যে, আমি নিশ্চিত যে দেখতে ঠিক আমার মায়ের মতোই হয়েছে, যদিও মায়ের মতো অতোটা সুন্দরী নয়। আমার এত প্রিয় ছোট্ট ছেলেটি, যে আপনাকে আনন্দ দেবে, সে অনেক দিন থেকে আমার প্রিয় ভাইয়ের মতো। আমার ভাইটি যখন বেঁচে ছিল, আমি তার সাথে আপনার কথা, আমার মায়ের কথা আলোচনা করতাম। ভারতে আমাদের স্মৃতিগুলো তুলনা করতাম..।"

কিটি তার মায়ের জীবনে রাসেলের ভূমিকা সম্পর্কে তার সন্দেহ ব্যক্ত করেছিলেন ডানকান ম্যালকমের কাছে। তাকে খোঁজ নিয়ে জানতে বলেছিলেন যে, চিনারির আঁকা তাদের দুই ভাইবোনের ছবিটি কি রাসেলের কাছে যাওয়ার কথা ছিল, না কি তার কাছে। ম্যালকম কৌশলে এই কাজ করতে অস্বীকার করেন এবং লিখেন, 'বৃদ্ধা মহিলার স্মৃতিশক্তি ভালো নয় এবং এ ব্যাপারে আমি আপনার নানির বক্তব্যের চাইতে স্যার হেনরির বক্তব্যইকে গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ আপনার নানির এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই।'

কিটি তার নানিকে তার বাবা মা'র সাক্ষাৎ ও তাদের বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাঠাতে বলেন, যা শরফ-উন-নিসা তাকে পাঠান। একটি বিষয় তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি, যা অনুসন্ধান করতে কিটি সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন, তা হচ্ছে অবৈধ সন্তান হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণ। জেমস কার্কপ্যাট্রিক তার সকল উইলে সাহিব আলম ও সাহিব বেগমকে তার সমসাময়িক আইনগত পরিভাষা অনুসারে অবিবাহিত দম্পতিদের সন্তানদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা, 'স্বাভাবিক সন্তান' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নানির কাছে কিটির লেখার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল তার নানিকে দিয়ে নিজামের কাছ থেকে অথবা কোনো 'মুজতাহিদ-এর কাছ থেকে একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা, যা প্রমাণ করবে যে, জেমস কার্কপ্যাট্রিক ও খায়রুন্নিসার মধ্যে কোনো ধরনের আইনসম্মত বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। খায়রুন্নিসাকে বিয়ে করার আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরিত বিবরণ থাকলেও শরফ-উন-নিসা তা কিটিকে পাঠাতে পারেননি। ফলে বিষয়টি বিতর্কিত রয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই এগিয়ে আসেন স্যার হেনরি রাসেল। তিনি এ ব্যাপারে কিটির দুশ্চিন্তা ও বেদনার কথা জানতে পেরে মনে করেন যে, জীবিত লোকদের মধ্যে এ সত্য জানেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ইংল্যান্ডের পশ্চিম অংশে টরকোয়েতে বসবাসরত কিটির সাথে সাক্ষাৎ করতে যান তিনি। কিন্তু নিজেকে তার সাথে একা দেখে বিব্রত অবস্থার মধ্যে পড়ে তিনি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে পারেননি। কিটির মায়ের ক্ষেত্রে আগে যেমন করেছেন, এক্ষেত্রেও তিনি চার্লসের ওপর ভর করলেন। চার্লস গ্রেট ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ের চেয়ারম্যান এবং হাউজ অফ কমন্সের সদস্য। হেনরি রাসেল তার ভাইকে লিখলেন যে, তিনি কিটির সাথে কথা বলতে পারেন কিনা। তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, আমার সাথে জড়িত কোনো ব্যাপার নয়, অথচ আমি জড়িত হচ্ছি বলে মনে করা হতে পারে। মিসেস ফিলিপসকে সবসময় অবৈধ সন্তান বলে ভাবা হয়েছে এবং তার পিতার উইলেও সেভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও তার জন্ম তোমার ও আমার মতোই বৈধ। কর্নেল কার্কপ্যাট্রিক তাদের প্রেমের সম্পর্ককে ধরে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন যে, তিনি বিয়ে করেছেন, কিন্তু তিনি মনে করেননি যে, তার বিয়েটা বৈধ। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, (আমার বাবা ধারণা সঠিক করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমারও ভুল ধারণা ছিল) খ্রিস্টানের কাছে মুসলিম বিয়ে অবৈধ এবং আমার মনে হয়, তিনি ভয় করেছিলেন যে, তিনি যদি বিয়ের সূত্র তার উইলে উল্লেখ করেন তাহলে আইন তার কন্যার পক্ষে থাকবে না।

কখন বা কার কাছ থেকে আমি প্রথম এই বিয়ের কথা শুনি তা আমার স্মরণে নেই। আমার মনে হয় ১৮০৫ সালে কর্নেল কার্কপ্যাট্রিকের মৃত্যুর পর মুনশি আজিজ উল্লাহ আমাকে একথা বলেন, যিনি আমার সাথে কলকাতায় গিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি বেনারস চলে যান এবং আমার বিশ্বাস সেখানেই তিনি মারা গেছেন। কর্নেল কার্কপ্যাট্রিকের কাছে অবশ্যই ঘটনাটি শুনিনি। তিনি নিজে বলেননি অথবা মিসেস ফিলিপসের মা খায়রুন্নিসা অথবা তার নানি শরফ-উন-নিসার কাছেও শুনিনি। যদিও তারা এ ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিত করেছেন এবং তাদের কথার ওপর এখনও আমার বিপুল আস্থা আছে যে, তারা যে অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন তা অবশ্যই সম্পাদিত হয়েছে এবং মনে হয়েছে, তাতে আমিও উপস্থিত ছিলাম।'

১৮৪৩ সালে কিটি তার নানিকে জানান যে, উইলিয়াম জর্জের বড় মেয়েটি ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সেখানে গেলে শরফ-উন-নিসার সাথেও সাক্ষাতের পরিকল্পনা আছে তার। এ খবর পাওয়ার পর দ্রুত উচ্ছ্বসিত উত্তর এল: 'সাহিব আলমের কন্যা তার স্বামীকে সাথে নিয়ে হিন্দুস্থান সফরে

BanglaBook.org

আসছেন এ খবর শোনার পর আমার হৃদয়ে আনন্দ উপচে পড়ছে এবং আমি তাকে আমার চোখের তারার মতো করে দেখবো। আল্লাহ আমাদের মাঝ থেকে বিচ্ছেদের পর্দা উঠিয়ে নিক এবং আমাদের সকলকে একত্রিত করুক, যাতে আমরা সুখী হতে পারি।'

শরফ-উন-নিসা তার নাতির কন্যার সাথে কখনো সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে তার নাতনি কিটিকে আর কখনো দেখেননি। চার বছর পর হেনরি রাসেল উইলিয়াম পামারের আরেকটি চিঠি পান। ১৮৪৭ সালের ২৭ জুলাই তারিখে লিখিত ছিল চিঠিটি।

> "প্রিয় মহোদয়
> আমার ভয় হয় যে, আমি আপনাকে যে খবর দেব তা আপনাকে দুঃখ দেবে। এ মাসের ২১ তারিখে শরফ-উন-নিসা মারা গেছেন। কোনো ইংরেজ চিকিৎসক তার চিকিৎসা করেনি। তার যে বয়স হয়েছিল (আশির ওপর), সে অবস্থায় কোনো রোগ থেকে আরোগ্যের আশা কমই থাকে। আমি জানি না, তার এক আত্মীয় মাহমুদ আলী খানের কথা আপনার মনে আছে কিনা। তিনি তার সাথে থাকতেন। তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতা ছিল, যা থেকে মনে হত যে, তিনি তাকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মাহমুদ আলী খান তার কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন সোলায়মান জাহের সাথে এবং সম্পর্ক এত গভীর হয়েছিল যে, সোলায়মান জাহ সে সম্পর্কের ছলে তার সম্পত্তির দেখাশুনা করত, যা ছিল তাকে দেউলিয়া করার প্রস্তুতি। মাহমুদ আলী খান আমাকে লিখেছেন যে, তিনি তার জামাতার প্রতি বিতৃষ্ণ এবং আশঙ্কা করেছেন যে, তার হাতে তাকে ভোগান্তি সহ্য করতে হবে। এর থেকে কোনো নিস্তার নেই। সরকারের এমন অবস্থা নেই যে, কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদান করে..।"

দশ বছর পর ১৮৫৭ সালের ১০ মে দিল্লির উত্তরে অবস্থিত মিরাটে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। সেই সময়ের মধ্যে যে পৃথিবী কিটি কার্কপ্যাট্রিকের জন্ম দিয়েছিল তা হারিয়ে গেছে। বিগত দুই দশক ধরেই সেই পৃথিবীর মৃত্যু ঘটেছে। সকল শ্বেতাঙ্গ মোগল দীর্ঘদিন আগেই তাদের কবরে আশ্রয় নিয়েছেন: স্যার ডেভিড অক্টারলোনি ১৮২৫ সালে মিরাটে মারা যান কলকাতায় তার মনিবদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার পর। তার দশ বছর পর তার বন্ধু ও উত্তরাধিকারী উইলিয়াম ফ্রেশার ঘাতকের হাতে নিহত হন। জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিকের জগতের শেষ জীবিত সদস্য ছিলেন সম্ভবত উইলিয়াম লিনেয়াস গার্ডনার, যিনি তরুণ বয়সে বিয়ে করেছিলেন ক্যাম্বের বেগমকে, ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৭৯৮ সালে ডি রেমন্ডের বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় হায়দারাবাদে নিজামের বাহিনীতে ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজার পক্ষে যুদ্ধ

করার পর ১৮০৩ সালে তিনি ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজস্ব অনিয়মিত অশ্বারোহী রেজিমেন্ট 'গার্ডনার হর্স' গড়ে তোলেন। তার শেষ নিয়োগ ছিল হিন্দু ষ্টুয়ার্টের সহকারী হিসেবে, যার বহু খামখেয়াল সত্ত্বেও তাকে মধ্য ভারতের সাউগড়ে অবস্থিত সর্ববৃহৎ অশ্বারোহী সেনানিবাসের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক স্থাপনার মধ্যে এটি ছিল ব্যতিক্রমী এক কেন্দ্র, যার নেতৃত্ব দুই ইউরোপীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তির ওপর-একজন হিন্দু, আরেকজন মুসলিম। ১৮-২০-এর দশকের শুরুর দিকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট তার সিপাহীদের বর্ণচিহ্ন এবং কুচকাওয়াজে তাদের নিজ ঢং-এ উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যে কলকাতা কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যর্থ দেনদরবার করেন। কমান্ডার-ইন-চিফ তাকে ধমক দেন। ষ্টুয়ার্টের সামরিক জীবনের অবসান ঘটে আকস্মিকভাবে। তার সহকারী গার্ডনার লিখেন, 'বেচারি পণ্ডিত জেনারেল। প্রায় প্রত্যেকের সাথে তা বিবাদ; লেগে থাকত।'

অন্যদিকে গার্ডনার অবসর গ্রহণের পর আগ্রার কাছে খাসগঞ্জে তার স্ত্রীর জায়গিরে চলে যান। তার পুত্র জেমস মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহের ভাতিজী এবং অযোধ্যার নওয়াবের শ্যালিকা মুক্তা বেগমকে বিয়ে করেন। তারা অভিজাত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বংশের সূচনা করেন, যাদের অর্ধেক মুসলিম, অর্ধেক খ্রিস্টান। যেমন, জেমস জাহাঙ্গীর শিকোহ গার্ডনার। গার্ডনারের যেসব সন্তান পুরোপুরি খ্রিস্টান নামের ছিল, যেমন, রেভারেন্ড বার্থোলোমিউ গার্ডনার, তারও বিকল্প মুসলিম নাম ছিল। ফলে তাকে 'সবর' বলা হতো, যিনি এক সময়ে উর্দু ও ফারসি কবিতায় খ্যাতি অর্জন করেন। যাজকের পোশাক ঝেড়ে ফেলে তিনি অযোধ্যার পোশাক পরিধান শুরু করেন লক্ষ্ণৌর 'মুশায়রায়' অংশ নিতে।

উইলিয়াম গার্ডনার ১৮৩৫ সালের ২৯ জুলাই খাসগঞ্জে তার বাড়িতে মারা যান। তখন তার বয়স পঁয়ষট্টি বছর। আটত্রিশ বছর আগে সুরাটে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা তার বেগম তাকে ছাড়া বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। স্বামীর মৃত্যুর এক মাস দুদিন পর তার মৃত্যু হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় গার্ডনারের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান উত্তরাধিকারীর অন্য শ্বেতাঙ্গ মোগলদের মতোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে যে কোনো একটি পক্ষ বেছে নিয়েছিলেন। অবশ্য অনেকের জন্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ারই ছিল। কিছু পরিবার, যেমন, লক্ষ্ণৌর রটেনস পরিবার, দিল্লিতে অক্টারলোনির বিধবা স্ত্রী মোবারক বেগম বিদ্রোহী সৈন্যদের পক্ষাবলম্বন করেন। গার্ডনার পরিবারের সম্পত্তির ওপর হামলার পর তারা প্রথমে আলীগড়ে এবং পরে আগ্রা দুর্গে আশ্রয় নেন এবং ব্রিটিশদের সমর্থনে চলে যান তারা, যদিও তারা দিল্লি ও লক্ষ্ণৌর মোগলদের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

BanglaBook.org

বিদ্রোহে ব্যাপক রক্তপাত হয়। উভয় পক্ষেই বিপুল প্রাণহানি ঘটে। এরপর কোনোকিছুই আর আগের মতো হয়নি। শ্বেতাঙ্গ মোগলরা যে আস্থা ও পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল তা চিরতরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ বিজয়ের পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ও অন্যভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘটনা ছিল গণহত্যার মতো। শীর্ষস্থানীয় মোগল অভিজাতদের পদাবনতি ঘটানো হয় এবং কঠোরভাবে ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ব্রিটিশ সংস্কৃতি। একই সাথে ব্রিটিশ মেমসাহিবদের ব্যাপক আগমন ঘটতে থাকে এবং ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টবাদের বিকাশ ঘটে। নৈতিক মান নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কারণে দুই জাতির মধ্যে প্রকাশ্য যৌন সম্পর্কের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

হায়দারাবাদে উত্তর-ভারতের মতো সিপাহী বিদ্রোহী ততটা প্রচণ্ড ছিল না। রোহিলা অশ্বারোহীরা একবার রেসিডেন্সির ওপর আঘাত হেনেছিল। উইলিয়াম পামার মধ্যস্থতা করে ব্রিটিশের পক্ষে নিয়ে আসেন পরিস্থিতিকে। তিনি যদিও প্রথম জীবনে মুসলিম হিসেবে বড় হয়েছেন এবং বেশ ক'জন মুসলিম রমণীকে বিয়ে করেছিলেন এবং মুসলিম মায়ের যত্ন করতেন আন্তরিকভাবে, কিন্তু জীবনের শেষদিকে তিনি সচেতন ও কট্টর খ্রিস্টানে পরিণত হন। মৃত্যুর আগে তিনি তার বন্ধু মেজর ফ্রান্সিস গ্রেসলেকে লিখেছিলেন যে, 'ভারতে পরিস্থিতি কত পালটে গেছে। ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের ঘৃণা কি ব্যাপকতা লাভ করেছে। একই সাথে কাজ করে যে দেশীয়রা, তাদেরকে ব্রিটিশরা ভাবতে শুরু করে এক একজন ঘাতক হিসেবে।'

জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিকের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র—পুরনো শহরে পরিবার নিয়ে উৎসব, তাজাল্লি আলী শাহে আনন্দমুখর রাত্রি যাপন, হায়দারাবাদের মুশায়রায় উপস্থিতি, সন্ধ্যায় নিজামের সাথে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা, বিকেলে উজিরের সাথে তার উদ্যানে কবুতর উড়ানোর দিনগুলো শেষ হয়ে গেছে।

১৮৬৭ সালের ২৫ নভেম্বর উইলিয়াম পামার মারা যান। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যার রিচার্ড টেম্পল তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাড়াহুড়ো করে চলে যান চান্দারঘাটে ঘোড়াদৌড় দেখার জন্যে।

কিটির স্বামী মেজর ফিলিপস ১৮৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কিটি তখনো জীবিত। মৃত্যুর আগে কিটি শেষবারের মতো সাক্ষাৎ করতে যান টমাস কার্লাইলের সাথে। এরপর কার্লাইল তাকে লিখেন, 'তোমার সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ আমাকে আনন্দ দিয়েছে। যাকে আমরা 'কিটি' বলে ডাকতাম সে যেন সন্ধ্যার ঝাপসা স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এতে দীর্ঘদিন আগে কাটানো সময় নিয়ে আমি ভেবেছি এবং সেই সাথে অনেক লোক, অনেক ঘটনা, যেগুলো আমার কাছে কখনো গুরুত্বহীন হয়ে যায়নি।'

BanglaBook.org

কিটি টরকোয়েতেই বাস করেন এবং ১৮৮৯ সালে তার বাড়ি 'ভিলা সরেনটোতে' মারা যান। এর চার বছর পর তার চাচাতো বোনের স্বামী স্যার এডওয়ার্ড স্ট্রাচে খায়রুন্নিসার সাথে জেমসের বিয়ের প্রথম বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া কিটির প্রতি কার্লাইলের আকৃষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গও লিখেন তিনি, যা ১৮৯৩ সালের জুলাই-এ ব্ল্যাকউডস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তার শেষ বাক্যটি ছিল, 'তিনি আমার চাইতে দশ বছরের বড়। কিন্তু আমি তাকে বালিকা থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত দেখেছি অত্যন্ত আকর্ষণীয়া মহিলা হিসেবে।'

১৮৬৭ সালে উইলিয়াম পামারের মৃত্যু এবং ১৮৮৯ সালে কিটি কার্কপ্যাট্রিকের মৃত্যুর পর যথার্থই একটি অধ্যায়ে অবসান ঘটেছে বলে বলা যায়। যদিও একটি মৃত্যু ঘটে হায়দারাবাদে, আরেকটি ইংল্যান্ডে। দুজনকেই কবরস্থ করা হয় খ্রিস্টান গোরস্থানে। তার স্মরণে কবরগাত্রে খ্রিষ্টীয় লিপি উৎকীর্ণ আছে স্পষ্টভাবে। আর কোনো অস্পষ্টতা বা সীমালঙ্ঘনের সুযোগ নেই। সে সুযোগ চলে গেছে। তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনশো বছরের জাতি ও বর্ণমিশ্রতার, ভিক্টোরীয় যুগের ইতিহাস গ্রন্থের বিব্রতকর সকল স্মৃতির কার্যকরভাবে অবসান ঘটেছে। যদিও খায়রুন্নিসার মৃত্যুর পর তাকে 'হিন্দু রাজকন্যা' হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তার মাধ্যমে এ ধরনের বহু ঘটনাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। দুই জাতির জন্যে আবার ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে আরও সত্তরটি বছর লেগেছে।

এখন, সকল অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা 'সভ্যতার সংঘাতের' কথা বলি এবং প্রায় প্রতিদিনের সংবাদপত্রে থাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের প্রসঙ্গ। যে ব্যাপক ব্যবধান ও মৌলিক ব্যবধান যা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে দুটি পৃথিবীকে। শ্বেতাঙ্গ মোগলরা তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত মিলন প্রক্রিয়ায় সবকিছুর ওপরে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন সহনশীলতা ও সমঝোতা—বিচ্ছিন্ন দুটি পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং তারা একটি পর্যায় পর্যন্ত তাদের উদ্যোগে সফলও হয়েছিলেন।

জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক ও খায়রুন্নিসার কাহিনিতেই স্পষ্ট যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে খাপ খাওয়ানো অসাধ্য কিছু নয় এবং কখনো তা ছিল না। শুধুমাত্র অন্ধ গোঁড়ামি, কুসংস্কার, বর্ণবাদ ও ভয় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তারা অতীতে এক হয়েছে এবং মিশে গেছে এবং আবার তারা মিলিত হবে।

BanglaBoi.org

## পরিশিষ্ট
## গ্রন্থে আলোচিত উল্লেখযোগ্য চরিত্র

* **কর্নেল জেমস কার্কপ্যাট্রিক** (সুদর্শন কর্নেল, ১৭২৯—১৮১৮): উইলিয়াম, জর্জ এবং জেমস অ্যাচিলেস-এর পিতা। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। জেমসের প্রণয় ঘটনার সময় তিনি ইংল্যান্ডের কেন্টের হলিডেল-এ নিজস্ব বাসভবনে কাটাচ্ছিলেন।

* **লেঃ কর্নেল উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক (১৭৫৬—১৮১২):** ফারসি ভাষায় দক্ষ, ভাষাবিদ এবং আফিমে আসক্ত। হায়দারাবাদের সাবেক রেসিডেন্ট এবং ১৮০০ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির সামরিক সচিব ও প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা। জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিকের অবৈধ সৎ বড় ভাই।

* **জর্জ কার্কপ্যাট্রিক (১৭৬৩—১৮১৮):** জেমসের বড় ভাই, যিনি 'সদাশয় সৎ জর্জ' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ধার্মিক ও সুরসিক ব্যক্তি। ভারতে পেশাগত জীবনে ব্যর্থ হন এবং মালাবারে সামান্য কর আদায়কারীর চাইতে উচ্চতর কোনো পদে উন্নীত হতে পারেননি।

* **মেজর জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক (১৭৬৪—১৮০৫):** হায়দারাবাদে হাশমত জং এবং নওয়াব ফখর-উদ-দৌলা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হায়দারাবাদে নিজামের দরবারে তিনি ছিলেন ভারত প্রেমিক ইংরেজ রেসিডেন্ট।

* **উইলিয়াম জর্জ কার্কপ্যাট্রিক (১৮০১—১৮২৮):** হায়দারাবাদে জন্মের পর তার নাম ছিল মীর গোলাম আলী সাহিব আলম। ভারত ত্যাগের সময় তার মুসলিম নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে পৌঁছার পর ১৮১২ সালে ফুটন্ত পানির পাত্রে পড়ে তিনি পঙ্গু হয়ে যান। তবু স্বাপ্নিক কবি হিসেবে বেঁচে ছিলেন ১৮২৮ সাল পর্যন্ত। মৃত্যুর পূর্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের কবিতা ও অধিবিদ্যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

* **ক্যাথারিন অরোরা কার্কপ্যাট্রিক (১৮০২—১৮৮৯):** হায়দারাবাদে নূরুন্নিসা সাহিব বেগম নামে পরিচিত ছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডে তার নাম হয় কিটি কার্কপ্যাট্রিক। জেমস ও খায়রুন্নিসার কন্যা। ১৮২৯ সালে ক্যাপ্টেন জেমস ফিলিপের সাথে বিয়ে হয়। ১৮৮৯ সালে সাতাশি বছর বয়সে তার মৃত্যু ঘটে।

* **রিচার্ড কোলে ওয়েলেসলি (১৭৬০—১৮৪২):** ভারতের গভর্নর জেনারেল। প্রথম দিকে জেমসের দৃষ্টিতে একজন বীরপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তার সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতিতে জেমস তার ওপর বিরূপ হন এবং দক্ষিণাত্যের ওপর কোম্পানির সম্প্রসারণবাদী নীতি মোকাবেলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন জেমস।

* **কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলি (১৭৬৯—১৮৫২):** মহীশূরের গভর্নর এবং দাক্ষিণাত্যে ও মারাঠা অঞ্চল সংক্রান্ত রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তা। উইলিয়াম ও জেমস কার্কপ্যাট্রিক ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীতে ডিউক অফ ওয়েলিংটন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

* **হেনরি ওয়েলেসলি (১৭৭৩—১৮৪৭):** গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির ভাই ও সহকারী এবং অযোধ্যার গভর্নর।

* **জেনারেল উইলিয়াম পামার (মৃত্যু ১৮১৪):** গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিকের বন্ধু। তিনি পুনায় মারাঠা দরবারে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি তাকে বরখাস্ত করেন। অযোধ্যার নওয়াবের সেনাধ্যক্ষের কন্যা ফায়জি বখশ বেগমকে বিয়ে করেন। তার তিন পুত্র ছিলেন উইলিয়াম, জন ও হেস্টিংস।

* **ফায়জি বখশ বেগম পামার (১৭৬০—১৮২০):** অযোধ্যার নওয়াবের অশ্বারোহী বাহিনীর পারসিক সেনাপতির কন্যা। তার বোন নূর বেগমকে বিয়ে করেন ফরাসি সেনাধ্যক্ষ জেনারেল বনেট ডি বোনে। ফায়জি বিয়ে করেন জেনারেল পামারকে। তার গর্ভে পামারের চার পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। পুত্রদের একজন উইলিয়াম পামারের সাথে তিনি শেষ জীবনে হায়দারাবাদে কাটান। খায়রুন্নিসার বান্ধবী। খায়রুন্নিসার মৃত্যুর পর শোকে প্রায় এক মাস নির্জনে এক কক্ষে আবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।

* **জন পামার (১৭৬৭—১৮৩৬):** কলকাতায় 'প্রিন্স অফ মার্চেন্টস' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণে। তিনি জেনারেল পামারের প্রথম স্ত্রী সারাহ্ হ্যাজেলের পুত্র।

* **ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পামার (১৭৮০—১৮৬৭):** ফায়জি বেগমের গর্ভে জেনারেল পামারের পুত্র। জেমস কার্কপ্যাট্রিকের প্রথমে নিজামের দরবারে অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক পদে চাকরি দেন। জেমসের প্রতি গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলির আচরণে ক্ষুব্ধ উইলিয়াম পামার 'ফিলোথেটিস' ছদ্মনামে ওয়েলেসলির সমালোচনা করে একটি চিঠি লিখেন। উইলিয়াম পরবর্তীতে হায়দারাবাদের শক্তিশালী মহাজনে পরিণত হন। অবশ্য পরে দেউলিয়া হয়ে যান।

* **স্যার হেনরি রাসেল (১৭৫১—১৮৩৬):** বাংলার প্রধান বিচারপতি এবং হেনরি ও চার্লস রাসেলের পিতা।

* **হেনরি রাসেল (১৭৮৩—১৮৫২):** জেমস কার্কপ্যাট্রিকের একান্ত সচিব ও সহকারী। পরবর্তীতে খায়রুন্নিসার প্রেমিক।

* **চার্লস রাসেল :** রেসিডেন্টের দেহরক্ষী দলের অধিনায়ক। হেনরি রাসেলের ছোট ভাই।

* **ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হেমিং:** রেসিডেন্টের দেহরক্ষী দলের অধিনায়ক হেনরি রাসেলের মতে, হায়দারাবাদ রেসিডেন্সিতে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের প্রধানশত্রু।

* **স্যামুয়েল রাসেল:** প্রকৌশলী, বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন রাসেলের পুত্র। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে নিজামের প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেন এবং নতুন রেসিডেন্সি ভবন নির্মাণে সহায়তা করেন।

* **টমাস সিডেনহ্যাম:** হায়দারাবাদ রেসিডেন্টের সচিব। জেমস তাকে বিশ্বাস করতেন না। জেমসের মৃত্যুর পর সিডেনহ্যাম হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট হন এবং রেসিডেন্সি থেকে মোগল প্রভাব দূর করার পদক্ষেপ হিসেবে জেমসের সময়ের বহু কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন।

* **মুনশি আজিজ উল্লাহ ও মুনশি আমান উল্লাহ:** দিল্লিতে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষিত দুই ভাই, যারা জেমসের বিশ্বস্ত মুনশি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

* **ডা. জর্জ ওরে:** হায়দারাবাদ রেসিডেন্সিতে নিয়োজিত চিকিৎসক।

* **মিসেস ওরে:** ডা. জর্জ ওরের স্ত্রী, যিনি অনর্গল উর্দু বলতে পারতেন। ভোজনবিলাসী মহিলা ছিলেন। ১৮০৫ সালে জেমসের পুত্র ও কন্যা তার সাথেই ইংল্যান্ডে যায়।

* **লে. কর্নেল জেমস ড্যালরিম্পেল (১৭৫৭—১৮০০):** হায়দারাবাদে মোতায়েন অতিরিক্ত বাহিনীর কমান্ডার।

* **লে. কর্নেল স্যামুয়েল ড্যালরিম্পেল:** জেমস প্যালরিম্পেলের চাচাতো ভাই এবং হেনরি রাসেলের বন্ধু। কলকাতার উদ্দেশে জেমস কার্কপ্যাট্রিকের শেষ নৌ যাত্রায় তার সাথে ছিলেন। তার স্ত্রী মার্গারেট অত্যন্ত নিন্দিত মহিলা ছিলেন।

* **এডওয়ার্ড লর্ড ক্লাইভ (১৭৫৪—১৮৫৯):** পলাশী যুদ্ধ খ্যাত রবার্ট ক্লাইভের পুত্র। মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন।

* **মাউন্টষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোন (১৭৭৯—১৮৫৯):** পর্যটক এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন, যিনি এক পর্যায়ে বোম্বের গভর্নর পদে উন্নীত হন। ১৮০১ সালে এডওয়ার্ড স্ট্রাচের সাথে পুনরায় যাওয়ার পথে হায়দারাবাদ সফর করেন।

* **এডওয়ার্ড স্ট্রাচে (১৭৭৪—১৮৩২):** পর্যটক ও সিভিল সার্ভেন্ট। মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের সাথে হায়দারাবাদ সফর করেন। ১৮০৮ সালে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের সুন্দরী কন্যা জুলিয়াকে বিয়ে করেন।

* **মাইকেল জোয়াচিম মেরি রেমন্ড (১৭৫৫—১৮৯৮):** হায়দারাবাদে নিয়োজিত ফরাসি বাহিনীর অধিনায়ক।

* **জীন পিয়েরে পিরন:** রেমন্ডের মৃত্যুর পর ফরাসি বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকারী।

## নিজাম পরিবার

* **নওয়াব মীর নিজাম আলী খান, দ্বিতীয় আসফ জাহ (১৭৬১—১৮০৩):** হায়দারাবাদের নিজাম, সিকান্দার জাহের পিতা। নিজাম-উল-মুলকের চতুর্থ পুত্র। বড় ভাই সালাবত জংকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

* **বখশি বেগম:** নিজাম আলী খানের প্রথম স্ত্রী। সিকান্দার জাহকে তিনিই লালন পালন করেন। নিজামের জেনানার ক্ষমতাশালী মহিলা ও নিয়ন্ত্রকারী।

* **তিনাত-উন-নিসা বেগম:** নিজাম আলী খানের স্ত্রী ও সিকান্দার জাহের মা। তিনিও জেনানায় ক্ষমাধর ছিলেন এবং নিজাম পরিবারের অহংকারাদি ছিল তার দায়িত্বে।

* **আলী জাহ (মৃত্যু ১৭৯৮):** নিজাম আলী খানের পুত্র। ১৭৯৮ সালে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আলী জাহ বিদরের কাছে মীর আলম ও জেনারেল রেমন্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং কিছুদিন পরই আত্মহত্যা করেন। তার আত্মহত্যার ঘটনা ছিল সন্দেহজনক।

* **দারা জাহ:** নিজাম আলী খানের জামাতা, যিনি ১৭৯৬ সালে বিদ্রোহ করেন। জেমস ড্যালরিম্পেল তাকে রায়চূড়ে গ্রেফতার করে হায়দারাবাদে ফিরিয়ে আনেন। এরপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

* **নওয়াব মীর আকবর আলী খান সিকান্দাহ জাহ, তৃতীয় আসফ জাহ (১৭৭১—১৮২৯):** হায়দারাবাদের নিজাম  নিজাম আলী খানের একমাত্র জীবিত পুত্র।

* **জাহান পাওয়ার বেগম:** হাজী বেগম নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি মা'আলী মিয়া ও ফারজান্দ বেগমের কন্যা, নিজামের প্রধান উজির আরিস্তু জাহের নাতনি এবং

সিকান্দার জাহের স্ত্রী। সিকান্দার জাহ তার সাথে দুর্ব্যবহার করতেন এবং তার স্বামী যে জেমসকে হত্যার চক্রান্ত করেছে সে ব্যাপারে তাকে সতর্ক করেছিলেন।

* **মামা বরুণ, মামা চম্পাঃ** নিজামের দরবারে মহিলা রক্ষী ও পরিচারিকাদের প্রধান। খার্দলা অভিযানে মহিলার রেজিমেন্ট জুফ্ফুর পল্টনের নেতৃত্বেও ছিল তারা।

## আরিস্তু জাহের পরিবার

* **গোলাম সাইয়িদ খান, আরিস্তু জাহ, আজিম-উল-ওমরাহ (মৃত্যু ১৮০৪)ঃ** নিজাম আলী খানের প্রধান উজির। উইলিয়াম ও জেমস তার বিচক্ষণতার কারণে তাকে 'সলোমন' বলে ডাকতেন। আওরঙ্গাবাদে একজন 'কিলাদার' বা 'দুর্গরক্ষক' হিসেবে তার পেশা জীবনের শুরু। হায়দারাবাদের উজির রুকন-উদ-দৌলা নিহত হবার পর তিনি নিজামের দরবারে প্রথমে সহকারী উজির, পরে উজির পদে উন্নীত হন। খার্দলায় পরাজয়ের পর ১৯৭৫ সালের মার্চে তাকে বন্দি হিসেবে পুনায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৭৯৭ সালে পুনা থেকে হায়দারাবাদে ফিরে আবার নিজ দায়িত্ব লাভ করেন এবং ১৮০৪ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে দায়িত্বে ছিলেন।

* **সারওয়ার আজফা, নওয়াব বেগমঃ** আরিস্তু জাহের প্রধান স্ত্রী। স্বামী এবং নিজাম সিকান্দার জাহের ক্ষমতালাভের পর প্রধান উজির হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকারী মীর আলম তার সকল সম্পত্তি লুণ্ঠন করেন।

* **মা'আলী মিয়াঃ** আরিস্তু জাহের পুত্র। ১৭৯৫ সালে খার্দলা অভিযানে নিহত হন।

* **ফারজান্দ বেগমঃ** মুনীর-উল-মুলকের বোন ও আরিস্তু জাহের পুত্র মা'আলী মিয়ার স্ত্রী। শরফ-উন-নিসার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। খায়রুন্নিসাকে জেমসের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি শরফ-উন-নিসার ওপর প্রভাব খাটান বলে জানা যায়।

## শুস্তারি পরিবার

* **সাইয়িদ রেজা শুস্তারি (মৃত্যু ১৭৮০)ঃ** ইরানের শুস্তার এলাকার শিয়া ধর্মীয় নেতা। তিনি শুস্তার থেকে প্রথমে দিল্লি এবং পরে হায়দারাবাদে আসেন। নিজাম-উল-মুলক তাকে জায়গির প্রদান করেন। সাইয়িদ রেজা নিজামের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া সকল সরকারি দায়িত্ব, এমনকি প্রধান কাজির দায়িত্ব গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানান। ইবাদতের জীবন বেছে নেন তিনি। তার চারিত্রিক দৃঢ়তার খ্যাতির কারণেই তার

পুত্র মীর আলম এবং গুস্তারি বংশের অন্যান্যরা হায়দারাবাদে বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন।

* **মীর আবুল কাসিম, মীর আলম বাহাদুর (মৃত্যু ১৮০৮):** আরিস্তু জাহের উকিল এবং কলকাতায় নিজামের প্রতিনিধি। সেরিঙ্গাপতমে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে নিজামের বাহিনিকে পরিচালনা করেন। ১৮০০ সালে নির্বাসিত হন। ১৮০৪ সালে আরিস্তু জাহের মৃত্যুর পর তার নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটে এবং নিজাম সিকান্দার জাহের প্রধান উজির পদ লাভ করেন। ১৮০৮ সালে কুষ্ঠরোগে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাসিক দুই হাজার রুপি ভাতা লাভ করতেন।

* **মীর দৌরান:** মীর আলমের পুত্র। ১৮০১ সালে কুষ্ঠরোগে তার মৃত্যু হয়।

* **মীর আবদুল লতিফ গুস্তারি:** মীর আলমের জ্ঞাতি ভাই ও সহকর্মী। 'তুহফাত-উল-আলম' গ্রন্থের প্রণেতা।

* **বকর-আলী খান, আক্লি-উদ- দৌলা:** ইরানের গুস্তার থেকে আগত। মীর আলমের জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই, মীর আলমের পিতার বড় বোনের পুত্র। মীর আলমের সাথে তিনিও কলকাতায় ব্রিটিশ সদর দফতরে যান। পরবর্তীতে হায়দারাবাদে অতিরিক্ত ব্রিটিশ বাহিনীর বখশি বা বেতন প্রদানের দায়িত্ব লাভ করেন। সে কারণে তাকেও অতিরিক্ত বাহিনীর সাথে শ্রীরঙ্গপতম অভিযানে যেতে হয়। তিনি খায়রুন্নিসার মা শরফ-উন-নিসার পিতা। জেমসের সাথে খায়রুন্নিসার বিয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি আরিস্তু জাহের বিরাগভাজন হন। তাকে নিজামের দায়িত্ব থেকে অবসর দিয়ে জাগির প্রদান করেন।

* **দুরদানা বেগম:** বকর আলী খানের স্ত্রী ও শরফ-উন-নিসার মা। তিনি মীর জাফর আলী খানের বংশোদ্ভূত ছিলেন।

* **শরফ-উন-নিসা (১৭৫৬—১৮৪৭):** বকর আলী খানের কন্যা; খায়রুন্নিসার মা। মেহদি ইয়ার খানের স্বল্প বয়স্কা স্ত্রী। ১৭৮০ বা ৯০-এর দশকে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা হিসেবে পিতার আশ্রয়ে চলে আসেন দুই কিশোরী কন্যাকে নিয়ে। জেমসের সাথে খায়রুন্নিসার বিয়ের পর তাকে জাগির প্রদান করা হয়। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয় এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যের মাঝে কাটান তিনি।

* **মেহদি ইয়ার খান:** মির্জা কাসিম আলী খানের পুত্র, খায়রুন্নিসার পিতা ও শরফ-উন-নিসার স্বামী। তরুণী স্ত্রী ও দুই কিশোরী কন্যাকে রেখে তিনি মারা যান।

* **খায়রুন্নিসা বেগম:** শরফ-উন-নিসার কন্যা ও বকর আলী খানের নাতনি এবং জেমস অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিকের স্ত্রী। প্রথমে তার বিয়ের কথা হয়েছিল বাহরাম-উল-মুলুকের পুত্র মোহাম্মদ আলী খানের সাথে।

* **নাজির-উন-নিসা বেগম:** খায়রুন্নিসার বড় বোন।

* **দোস্তি আলী খান:** মেহদি ইয়ার খানের প্রথম স্ত্রীর পুত্র এবং খায়রুন্নিসার সৎ ভাই।

## হায়দারাবাদের অন্যান্য ওমরাহ

* **রাজা রাগোতিম রাই:** আরিস্তু জাহের ঘনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ নিজামের দরবারে প্রভাবশালী ওমরাহ। জেমস তাকে পছন্দ করতেন না। আরিস্তু জাহের মৃত্যুর পর মীর আলম তাকে বরখাস্ত করেন।

* **রাজা চান্দু লাল:** প্রথমে জেমস ও পরে মীর আলমের আশ্রিত ক্ষমতাধর ব্যক্তি। নিজাম সিকান্দার জাহের দিওয়ান হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। শরফ-উন-নিসার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে তিনিই দায়ী। কাব্যের বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক।

* **মাহলাকা বাই চান্দা:** কবি, ইতিহাসবিদ ও দরবারে অভিজাত মহিলা। প্রথমে আরিস্তু জাহের প্রিয়ভাজন ছিলেন। পরে মীর আলমের প্রেমিকায় পরিণত হন।

## লন্ডনে যারা জড়িত

* **বারবারা ইসাবেলা বুলার ও চার্লস বুলার:** উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের কন্যা ও জামাতা। কলকাতায় জেমস ইসাবেলার বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। তাদের বাড়িতেই জেমসের কন্যা কিটি ও টমাস কার্লাইলের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

* **জুলিয়া কার্কপ্যাট্রিক:** উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের কন্যা, এডওয়ার্ড স্ট্রাচের স্ত্রী এবং কিটি কার্কপ্যাট্রিকের সম্পর্কিত বোন।

* **টমাস কার্লাইল (১৭৯৫—১৮৮১):** চার্লস বুলারের পুত্রদের গৃহশিক্ষক।

### শাসনকাল

হায়দারাবাদের নিজাম

| | |
|---|---|
| নিজাম-উল-মুলক | ১৭২৪—১৭৪৮ |
| গৃহযুদ্ধ | ১৭৪৮—১৭৬২ |
| নিজাম আলী খান | ১৭৬২—১৮০৩ |
| নিজাম সিকান্দার জাহ | ১৮০৩—১৮২৯ |
| নিজাম নাসির-উদ- দৌলা | ১৮২৯—১৮৫৭ |

**নিজামের দরবারে প্রধান উজির**

| | |
|---|---|
| আরিস্তু জাহ | ১৭৭৮—১৮০৪ |
| মীর আলম | ১৮০৪—১৮০৮ |
| মুনীর-উল-মুলক | ১৮০৯—১৮৩২ |
| রাজা চান্দু লাল | ১৮৩২—১৮৪৩ |

**হায়দারাবাদে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট**

| | |
|---|---|
| জন ক্যানাওয়ে | ১৭৮৮—১৭৯৪ |
| উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক | ১৭৯৪—১৭৯৮ |
| জন অ্যাচিলেস কার্কপ্যাট্রিক | ১৭৯৮—১৮০৫ |
| হেনরি রাসেল (ভারপ্রাপ্ত) | অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৮০৫ |
| টমাস সিডেনহ্যাম | ১৮০৫—১৮১০ |
| চার্লস রাসেল (ভারপ্রাপ্ত) | জুন ১৮১০—মার্চ ১৮১১ |
| হেনরি রাসেল | ১৮১১—১৮২০ |
| স্যার চার্লস মেটকাফি | ১৮২০—১৮২৫ |

**গভর্নর জেনারেল**

| | |
|---|---|
| ওয়ারেন হেস্টিংস | ১৭৭৪—১৭৮৫ |
| মার্কেস কর্নওয়ালিস | ১৭৮৬—১৭৯৩ |
| স্যার জন শোর (ভারপ্রাপ্ত) | ১৭৯৩—১৭৯৮ |
| লর্ড ওয়েলেসলি | ১৭৯৮—১৮০৫ |
| মার্কেস কর্নওয়ালিস (পুনঃনিয়োগ) | ১৮০৫ |
| জর্জ বার্লো (ভারপ্রাপ্ত) | ১৮০৫—১৮০৭ |
| লর্ড মিন্টো | ১৮০৭—১৮১৩ |

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG